বাংলা সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরী

বাংলা সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরী

র থী ন্দ্র না থ রা য়

জি জ্ঞা সা
কলিকাতা ৯ : কলিকাতা ২৯

BANGLA SAHITYE PRAMATHA CHOUDHURY
by Dr. Rathindranath Roy

ভারতী রায়

দ্বিতীয় মুদ্রণ (জিজ্ঞাসা) আশ্বিন ১৩৭৬
অক্টোবর ১৯৬৯

প্রকাশক :
শ্রীশ্রীশকুমার কুণ্ড
জিজ্ঞাসা
৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা-৯
১৩৩এ, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-২৯

মুদ্রাকর :
শ্রীবিবেকরঞ্জন দাস
অনুশীলনী প্রকাশন,
২০ কলেজ রো, কলিকাতা-৯

শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী

পূজনীয়াসু

আমি বাঙালী জাতির বিদূষক মাত্র। তবে
রসিকতাচ্ছলে সত্য কথা বলতে গিয়ে
ভুল করেছি। কারণ নিত্য দেখতে পাই যে,
অনেকে আমার সত্যকথাকে রসিকতা বলে, আর
রসিকতাকে সত্য কথা বলে ভুল করেন।

প্রমথ চৌধুরী

ভূমিকা

প্রমথ চৌধুরীর ব্যক্তিত্ব ও মনোজীবন বিস্ময়কর। অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও কিছু কিছু আলোচনা করতে গিয়ে প্রমথ চৌধুরী সম্পর্কে একখানি পূর্ণাঙ্গ বই লেখার আকাঙ্ক্ষা জাগে। 'যুগান্তর' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত নন্দগোপাল সেনগুপ্ত মহাশয় বর্তমান লেখককে এ বিষয়ে উৎসাহিত করেন। 'বাংলা সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরী'র কোনো কোনো অংশ 'আনন্দবাজার পত্রিকা', 'জয়শ্রী' ও 'সমকালীন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এই সুযোগে ঐ সব পত্রিকার সম্পাদক ও সম্পাদিকাকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। কবিবন্ধু আনন্দগোপাল সেনগুপ্তের উৎসাহ ও উৎপীড়ন ছাড়া এই গ্রন্থ লেখা হ'ত কিনা সন্দেহ। তিনি জোর তাগিদ লাগিয়ে সমকালীনের জন্য প্রমথ চৌধুরী বিষয়ক একাধিক প্রবন্ধ আদায় করে তাঁর পত্রিকায় প্রকাশ না করলে এ বই লেখা সম্ভব হ'ত না। এই একান্ত শুভানুধ্যায়ী স্নেহশীল ও শাসন-তৎপর বন্ধুটিকে আমার হৃদয়ের অকুণ্ঠ ভালবাসা জানাই।

এই সুযোগে একটি কথা জানিয়ে রাখা ভালো। প্রমথ চৌধুরী সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ লেখার ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও এ গ্রন্থটিকে পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ বলা যায় না। পুরানো সাময়িক পত্রিকার ফাইল অনুসন্ধান করতে গিয়ে চৌধুরী মহাশয়ের এমন কিছু লেখা চোখে পড়েছে, যা তাঁর সাহিত্য-কৃতিত্ব বিচারের পক্ষে অপরিহার্য। কিন্তু দু'একটি অনিবার্য কারণে সেগুলি সর্বাংশে ব্যবহার করা সম্ভব হয় নি। প্রমথ চৌধুরী সম্পর্কে চারশো পৃষ্ঠার বই হচ্ছে শুনে কেউ কেউ একটু আশ্চর্য হয়েছেন। কিন্তু আমার মনে হয় প্রমথ চৌধুরী সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ এখনো আছে। কারণ তাঁর সাহিত্য-জীবনের সঙ্গে রবীন্দ্র-যুগের উত্তর-পর্বটি বিশেষভাবে সংযুক্ত। তাঁর এমন কিছু রচনা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ছড়িয়ে আছে, যা তাঁর মানস-জীবনের ওপরে নূতন আলোকপাত করবে। যদি পরবর্তী সংস্করণ সম্ভব হয় তবে পূর্ণতর আলোচনা করার ইচ্ছে রইলো।

গ্রন্থরচনাপ্রসঙ্গে আর একজনের নাম উল্লেখ না করলে ধন্যবাদের পালা অসম্পূর্ণই থেকে যায়। যিনি আমাকে প্রমথ চৌধুরী সম্পর্কে বই লেখার জন্য সবচেয়ে বেশী উৎসাহিত করেছেন, তিনি হলেন চৌধুরী দম্পতির একান্ত স্নেহভাজন ও সবুজপত্র পর্বের শ্রেষ্ঠ স্মৃতিচিত্রকর শ্রীযুক্ত পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়। প্রমথ চৌধুরী সম্পর্কে বই লেখা হচ্ছে জানতে পেরে তিনি স্বতঃ

প্রণোদিত হয়ে লেখককে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই। আমার ছাত্র ও বর্তমানে সহকর্মী অধ্যাপক রবীন্দু গুপ্ত আমার এই গ্রন্থ পরিকল্পনা ও প্রকাশনা ব্যাপারে নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন। তাঁকে আমার সস্নেহ আশীর্বাদ জানাই।

বিশ্বভারতী প্রকাশনী বিভাগের শ্রীসুশীল রায় ও মানবেন্দ্র পাল পুরানো পত্র-পত্রিকার ফাইল ব্যবহার করতে দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করেছেন। 'ইস্ট এণ্ড কোম্পানী'র কর্ণধার শ্রীজ্যোতিভূষণ বিশ্বাস ও তাঁর সহকর্মীদের প্রীতি-পক্ষপাত ব্যতীত গ্রন্থ-প্রকাশ ব্যাপারটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হত না। তাঁদের আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। তরুণ শিল্পী শ্রীমান রোহিণী মুখোপাধ্যায় অতি অল্প সময়ের মধ্যে প্রচ্ছদপট এঁকে কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। সাহিত্যরসিকদের কাছে যদি প্রমথ চৌধুরীর বিদগ্ধ মনোজীবন ও শিল্পকৃতিত্বের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতে পারি, তা হলে আমার শ্রম সার্থক হয়েছে মনে করব।

ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৮
কলিকাতা

রথীন্দ্রনাথ রায়

দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রসঙ্গে ঃ

নিবেদন

'বাংলা সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরী' প্রকাশের অল্পকালের মধ্যেই এর প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হয়। তারপর নানা জায়গা থেকেই দ্বিতীয় সংস্করণ শীঘ্র প্রকাশের জন্য অনুরোধ আসতে থাকে। গ্রন্থকারের অপেক্ষাকৃত পরিমার্জিত এবং পরিবর্ধিত আকারে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের ইচ্ছা ছিল। কিন্তু আকস্মিক লোকান্তর গমন তাঁর আরব্ধ ও পরিকল্পিত আরো অনেক কাজের মত এ কাজটিকেও অসমাপ্ত রেখে দিল। আমরা বইখানিকে তাই সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত আকারে পুনঃ প্রকাশ করলাম।

২/১ রামকৃষ্ণ লেন
আশ্বিন, ১৩৭৬

ভারতী রায়

সূচীপত্র

গতানুগতিক জীবনাচরণের ধারাকে কাটিয়ে ওঠা সহজ নয়। তার কারণ অনভ্যস্ত পথে যাত্রা করা অর্থ বহু বাধা-বিঘ্নকে বরণ করে নেওয়া। তার জন্য দরকার প্রচুর মানসিক শক্তির ও সংস্কারহীন দৃষ্টির। যাঁরা গড্ডলিকা-প্রবাহে গা ভাসিয়ে না দিয়ে নূতন পথের প্রবর্তন করতে চেয়েছেন, তাঁরা সমসাময়িক দেশ-কাল থেকে পেয়েছেন নানা বিরুদ্ধতা, মুষ্টিমেয় নবীন-প্রত্যাশী হয়তো তাঁদের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। সাময়িকতার ধূলিজাল নিঃসন্দেহে তাঁদের সামনের পথকে অস্পষ্ট ক'রে তুলতে চেয়েছে, কিন্তু বার বার প্রতিহত হয়েছে। সুলভ জনপ্রিয়তা ও সোল্লাস অভ্যর্থনা হয়তো তাঁদের ভাগ্যে জোটে নি। তবুও চিন্তার স্বাতন্ত্র্যে, ব্যক্তিত্বের বলিষ্ঠতায় তাঁরা অনাগত-কালের সীমান্তে অবিস্মরণীয় চিহ্ন রেখে গেছেন। বহু আলোচনা ও বিতর্কের ভিড়েও তাঁরা হারিয়ে যান না, তাই শতকণ্ঠের কোলাহল যখন স্তব্ধ হ'য়ে আসে, তখনও তাঁদের শান্ত ধীর ও প্রত্যয়নিষ্ঠ কণ্ঠ শোনা যায়। তেমনি একজন মানুষ প্রমথ চৌধুরী।

নব্যতন্ত্রী সাহিত্যের অগ্রপথিক, সাহিত্যের ক্ষেত্রে নূতন রূপ ও রীতির প্রবর্তক প্রমথ চৌধুরী [১৮৬৮-১৯৪৬]। 'সবুজপত্র' সম্পাদকের বর্ণনা দিয়েছেন একজন প্রত্যক্ষদর্শী, 'প্রশস্ত ললাটে ও গভীর দৃষ্টিতে তাঁর প্রখর বুদ্ধিমত্তার দীপ্তি উদ্ভাসিত মনে হলো। গৌরবর্ণ দোহারা চেহারায় সাদা আদ্দির বুঁটিদার পাঞ্জাবি, পরণে সাদা ঢিলে পায়জামা। দুহাতের তর্জনী ও মধ্যমার ফাঁক-দুটো সিগারেটের ধোঁয়ায় লালচে হয়ে গেছে।'[১] রূপে, প্রখর বুদ্ধিদীপ্তিতে, রুচিতে ও মানসপ্রকর্ষে তিনি ছিলেন অনন্য। বিরাট লাইব্রেরী, প্রচুর অবকাশ—নূতন বই কেনা ও তা পড়ার অনলস আগ্রহ, ব্যক্তিত্বে ও মানসিকতায় বাদশাহী আভিজাত্য, আলাপে-আচরণে স্বকীয়তা সব কিছু মিলিয়ে তাঁর উপস্থিতি বিস্ময়কর। পড়েছেন বহু, লিখেছেন তার তুলনায় নিতান্তই অল্প। অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সে কলম ধরেছেন, কিন্তু সিদ্ধিলাভ করতে মোটেই দেরী হয় নি। পরিণত মন নিয়েই সাহিত্য-ক্ষেত্রে তিনি দেখা দিয়েছিলেন—ধূমকেতু নয়, ধ্রুবতারা হিসেবেই।

'সবুজপত্রে'র কাল থেকে তাঁর সাহিত্যিক জীবনের খবরাখবর কম-বেশী সকলের জানা। বৃহত্তর সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পটভূমিতে তাঁর

পরিচয় আছে। কিন্তু অখ্যাত প্রমথ চৌধুরীর বিলেত-যাত্রা পর্যন্ত কাহিনীটি তিনি নিজেই বলেছেন তাঁর আত্মকথায়। তাঁর পৈত্রিক ভদ্রাসন পাবনা জেলার হরিপুর গ্রামে, জন্মভূমি যশোর, মানসিক গঠন ও ভাষা কৃষ্ণনগরের, সাধনপীঠ কলকাতায়। যশোর, তাঁর মনোজীবন-গঠনের কোন সাহায্যই করে নি। নিতান্ত অল্প বয়সেই যশোর ছেড়ে কৃষ্ণনগরে আসতে হয়। চৌধুরী মহাশয়ের সমালোচকদের কাছে যশোরের দু'টি ছবি মূল্যবান। প্রথমটি পিরালীবাবুর জলকেলি; দ্বিতীয়টি, বালিকা বিদ্যালয়ের 'শান্তশিষ্ট', 'উজ্জ্বল শ্যাম' একজন সহপাঠিনী। প্রথমটির কিছু ছাপ তাঁর 'আহুতি' গল্পটিতে আছে, আর দ্বিতীয়টির উপাদান নিয়ে তাঁর 'নীল-লোহিতের আদিপ্রেম' গল্পটি রচিত হয়। যশোরের অগ্নিকাণ্ডের স্মৃতিটিও সেখানে বাদ পড়ে নি। চুয়াত্তর বছর বয়সে আত্মজীবনী বলতে ব'সে প্রমথ চৌধুরী এই ঘটনার উল্লেখ ক'রে বলেছেন 'আর আমি একটি বালিকা-বিদ্যালয়ে ভর্তি হ'য়েছিলুম। একটি বালিকাকে আজও মনে আছে। মেয়েটি ছিল শান্তশিষ্ট আর তার কপালজোড়া দু'টি চোখ, নাক খাঁদা নয়, আর বর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম। পাঁচ বছর বয়সে যদি কেউ love-এ পড়ে তাহ'লে আমি তার সঙ্গে love-এ পড়েছিলুম। অনেকদিন পর্যন্ত আমার মনে হ'ত মেয়েটির কি হল, কার সঙ্গে বিয়ে হল। এই মেয়েটিকে মন থেকে ঝেড়ে ফেলবার জন্য একটি ছোট গল্পও পরে লিখেছি।'

প্রমথ চৌধুরীর মানসিক জীবনের পক্ষে কৃষ্ণনগরের স্থান অসাধারণ। রূপ-রস আস্বাদনের চেতনার উন্মেষ কৃষ্ণনগরেই। কৃষ্ণনগরই তাঁকে দিল রূপের দীক্ষা, 'কৃষ্ণনগরে পদার্পণ করা মাত্র ইন্দ্রিয়গোচর পদার্থ সব আমার নাক, কান, চোখের ভিতর দিয়ে ভিড় ক'রে ঢুকতে লাগল।...আমি নানাবস্তুর রূপ দেখলুম আর তাদের নামও শিখলুম। দার্শনিকেরা যাকে বলেন নামরূপের জগৎ সেই জগতের সঙ্গে আদান-প্রদানের কারবার আরম্ভ হল।' তখনকার অর্ধেক পাড়াগাঁ, অর্ধেক শহর কৃষ্ণনগরে বাল্যকালেই নানা শ্রেণীর লোকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল—ঘুড়ি ওড়ানোর সূত্র ধরেই সব জাতের ছেলেদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। বিচিত্র বস্তুজ্ঞানও কৃষ্ণনগরের জীবনেই তিনি লাভ করেন।

কৃষ্ণনগরই চৌধুরী মহাশয়ের সাংস্কৃতিক জীবনের ভূমিকা রচনা করে। পাঠ্যপুস্তক থেকে তিনি ভাষা শেখেন নি, নানা শ্রেণীর লোকের মুখের ভাষা

তাঁর ভাষাশিক্ষার মূলে। তিনি বলেছেন, 'আমি জন্মেছিলুম পদ্মাপারের বাঙ্গাল, কিন্তু আমার মুখে ভাষা দিয়েছে কৃষ্ণনগর।' বাক্‌চাতুরী ও রসিকতা সেকালের কৃষ্ণনগরের ভাষার প্রধান ঐশ্বর্য ছিল। তথাকথিত ধর্মবিষয়ক গোড়ামিও সেখানে ছিল না। সাম্প্রদায়িক মতামত-মুক্ত উদার মনের পক্ষে পরিহাস-রসিকতা একটি আর্টের বিষয় হ'য়ে উঠেছিল। বৈদেশিক সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর পরিচয় অতি অল্প বয়সেই—বাড়ীতেই বৈদেশিক সাহিত্যের আবহাওয়া ছিল। পিতা ছিলেন হিন্দু কলেজের ছাত্র—ইংরাজী বইয়ের বিরাট এক লাইব্রেরী ছিল তাঁর। প্রমথ চৌধুরীর বই পড়া ও বই কেনার স্বভাব সেখান থেকেই গড়ে ওঠে। তাঁর ভাইয়েরা সকলেই ছিলেন কৃতবিদ্য। লাইব্রেরীর আবহাওয়ায় তিনি মানুষ হয়েছেন আর ইংরেজী নভেল পড়ার দীক্ষা পান সেজদা কুমুদনাথের কাছ থেকে।

প্রমথ চৌধুরীর রূপজ্ঞানের দীক্ষাও হয়েছে কৃষ্ণনগর থেকে। কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুল বাংলাদেশের অন্যতম সম্পদ। কৃষ্ণনগরের আহ্লাদী-পুতুল সম্পর্কে তিনি বলেছেন, 'আমি তাদের হাতের চমৎকার আহ্লাদী-পুতুল দেখেছি, যার দাম দু'পয়সা। ওর ভিতর এমন গড়নের কৌশল আছে যা দেখে হাসি পায়। মুখব্যাদান ক'রে এ পুতুল লোককে হাসায় না, হাসায় তার গড়নের গুণে। আজকাল শিশুপাঠ্য বইয়ের ছবিগুলি প্রায়ই ভয়ঙ্কর। ভয়ঙ্কর রস যে হাস্যরস নয়, সে জ্ঞান কৃষ্ণনগরের পুতুল-নির্মাতাদের ছিল।' কৃষ্ণনগরের গুণীদের রূপ-রসজ্ঞান বালক প্রমথ চৌধুরীর মনোজীবনকে গভীর-ভাবে প্রভাবিত করে। ভাস্কর্যের মতো স্থাপত্যেও কৃষ্ণনাগরিকদের বিশেষত্ব ছিল। দালান, নাটমন্দির, থাম, খিলান প্রভৃতিতে মুসলমান স্থাপত্যের সুন্দর নিদর্শন তাঁর চোখে পড়েছে। কিন্তু চৌধুরীপরিবারে কস্মিন-কালে সঙ্গীত-চর্চার রেওয়াজ ছিল না। তাঁরা যাদবানন্দ কীর্তনীয়ার বংশধর এবং নবদ্বীপ-শান্তিপুরের প্রতিবেশী হ'য়েও সঙ্গীত সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন। প্রমথ চৌধুরী তাঁর মায়ের সঙ্গীতপ্রিয়তা উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেন। কৃষ্ণনগরে তখন সঙ্গীতচর্চা হ'ত—দ্বিজেন্দ্রলালের পিতা দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায় ছিলেন একজন বড়ো ওস্তাদ। উত্তরকালে প্রমথ চৌধুরী মার্গসঙ্গীত সম্পর্কে কিছু আলোচনা করেছেন। বাল্যকালের এই সঙ্গীত-পরিবেশই তার জন্য দায়ী। তিনি বলেছেন 'এ সব গানই গাওয়া হ'ত ওস্তাদী ঢংয়ে, ওস্তাদদের তালকর্তব বাদ দিয়ে। সেকালের বাঙ্গলা গানকে হিন্দী গানের

অপভ্রংশ বলা যেতে পারে।···ফলে বাল্যকালে আমার কান তৈরী হয়েছিল বাঙ্গলায় যাকে বলে ওস্তাদী ঢংয়ের গানে। আজ পর্যন্ত আমার কানের সে অভ্যাস যায় নি। আমার কান সহজেই মার্গসঙ্গীতের অনুকূল।'

হরিপুরের যে চিত্র তাঁর 'আত্মকথা'য় আছে, তা থেকে তাঁর মনোজীবন, এমন কি দু'একটি প্রসিদ্ধ গল্পেরও উপাদান পাওয়া যায়। প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যিক মননের মধ্যে নাগরিক মেজাজ যতই থাকুক না কেন, অনেকগুলি গল্পেই পুরাতন জীবনধারার ছাপ আছে। জমিদার-শাসিত অতীত কালের পল্লী-বাংলার মোহ তাঁর গল্প থেকে একেবারে অপসারিত করা সম্ভব হয় নি। তাঁর নাগরিক মেজাজের সঙ্গে এই আপাত-বিরোধী উপাদানটুকু অক্লেশে মিশে ছিল। তিনি নিজেই বলেছেন, 'আমার মনে ও চরিত্রে শহরের ও পাড়াগাঁয়ের প্রভাব কতটা আছে বলতে পারি নে, তবে দুইয়ের কতকটা আছে। তার ফলে আমার মনে পরস্পর-বিরোধী সংস্কার থাকা সম্ভব।' প্রমথ চৌধুরীর ছোট গল্পগুলি প্রসঙ্গে তাঁর এই মূল্যবান স্বীকৃতিটি মনে রাখা প্রয়োজন। হরিপুর গ্রামে তিনি চৌধুরী পরিবারের যে চিত্র এঁকেছেন, তাকে অনায়াসেই 'আহুতি' গল্পটির বহিরাবরণ হিসেবে ধরা যেতে পারে। হরিপুরের ছাপ অবশ্য তাঁর বেশী গল্পে নেই।

দুই

কৃষ্ণনগর প্রমথ চৌধুরীকে দিয়েছে ভাষা ও রূপজ্ঞানের মোহন মন্ত্র। তাই তিনি কীর্তিমান হ'য়েও পরিণত বয়সে কৃষ্ণনগরের কথা ভুলতে পারেন নি—বার বারই নিজেকে 'কৃষ্ণনাগরিক' বলে পরিচয় দিয়েছেন। ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আশুতোষ চৌধুরী পাঁচ বছর পরে বিলেত থেকে ফিরে এলেন। এর পর থেকে চৌধুরী মহাশয়ের মনোজীবনের ওপর সাহিত্যের সাত সমুদ্রের আলো ছড়িয়ে পড়ল। বড়দা আশুতোষ চৌধুরীর বিশেষ বন্ধু ছিলেন রবীন্দ্রনাথ—সেই সূত্র ধরেই তরুণ কবি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আঠারো বছরের এই তীক্ষ্ণধী জিজ্ঞাসুর পরিচয়। তাঁর প্রথম রবীন্দ্র-দর্শনের স্মৃতি বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি নিজেই বলেছেন, 'রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সংক্ষেপে আমার বক্তব্য এই যে, আমি প্রথমেই আবিষ্কার করি তিনি দেহে ও মনে একটি লোকোত্তর পুরুষ।' রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর এই ধারণাটি পরবর্তীকালে আরও গাঢ় হয়েছিল। এই সময় থেকে তাঁর মানস-পরিণতির দ্বিতীয় অধ্যায়ের সুরু হ'ল বলা যায়। সঙ্গীত,

সাহিত্য ও চিত্রকলা—সংস্কৃতির এই তিনটি ধারার লালনে তাঁর মনোজীবন বিকশিত হ'য়ে উঠেছিল। চৌধুরীদের মট্‌স লেনের বাসা শিল্প-সংস্কৃতিচর্চার কেন্দ্রে পরিণত হ'ল। প্রমথ চৌধুরীর ফরাসী সাহিত্যের হাতেখড়িও হ'ল এই সময় থেকেই। তাঁর মানস-সংগঠনের পক্ষে এই অধ্যায়টি অত্যন্ত মূল্যবান। ফরাসী সাহিত্য, প্রি-র‍্যাফালাইট্‌ কবিদের কবিতা ও প্রি-র‍্যাফালাইট্‌ শিল্পের সঙ্গেও তাঁর পরিচয় হ'ল, 'দাদার সঙ্গে কলকাতা প্রত্যাবর্তনের পর আমার জীবন ও মনের মোড় ফিরে গেল। দাদা যে সব নূতন লেখকের বই নিয়ে এসেছিলেন, আমি পূর্বে কখনো তাদের নাম শুনি নি,—যথা, রসেটি ও স্থইনবার্ণ প্রভৃতির কবিতা। আর ছবি সম্বন্ধে Pre-Raphaelite art-এর সঙ্গে প্রথম পরিচিত হই। দাদার বাড়ির আবহাওয়া aesthetic ছিল।'—তা ছাড়া এইকালেই তিনি জোড়াসাঁকোর অসাধারণ পরিবারটির নিকটসংস্পর্শে আসেন। উনিশ শতকের শেষ দু'দশকে তরুণ রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র ক'রে কলালক্ষ্মীর যে নিত্য নূতন প্রসাধন চলেছিল, প্রমথ চৌধুরী তার সর্বগ্রাসী আকর্ষণ থেকে মুক্ত হ'তে পারেন নি। 'বাল্মীকি-প্রতিভা' গীতিনাট্যটির স্মৃতি তাঁর তরুণ মনে রেখাপাত করেছিল। উনিশ শতকীয় 'রেনেসাঁ'র শেষ-রশ্মিটুকু রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র ক'রে শেষবারের মতো শত শিখায় জ্বলে উঠেছিল—সঙ্গীত-সাহিত্যের অনলস-চর্চা, অসাধারণ মানসিক বিস্তৃতি, উদারনৈতিক জীবনদৃষ্টি সে যুগের সাংস্কৃতিক জীবনকে গৌরবান্বিত ক'রে তুলেছিল। আধুনিক কালে সঙ্গীত-সমালোচনার ক্রম-প্রসারণ লক্ষণীয়। প্রমথ চৌধুরী যেকালে সঙ্গীত আলোচনা করেন, তখনকার কালকে সঙ্গীত-আলোচনার আদিযুগ বলা যেতে পারে। ঠাকুর-পরিবারের সঙ্গীতরসিক আবহাওয়া তাঁর সঙ্গীতমুগ্ধ মনটিকে পুষ্ট করেছিল।

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপজ্ঞানের সাধনা প্রথম চৌধুরীর শিল্পীজীবনের এক বড় বৈশিষ্ট্য। তিনি সৌন্দর্য সম্পর্কে তাঁর অভিমতটিকে প্রবন্ধে ও গল্পে নানা ভাবে বলেছেন। রূপ সম্পর্কে তিনি অতীন্দ্রিয়পন্থী ছিলেন না। যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও প্রত্যক্ষগোচর তাকেই তিনি রূপ বলে স্বীকার করেছেন। এই ইন্দ্রিয়-নির্ভর রূপজ্ঞান ঠাকুরপরিবারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে এসে প্রখরতর হয়েছিল। তিনি নিজেই বলেছেন, 'পূর্বেই বলেছি যে, রূপজ্ঞানে আমি বর্জিত ছিলুম না। যে রূপ চোখে দেখা যায় সে রূপের আমি চিরকালই অনুরাগী ছিলুম। এবং এই ঠাকুরপরিবারের তুল্য সুন্দর স্ত্রী-পুরুষ আমি অন্য কোন পরিবারে দেখি নি। যে রূপ শ্রোত্র-রসায়ন, সে রূপেরও এঁরা সম্যক চর্চা করতেন। বাকি থাকল

এক কাব্যের কথা। সে কথা পরে বলব।' ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপের ভক্ত প্রমথ চৌধুরী তাঁর এই রূপানুভূতির স্বরূপের কথা 'রূপের কথা' প্রবন্ধটিতে আরও বিস্তৃত ক'রে বলেছেন, 'বস্তুর রূপ বলে যে একটি ধর্ম আছে, এ হচ্ছে শোনা কথা নয়—দেখা জিনিস। যাঁর চোখ নামক ইন্দ্রিয় আছে, তিনি কখন-না কখনও তার সাক্ষাৎ লাভ করেছেন এবং আমাদের সকলেরই চোখ আছে,—সম্ভবতঃ শুধু তাঁদের ছাড়া, যাঁরা সৌন্দর্যের নাম করলেই অতীন্দ্রিয়তার ব্যাখ্যান অর্থাৎ উপাখ্যান স্বরু করেন। আমি এই রূপ জিনিসটিকে অতি-বর্জিত ইন্দ্রিয়ের কোঠাতেই টি'কিয়ে রাখতে চাই—কেননা, অতীন্দ্রিয় জগতে রূপ নিশ্চয়ই অরূপ হ'য়ে যায়।' ছোটগল্পে, বিশেষতঃ নারীচরিত্র-বর্ণনায় তাঁর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপচেতনার বিচিত্র ভঙ্গি, বর্ণ ও রেখাবিন্যাসের কুশলী স্বাক্ষর বিদ্যমান।

উনিশ শতকের শেষ দু'দশকের সাংস্কৃতিক আবহাওয়া শেক্সপীয়রের নাটক ও বায়রণের স্বাধীনতা-স্বপ্নে মুখরিত ছিল। দেশপ্রেমিকতার স্বপ্নে, 'পলাশীর যুদ্ধ' ও 'পদ্মিনী উপাখ্যান'-এর উদ্দীপ্ত জাগরণমন্ত্রে, মিল এমার্সনের রচনায়, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের আস্বাদনে সে যুগের শিক্ষিত সাধারণের মনের আকাশ আলোকিত ছিল। তখন রবীন্দ্রনাথের 'কড়ি ও কোমল'-এর রচনাকাল—আশুতোষ চৌধুরীর মট্‌স লেনের বাসায় তিনি প্রায়ই এসে তাঁর কবিতার পাণ্ডুলিপি পড়তেন—দুই বন্ধুতে কাব্যসম্পর্কে গভীর আলোচনা হ'ত। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনস্মৃতিতে এই যুগের একটি অন্তরঙ্গ চিত্র দিয়েছেন। এই ঘটনার প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে প্রমথ চৌধুরী সে দিনের কথা স্মরণ ক'রে লিখেছেন, 'এই আলোচনার ফলে কবিতা সম্বন্ধে আমার মন যেন জেগে উঠল। তিনি কবে কি বলেছেন, তা অবশ্য আমার মনে নেই। তবে যেমন তিনি (রবীন্দ্রনাথ) আমাদের পরিবারে সঙ্গীতের আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছিলেন, তেমনি আমাদের মধ্যে কাব্যচর্চারও আবহাওয়া সৃষ্টি করেন, এই পর্যন্ত বলতে পারি। খুব সম্ভবতঃ আমি তাঁর দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছি।' প্রথম চৌধুরীর এই স্বীকৃতি আপাত-দৃষ্টিতে একটু অসঙ্গত ব'লেই বোধ হবে। তার কারণ সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি মূলতঃ রবীন্দ্রনাথের বিপরীত মার্গের সাধক—হৃদয়াবেগ-বর্জিত বুদ্ধিদীপ্ত বাণী-বিন্যাসের তিনি কুশলী শিল্পী। স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণার চেয়ে সযত্ন-কলাকৃতির ওপরেই তিনি নির্ভরশীল। কিন্তু তাঁর মার্জিতবুদ্ধি বিদগ্ধমন যে অভিজাত-রুচি মানসিকতার লালন চেয়েছিল, রবীন্দ্রনাথের চলনে-বলনে-রুচিতে নিঃসন্দেহে সে পিপাসা মিটেছিল।

সে যুগের সাংস্কৃতিক পরিবেশে কয়েকজন পাশ্চাত্য সাহিত্যরসিকের নাম উল্লেখযোগ্য—প্রমথ চৌধুরীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আশুতোষ চৌধুরী, সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ, লোকেন্দ্রনাথ পালিত, প্রিয়নাথ সেন। এঁদের মধ্যে এক প্রিয়নাথ সেন ছাড়া যথার্থ লেখক কেউ-ই ছিলেন না—কিন্তু এঁদের মতো সাহিত্যরসিক ও সমঝদার দুর্লভ। তা ছাড়া এঁরা সকলেই ফরাসী-সাহিত্যরসিক ছিলেন। সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সম্পর্কে চৌধুরী মহাশয় বলেছেন, 'তিনি ফরাসী ভাষা ভালই জানতেন এবং অসংখ্য ফরাসী নভেল পড়তেন। সুতরাং সাহিত্যরসে একেবারে বঞ্চিত ছিলেন না।' লোকেন পালিতের কথা বলেছেন, 'লোকেন পালিত ছিলেন I. C. S. আর দিবারাত্র সাহিত্যালোচনা করতেন। এ বিষয়ে তাঁর মুখে খই ফুটত।' প্রিয়নাথ সেন সম্পর্কে তিনি নানা প্রসঙ্গ আলোচনা ক'রেছেন। তাঁর সাহিত্যানুরাগ, সূক্ষ্ম ও সুমার্জিত রসবোধ, ফরাসী-সাহিত্যরসিকতা ও বহুপঠনশীলতা প্রমথ চৌধুরীর সশ্রদ্ধ প্রশংসা অর্জন করেছিল। প্রিয়নাথ সেনের মৃত্যুর পর তিনি লিখেছিলেন, 'আমরা উভয়ে একই রসের,—সাহিত্যরসের,—রসিক ব'লে, সেই প্রথম সাক্ষাতে আমাদের উভয়ের মধ্যে যে আত্মীয়তা জন্মায় তা তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। যদিচ তখন আমি কলেজের ছাত্র এবং তিনি সাহিত্য-সমাজে গণ্যমান্য ব্যক্তি, তবুও পাঁচ মিনিটের আলাপে আমরা পরস্পরের বন্ধু হয়ে উঠলুম।…৺প্রিয়নাথ সেন ফরাসী সাহিত্যের প্রতি অতিশয় অনুরক্ত ছিলেন। ফরাসী ভাষার সঙ্গে আমার সামান্য পরিচয় এবং ফরাসী সাহিত্যের প্রতি আমার বিশেষ অনুরাগ ছিল ব'লে, প্রথম থেকেই তিনি আমাকে তাঁর সাহিত্যিক বন্ধুশ্রেণীতে ভুক্ত করে নেন'।[২] প্রমথ চৌধুরীর জ্ঞানতৃষ্ণার স্বরূপ বিচিত্র। এম. এ. পাশ করার পরে তিনি সংস্কৃত ও ইতালীয় ভাষা চর্চা সুরু করেন। জ্ঞানের ক্ষেত্রে তিনি পল্লবগ্রাহী ছিলেন না, সব কিছুর মূলে প্রবেশ করায় ছিল তাঁর অসীম আগ্রহ—সব কিছুর জহুরী হয়েও পাণ্ডিত্যকে জাহির করা ছিল তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ।

চিন্তার মৌলিকতা ও রচনারীতির পরিচ্ছন্নতা তাঁর ছাত্রজীবন থেকেই পরিস্ফুট হয়েছিল। সাহিত্য ছাড়া দর্শন তাঁর অত্যন্ত প্রিয় বিষয় ছিল। তাঁর ছাত্রজীবনের মধ্যেই মননশীলতা, নিজস্ব চিন্তাশক্তি ও সুপরিচ্ছন্ন প্রকাশনিপুণতা ছিল—পরবর্তীকালের সাহিত্যিক জীবনে তারই পূর্ণতর রূপ উদ্ভাসিত হয়েছে। বি. এ. তে ফিলজফি অনার্সে ফার্স্ট হওয়ার পর সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক পি. কে. রায় তাঁকে বলেছিলেন 'তুমি যে ফিলজফি সব

ছাত্রের চেয়ে বেশী জ্ঞান তা নয়; কিন্তু তোমার কাগজ যারা পরীক্ষা করেছে, সেই ইংরেজ অধ্যাপকেরা আমাকে বলেছে যে তোমার মত অপর কেউ এত সুন্দর ও পরিষ্কার ক'রে লিখতে পারে না।' ইংরেজীর এম. এ. তে তিনি প্রথম শ্রেণীর প্রথম স্থান অধিকার করেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্যটি প্রণিধান-যোগ্য, 'আমি শেক্সপীয়রের সমালোচনা অন্য কোন সমালোচকের বইয়ে পড়ি নি। আমার নিজের মতামত নিজের ভাষায় ব্যক্ত ক'রেছিলুম, যা ইংরেজের কাছেও গ্রাহ্য হত।' এর থেকেই বেশ বোঝা যায় যে আস্বাদনের ক্ষেত্রে তিনি প্রথম থেকেই পরের মুখে ঝাল খেতে অভ্যস্ত ছিলেন না।

তিন

ধরাবাঁধা চাকুরি-জীবনকে তিনি পরিহার করেছেন। বহরমপুর কলেজ ও কুচবিহার কলেজ—দু'জায়গা থেকেই প্রিন্সিপ্যালের পদ গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ এসেছিল। বলা বাহুল্য, দু'টির কোনটিই তিনি গ্রহণ করেন নি। প্রমথ চৌধুরীর মনোজীবনের স্বরূপ নির্ণয়ের পক্ষে এই সামান্য তথ্যটুকুও কম মূল্যবান নয়। এই ধরণের মানসিকতার সঙ্গে অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী দেশের অভিজাত মানস-মণ্ডলের খানিকটা সাদৃশ্য আছে। (অবশ্য রাজনৈতিক চক্রান্ত ও অবৈধ প্রেমাভিনয় ছাড়া)। মনকে পরিণত ক'রে তোলার উপযুক্ত অবসর তিনি পেয়েছিলেন। কৃষ্ণনগরের ভাষা, ঠাকুরপরিবারের বিদগ্ধ পরিবেশ, বিলেত-ফেরৎ সাহিত্য-রসিকদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, বই কেনা ও বই পড়া তাঁর মনকে ও রুচিকে তৈরী করেছিল। তাঁর রচনাবলীর সঙ্গে পরিচিত হওয়া অর্থ দেশ-বিদেশের নানা সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের সঙ্গে পরিচিত হওয়া। তাঁর প্রবন্ধগুলির মধ্যে নানা প্রসঙ্গের উল্লেখ থেকে তাঁর বহু-শাখায়িত পঠনশীল মনের পরিচয় পাওয়া যায়। 'সবুজপত্র' পত্রিকা প্রকাশের আগে তাঁর মাত্র কয়েকটি রচনা সাময়িক পত্রিকার অভ্যন্তরে আত্মগোপন ক'রে ছিল—একমাত্র বই আকারে বেরিয়েছিল 'সনেট পঞ্চাশৎ'। প্রমথ চৌধুরীর লেখায় কাঁচা হাতের ছাপ নেই বললেই হয়, কারণ পরিণত মন নিয়েই তিনি কলম ধরে-ছিলেন। তাঁর লেখায় তাই ক্রম-পরিণতির ইতিহাস তেমন স্পষ্ট নয়—'অনন্ত যৌবনা উর্বশী'র মতো তাঁর মনটিও চির-পরিণত ছিল। রবীন্দ্রনাথের রচনার মধ্যে তাঁর কবি-মানসের প্রারম্ভ থেকে পরিণতি পর্যন্ত সবগুলি স্তর বিদ্যমান। প্রমথ চৌধুরীর মনোজীবনও নিঃসন্দেহে কতকগুলি স্তর অতিক্রম

করেছিল, কিন্তু তাঁর রচনায় তার বিশেষ কোন পরিচয় নেই। লেখার চেয়ে তিনি চিন্তার অনুশীলন করেছেন বেশী। ইতিহাসে এর অনুরূপ কাহিনী আছে। জুলিয়াস সীজার পরিণত বয়সে অস্ত্র ধরেছিলেন, কিন্তু সেইদিন থেকেই তিনি শ্রেষ্ঠ সেনাপতি হয়েছিলেন।

সাধুভাষায় তাঁর পাঁচটি লেখা আছে। 'প্রবাসস্মৃতি' [গল্প] 'জয়দেব' [প্রবন্ধ], 'আদিম মানব', 'ফুলদানী' [মেরিমের ফরাসী গল্পের অনুবাদ], 'টরকয়টো টাসো এবং তাঁহার সিদ্ধ বেতালের কথোপকথন' [ইতালীয়ের অনুবাদ]। তাঁর প্রথম প্রবন্ধ 'জয়দেব' ১২৯৭ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটিতে তিনি প্রচলিত মতের বিরুদ্ধতা করেন—জয়দেবকে তিনি কবি হিসেবে উঁচু স্থান দিতে রাজি হন নি। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ প্রভৃতি আরও ক'জন এতে মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন। কিন্তু অক্ষয় বড়ালের মতো লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবির তিনি সপ্রশংস অনুমোদন লাভ করেছিলেন। 'ফুলদানী' তর্জমাটিকে রবীন্দ্রনাথ 'সাধনা' পত্রিকায় তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের আপত্তির কারণ ছিল—প্রথমতঃ লেখাটি কাঁচা, এই ধরণের গল্প বাংলা সাহিত্যের অন্তর্ভূ'ত হওয়া অনুচিত। চৌধুরী মহাশয় তাঁর প্রথম ত্রুটি মেনে নিয়েছেন, দ্বিতীয়টি মানতে পারেন নি, কারণ সেখানে নৈতিকতার প্রশ্নও ছিল। 'সাহিত্যিক শুচিবাই' তাঁর কোন কালেই ছিল না। এখানেও প্রমথ চৌধুরীর মনোজীবনের একটি বড় সত্য উদ্ভাসিত হয়েছে। 'সাহিত্যিক শুচিবাই' তাঁর ছিল না বটে, কিন্তু তার জন্য তাঁর অভিজাতরুচির বিন্দুমাত্র পদস্খলন ঘটে নি। তাঁর মনের মধ্যে কোথায় যেন একটি শীতলস্পর্শ কঠিন শিলাস্তর ছিল—তাই অশ্লীল না হ'য়েও 'অসামাজিক' কাহিনী বলা তাঁর পক্ষে মোটেই অসম্ভব ছিল না।

'সবুজপত্র' পত্রিকার প্রথম প্রকাশকালের প্রায় বারো বছর (১৩০৯) আগে থেকেই তিনি চলিত ভাষার সমর্থকরূপে প্রবন্ধ-সাহিত্যের ক্ষেত্রে দেখা দিলেন। সবুজপত্রের পেছনে কোন ব্যবসায়ী উদ্দেশ্য ছিল না—তাই সুলভ জনপ্রিয়তা অর্জনের পথ তিনি অনায়াসেই বর্জন করলেন। 'বঙ্গদর্শন'-এর পর এমন উচ্চাঙ্গের অভিজাত-রুচি পত্রিকা আর হয় নি। সাময়িক পত্রিকার মধ্যে 'সাময়িকতা ও সাংবাদিকতা'র যে সঙ্কীর্ণ সীমারেখা থাকে, সবুজপত্র তার ধার দিয়েও যায় নি। তা ছাড়া সেই সময় এই ধরণের একটি পত্রিকার প্রয়োজনও ছিল। নানা ধরণের প্রতিক্রিয়াশীল মন্তব্যের জন্য জর্জরিত হ'য়ে রবীন্দ্রনাথ

সাময়িকপত্রের জন্য কিছু লিখবেন না স্থির করেছিলেন।[৩] সেই সময় মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও প্রমথ চৌধুরীর মধ্যে নূতন পত্রিকা প্রকাশ সম্পর্কে আলোচনা হয়। পত্রিকা প্রকাশের ব্যাপার রবীন্দ্রনাথের অনুমোদন লাভ করে—তিনি নিয়মিত লেখা দিতেও প্রতিশ্রুত হন। প্রমথ চৌধুরী সাহিত্যের যে মানদণ্ড সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন, তার আদর্শও ছিল খুব উচ্চশ্রেণীর। এই কারণেই সবুজপত্রের নিয়মিত লেখকসংখ্যা খুব বেশী ছিল না। অধিকাংশ অংশই সম্পাদক ও রবীন্দ্রনাথের লেখাতে-ই জুড়ে থাকত। কিন্তু নূতন লেখক সৃষ্টি করার দিকে তাঁদের আগ্রহ কম ছিল না—রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে প্রমথ চৌধুরীর কাছে একাধিক চিঠি লিখেছেন। সবুজপত্রের লেখকগোষ্ঠীর মতো পাঠকসংখ্যাও ছিল সীমাবদ্ধ। কিন্তু যাঁরা নিতান্ত তরুণ বয়সে সবুজপত্রের আসরে উপস্থিত হতেন, তাঁদের রচনাতেও নানাদিক দিয়ে বৈশিষ্ট্য আত্মপ্রকাশ করেছিল। সবুজপত্রের তরুণতর লেখকদের রচনাতেও পরিচ্ছন্ন রচনারীতি, বুদ্ধিদীপ্ত মননশীলতা ও আবেগবিরল যুক্তিপ্রবণতা ফুটে উঠেছিল। পরবর্তীকালে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে সবুজপত্রীয়দের অনেকেই স্থায়ী আসন লাভ করেছেন। অতুলচন্দ্র গুপ্ত, কিরণশঙ্কর রায়, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র ঘটক, বরদাচরণ গুপ্ত, বিশ্বপতি চৌধুরী, হারিতকৃষ্ণ দেব, প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এঁদের কেউ কেউ পরবর্তীকালে সাহিত্য থেকে একটু দূরে সরে গিয়েছেন, কিন্তু পুরাণো সবুজপত্রের পাতায় তাঁদের রচনা আজও সবুজ হ'য়ে আছে। সবুজপত্রের নিয়মিত আড্ডা ও আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে চিন্তাজগতের এক একটি রুদ্ধ দ্বার তাঁদের কৌতূহলী জাগ্রত চিত্তের সম্মুখে উন্মোচিত হয়েছে।

আসল কথা, সবুজপত্রের স্বল্পস্থায়ী অধ্যায়টি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় চিহ্ন রেখে গেছে—'সবুজপত্র' যুগের লেখকদের গদ্যরীতির ছাপ জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে পরবর্তী লেখকদের ওপরেও পড়েছে। ঐতিহাসিক মুহূর্তে সবুজপত্রের জন্ম না হ'লে বর্তমান বাংলা গদ্যের আদর্শের অনেকখানিই যে বাদ পড়ত এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সবুজপত্র জ্ঞানমার্গ ও বুদ্ধিমার্গের দীপ্ত হোমানল জ্বালিয়েছিল, প্রমথ চৌধুরীর সুকর্ষিত মনোজীবন ছিল তার নির্ধূম বহ্নি। তিনি বাঙালী জাতের মন তৈরীর ভার নিয়েছিলেন—জড়তামুক্ত সদাজাগ্রত অনুশীলন-তৎপর অভিজাত-রুচি মানসিকতাই তিনি চেয়েছিলেন। তাই তিনি সবুজপত্রের পুরোহিতরূপে স্পষ্টকণ্ঠে ঘোষণা করলেন, 'আমরা তাই

দেশী কি বিলাতী পাথরে-গড়া সরস্বতী মূর্তির পরিবর্তে, বাংলার কাব্যমন্দিরে দেশের মাটির ঘটস্থাপনা ক'রে তার মধ্যে সবুজপত্রের প্রতিষ্ঠা করতে চাই। কিন্তু এ মন্দিরে কোনও গর্ভমন্দির থাকবে না, কারণ, সবুজের পূর্ণ অভিব্যক্তির জন্য আলো চাই, আর বাতাস চাই। অন্ধকারে সবুজ ভয়ে নীল হ'য়ে যায়। বদ্ধ ঘরে সবুজ দুঃখে পাণ্ডু হ'য়ে যায়। আমাদের নবমন্দিরের চারিদিকের অবারিত দ্বার দিয়ে প্রাণবায়ুর সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের যত আলো অবাধে প্রবেশ করতে পারবে। শুধু তাই নয়, এ মন্দিরে সকল বর্ণের প্রবেশের সমান অধিকার থাকবে।···সে মন্দিরে স্থান হবে না কেবল শুষ্কপত্রের।'[৪] 'সবুজপত্র' পত্রিকা উঠে যাওয়ার পরও প্রমথ চৌধুরীর চিন্তাজগতের সারথ্য বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নি।

প্রথম চৌধুরী 'বীরবল' ছদ্মনাম গ্রহণ করেছিলেন। এই নাম গ্রহণের পেছনে তাঁর খেয়ালের চেয়েও বেশী ছিল বোধ হয় মনের বিশেষ ধরণের গড়ন। তাঁর প্রকৃতির মধ্যে মধ্যযুগের সভাসদ [courtier]-সুলভ বৈশিষ্ট্য ছিল। বাক্-বৈদগ্ধ্য, মজলিশী মন, অভিজাত মানসিকতা—সব কিছু মিলিয়ে বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে রাজসভার সাহিত্যের রেশটুকু যেন তাঁর মনের গড়নে ও বলার ঢংয়ে কিছু কিছু পাওয়া যায়। আকবরের সভার অন্যতম সভাসদ সুরসিক বীরবলের ওপরে তাঁর আকর্ষণ নিতান্ত বাল্যকাল থেকেই। সভাসদ বীরবলের সূক্ষ্ম-চতুর রসিকতার অজস্র কাহিনী উত্তরভারতের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে—রসিকতা ও বাক্-চাতুর্যের ইতিহাসে বীরবলের নাম এমন সুবিদিত যে পরবর্তীকালে অনেকে বীরবলের নামে অনেকে অ-বীরবলী রসিকতাও চালিয়ে দিয়েছেন। প্রমথ চৌধুরী বীরবল ছদ্মনাম গ্রহণের কৈফিয়ৎ দিয়েছেন, 'বছর কুড়িক আগে আমি যখন দেশের লোককে রসিকতার-ছলে কতকগুলি সত্যকথা শোনাতে মনস্থ করি, তখন আমি না-ভেবেচিন্তে বীরবল নাম অবলম্বন করলুম। এ নামের দুটি স্পষ্ট গুণ আছে, প্রথমতঃ নামটি ছোট, দ্বিতীয়তঃ শ্রুতিমধুর।[৫] কিন্তু এইটুকু কৈফিয়ৎ বোধহয় বীরবল নাম গ্রহণের পক্ষে যথেষ্ট নয়। বীরবল সভাসদ ছিলেন ও রসিকতার ছলে সত্যকথা বলতেন—এই দু'কারণও তাঁর বীরবল নাম গ্রহণের স্বপক্ষে ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যান্য রচনার সঙ্গে 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এর প্রভেদ আছে। কমলাকান্তের ব-কলমে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর রচনারীতিতেও স্বতন্ত্র পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে বীরবলের এতটুকু পার্থক্যও নেই—'বীরবল' ছদ্মনামের ও প্রমথ চৌধুরীর স্বনামের রচনাগুলির মধ্যে কোন সীমারেখা টানা সম্ভব নয়।

উত্তরকালে 'ঝাঁপান খেলা' গল্পে তিনি বীরবল নামটিকে আবার স্মরণ করেছেন।

ইংরেজীতে যাকে 'Aesthetic Sense' বলে, প্রমথ চৌধুরী ছিলেন সেই রসরুচির সম্রাট। তাই এই অনন্যমানস কুশলী শিল্পী সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের সশ্রদ্ধ মন্তব্যটি উল্লেখযোগ্য, 'যখন তিনি (প্রমথ চৌধুরী) সাহিত্যক্ষেত্রে অপরিচিত ছিলেন, তাঁর পরিচয় আমার কাছে ছিল সমুজ্জ্বল। যখন থেকে তিনি সাহিত্যপথে যাত্রা আরম্ভ করেছেন আমি পেয়েছি তাঁর সাহচর্য এবং উপলব্ধি করেছি তাঁর বুদ্ধিপ্রদীপ্ত প্রতিভা। আমি যখন সাময়িকপত্র চালনায় ক্লান্ত এবং বীতরাগ, তখন প্রমথর আহ্বানমাত্রে 'সবুজপত্র' বাহকতায় আমি তাঁর পার্শ্বে এসে দাঁড়িয়েছিলুম। প্রমথনাথ এই পত্রকে যে একটি বিশিষ্টতা দিয়েছিলেন তাতে আমার তখনকার রচনাগুলি সাহিত্য-সাধনায় একটি নূতন পথে প্রবেশ করতে পেরেছিল। প্রচলিত অন্য কোন পরিপ্রেক্ষণীর মধ্যে তা সম্ভবপর হতে পারত না। সবুজপত্রে সাহিত্যের এই একটি নূতন ভূমিকা রচনা প্রমথর প্রধান কৃতিত্ব। আমি তাঁর কাছে ঋণ স্বীকার করতে কখনও কুণ্ঠিত হই নি।'[৬]

---

১. চলমান জীবন, প্রথম পর্ব, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়।

২. সবুজপত্র, অগ্রহায়ণ, ১০২৩।

৩. 'গত অগ্রহায়ণ মাসে [১৩২০] শান্তিনিকেতনে নোবেল-সম্বর্ধনায় কবির প্রতি-ভাষণের প্রতিক্রিয়ায় যে হলাহল বাংলা সাময়িক সাহিত্যে উছলিয়া উঠে, তাহাতে কবি নাকি অন্তরে অন্তরে জর্জরিত হন; এবং স্থির করেন যে সাময়িক পত্রের জন্য কিছু লিখিবেন না।'—[রবীন্দ্রজীবনী, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়]।

৪. সবুজপত্র, বীরবলের হালখাতা।

৫. বীরবল, নানা-চর্চা।

৬. প্রমথ চৌধুরীর গল্প-সংগ্রহের ভূমিকা, রবীন্দ্রনাথ।

সবুজপত্র ও তার দেশ-কাল

যেকালে প্রমথ চৌধুরী 'সবুজপত্র' পত্রিকা প্রতিষ্ঠা ক'রে নূতন গদ্যরীতি প্রবর্তন করেন, সেকালটিকে আর যাই বলা যাক না কেন, প্রবন্ধ-সাহিত্যের শৈশবযুগ বলা যায় না। কারণ তার অব্যবহিতপূর্ব শতাব্দীতেই বাংলা সাহিত্যের প্রখ্যাত প্রবন্ধকারেরা জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর পার্শ্বসহচর মনীষী লেখকদের হাতে বাংলা গদ্যের বলিষ্ঠতা, প্রসাদগুণ ও যুক্তিনিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রমথ চৌধুরীর সমকালীনদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ও রামেন্দ্রসুন্দরের মত প্রবন্ধকারও ছিলেন, তথাপি প্রমথ চৌধুরীর নিঃসঙ্গ একাকিত্ব বাংলা গদ্যের ঐতিহ্যের দিক থেকে একটু আকস্মিক বলে মনে হয়। বাংলা সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে যে সহজ-সংস্কার আমাদের মনে বদ্ধমূল হয়ে আছে, প্রমথ চৌধুরীর রচনা যেন সেই সহজাত সংস্কারকে প্রবলভাবে আঘাত করে। বাংলা সাহিত্যের যে একটি দীর্ঘ-প্রসারী ঐতিহ্য আছে, তিনি শুধু তার ব্যতিক্রমই নন, বলিষ্ঠ প্রতিক্রিয়াও। বাংলা সাহিত্যের কৌলিক পরিচয় বিচার করলেই এ বিষয় সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠবে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে ভাবাতিরেক ও আবেগাতিশয্যের পরিচয় আছে। ভক্তিরস-মন্থর সংস্কারাচ্ছন্ন মনের স্বেচ্ছানিয়ন্ত্রিত গতিশক্তি যেন স্তিমিতপ্রায়। মধ্যযুগের বৈষ্ণব-কবিতা, মঙ্গলকাব্য ও অনুবাদ-সাহিত্য—এই ত্রিধারাই যে বিশেষ রসস্রোতে আন্দোলিত হয়েছে, সে রস আর যাই হোক, আবেগবিরল পরিমার্জিত বুদ্ধিধর্ম সেখান থেকে নির্বাসিত। উনিশ শতকের বাংলা গদ্য অনেকখানি যুক্তিতর্কের বাহন হ'য়ে উঠেছিল। বাংলা গদ্যের এই নৈয়ায়িক মেজাজের যুগেও প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যিক পিতৃপুরুষের সন্ধান মেলে নি। কারণ, যুক্তি-তর্ক এলেও আবেগের বন্যা রোধ করার মতো ক্ষমতা তার হয় নি। তাই কারণে-অকারণে বাষ্পোচ্ছ্বাস ও আতিশয্য-প্রবণতা তখনকার গদ্যের একটি সাধারণ ধর্ম ছিল। ঐ যুগের প্রবন্ধকারদের রচনায় গবেষণা-ধর্ম ছিল প্রধান, পাণ্ডিত্য ছিল অসাধারণ। বক্তব্যটিই ছিল প্রধান, সে যেমন ভাবেই হোক-না কেন। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধের উপাদান ও বস্তুগুণের তুলনা নেই, কিন্তু সে তুলনায় বলার মাধ্যমটি দুর্বল। সে যুগের লেখক কি বিষয় লিখবেন, তার সাধনাই করেছেন, কেমনভাবে লিখবেন, তার দিকে তাঁদের তেমন নজর পড়ে নি। গৌতম বুদ্ধের জাতিনির্ণয়ে এথ্‌নলজিষ্টদের সম্পর্কে

বীরবলী ব্যঙ্গকে লক্ষ্য ক'রে শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত বলেছেন, 'অনুমান করা কঠিন নয়, রবীন্দ্রনাথ যদি এ আলোচনা করতেন কৌতুকের শুভ্রহাস্যে ও দুটি-একটি উপমার বিস্ময়ের চমকে একটি রসবস্তু গড়ে উঠত। রামেন্দ্রসুন্দরের হাতের বিজ্ঞানবুদ্ধির তীক্ষ্ণ আলোতে এ অপবিজ্ঞানের সমস্ত ফাঁক প্রকট হ'ত। প্রমথ চৌধুরী বিজ্ঞানের চর্মে ঢাকা অজ্ঞানের বুকে সোজাসুজি ছুরি বসিয়েছেন। সে ছুরির ধার ও ঔজ্জ্বল্য চোখে ধাঁধা লাগায়। কিন্তু সে ছুরি যে খুন করার ছুরি তাতে সন্দেহ থাকে না।'[১]

তা হ'লে প্রমথ চৌধুরী কি বাংলা সাহিত্যের বৃন্তহীন পুষ্প ? সমালোচকমহল এর সদুত্তর সন্ধান করেছেন নানাভাবে। কেউ কেউ বলেছেন যে এর প্রধান কারণ তাঁর ফরাসী-সাহিত্য-অনুশীলন,[২] আবার কেউ কেউ ভারতচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর জ্ঞাতিত্ব নির্ণয় করেছেন,[৩] আবার কেউ কেউ সংস্কৃত টীকাকারদের সঙ্গে তাঁর রচনারীতি ও মেজাজের তুলনা করেছেন।[৪] নিঃসঙ্গ একক বাংলা সাহিত্যের এই কুশলী শিল্পীটির জ্ঞাতি-গোত্র নির্ণয়ে গবেষণার অন্ত নেই। এই তিনটি মতেরই কিছু সারবত্তা আছে। এক সময় তিনি নিজেই বলেছেন, 'ফরাসী সাহিত্য এই অর্থে-ই স্পষ্টভাষী যে, সে-সাহিত্যের ভাষায় জড়তা কিংবা অস্পষ্টতার লেশমাত্রও নেই। যে বিষয়ে লেখকের পরিষ্কার ধারণা আছে, সেই কথা অতি পরিষ্কার ক'রে বলাই হচ্ছে ফরাসী সাহিত্যের ধর্ম। আমি পূর্বে বলেছি যে, ফরাসী সাহিত্যের ভিতর সায়েন্স এবং আর্ট দুই-ই আছে। ফরাসী মনের এই প্রসাদগুণ-প্রিয়তার ফলে সে দেশের দর্শন-বিজ্ঞানের ভিতরও সাহিত্য-রস থাকে। পাণ্ডিত্য না ফলিয়ে অসাধারণ বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় একমাত্র ফরাসী লেখকরাই দিতে পারেন। জ্ঞানবিজ্ঞানের ঐকান্তিক চর্চাতেও ফরাসী পণ্ডিতদের সামাজিক বুদ্ধি ও রসজ্ঞান নষ্ট হয় না।'[৫] ফরাসী সাহিত্য-প্রসঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর এই মন্তব্য শুধু সাহিত্য-সমালোচকের বিচারই নয় তাঁর নিজের সাহিত্যাদর্শের মাপকাঠিও বটে। প্রমথ চৌধুরীর সুমার্জিত বুদ্ধি, বিচিত্র জ্ঞান বিজ্ঞানচর্চায় সুকর্ষিত, কিন্তু তাঁর 'সামাজিক বুদ্ধি ও রসজ্ঞান' নষ্ট হয় নি। ফরাসী গদ্য-সাহিত্যের একটি বিশেষ পরিচয় আছে—লঘুপদক্ষেপের দ্রুতসঞ্চারী গতি, বুদ্ধি-মার্জিত তীক্ষ্ণতা ও হৃদয়াবেগমুক্ত বাগ্‌বৈদগ্ধ ফরাসী গদ্যের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য। ফরাসী সাহিত্যের সঙ্গে অতি তরুণ বয়সেই তাঁর একটি আত্মিক যোগ ঘটেছিল। তাঁর 'আত্মকথা'য় ফরাসী-সাহিত্য-অনুশীলনের বর্ণনা আছে—তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কাছ থেকেই তিনি এ রসের দীক্ষা পেয়েছিলেন।[৬]

ভারতচন্দ্রের সঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর জ্ঞাতিত্ব আবিষ্কার করেছেন অনেকেই। প্রমথ চৌধুরীও স্বভাবসিদ্ধ পরিহাস-রসিকতার সুরে ভারতচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগের কথা বলেছেন। তবে ভারতচন্দ্রের তিনি যে একজন রসজ্ঞ পাঠক, তার প্রমাণ তাঁর বহু রচনাতেই বিদ্যমান। ভারতচন্দ্র থেকে এত বেশি উদ্ধৃতি সম্ভবতঃ আর কোন লেখকের রচনায় নেই—প্রমথ চৌধুরীর লেখাতেও ভারত-চন্দ্রের প্রসঙ্গই সবচেয়ে বেশি। কাল ও রুচির এত পার্থক্য, তথাপি কেমন ক'রে যে অষ্টাদশ শতকের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি ভারতচন্দ্রের সঙ্গে বিংশ শতাব্দীর এই বিদগ্ধচিত্তটির মিল হ'ল তা ভাবতে গেলেও অবাক হতে হয়। প্রমথ চৌধুরীর মতে বাংলা সাহিত্যে ভারতচন্দ্রের মতো শিল্পী আর হয় নি, 'Bharatchandra, as a supreme literary craftsman, will ever remain a master to us, writers of the Bengali language.'[৭] অনেকে এ প্রশ্নও করেছেন যে প্রমথ চৌধুরীর মতো অভিজাতরুচি লেখক ভারতচন্দ্রকে কেমন ক'রে বরদাস্ত করলেন? এর উত্তর দিয়েছেন তিনি নিজেই, 'ভারতচন্দ্রের সাহিত্যের প্রধান রস কিন্তু আদিরস নয়, হাস্যরস। এ রস মধুর রস নয়, কারণ এ রসের জন্মস্থান হৃদয় নয়, মস্তিষ্ক, জীবন নয়, মন।'[৮] প্রমথ চৌধুরীর ভারতচন্দ্র-প্রীতির দ্বিতীয় কারণ বোধ হয় রায়গুণাকরের ভাষার সংহতিগুণ। কোন কোন সমালোচক এমন কথাও বলেছেন যে প্রমথ চৌধুরী ভারতচন্দ্রের যুগে জন্মগ্রহণ করলে রায়গুণাকরের গোষ্ঠীর লেখক হতেন, আবার একালে ভারতচন্দ্রের আবির্ভাব হ'লে তিনি সবুজপত্রের নিয়মিত লেখক হতেন।[৯]

ভারতচন্দ্রের সঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর আর একটি কারণে সংযোগসূত্র সুস্পষ্ট। তিনি তাঁর আত্মকথায় নিজেকে 'কৃষ্ণনাগরিক' ব'লে দাবি ক'রেছেন। ভারত-চন্দ্রও খাঁটি কৃষ্ণনাগরিক। প্রায় দু'শতাব্দীর ব্যবধান হ'লেও নাগরিকতার এই ঐক্যে তাঁরা অভিন্নহৃদয় প্রতিবেশী। প্রমথ চৌধুরীর বাল্যকালেও কৃষ্ণনগরে সঙ্গীত, বাগ্‌বৈদগ্ধ্য ও হাস্যরসের রীতিমতো চর্চা হ'ত। কৃষ্ণনগরের হাস্য-রসিকতা সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, 'সবজিনিষ হেসে উড়িয়ে দেওয়া তাদের স্বভাব ছিল। ঠাট্টা জিনিসটেরই তারা চর্চা করতো।'[১০] এখানে স্মরণ রাখা উচিত যে ষোড়শ শতকের নবদ্বীপ ও অষ্টাদশ শতকের কৃষ্ণনগর এক নয়—প্রায় দুই বিপরীত মেরুর অধিবাসী বললেও হয়। তবে এ কথাও ঠিক যে একালের 'বীরবল' চৈতন্যদেবের নয়নাশ্রু ও হৃদয়াবেগ-চর্চার উত্তরাধিকারী না হ'লেও নব্যন্যায়ের সঙ্গে তাঁর মনের একটি যোগ ছিল। কৃষ্ণনগরের সাংস্কৃতিক

পটভূমিকার পরিচয় দিতে গিয়ে যথার্থ-ই বলা হয়েছে, 'একদিকে যেমন নবদ্বীপ-ধামের পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহাদের অপূর্ব ও বিচিত্র জ্ঞানালোকে সমগ্র ভারতভূমিকে উদ্বুদ্ধ ও প্রভাবান্বিত করিয়া তুলিতেন তেমনিই আবার নদীয়া জেলার—কৃষ্ণনগরের অধিবাসীবৃন্দের শিষ্টাচার, সদাচার, রসিকতা, শিল্প-নৈপুণ্য ও সাহিত্যানুরাগ এদেশে সর্বত্র নব-নব আদর্শ ও সৎশিক্ষার প্রসার বা বিস্তার সাধন করিত।'[১১] যথার্থ কৃষ্ণনাগরিক প্রমথ চৌধুরীর চিত্তলোকে যে এর ছায়া পড়বে তাতে আর বিচিত্র কি ?

অনেক বড় জার্মাণ লেখকদের লেখা তাঁর ভাল লাগে নি, অথচ ফরাসী লেখকদের লেখা তাঁর ভালো লেগেছে। এর কারণ হ'ল ফরাসী লেখকদের প্রকাশের তুলনাহীন নিপুণতা। যত বড় লেখকই হন না কেন, প্রমথ চৌধুরীর কাছে ভাষার শৈথিল্য ছিল অসহ্য, ঢিলেঢালা লেখা তাঁর কাছে ছিল অমার্জনীয় অপরাধ। ভারতবর্ষের প্রাচীন টীকাকার ও ভাষ্যকারদের মধ্যে এই গুণটি তিনি প্রভূত পরিমাণেই পেয়েছিলেন। টীকাকারদের যুক্তি-তর্কের তীক্ষ্ণতা ও সূক্ষ্মতা, বাক্‌নৈপুণ্য ও শব্দপ্রয়োগের সংহতিগুণ তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। যুক্তিতর্কের গাঢ়বদ্ধ ভাষা তিনি চিরকালই পছন্দ করেছেন। তিলকের গীতাভাষ্যটি এক সময় তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। এই মহাগ্রন্থ প্রসঙ্গে তিনি যা বলেছেন তা প্রণিধানযোগ্য, 'মহাত্মা তিলক এ গ্রন্থে যে বিপুল শাস্ত্রজ্ঞান, যে সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন, তা যথার্থই অপূর্ব। সমগ্র মহাভারতের নৈলকণ্ঠীয় ভাষ্যও, আমার বিশ্বাস, পরিমাণে এর চাইতে ছোট। তাইতে মনে হয় যে এ ভাষ্য মহাত্মা তিলক প্রাকৃতে না লিখে সংস্কৃতে লিখলেই ভালো করতেন।'[১২] প্রমথ চৌধুরীর মনের দোসর তাই বিচিত্র—নিজের মানস-মিতার সন্ধানে প্রাচীন ভারতবর্ষ, অষ্টাদশ শতাব্দীর কৃষ্ণনগর ও ফরাসী সাহিত্য—এই আপাতবিরোধী ভাবজগৎগুলি পরিভ্রমণ করতে হয়েছে। তাঁর লেখা পড়লেই বোঝা যায় এদের সংযোগসূত্র কোথায়। প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যিক-পিতৃপুরুষ নির্ণয়ের এক বিচিত্র রূপ এই হিসেবে বর্ণসঙ্কর হলেও বৃহত্তর অর্থে সগোত্র।

দুই

প্রমথ চৌধুরী ও 'সবুজপত্র' আজ প্রায় একার্থবোধক হ'য়ে উঠেছে। প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যিক আদর্শের আলোচনায় তাই সবুজপত্র-পর্ব আলোচনা

অপরিহার্য। সাধারণভাবেই সাহিত্যসৃষ্টির ইতিহাসে সাময়িক পত্রের একটি বিশিষ্ট মূল্য আছে। তার উপর সবুজপত্রের মতো পত্রিকা। গদ্য-রচনারীতির অভিনব কর্ষণা ছাড়াও কালের দিক থেকে এই পত্রিকাটির একটি ঐতিহাসিক মূল্য আছে। সবুজপত্র যুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর যুগের বিদ্রোহী সন্তান।[১৩] তাই তার আচরণ ও বাগ্‌বিন্যাসেও এই বিদ্রোহের বক্র তির্যক ভঙ্গিটি স্পষ্টরেখায় স্বাক্ষরিত। নব্যতন্ত্রী সাহিত্যিকদের প্রকাশের মাধ্যম হ'য়ে উঠল এই ভাষা। 'সবুজপত্র' নাম ও পত্রিকার মলাটের সবুজ রঙ ছিল বৈশিষ্ট্যের দ্যোতক। সবুজ তারুণ্যের বর্ণ, প্রাণধর্মের বর্ণপত্র—'ওঁ প্রাণায় স্বাহা' বাণীটি ছিল এই পত্রিকার মূলমন্ত্র। আমাদের সমাজে জীবন-রসিকতার যে অভাব দেখা গিয়েছে সেই প্রসঙ্গে চৌধুরী মশায় যে শ্লেষোক্তি করেছেন, তা মূল্যবান, 'তাই আমাদের কর্মযোগীরা আর জ্ঞানযোগীরা, অর্থাৎ শাস্ত্রীর দল, আমাদের মনকে রাতারাতি পাকা ক'রে তুলতে চান। তাঁদের বিশ্বাস যে, কোনোরূপ কর্ম কিংবা জ্ঞানের চাপে আমাদের হৃদয়ের রসটুকু নিংড়ে ফেলতে পারলেই আমাদের মনের রং পেকে উঠবে।...এরা ভুলে যান যে, জোর ক'রে পাকাতে গিয়ে আমরা শুধু হরিৎকে পীতের ঘরে টেনে আনি, প্রাণকে মৃত্যুর দ্বারস্থ করি। অপর দিকে এদেশের ভক্তিযোগীরা, অর্থাৎ কবির দল, কাঁচাকে কচি করতে চান।...এঁদের ইচ্ছা সবুজের তেজটুকু বহিষ্কৃত ক'রে দিয়ে ছাঁকা রসটুকু রাখেন। এঁরা ভুলে যান যে, পাতা কখনো আর কিশলয়ে ফিরে যেতে পারে না; প্রাণ পশ্চাৎপদ হতে জানে না।'[১৪] 'সবুজপত্র' পত্রিকার মর্মমূলে এই শ্রেণীর একটি স্পষ্টোচ্চারিত, সঙ্কল্প-কঠোর জীবন-সমালোচনা ছিল। এই জীবন-সমালোচনাই পত্রিকাটির স্বরূপ নিয়ন্ত্রিত করেছে।

'সবুজপত্র' পত্রিকায় চৌধুরী মশায় যে জীবন-রসিকতা দাবী করেছেন, তার আড়ালে সম্ভবত তাঁর সাহিত্যধর্মের একটি ইংগিত আছে। বাংলা সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীর হাস্যরস অত্যন্ত দুর্লভ। প্রমথ চৌধুরী যে শ্রেণীর হাস্যরস পরিবেশন করতে চেয়েছেন, তাতে জীবন-রসিকতার একটি বড়ো স্থান আছে। জীবনের একটি উজ্জ্বল ও প্রসন্ন রূপ দেখেছেন তিনি, কিন্তু আমাদের দেশের সংস্কার-প্রবণতা ও নৈতিক-দৃষ্টি সেই প্রসন্ন ও পরিপূর্ণ রূপটিই আচ্ছন্ন করেছে। প্রমথ চৌধুরী আমাদের সামাজিক জীবনের সেই জীবন-বিধ্বংসী দুর্লক্ষণকে আঘাত হানতে চেয়েছেন, দূর করে দিতে চেয়েছেন।

তাঁর হাস্যরসের সঙ্গে এই শ্রেণীর জীবনাচরণের একটি গভীর সম্পর্ক আছে। প্রমথ চৌধুরীর জীবনদৃষ্টির সঙ্গে সাহিত্যাদর্শের এইখানে একটি নিগূঢ় মিল আছে। আসল কথা আমাদের জীবনের বহু অসঙ্গতি তাঁর চোখে পড়েছিল—পূর্ণাঙ্গ ও বলিষ্ঠ জীবন ছিল কাম্য। সবুজপত্রের যাত্রাপথ নির্ণয়ে তাঁর কামনাই রূপায়িত হয়েছে মাত্র। শুধু গদ্য-রচনাতে নয়, কবিতাতেও তিনি শ্লেষ-চতুর কণ্ঠে বলেছেন,

'হয় মোরা মিছে খেটে হই গলদ্‌ঘর্ম,
নয় থাকি বসে, রাখি করেতে চিবুক।
এ জাতে শেখাতে পারি জীবনের মর্ম,
হাতে যদি পাই আমি তোমার চাবুক।'[১৫]

সবুজপত্রের রচনাবলী যদি শুধু একজাতীয় সাহিত্যবিদ্রোহ-ই হতো, তাহলে তার প্রভাব এমন সুদূরপ্রসারী হওয়া সম্ভব ছিল না।। আসল কথা, এ বিদ্রোহ একজাতীয় জীবন-বিদ্রোহও বটে। এই কারণেই রচনারীতি, বক্তব্য ও জীবন—তিনটিকে এক্ষেত্রে স্বতন্ত্র মনে করবার কোন কারণই নেই।

বাংলা সাময়িক পত্রিকার ইতিহাসে সবুজপত্রের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য নানা দিক থেকে। পত্রিকার প্রচলিত রীতি অগ্রাহ্য করা হয়েছিল। বিজ্ঞাপন, ছবি, 'ফিচার' শ্রেণীর নয়নরঞ্জন কোন কিছু তাতে থাকত না। সম্পাদক এবং রবীন্দ্রনাথ—দু'জনের লেখাই পত্রিকার বারো আনা জুড়ে থাকত। আসল কথা, পত্রিকার পরিকল্পনার মূলে কোন ব্যবসায়-বুদ্ধি ছিল না, নব্যতন্ত্রী সাহিত্যের গতিপথ নির্দেশই ছিল এর মূল উদ্দেশ্য। আভিজাত্য ও কৌলিন্য এর চালচলন ও রুচিতে ফুটে উঠেছে। এর দৃষ্টিভঙ্গিতে আধুনিকতার ছাপ সুস্পষ্ট। গত প্রথম মহাযুদ্ধ ও তার প্রাক্কালে যে নবীন চিন্তাধারা বাংলা দেশের সাংস্কৃতিক ভূমিকে নূতন ফসলের সম্ভাবনায় উর্বর ক'রে তুলেছিল, সবুজপত্র সেই আধুনিক চিন্তাধারার বাণীবাহক। বক্তব্য ও বলার অভিনব স্টাইল দুই-ই সবুজপত্রের দান।

সবুজপত্রের সবচেয়ে বড় কাজ ভাষা-আন্দোলনের সারথ্য করা। সাধুভাষা ও চলিত ভাষার মধ্যে দীর্ঘ বিরোধের একটি মীমাংসা সবুজপত্রের মাধ্যমেই সম্ভব হয়ে ওঠে। অবশ্য 'সবুজপত্র' প্রতিষ্ঠার অর্ধশতাব্দীরও অধিককাল থেকে কথ্যভাষাকে সাহিত্যিক কৌলীন্য দেওয়ার চেষ্টা চলেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের সূচনা থেকেই কথ্যভাষার সাহিত্যিক প্রয়োগ সম্পর্কে আলোচনার

সূত্রপাত হয়। 'আলালের ঘরের দুলাল' ও 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' কথ্যভাষাকে সাহিত্যের বাহন করার প্রাচীনতম নমুনা। রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণকাহিনীতে, পত্র-সাহিত্যে ও স্বামী বিবেকানন্দের কিছু কিছু রচনায় কথ্যভাষার সুমার্জিত রূপ ও রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু প্রাক্-সবুজপত্র যুগের কথ্যভাষার প্রয়োগ-পদ্ধতির মূলে সর্বজনীন স্বীকৃতি ছিল না, তাছাড়া এগুলি একটি বিস্তৃত আন্দোলন নয়, বিক্ষিপ্ত ও পরীক্ষামূলক প্রচেষ্টা মাত্র। 'সবুজপত্র' পত্রিকা অবলম্বন ক'রে কথ্যভাষার প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা শুধু একটি বিচ্ছিন্ন সাহিত্যিক উদ্যম মাত্র নয়,—এর বিস্তৃতি ও প্রভাব একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মর্যাদাবাহী। তাছাড়া 'আলালের ঘরের দুলাল' বা 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'র ভাষায় আঞ্চলিক ভাষার একটি রূপ পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু কথ্যভাষা বলতে গিয়ে যা বোঝায় এ ভাষা ঠিক তা নয়।[১৬] প্রমথ চৌধুরীর কথ্যভাষা আঞ্চলিক ভাষা হ'য়েও আঞ্চলিকতার সঙ্কীর্ণ গণ্ডী অতিক্রম করতে সমর্থ হয়েছিল। কারণ কৃষ্ণনগর এককালে সংস্কৃতিচর্চার পীঠস্থানে পরিণত হয়েছিল। বাক্-বৈদগ্ধ্য ও কথা-বিন্যাসকুশলতায় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজধানীটির খ্যাতি প্রায় একটি স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপারে পরিণত হয়েছিল। দীর্ঘকাল ভাষাকর্ষণার ফলে এই আঞ্চলিক ভাষাটি একটি 'সর্বজন-বোধগম্য' সাহিত্যিক আভিজাত্য লাভ করেছিল। সবুজপত্রের আনুকূল্যে ও পৃষ্ঠপোষকতায় এই ভাষাই শ্রীসমৃদ্ধ সাহিত্যিক ভাষায় পরিণত হ'ল। অবশ্য প্রাক্-সবুজপত্র যুগে চৌধুরী মশায়ের নিজেরই রচনায় চিন্তার স্বাতন্ত্র্য ও পরিচ্ছন্ন বক্রোক্তি-জীবিত ভাষার নমুনা পাওয়া যাবে। এমন কি তাঁর সাধুভাষায় রচিত যে দু'একটি প্রবন্ধ প্রাক্-সবুজপত্র যুগে প্রকাশিত হয়েছিল, তাতেও তাঁর মৌলিক রূপ-রচনার বিস্ময়কর পরিচয় আছে। 'জয়দেব' প্রবন্ধটি সাধু ভাষায় রচিত হ'লেও প্রমথীয় বৈশিষ্ট্যের অভাব নেই।[১৭] 'সবুজপত্র' পত্রিকা প্রকাশের ফলে গদ্যরীতির সুমার্জিত কর্ষণার উপযুক্ত ক্ষেত্র পেয়েছেন তিনি। সবুজপত্রেই চৌধুরী মশায়ের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা ঘটে। সুরেশ সমাজপতি-সম্পাদিত 'সাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশিত 'ফুলদানি' গল্পটি একটি ফরাসী গল্পের অনুবাদ। 'সবুজপত্র' কথাসাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরীর প্রধান বাহন হয়েছিল। এইখানেই তাঁর অধিকাংশ ছোটগল্প প্রকাশিত হয়েছিল; ঘোষাল ও নীললোহিতের মতো অসাধারণ কথকদের আবির্ভাবও সবুজপত্রেই। সবুজপত্রের মাধ্যমে চৌধুরী মশায় আমাদের তন্দ্রাতুর

জরাগ্রস্ত মনকে জাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। এই জাগরণের জন্য ইউরোপীয় সাহিত্যের চর্চার কথাও বলেছেন তিনি—তবে ইউরোপের বহিরাঙ্গিক অনুকরণের ব্যর্থতার কথাও তিনি বলেছেন। ইউরোপের সাহিত্যে জড়তার ঘুম ভাঙ্গিয়ে দেওয়ার মতো উপাদান আছে, কিন্তু সেই উপাদান যেন বাংলা সাহিত্যে 'পরগাছার ফুল'-এর মতো শোভা না পায়—বাংলা সাহিত্যের প্রাণধর্মের সঙ্গে যেন মিশে যায়। তিনি বলেছেন, 'আমাদের বাংলাঘরের খিড়কি দরজার ভিতর প্রাচীন ভারতবর্ষের হাতি গলাবার চেষ্টা করতে হবে, আমাদের গৌড়ভাষার মৃৎকুম্ভের মধ্যে সাতসমুদ্রকে পাত্রস্থ করবার চেষ্টা করতে হবে। এ সাধনা অবশ্য কঠিন, কিন্তু স্বজাতির মুক্তির জন্য অপর কোনো সহজ সাধনপদ্ধতি আমাদের জানা নেই।'[১৮]

তিন

প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্য-সাধনার প্রকৃতি নির্দেশ করতে হ'লে সবুজপত্রের পর্বে বাঙালীর সাহিত্য ও সংস্কৃতি-সাধানার ইতিহাস জানতে হবে। তৎকালীন বাংলা সাহিত্যের গতিপ্রকৃতির পটভূমির ওপরেই প্রমথ চৌধুরী তথা সবুজপত্রের বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করা সম্ভব হবে। রবীন্দ্রসাহিত্যের মোড় পরিবর্তনের কিঞ্চিৎ দায়িত্ব সবুজপত্রেরও আছে—এই দিক দিয়ে পত্রিকাটির গুরুত্ব অসাধারণ। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের ভাবজীবনে একটি দ্রুত পরিবর্তনের সুর সুস্পষ্ট হ'য়ে আসছিল—অন্তর্জীবনের এই সুর-পরিবর্তনকেই সবুজপত্র আরও মুখর ক'রে তুলেছিল। সবুজপত্রের তারুণ্যের বাণীর সঙ্গে কবির এই পঞ্চাশোর্ধ প্রৌঢ় তারুণ্যের একটি গভীর মিল আছে। কবি বলেছেন, 'আমাদের সমাজে যে পরিমাণে কর্ম বন্ধ হইয়া আসিয়াছে সেই পরিমাণে বাহবার ঘটা বাড়িয়া উঠিয়াছে। চলিতে গেলেই দেখি, সকল বিষয়েই পদে পদে কেবলি বাধে। এমন স্থলে হয় বলিতে হয় "খাঁচাটাকে ভাঙো, কারণ ওটা আমাদের ঈশ্বরদত্ত পাখাদুটাকে অসাড় করিয়া দিল" নয় বলিতে হয়—ঈশ্বরদত্ত পাখার চেয়ে খাঁচার লোহার শলাগুলো পবিত্র, কারণ, পাখা তো আজ উঠিতেছে আবার কাল পড়িতেছে, কিন্তু লোহার শলাগুলো চিরকাল স্থির আছে।'[১৯] 'বলাকা' কাব্য ও 'ফাল্গুনী' নাটকের মূল বক্তব্য থেকেই এই সময়ের কবিমানসের স্বরূপধর্মের পরিচয় পাওয়া যায়। সবুজপত্রের একটি সংখ্যায় শুধু কবির ফাল্গুনী নাটকই ছিল। তারুণ্যধর্মিতা ও দৃপ্ত প্রাণবন্দনার কাব্য 'বলাকা'।

'ফাল্গুনী' নাটকেও নূতন আশাবাদ ও প্রাণের ছন্দ স্পন্দিত হ'য়ে উঠেছে। এই সময়ের মানসিক অবস্থার কথা কবি একখানি চিঠিতে বলেছেন,—'I had been struggling during these last few days in a world where shadows held sway and right proportions were lost.—Now I feel that I am emerging once again into the air and light and breathing freely.'[২০] রবীন্দ্রসাহিত্যের সবুজপত্র-পর্ব বাস্তবিকই আলো-হাওয়া-রচিত একটি প্রাণ-সমুজ্জ্বল ইতিহাস। শুধু কাব্যনাটকেই নয়, গদ্য-সাহিত্যেও একটি নূতন যুগের সূচনা হ'ল। দীর্ঘকাল পরে আবার ছোট-গল্প লেখার প্রেরণা এল—কিন্তু এ গল্পগুলি পদ্মালালিত গল্প থেকে স্বতন্ত্র, স্বতন্ত্র শুধু বক্তব্যে নয়, বাক্‌রীতির নবীনতায়ও। পদ্মালালিত গল্পগুলিতে এক অপরূপ প্রসন্নতা ও ছায়ালোক-স্নিগ্ধ রমণীয়তা আছে। 'সবুজপত্র' যুগের গল্পগুলির বুদ্ধিমার্জিত সংক্ষিপ্ত অথচ শ্লেষগাঢ় বাক্‌রীতি, ক্লাইমেক্স-অ্যান্টি-ক্লাইমেক্সের দ্রুতসঞ্চারী আরোহ-অবরোহ ও আকস্মিক পরিসমাপ্তির ইঙ্গিত-রেখা বিস্মিত করে। 'ভারতী' 'সাধনা'র যুগের ভাষাচারণায় সঙ্গে সবুজপত্র যুগের ভাষাবিন্যাসের পার্থক্য স্পষ্টগোচর।

রবীন্দ্রনাথের দু'খানি উপন্যাস সবুজপত্রেই প্রকাশিত হয়, 'চতুরঙ্গ' ও 'ঘরে বাইরে'। 'চতুরঙ্গে'র ভাষা ক্রিয়াপদ ব্যবহারের দিক থেকে সাধুভাষার লক্ষণাক্রান্ত হ'লেও প্রাক্-সবুজপত্রের ভাষার সঙ্গে এই ভাষার একটি মৌলিক পার্থক্য আছে। হৃদয়াবেগের আতিশয্য এই ভাষায় অনুপস্থিত, অস্পষ্টতা ও অতিভাষণের স্থান এখানে নেই। ইস্পাতের মতো কঠিন এর ভাষার বাঁধুনি, মননের দীপ্তিতে ভাস্বর হ'য়ে উঠেছে। এ ভাষায় রাজকীয় ঐশ্বর্য নেই সত্য, কিন্তু আতিশয্যহীন বুদ্ধিমার্জিত গদ্যরীতির একটি নিজস্ব রূপ আছে। রবীন্দ্রনাথের শেষযুগের কথাসাহিত্যে যে অপরূপ গদ্যরীতির সাক্ষাৎ মেলে তার প্রথম পদক্ষেপ 'চতুরঙ্গে'র ভাষাবিন্যাসে রূপ পেয়েছে। 'চতুরঙ্গে' তবু কবির ভাষাসংস্কার শেষ হয় নি, 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের ভাষা আর এক ধাপ অগ্রসর হয়েছে। এপিগ্রামের সূক্ষ্ম-চতুর প্রয়োগ, ভাষার দ্রুতসঞ্চারী লঘুতা 'ঘরে বাইরে'র ভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। রবীন্দ্রসাহিত্যের রূপ ও রীতির এই পরিবর্তনের মূলে 'সবুজপত্রে'র দান কম নয়।[২১] তাছাড়া রবীন্দ্রনাথ প্রমথ চৌধুরীর রচনা সম্পর্কে যত সপ্রশংস উক্তি করেছেন, সম্ভবতঃ রবীন্দ্র-কনিষ্ঠদের আর কারো ভাগ্যে তেমন

ঘটে নি। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে যেমন উৎসাহিত করেছেন তেমনি শ্রদ্ধাও করেছেন। চৌধুরী মশায়ের ফর্ম-নিষ্ঠা, পালিশ-করা রচনারীতি রবীন্দ্রনাথের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। বহুবার তিনি তাঁর রচনারীতি সম্পর্কে মূল্যবান মন্তব্য করেছেন। একবার তিনি লিখেছিলেন 'তোমার গদ্যপ্রবন্ধ সবগুলিই পড়েছি। তোমার কবিতার যে গুণ তোমার গদ্যেও তাই দেখি—কোথাও ফাঁক নেই এবং শৈথিল্য নেই, একেবারে ঠাসবুনানি। এগুণটি কিন্তু প্রাচ্য নয়।··· তোমার গদ্য-রচনারীতির মধ্যে যে নৈপুণ্য আছে আমাদের দেশের পাঠকেরা তার পুরো দাম দিতে প্রস্তুত নয়। গদ্য-লেখাও যে একটা রচনা সেটা আমরা এখনো স্বীকার করতে শিখি নি।'[২২] রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্যটি থেকেই প্রমথ চৌধুরীর রচনাকুশলতা, ও তিনি যে তথাকথিত 'জনপ্রিয়' সাহিত্যিক ছিলেন না, তা বেশ বোঝা যায়।

প্রমথ চৌধুরীর কাছে রবীন্দ্রনাথ যে সমস্ত চিঠিপত্র লিখেছেন, তা থেকে সবুজপত্রের আমলের বাংলা সাহিত্যের পরিস্থিতিও বেশ বোঝা যায়। প্রমথ চৌধুরীর পাঠকসংখ্যা যেমন সীমাবদ্ধ তেমনি তাঁর পত্রিকার পাঠকসংখ্যাও ছিল সীমাবদ্ধ। তাই সবুজপত্র যুগান্তকারী পত্রিকা হ'লেও জনপ্রিয় পত্রিকা ছিল না। 'সবুজপত্র' পত্রিকার সম্পাদক ও নায়ক প্রমথ চৌধুরী, কিন্তু এর অন্তরালের প্রাণশক্তি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। সবুজপত্রকে লালন করেছেন রবীন্দ্রনাথ। নানা প্রকার যুক্তি বুদ্ধি উৎসাহ দিয়ে কবি প্রকারান্তরে সবুজ-পত্রের সারথ্য করেছেন। সবুজপত্রের ভালো লেখাকে তিনি যেমন উৎসাহিত করেছেন, তেমনি ত্রুটি থাকলে তাও নির্দেশ করতে ছাড়েন নি। তাছাড়া নবীন লেখকদের নানাভাবে আগ্রহশীল ক'রে তোলা ছিল কবির উদ্দেশ্য। সম্পাদক ও রবীন্দ্রনাথ ছাড়া সবুজপত্রের লেখকসংখ্যা ছিল অত্যন্ত মুষ্টিমেয়। কিন্তু যাতে তরুণ সাহিত্যিকেরা সবুজপত্রে লেখেন, এ বিষয়ে তিনি প্রমথ চৌধুরীকে বহু চিঠি লিখেছেন। ১৩২৬-এ লেখা একখানা চিঠিতে দেখি, কবি কায়মনোবাক্যে সবুজপত্রের পাতায় নূতন লেখকদের আবির্ভাব দাবি করেছেন, 'কিন্তু নবীন লেখক চাই। তাদের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না কেন? সবুজপত্রের সভার পোনের আনা আসন আমরাই যদি জুড়ে থাকি তাহলে কালব্যতিক্রম দোষ ঘটে।'[২৩] কবির মনে কিছুকাল ধ'রে এক ধরণের অস্বস্তি দেখা যাচ্ছিল। সবুজপত্রে যদি নূতন একদল লেখক সৃষ্টিই না হ'ল, তা হ'লে এর উদ্দেশ্য তো সিদ্ধ হবে না। তার ওপর এর অধিকাংশ লেখাই

রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরীর,—রবীন্দ্রনাথের মাঝে মাঝে এই অবস্থাটা ভালো লাগে নি। পরবর্তী চিঠিতে বলেছেন, 'সবুজপত্র পড়ে খুসি হ'লুম। কিন্তু আরো লেখক চাই। লেখাসৃষ্টির চেয়ে লেখকসৃষ্টির বেশী দরকার। লেখাসৃষ্টির দ্বারাই লেখককে টানা যায় কিন্তু এখনো বেশী দূর পর্যন্ত সবুজপত্রের টান পৌঁচচ্চে না। নবীন লেখকেরা সবুজপত্রের আদর্শকে ভয় পায়—তাদের একটু অভয় দিয়ে দলে টেনে নিয়ে, ক্রমে তাদের বিকাশ হবে।'[২৪] রবীন্দ্রনাথের এই অকুণ্ঠ আনুকূল্য সবুজপত্রের যাত্রাপথের সবচেয়ে বড় পাথেয় হ'য়ে উঠেছিল। যখনই সবুজপত্রে ভালো লেখার অভাব হয়েছে, তখনই কবির অক্লান্ত লেখনী সহস্রধারে অমৃত পরিবেশন করেছে।

সবুজপত্রের যুগের আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই সময়ের বিভিন্ন সাহিত্যিক বিতর্ক। চিরাচরিত ব্যবস্থার জায়গায় নূতন কিছু দেখা দিলেই নানাদিক থেকে সংক্ষুব্ধ প্রতিবাদ দেখা দেয়। বলা বাহুল্য, সবুজপত্রের সঙ্গেও সমসাময়িক পত্র-পত্রিকার বিরোধ ছিল। আজ বিরোধ মিটে গেছে, কিন্তু সেকালের বাংলা সাহিত্যের কতকগুলি ঐতিহাসিক মুহূর্ত এর মধ্যে আত্মগোপন ক'রে আছে। এই বিরোধের সবচেয়ে বড়ো কারণ হ'লো সবুজপত্রের ভাষাদর্শ। সবুজপত্রের বিরোধী পত্রিকাগুলির মধ্যে 'মানসী' ও 'নারায়ণ'ই ছিল প্রধান। প্রমথ চৌধুরীর স্বরচিত ভাষাবিষয়ক প্রবন্ধগুলি মূলতঃ বিতর্ক থেকেই উদ্ভূত হয়েছে। মাঝে মাঝে চৌধুরী মশায়ও এই বিরোধী দলের আক্রমণে বিপন্ন বোধ করেছেন, কিন্তু সব সময়েই অভয় দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। তৎকালীন 'সবুজপত্র'-বিরোধিতার বিষয় রবীন্দ্রনাথের একখানি চিঠিতে জানা যায় 'সাহিত্যে তোমার প্রতিষ্ঠা যতই দৃঢ় হতে থাকবে ততই তোমার উপর ধাক্কা বেশী পড়বে—যারা মাঝারি মানুষ তাদের সুবিধা এই যে তাদের মাথার অনেক উপর দিয়ে তুফান চলে যায়। আমি দেখেছি যত রাজ্যের বাজে লোকের কথায় তোমাকে উত্তেজিত করে—তুমি বাজে লোককে কিছু বেশী নাই দিয়েও থাক—তার একটা কারণ তুমি···তাদের দুর্বাক্যকে এখনো ভয় কর।'[২৫] বাংলা সাহিত্যের অচলায়তন ভাঙ্গার ব্রত নিয়েছিলেন প্রমথ চৌধুরী, মাথার ওপরে চির-যৌবনের কবি রবীন্দ্রনাথের দক্ষিণপাণি। আধুনিক মনন ও বিংশ শতাব্দীর নূতন জিজ্ঞাসার সূত্রপাত এখানেই।

চার

'সবুজপত্র' পত্রিকার আদর্শ ছিল অগ্রগতির, কিন্তু তখনকার দেশকালের মধ্যেই নবীন চিন্তাধারার বীজ ছিল। প্রকৃতপক্ষে 'সবুজপত্র'ই বিংশ শতাব্দীর সর্বপ্রথম মাসিকপত্র। আধুনিক চিন্তাধারার, আধুনিক জিজ্ঞাসার বাহন হিসেবে এই পত্রিকাটির একটি ঐতিহাসিক মূল্য আছে। বাঙালীর উনিশ শতকীয় সুস্থ সমৃদ্ধ জীবন-চেতনার মর্মমূলে বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলন একটি তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সেই আলোড়নকেই তীব্রতর ক'রে তুলেছিল। ধ্রুব আদর্শের প্রতি প্রশ্নচঞ্চল মনোভাব, সংশয়বাদ, প্রচলিত জীবনাচরণের প্রতি ব্যঙ্গাত্মক দৃষ্টি—এই যুগের সাংস্কৃতিক জীবনের কতকগুলি মূল বৈশিষ্ট্য। জড়তাবিহীন নবীন চিন্তাধারায়, যুক্তি-বুদ্ধির মার্জিত প্রতিফলনে, মননশীলতার মৌলিকত্বে সবুজপত্রের তরুণতর লেখক-সম্প্রদায়ের মধ্যেও এক নবজীবনের সঞ্চার হয়। রবীন্দ্রনাথ নিজেই সবুজপত্রের পথ-নির্দেশ দিয়েছেন, 'আমাদের সমাজে যে পরিমাণে কর্ম বদ্ধ হইয়া আসিয়াছে সেই পরিমাণে বাহবার ঘটা বাড়িয়া উঠিয়াছে। চলিতে গেলেই দেখি সকল বিষয়েই পদে পদে কেবলই বাধে।'[২৬]—রবীন্দ্রনাথের এই বিক্ষোভ থেকেই তৎকালীন প্রগতিবাদীদের জীবনদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। তৎকালীন জীবনাচরণের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে 'সবুজপত্র' পত্রিকায় চৌধুরী মহাশয়ের স্নেহধন্য সহযোগী শ্রীপবিত্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন, 'এদিকে ইউরোপীয় মহাসমর অপর দিকে ভারতের জাতীয় আন্দোলন—এই দুয়ের টানাটানি সত্ত্বেও বাঙালীর সাংস্কৃতিক জীবনের অগ্রগতির চেষ্টা ব্যাহত হয় নি—এইটিই সুখের কথা।'[২৭] 'সবুজপত্র'কে অবলম্বন ক'রে এ যুগের অব্যাহত ও বলিষ্ঠ সাংস্কৃতিক অভিযান উদ্ধৃত মন্তব্যটির সমর্থন করে।

বিংশ শতাব্দীর চিন্তা-চেতনাকে সর্বপ্রথম এই পত্রিকাটিই স্পষ্টকণ্ঠে উচ্চারণ করেছে। নবযুগের রৌদ্র-জল-বায়ু রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী থেকে আরম্ভ ক'রে সবুজপত্রের তৎকালীন তরুণতম লেখক পর্যন্ত,—সকলেরই মনে নূতন ধরণের ভাবের ফসল ফলিয়েছিল। শব্দ-সৃষ্টির পরীক্ষা-নিরীক্ষা, ভঙ্গি ও আঙ্গিকের বৈচিত্র্য, এককথায় পুরাণো ভাব ও ঢঙ্ বর্জন ক'রে নূতনভাবে সাহিত্য সৃষ্টি করা এই গোষ্ঠীর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। প্রচলিত পথের বিরুদ্ধে প্রবল অনাস্থাই সবুজপত্রের ইতিহাসকে এমন বিচিত্র ক'রে তুলেছে। চৌধুরী মহাশয়ের চিন্তাশক্তির স্বাতন্ত্র্যের কথা—তাঁর নিজকথাই উদ্ধার ক'রে বলেছেন

অচিন্ত্যকুমার, 'বলেই ফের জের টানতেন, "নিত্য তুমি খেল যাহা, নিত্য ভাল নহে তাহা, আমি যা খেলিতে বলি সে খেলা খেলাও হে।" একথা ভারতচন্দ্র লিখেছিল। চাই সেই শক্তিমান স্রষ্টিকর্তার কৃতিত্ব, সেই অনন্যপূর্বতা। যদি সর্বক্ষণ মনে কর, সামনে রবীন্দ্রনাথ রয়েছেন, তবে নিজের কথা আর বলবে কি ক'রে? তবে তো শুধু রবীন্দ্রনাথেরই ছায়ানুসরণ করবে। তুমি ভাববে তোমার পথ মুক্ত, মন মুক্ত, তোমার লেখনী তোমার নিজের আজ্ঞাবহ।'[২৮] এই মন্তব্য থেকেই 'সবুজপত্রের'র যুগের চিন্তা-কর্ষণার বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যাবে।

দেশ-কালে যুগোচিত বিবর্তনধারার সঙ্গে 'সবুজপত্র' পত্রিকার আন্তরিক যোগাযোগের সূত্রটি লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, তখনকার দিনের বিতর্কসঙ্কুল আবহাওয়ার মধ্যে সবুজপত্র বহু-প্রচলিত পথ ছেড়ে দিয়ে পরীক্ষামূলক নূতন পথই ধরেছে। দেশ-কালের সেই ঐতিহাসিক সন্ধিলগ্নে সবুজপত্র নানা রচনায় আত্মপ্রকাশ করেছে। তখনকার দিনের নানা তর্ক-কণ্টকিত বিতর্কমূলক সমাজ ও সাহিত্যের নানা চিন্তার আলোড়নের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাওয়া যায় শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্তের একটি মূল্যবান রচনায়,—'আজ আমরা যাকে বলছি "প্রগতি সাহিত্য" বা "সমাজচেতন সাহিত্য" তার তর্ক খুব প্রখর হ'য়ে উঠেছে, ঐতিহাসিক কারণে। কিন্তু সবুজপত্র যখন প্রথম প্রকাশ হচ্ছে সে তর্কের তখন অপ্রতুল ছিল না। মানুষের সমাজের আমূল পরিবর্তনের প্রয়োজন; তার শ্রেণীভেদের, তার ধনোৎপাদন ও বণ্টনব্যবস্থার, তার রাষ্ট্রশক্তির মূল উৎসের। এ আলোচনা তখন বেশ চলেছে; কারণ সময়টা প্রথম মহাযুদ্ধের উদ্যোগ ও ভীষ্মপর্ব। এ আলোচনায় প্রমথ চৌধুরীর মন ছিল মোটের উপর এই পরিবর্তনের পক্ষে।'[২৯] 'সবুজপত্র' সম্পাদকের নবীন প্রত্যাশী মানসিকতার পরিচয় এই উক্তিটিতে পরিস্ফুট হয়েছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বাঙালী মানসিকতার পরিবর্তন নূতন প্রকাশের বেদনায় উৎকণ্ঠিত হ'য়ে উঠেছিল। পাশ্চাত্ত্য চিন্তাধারার শুধু ভাবগত প্রভাবই নয়, তার বিচিত্র রূপ ও রীতির অনুসরণ সবুজ-গোষ্ঠীর লেখকদের মধ্যে স্পষ্টই লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য পাশ্চাত্ত্য চিন্তাধারা এবং রূপ ও রীতির অনুসন্ধান সবুজপত্রের আগে অন্য কোন পত্রিকায় লক্ষ্য করা যায় নি—একথা বললে ঐতিহাসিকতার দিক থেকে ভুল হবে। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার মাধ্যমে বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং ইউরোপীয় চিন্তাধারা, রূপ ও রীতি বাংলা সাহিত্যে সঞ্চারিত করতে সচেষ্ট ছিলেন। দেশ-বিদেশের বিচিত্র

জ্ঞান-বিজ্ঞান বাঙালীর মনোজীবনকে সরস ক'রে তুলেছিল। কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে 'বঙ্গদর্শন'-এর সঙ্গে 'সবুজপত্র' পত্রিকার পার্থক্য কম নয়। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, 'বাঙালী যে ইংরাজের অনুকরণ করে ইহাই বাঙালীর ভরসা।'[৩০] তা ছাড়াও প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য ভাব-সাধনার একটি সমন্বয় সাধন করা 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার উদ্দেশ্য ছিল। এ ক্ষেত্রে সবুজপত্রের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্নজাতীয়। এ সম্পর্কে সবুজপত্রের প্রথম সংখ্যায় সম্পাদক নিজেই যে মন্তব্য করেছেন, তা নানাকারণে প্রণিধানযোগ্য, 'ইউরোপের সভ্যতা অমৃতই হোক, মদিরাই হোক আর হলাহলই হোক তার ধর্মই হচ্ছে মনকে উত্তেজিত করা, স্থির থাকতে দেওয়া নয়। এই ইংরাজী শিক্ষার প্রসাদে, এই ইংরাজী-সভ্যতার সংস্পর্শে আমরা দেশসুদ্ধ লোক যে দিকে হোক কোনও-একটা দিকে চলবার জন্য এবং অন্যকে চালাবার জন্য আঁকুবাঁকু করছি। কেউ পশ্চিমের দিকে এগোতে চান, কেউ পূর্বের দিকে পিছু হটতে চান, কেউ আকাশের উপরে দেবতার আত্মা অনুসন্ধান করছেন, কেউ মাটির নীচে দেবতার মূর্তির অনুসন্ধান করছেন। এক কথায়, আমরা উন্নতিশীল হই, আর অবনতিশীলই হই—আমরা সকলেই গতিশীল, কেউ স্থিতিশীল নই। ইউরোপের স্পর্শে আমরা, আর-কিছু না হোক, গতি লাভ করেছি, অর্থাৎ মানসিক ও ব্যবহারিক সকলপ্রকার জড়তার হাত থেকে কথঞ্চিৎ মুক্তিলাভ করেছি।'[৩১] প্রথাবদ্ধ জীবনকে আলোড়িত করা, গতিশীল ক'রে তোলা ইউরোপীয় সভ্যতার প্রত্যক্ষ ফল। সবুজপত্র-পর্বে এই স্বীকৃতিকে জীবনাচরণের বৈশিষ্ট্যে পরিণত করা হ'য়েছিল। নবযুগের সাহিত্যের পট-পরিবর্তন সম্পর্কে প্রমথ চৌধুরীর ধরণা খুব সুস্পষ্ট ছিল। শুধু প্রাচীনকাল নয়, উনিশ শতকের সাহিত্যের সঙ্গে বিংশ শতাব্দীর সাহিত্যের যে মূলগত প্রভেদ, তারও একটা সঙ্গত কারণ খুঁজে পাওয়া যায়। প্রমথ চৌধুরীর মনে চল্লিশ বছর আগে যে প্রশ্ন জেগেছিল, আমাদের সামনেও প্রাচীন ও অর্বাচীন সাহিত্য প্রসঙ্গে সেই প্রশ্নই জেগেছে। তাই নব্য লেখকদের সামনে তিনি একালের সাহিত্যের যে স্বরূপবৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন, তার মূল্য অনস্বীকার্য, 'প্রথমেই চোখে পড়ে যে, এই নবসাহিত্য রাজধর্ম ত্যাগ ক'রে গণধর্ম অবলম্বন করেছে। অতীতে অন্য দেশের ন্যায় এ দেশের সাহিত্যজগৎ যখন দু'চারজন লোকের দখলে ছিল, যখন লেখা দূরে থাক্ পড়বার অধিকারও সকলের ছিল না, তখন সাহিত্যরাজ্যে রাজা সামন্ত প্রভৃতি বিরাজ করতেন। এবং তাঁরা কাব্য দর্শন ও ইতিহাসের ক্ষেত্রে, মন্দির অট্টালিকা স্তূপ স্তম্ভ

গুহা প্রভৃতি আকারে বহু চিরস্থায়ী কীর্তি রেখে গেছেন। কিন্তু বর্তমান যুগে আমাদের দ্বারা কোনরূপ প্রকাণ্ড কাণ্ড ক'রে তোলা অসম্ভব, এই জ্ঞানটুকু জন্মালে আমাদের কারও আর সাহিত্যে রাজা হবার লোভ থাকবে না। এবং শব্দের কীর্তিস্তম্ভ পড়বার বৃথা চেষ্টায় আমরা দিন ও শরীর পাত করব না।'[৩২] আসল কথা নবযুগের সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন এবং তিনি চেয়েছিলেন 'যুগধর্মানুযায়ী সাহিত্যরচনা' করতে। রবীন্দ্রোত্তর যুগের সাহিত্য প্রসঙ্গেও তাঁর এই মন্তব্যটি অপ্রযুক্ত নয়।

পাঁচ

শুধু নবযুগের সাহিত্যে ইউরোপের গতিশীল মনের স্পর্শ-ই লাগে নি, এ যুগের সাহিত্যভূমি তর্ক-কণ্টকিত ও বাদ-প্রতিবাদমুখর। দ্বিজেন্দ্রলাল ও রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক মতবিরোধের রেশ তখনও নানা আকারে সক্রিয় ছিল। এই বাদ-প্রতিবাদের তর্কসঙ্কুল আবহাওয়ার মধ্যেই 'সবুজপত্রের' জন্ম। সুতরাং সবুজপত্রের ইতিহাসের সঙ্গে সে দিনের বাদ-প্রতিবাদের ইতিহাসও অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হ'য়ে আছে। 'মানসী', 'নারায়ণ', 'মানসী ও মর্মবাণী' প্রভৃতি পত্রিকায় সবুজপত্র' বিরোধিতার যে পরিচয় আছে, তা থেকে সেকালের সাহিত্যিক বাদ-প্রতিবাদের স্বরূপ নির্ণয় করা দুরূহ নয়। শুধু ভাষাদর্শ নয়, সাহিত্যাদর্শ নিয়েও বাদ-প্রতিবাদের অন্ত ছিলনা। রবীন্দ্র-বিরোধিতার সূত্র ধরেই এই বাদ-প্রতিবাদের সুরু হয়। 'সবুজপত্র' প্রকাশের কিছুকাল পূর্ব থেকেই বিপিনচন্দ্র পাল সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে তাঁর প্রধান অভিযোগ ছিল যে তাঁর সঙ্গে বাস্তব জগতের কোন যোগ নেই। এমন কি রবীন্দ্রনাথের ধর্মসাধনাকেও তিনি বস্তুতন্ত্রহীন বলেছিলেন। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় [১৩১৮, চৈত্র] প্রকাশিত বিপিনচন্দ্রের একটি প্রবন্ধ নিয়ে তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি হয়।[৩৩] দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন-সম্পাদিত 'নারায়ণ' পত্রিকা সবুজপত্রের সমসাময়িক—পত্রিকাটি মোটামুটি প্রাচীন ধারার বাহক ছিল। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যাদর্শের বিরুদ্ধে এই যুগে চিত্তরঞ্জনও লেখনী ধারণ করেছিলেন। 'নারায়ণ' পত্রিকায় তিনি বাংলাগীতি-কবিতা প্রসঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করেন—তাতে বাংলাকাব্যের প্রাচীন ঐতিহ্য ও দেশীয় ভাষার প্রশংসা করা হয়েছে। তরুণ কবিরাও যাতে সেই বহু-প্রচলিত ধারা অনুসরণ করেন, প্রকারান্তরে তার নির্দেশও তিনি দিয়েছেন। 'সবুজপত্র' প্রকাশের সমকালীন

সাহিত্যিক পরিবেশ থেকেই 'সবুজপত্র' পত্রিকার বিরোধী মতবাদের স্বরূপ নির্ণয় করা মোটেই দুরূহ নয়।

সবুজপত্রে প্রকাশিত 'হৈমন্তী', 'স্ত্রীর পত্র' প্রভৃতি গল্পে ও 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে নারী-জাগরণের একটি নূতন দিকের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এই জাতীয় রচনায় যে নবীন সম্ভাবনার ইঙ্গিত ছিল, তা সনাতনপন্থীদের অতীতাশ্রয়ী মনে একটি প্রবল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। 'নারায়ণ' পত্রিকাই প্রাচীনপন্থীদের মুখপত্র হ'য়ে উঠেছিল। রবীন্দ্রনাথ শ্লেষের সঙ্গে তাঁর 'বাস্তব' প্রবন্ধে বলেছিলেন, 'বর্তমান সময়ে কতকগুলি বিশেষ কারণে হিন্দু আপনার হিন্দুত্ব লইয়া ভয়ঙ্কর রুখিয়া উঠিয়াছে। সেটা সম্বন্ধে তাহার মনের ভাব বেশ সহজ অবস্থায় নাই। বিশ্বরচনায় এই হিন্দুত্বই বিধাতার চরম কীর্তি এবং এই সৃষ্টিতেই তিনি তাঁহার সমস্ত শক্তি নিঃশেষ করিয়া আর কিছুতেই অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না। এইটে আমাদের বুলি। সাহিত্যের বাস্তবতা ওজনের সময়ে এই বুলিটা হয় বাটখারা। কালিদাসকে আমরা ভালো বলি, কেননা তাঁহার কাব্যে হিন্দুত্ব আছে।'[৩৪] অধ্যাপক রাধাকমল মুখোপাধ্যায় আরও ব্যাপকভাবে বর্তমান বাংলা সাহিত্যের বস্তুতন্ত্রহীনতার অভিযোগ করেন।[৩৫] পরবর্তীকালে রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের 'সাহিত্যে বাস্তবতা' প্রবন্ধকে অবলম্বন ক'রে প্রমথ চৌধুরী নিজে এই বিতর্কে যোগ দেন। 'বস্তুতন্ত্রতা বস্তু কি' প্রবন্ধে চৌধুরী মহাশয় রাধাকমলবাবুর প্রবন্ধের উত্তর দিতে গিয়ে বস্তুতন্ত্রতার মৌলিক সংজ্ঞা নিয়েও আলোচনা করেছেন। এই বিরোধের মধ্যে তিনি একটি সমন্বয়-সূত্রও আবিষ্কার করেছেন, 'কিন্তু একমাত্র সুন্দরের চর্চা করতে গিয়ে সত্যের জ্ঞান হারানো যেমন রোমান্টিকদের দোষ, সত্যের চর্চা করতে গিয়ে সুন্দরের জ্ঞান হারানোটা রিয়ালিস্টদের তেমনি দোষ; প্রমাণ, Zola। আকাশগঙ্গা অবশ্য কাল্পনিক পদার্থ। কিন্তু তাই ব'লে কাব্যে মন্দাকিনীর পরিবর্তে খোলা নর্দমাকে প্রবাহিত করার অর্থ তাকে জীবনদান করা নয়। রাধাকমলবাবু অবশ্য এ জাতীয় রিয়ালিজমের পক্ষপাতী নন। কেননা তাঁর মতে যেটি এদেশের আদর্শ কাব্য অর্থাৎ রামায়ণ, সেটি হচ্ছে সংস্কৃত সাহিত্যের সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান রোমান্স। জোলা প্রভৃতি রিয়ালিজমের দলবল সরস্বতীকে আকাশপুরী থেকে শুধু নামিয়েই সন্তুষ্ট হন নি, তাঁকে জোর ক'রে মর্ত্যের ব্যাধিমন্দিরে প্রতিষ্ঠা করিয়েছেন। কারণ রোগ যে বাস্তব, সে কথা আমরা চীৎকার ক'রে মানতে বাধ্য।'[৩৬]

এইকালে প্রমথ চৌধুরী ও ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণীকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্রগুচ্ছ সবুজপত্রের ইতিহাস-রচনার মূল্যবান উপাদান। নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ-পরিচালিত 'মানসী' পত্রিকা প্রসঙ্গে কবি মাঝে মাঝে যে দু'একটি কৌতূহলী মন্তব্য করেছেন তা থেকেও তখনকার অবস্থাটা কিছুটা বোঝা যাবে, 'নাটোর মানসীর জন্যে অত্যন্ত তাগিদ করছেন। জীবনের বাজে উপদ্রবের মধ্যে এই আর একটি উপসর্গ বাড়ল।...নাটোরকে তাঁর এই ব্যাধি থেকে মুক্ত করবার কি কোনো রাস্তা আছে? আমার আশঙ্কা আছে মানসীতে যদি মহারাজকে পেয়ে থাকে তাহ'লে হয়ত একদিন সবুজপত্রের সবুজে তাঁর চোখ না জুড়তেও পারে—সেটা আমাদের পক্ষে অসুখের কারণ হবে। অতএব এখন থেকে যদি পার তার প্রতিকার করো।'[৩৭] সমসাময়িক মাসিকপত্রগুলির প্রবন্ধ সম্পর্কে সম্পাদকীয় বক্তব্যকে আরও স্পষ্টতর করার জন্য রবীন্দ্রনাথ প্রমথ চৌধুরীকে একাধিক পত্র লিখেছেন। সমালোচনার একটি যথার্থ মানদণ্ড নির্ণীত হোক—এই অভিপ্রায় কবিকে তখন সচেষ্ট ক'রে তুলেছিল। তা ছাড়া যারা তরুণ অথচ যোগ্যতা আছে, তাদেরও পুরস্কৃত করা হবে। তখনকার দিনের মাসিকপত্রিকায় বাদ-প্রতিবাদের মাধ্যমে যে কেমন ক'রে সাহিত্যের মূল্য ও সমালোচনার মানদণ্ড নির্ণীত হচ্ছিল, তার পরিচয় পাওয়া যায় কবির একটি চিঠিতে, 'প্রতিমাসে সমালোচনার যোগ্য বই পাবে না, কিন্তু মাসিকপত্রের লেখাগুলোর প্রতি লক্ষ্য ক'রে কিছু না কিছু বলবার জিনিস পাবে। বিরুদ্ধ কথাও যথোচিত শিষ্টতা রক্ষা ক'রে কি ভাবে বলা উচিত তার একটা আদর্শ দেখাবার সময় এসেছে।'[৩৮] সবুজপত্রের অনেকগুলি সংখ্যা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ অনেক সূক্ষ্ম মন্তব্য করেছেন। বিশেষ ক'রে তরুণ সাহিত্যিকগোষ্ঠী যাতে গ'ড়ে ওঠে সে বিষয় সম্পাদককে দৃষ্টি দিতে বলেছেন। 'সবুজপত্রে'র জীবন-পরিধি খুব দীর্ঘ নয়। কিন্তু ইতিহাসের একটি সন্ধিলগ্ন এর কাল-পরিধি। তাই বাংলা সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট পর্বের ইতিহাসে এর দান কম নয়। 'সবুজপত্র' থেকেই বিংশ-শতকীয় বঙ্গসাহিত্যের যাত্রা সুরু—প্রমথ চৌধুরী তার পার্থ, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ পার্থসারথী।

১. প্রবন্ধসংগ্রহের (প্রথম খণ্ড) ভূমিকা।

২. 'আমাদের ভক্তিরস-মদির আনুগত্য-মন্থর মনোরাজ্যে তিনি ফরাসীদেশ-সুলভ লঘুচপল ব্যঙ্গ-প্রিয়তা ও শ্রদ্ধাবিমুখ, অথচ মার্জিতরুচি শ্লেষাত্মিকা মনোবৃত্তির আমদানী করিয়াছেন।'—বঙ্গ-সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩. 'সম্প্রতি কোন সমালোচক আবিষ্কার করেছেন যে, আমি হচ্ছি এ যুগের ভারতচন্দ্র, অর্থাৎ ভারতচন্দ্রের বংশধর।'—ভারতচন্দ্র, প্রবন্ধসংগ্রহ (প্রথম খণ্ড)।

৪. 'প্রাচীন ভারতবর্ষের ভাষ্যকার ও টীকাকারদের তিনি পরম অনুরাগী ছিলেন। এঁদের মধ্যে যাঁরা বড় তাঁদের সূক্ষ্ম অথচ বস্তুনিষ্ঠ যুক্তির ধারা এবং বিপুল শব্দসম্পদের প্রয়োগনৈপুণ্য এই প্রোজ্জ্বল-বুদ্ধি অসাধারণ শব্দকুশলী বাঙ্গালী লেখককে মুগ্ধ করেছিল।'—প্রমথ চৌধুরী, শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত, বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৫৪।

৫. ফরাসী সাহিত্যের বর্ণ-পরিচয় : নানাকথা।

৬. 'দাদা আশুতোষ চৌধুরী বিলেত থেকে অনেক ফরাসী বই সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। তিনি প্রস্তাব করেছিলেন, 'তুমি ঘরে চুপচাপ করে ব'সে থাক, ফরাসী শেখ না কেন? আমি তোমাকে সাহায্য করব।' সেই থেকে ফরাসী বই পড়া অভ্যাস হয়ে গেল।'—আত্মকথা, ৭৮ পৃঃ।

৭. The Story of Bengali Literature.

৮. ভারতচন্দ্র, প্রবন্ধসংগ্রহ।

৯. 'একথা একরকম নিশ্চয় করিয়া বলা যায় যে, চৌধুরী মহাশয় ভারতচন্দ্রের যুগে জন্মিলে রায়-গুণাকরের গোষ্ঠীর কবি হইতেন, আবার ভারতচন্দ্র বর্তমান যুগে জন্মিলে সবুজপত্রের লেখকরূপে সাহিত্যে অমর কীর্তি স্থাপন করিয়া যাইতেন'—বাংলার লেখক, প্রমথনাথ বিশী।

১০. আত্মকথা।

১১. দ্বিজেন্দ্রলাল, দেবকুমার রায়চৌধুরী, পৃঃ ২।

১২. মহাভারত ও গীতা, প্রবন্ধসংগ্রহ (প্রথম খণ্ড)।

১৩. বাংলা ১৩২১ (১৯১৪) সালে 'সবুজপত্র' প্রথম প্রকাশিত হয়।

১৪. সবুজপত্র, বীরবলের হালখাতা।

১৫. বার্ণার্ড শ, সনেট-পঞ্চাশৎ।

১৬। 'আলাল ও হুতোম প্যাঁচার নক্শা'। বিশেষ আঞ্চলিক ভাষায় লিখিত তাহাদের ভাষাকে মৌখিক ভাষা বলা উচিত নয়। সাহিত্যের মৌখিক ভাষা সাহিত্যের লৈখিক ভাষার মতই দেশব্যাপী পটভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক। আঞ্চলিক ভাষা সে দাবী করিতে পারে না।—বাংলার লেখক প্রমথ চৌধুরী। প্রমথনাথ বিশী।

১৭. 'জয়দেব' প্রবন্ধ সম্পর্কে চৌধুরী মশায় নিজেই ব'লেছেন, 'সে প্রবন্ধ "ভারতী" পত্রিকায় প্রকাশ করি। "ভারতী"র সম্পাদিকা ছিলেন স্বর্ণকুমারী দেবী। তিনি উক্ত প্রবন্ধের বহু অংশ বাদ দিয়ে সেটি ছাপান···বহুকাল পরে সেটি "সবুজপত্রে" পুনঃ প্রকাশিত করি। এর কারণ, সেটি আবার পড়ে দেখলুম যে আমি আমার মত পরিবর্তন করি নি। সেটি অবশ্য তথাকথিত সাধু ভাষায় লিখিত। কিন্তু ঈষৎ মনোযোগ দিয়ে পড়লেই বুঝতে পারবেন যে, আমার লেখার সব দোষ-গুণই তাতে বর্তমান।' আত্মকথা, ৯৪ পৃঃ।

১৮. সবুজপত্রের মুখপত্র, নানাকথা।

১৯. সবুজপত্র, ১৩২১, বৈশাখ।

২০. Letters, 23rd May, 1914.

২১. 'This certainly is a singular distinction for Pramatha Choudhuri, for he alone of Rabindranaths' Juniors influenced the poet without being influenced by him'.—An Acre of Green Grass : Buddhadev Bose. Page 16.

২২. চিঠিপত্র, পঞ্চম খণ্ড।

২৩. চিঠিপত্র, পঞ্চম খণ্ড ; ৭৮ নং।

২৪. চিঠিপত্র, পঞ্চম খণ্ড ; ৭৯ নং।

২৫. চিঠিপত্র, পঞ্চম খণ্ড ; ৩৬ নং।

২৬. বিবেচনা ও অবিবেচনা, কালান্তর।

২৭. চলমান জীবন (প্রথম পর্ব), পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়।

২৮. কল্লোল যুগ, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, পৃঃ ৮৩।

২৯. প্রবন্ধসংগ্রহ, প্রথম খণ্ডের ভূমিকা।

৩০. অনুকরণ, বিবিধ প্রবন্ধ।

৩১. সবুজপত্রের মুখপত্র, সবুজপত্র, বৈশাখ, ১৩২১।

৩২. বঙ্গসাহিত্যে নবযুগ, বীরবলের হালখাতা।

৩৩. অজিত কুমার চক্রবর্তী এই প্রবন্ধটির উত্তরে লিখেছিলেন 'রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ও দেশচর্যা কি বস্তুতন্ত্রহীন'? —প্রবাসী ১৩১৯, আষাঢ়।

৩৪. সবুজপত্র, ১৩২১, শ্রাবণ।

৩৫. প্রবাসী, ১৩২১, আষাঢ়।

৩৬. সবুজপত্র, ১৩২১, মাঘ।

৩৭. চিঠিপত্র, পঞ্চম খণ্ড, ১৯নং চিঠি।

৩৮. চিঠিপত্র, পঞ্চম খণ্ড, ২৪নং চিঠি।

উত্তর-সপ্ততি প্রমথ চেধুরীর একটি নিপুণ রেখাচিত্র এঁকেছেন বুদ্ধদেব বসু, 'Sharp eyes, a dagger-like nose, a clean shaven handsome face wreathed with wrinkles, a splendid body of a man shattered by illness, looking for all the World like a great mountain-eagle, wounded in combat, wings broken, alone. As the long trembling fingers reached out for the golden cigeratte-case lying on a little table amid books and cups and the things, the bright eyes, pouncing on the visitors, lingering, questioning, would so unnerve him that he would forget to strike a light for the cigeratte and begin to think of taking his leave. If he was lucky, however, Indira Devi Choudhurani would appear at the right moment and immediately start the right sort of conversation'.[১] এই দুর্লভ চিত্রটি শুধু চিত্র নয়, চরিত্রও। এই ছবির মধ্যে প্রমথ চৌধুরীর মনোজীবনের একটি আশ্চর্য-সুন্দর পরিচয় আছে। একটি পরিচ্ছন্ন, অভিজাত ও বিদগ্ধ পরিবেশ। জনকোলাহল থেকে এ জগতটি বহুদূরে—নির্বাচিত কয়েকজন অতিথির আনাগোনা সেখানে। প্রমথ চৌধুরীর বার্ধক্যের এই চমৎকার ছবি তাঁর সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্যকেও ব্যঞ্জিত করে। তিনি জনপ্রিয় সাহিত্যিক অথবা লোককান্ত শিল্পী ছিলেন না, কিন্তু যাঁরা তাঁর কাছাকাছি এসেছিলেন তাঁরা নিঃসন্দেহে তাঁর পরিশীলিত মনোজীবনের প্রভাব অনুভব করেছেন। এই দিক দিয়ে তিনি শরৎচন্দ্রের বিপরীত পথের পথিক। শরৎচন্দ্র যখন বাংলাদেশের সর্বশ্রেণীর মন জয় করেছিলেন, প্রমথ চৌধুরী তখন নির্বাচিত কয়েকজনের বিদগ্ধমনে গভীরভাবে রেখাপাত করেছিলেন। রুচি, আভিজাত্য, নাগরিক বৈদগ্ধ্য, জ্ঞান-বিজ্ঞানের বহুব্যাপক পঠনশীলতা তাঁকে বাংলাদেশের সাধারণ পাঠক থেকে দূরেই রেখেছিল। কদাচিৎ যাঁরা কাছে এসে পড়েছেন তাঁরা তাঁর ব্যক্তিত্ব ও অসাধারণ মনন-ক্রিয়াকে ভুলতে পারেন নি।

প্রমথ চৌধুরী নির্বাচিত পাঠকের লেখক। এই সত্যটি তাঁর মানসিক বৈশিষ্ট্যকেই নির্দেশ করেছে। আমাদের সংস্কার, ভালোলাগা মন্দ-লাগার

পেছনে দীর্ঘকালের একটি ইতিহাস থাকে। দীর্ঘকাল আচরিত রুচিকে এক মুহূর্তে পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। প্রাক্‌-বৃটিশযুগের বাংলা সাহিত্যের যে বিশেষ মেজাজ আমাদের চোখে পড়ে, তা প্রধানত পল্লীকেন্দ্রিক সাহিত্যের গ্রামীণ মেজাজ। উনবিংশ শতাব্দীর কাব্য-কবিতা, উপন্যাস, রোম্যান্টিক আখ্যায়িকা, নাটক—প্রভৃতির মধ্যেও এই পল্লীকেন্দ্রিকতার সুর বহুলাংশে বিদ্যমান। শরৎচন্দ্র পর্যন্ত বাংলা কথাসাহিত্যের সুরে প্রধানত গ্রাম্যজীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষাই ঝঙ্কৃত। অবশ্য এ সময়ের মধ্যে সাহিত্যে কখনও কখনও যে নাগরিক জীবনের ছায়াসম্পাত না ঘটেছে, এমন নয়—তা ছাড়া নাগরিক রুচি ও বৈদগ্ধ্যেরও কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু বাঙালীর স্তিমিত-মন্থর জীবনের মধ্যে এই নাগরিক চৈতন্য শুধু ক্ষণকালীন আবর্তই সৃষ্টি করেছে। বাংলা সাহিত্যের গ্রামীণ মেজাজের মধ্যে নাগরিক মানসিকতার যে স্পন্দন শরৎচন্দ্র পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে লক্ষ্য করা যায় তা খুব স্থায়ী হ'য়ে বসতে পারে নি। সে ক্ষেত্রে প্রমথ চৌধুরীর মতো নাগরিক মননের লেখকের ভাগ্যে যে সোল্লাস জনপ্রিয়তা ঘটে উঠবে না, তাতে আর বিচিত্র কি!

অবশ্য প্রাচীন ও মধ্যযুগের রাষ্ট্রপোষিত সাহিত্যে মাঝে মাঝে নাগরিক চৈতন্য ছায়াপাত করেছে। জয়দেব, বিদ্যাপতি, ভারতচন্দ্র প্রভৃতির কবিতায় নাগরিক মেজাজ আত্মপ্রকাশ করেছে। সুতরাং প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যে অসংস্কৃত গ্রাম্যকবির সরল হৃদয়ের অকুণ্ঠিত অভিব্যক্তির পাশে বুদ্ধিমার্জিত, বহু-পঠন-পরিশীলিত মননও অলক্ষ্যগোচর ছিল না। প্রমথ চৌধুরী বাংলা সাহিত্যের এই জনবিরল পথের পথিক। দরবারী সাহিত্যের শেষ রশ্মিটুকু তাঁর রচনায় মুছে যায় নি। পঞ্চ-গৌড়েশ্বর রাজা শিবসিংহের সভাকবি কবি বিদ্যাপতির কাব্যে রাজসভার ঐশ্বর্য, মধ্যযুগীয় বিলাস-বিভ্রম, নাগরিক জীবনের হাবভাব-লীলাচাতুর্য প্রতিফলিত হয়েছে। সংস্কৃতসাহিত্য, অলঙ্কার, রসশাস্ত্র, কামশাস্ত্র প্রভৃতিতে অসাধারণ অধিকারের সঙ্গে মিথিলার নাগরিক জীবনাচরণ ছিল তাঁর নখদর্পণে। তাই বিদ্যাপতির কবিতার এক একটি শব্দ যেমন সুমিত, তেমনি নিটোল ও মসৃণ। বিদ্যাপতির কাব্যপ্রতিভার মধ্যে স্বাভাবিকত্ব কম ছিল না, কিন্তু তার কলাপ্রযত্নের যে অভাব ছিল না, তার প্রমাণ তাঁর কাব্যে সুপরিস্ফুট। তা ছাড়া জয়দেবের 'বিলাসকলাসু-কুতুহলম্‌'-এর উত্তরাধিকারও তিনি পেয়েছিলেন। তাই তাঁর কাব্যে নানাদিক দিয়েই নাগরিক মেজাজ আত্মপ্রকাশ করেছিল। বাংলা কাব্যে স্বাভাবিক গ্রামীণ মেজাজের সঙ্গে নাগরিক বৈদগ্ধ্যের

তফাৎ যেন অনেকখানি। শব্দবিন্যাস, উপমা-উৎপ্রেক্ষার নিপুণ প্রয়োগ, উক্তি-প্রত্যুক্তির আবেগবিরল তীক্ষ্ণাগ্র শরপাতন রাজসভার সাহিত্য ও নাগরিক প্রকাশ-নিপুণতার পরিচায়ক। বিদ্যাপতির কাব্যের রচনারীতি ও মানসপ্রকর্ষ মধ্যযুগীয় রাজন্যপোষিত সাহিত্যের অনুকূল। মধ্যযুগের দরবারী সাহিত্যের সর্বত্র এই বৈশিষ্ট্য আছে, বলা যায় না। অনেক শক্তিশালী কবি রাজা বা প্রতাপশালী ভূম্যধিকারীর পোষকতা সত্ত্বেও তাঁদের স্বভাবসিদ্ধ গ্রাম্যভাব-প্রবণতা কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। সুতরাং 'নাগরিকতা' দেশ-কাল-পরিবেশের ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল সন্দেহ নেই, কিন্তু সাহিত্যিকের একটি বিশেষ মানসিক গঠনও এর জন্য কম দায়ী নয়।

বিদ্যাপতির সঙ্গে ভারতচন্দ্রের কালগত ব্যবধান কম নয়—দীর্ঘ চারশো বছর। কিন্তু বিদ্যাপতির মধ্যেই যেন ভারতচন্দ্রের পিতৃপুরুষের সন্ধান পাওয়া যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর সেই যুগসঙ্কটকালে ভারতচন্দ্রের কাব্যে আসন্ন কালবৈশাখীর মেঘ-দুর্যোগময় রাষ্ট্রীয় পটভূমিকা খরতর বিদ্যুদ্দীপ্তিতে বিলসিত। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিলীয়মান নবাবী আমলের দিগন্তসীমায় মুর্শিদাবাদ, কাশিমবাজার, কলিকাতা-ব্যাপী যে ষড়যন্ত্রের গোপন বিষের ছবি ঝলসিত হ'য়ে উঠেছিল, 'কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী-ঈশ্বর'-এর সুবিখ্যাত রাজধানীটিও তা থেকে বাদ পড়ে নি। সেই ষড়যন্ত্রসঙ্কুল নর্মলীলা-বিষাক্ত কৃষ্ণনগরের নাগরিক ভারতচন্দ্র। অন্নদার মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে গিয়ে প্রকারান্তরে সে যুগের ঐহিকতার তীব্রোজ্জ্বল মদিরাই তিনি পরিবেশন করেছেন। কিন্তু তার কত চাতুরী, কত নিপুণ কথাবিস্তার। নূতন ছন্দের চমকে, শব্দসৃষ্টির অভিনবত্বে, শ্লেষ-বিদ্রূপ-ব্যঙ্গের হৃদয়হীন অথচ অম্ল-মধুর রূপায়ণে ভারতচন্দ্র অষ্টাদশ শতাব্দীর নাগরিক মানসিকতাকে ফুটিয়ে তুলেছেন। অসামান্য বাঙ্‌নির্মিতি, আঙ্গিক-সচেতন শিল্প দৃষ্টি, নানা বিদ্যার অনুশীলন ভারতচন্দ্রকে প্রাগাধুনিক যুগের বাংলা সাহিত্যে একটি বিশিষ্টতা দিয়েছে। জীবনরসের গভীরে তিনি প্রবেশ করেন নি, কিন্তু জীবনের বহিরাশ্রয়ী লৌকিক তরঙ্গভঙ্গকে নিপুণ বাণীবিন্যাসে রেখায়িত ক'রে তুলেছেন। অষ্টাদশ শতকের নাগরিক জীবনের ভালোমন্দ সবটুকুই ভারতচন্দ্রের সাহিত্যে বাণীমূর্তি লাভ করেছে। সূক্ষ্ম রসিকতা, সুমার্জিত বিদ্যাবত্তা, কথা-রসনিপুণতা একদিকে, অন্যদিকে ভাষার ও কারুকরণের অবিকম্পিত রেখা-বিন্যাস—ভারতচন্দ্রের সাহিত্যে উজ্জ্বল হ'য়ে আছে। কথা-কলার শিল্পকে তিনি অদ্ভুতভাবে আয়ত্ত করেছিলেন। অষ্টাদশ শতকের নাগরিক জীবনের আর

একটি দিকও ছিল। বিলীয়মান মোগল শাসন ও নবাবী আমলের পতনোন্মুখ আভিজাত্যের মধ্যে নৈতিক কলুষতা যে বিষনিঃশ্বাসী আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছিল, ভারতচন্দ্রের সূক্ষ্ম-চতুর কাব্যভাষণের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত হ'য়ে আছে। রাষ্ট্রনৈতিক স্বার্থকৌটিল্য, ষড়যন্ত্রের বহু-বঙ্কিমপথ, অন্তঃপুরিকার দেহসর্বস্ব গোপন প্রেমলীলা—নাগরিক জীবনের ক্লেদপিচ্ছিল পথরেখা ভাষার বিদ্যুৎ-চমকে মাঝে মাঝে ফুটে উঠেছে। বঙ্কিম-ওষ্ঠাধরের তীক্ষ্ণাগ্র হাসি এই জীবনের সহচর। একশো আশী বছর পরে ভারতচন্দ্র-কথাকোবিদ প্রমথ চৌধুরী বলেছেন 'ভাষামার্গে আমি ভারতচন্দ্রের অনুসরণ করেছি। এর কারণ আমিও কৃষ্ণচন্দ্রের রাজধানীতে দীর্ঘকাল বাস করেছি।'[২] ভারতচন্দ্রের ভাষার প্রসাদগুণ ও হাস্যরস প্রমথ চৌধুরীকে ভারতচন্দ্রের অনুরাগী ক'রে তুলেছে। তাঁর মতে ভারতচন্দ্রের ভাষা সরল ও তরল। তাঁর অশ্লীলতাকে শোধন করেছে প্রাণবন্ত হাস্যরস।

দুই

অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাঙলার সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটে গেল। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধের পর থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছরকাল সময়কে মোটামুটি ভাবে ইংরেজের প্রাথমিক প্রতিষ্ঠার কাল বলা যেতে পারে। ইতিমধ্যে কলকাতাকে কেন্দ্র ক'রে নাগরিক চৈতন্যের অভ্যুদয় হয়েছে। গীতিকবিতা ও রোম্যান্টিক আখ্যায়িকা-মূলক কবিতার মধ্যে বিকৃতরুচি নাগরিক জীবনের কলুষ আত্মপ্রকাশ করেছিল। এমন কি ভবানী-বিষয়ক ও কৃষ্ণ-বিষয়ক গানেও ইহ-সর্বস্বতার সুর সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠেছিল। এই কবিগোষ্ঠীরই উত্তরসাধক ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতায় তৎকালীন কলকাতার নাগরিক মানস রূপায়িত হয়েছে। ইহ-সর্বস্বতা, ব্যঙ্গবিদ্রূপ-প্রবণতা, যুক্তিবাদী সংশয়াচ্ছন্ন মনোভাব, বাগ্‌বৈদগ্ধ্য প্রভৃতি নাগরিক চৈতন্যের কতকগুলি বিশিষ্ট লক্ষণ ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় লক্ষণীয়। সমকালীন দেশ, কাল ও সমাজকে তিনি কৌতূহলের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। তাঁর সামাজিক বিদ্রূপমূলক কবিতাগুলির মাধ্যমে তিনি উনিশ শতকের প্রথমার্ধের কলকাতার নাগরিক জীবনধারাকেই নানা-ভাবে ভাষ্য করেছেন। খ্রীষ্টধর্ম, বিধবা-বিবাহ, বাঙালীর অনুকরণপ্রিয়তা, স্ত্রী-শিক্ষা, ধনাঢ্য ব্যক্তিদের ব্যভিচার, নীলকর সাহেবদের অত্যাচার প্রভৃতি

তৎকালীন সামাজিক জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনার ওপর তিনি মন্তব্য করেছেন। প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার সংঘাতের ফলে বাঙালীর নিস্তরঙ্গ জীবনের মধ্যে যে প্রবল অলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল, ঈশ্বর গুপ্ত তাকেই বাণীবদ্ধ করেছেন। তিনি জার্ণালিস্ট ও কবি,—তাই তিনি তাঁর যুগের পরিচয় খুঁটিনাটি ক'রেই বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের নাগরিক চৈতন্য ও ব্যঙ্গবিদ্রূপ-নিপুণতায় সঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর অভিজাত মননের পার্থক্য কম নয়। ঈশ্বরচন্দ্রের রুচি সর্বত্র সূক্ষ্ম নয়—কোন কোন সময় মাত্রাতিরিক্ত রসিকতা স্থূলতার সীমায় উঠেছে। ব্যক্তিগত আক্রমণ ও অনুচিত মন্তব্য অনেক সময় তাঁর রসিকতাকে নিম্নশ্রেণীর ভাঁড়ামিতে পরিণত করেছে।[৩] তা ছাড়া তাঁর মতামতের মধ্যে প্রচুর পরস্পর-বিরোধী কথা আছে। তিনি ছিলেন প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য সংঘর্ষযুগের কবি। পরবর্তীকালের বাংলা সাহিত্যে যে প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য সমন্বয়ের আদর্শ দেখা গিয়েছিল, তা তাঁর কবিতায় অনুপস্থিত। সর্বশেষে, নব্য-বিদ্যার আলোকে তাঁর মন পরিমার্জিত ছিল না। সুতরাং প্রমথ চৌধুরীর নাগরিক মানসিকতার সঙ্গে, প্রথম 'কলকাতার কবি' ঈশ্বরগুপ্তের শব্দচাতুর্য ও বক্র-তির্যক দৃষ্টিকোণ ছাড়া আর কোন বিষয়েরই তুলনা করা যায় না। সময়ের ব্যবধান তো বটেই, তা ছাড়া মানসিকতার ব্যবধানও এখানে কম নয়।

উনিশ শতকের সামাজিক ব্যঙ্গ-বিদ্রূপগুলির মধ্যে নক্সাশ্রেণীর রচনা, আখ্যায়িকাশ্রেণীর রচনা ও হাস্যরসাত্মক কবিতা এই ত্রিধারাই অভিব্যক্ত হয়েছে। প্রমথ চৌধুরীর ব্যঙ্গবিদ্রূপের সঙ্গে তুলনা করতে হ'লে সেকালের ব্যঙ্গপ্রধান রচনার সামাজিক পটভূমিকা জানা প্রয়োজন। উনিশ শতকের নগরমন্য মানুষের আচার-আচরণের অসঙ্গতিকেই কৌতুকের বিষয়বস্তু ক'রে তোলা হয়েছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য জীবনের অসঙ্গত মিশ্রণের ফলে জীবনের ক্ষেত্রে যে সব কৌতুককর অসঙ্গতির সৃষ্টি হয়েছিল, তাকেই এ যুগের কোন কোন লেখক শরাঘাতে জর্জরিত ক'রে তুলেছেন। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই ধারার একজন খ্যাতনামা লেখক ছিলেন। তাঁর 'কলিকাতা কমলালয়' [১৮২৩], 'নববাবু বিলাস' [১৮২৫], 'নববিবি বিলাস' [১৮৩৪] প্রভৃতি রচনায় সে যুগের ব্যঙ্গবিদ্রূপ-প্রবণ মানসিকতার পরিচয় আছে। কেন্দ্রচ্যুত জীবনের অসঙ্গতি, ভণ্ডামী ভবানীচরণের লেখায় ফুটে উঠেছে। কিন্তু সে যুগের অন্যান্য ব্যঙ্গরচনার মতো ভবানীচরণের রচনাতেও স্থূলরুচি ও গ্রাম্যতা দোষ আছে। ভবানীচরণের রচনায় সংস্কার-প্রবণতার পরিচয় আছে। উগ্র-

সংস্কারবাসনা তাঁর রচনাগুলিকে উদ্দেশ্যমূলক রচনার অন্তর্ভুক্ত করেছে—উদ্দেশ্যমূলক সংস্কার-বাসনা চিরকালই রসসাহিত্য-রচনার পরিপন্থী। সে যুগের অধিকাংশ বিদ্রূপাত্মক রচনার মধ্যেই এই উদ্দেশ্যমূলকতা ও নীতিশিক্ষার ধারা সুপ্রকট। এই শ্রেণীর রচনার সর্বপ্রথম নিদর্শন 'সমাচারদর্পণ'-এর 'বাবু' প্রবন্ধটিতে এই ধারাটিরই প্রাথমিক রূপ লক্ষণীয়। বাংলা গদ্য সাহিত্যের প্রথম যুগের ব্যঙ্গ বিদ্রূপপূর্ণ রচনাগুলি উনিশ শতকের সংস্কার-আন্দোলনেরই সাহিত্যিক রূপ মাত্র।

'আলালের ঘরের দুলাল' [১৮৫৭] ও 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' [১৮৬২] সে যুগের ব্যঙ্গবিদ্রূপ-প্রধান সাহিত্যের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হ'য়ে আছে। 'আলালের ঘরের দুলাল' কাহিনীটিতে বিচিত্র-চরিত্রসংঘাতের মধ্য দিয়ে সে যুগের নবগঠিত কলকাতার সমাজজীবনের প্রাণস্পন্দন ও কলকোলাহল ধ্বনিত হ'য়ে উঠেছে। সংস্কারের উদ্দেশ্য এখানেও আছে, কিন্তু জীবনরসও একেবারে অনুপস্থিত নয়। 'আলালের ঘরের দুলাল'কে একটি সর্বাঙ্গসুন্দর উপন্যাস বলায় আপত্তি থাকা খুব অসঙ্গত নয়, কিন্তু সেকালের নক্সাশ্রেণীর সাহিত্য ও উপন্যাসের একটি মিশ্র পথই এখানে অবলম্বন করা হয়েছে। কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁর 'বাবু' নাটকে [১৮৫৪] যে রীতির সূত্রপাত করেছিলেন তাই অপেক্ষাকৃত পরিণত মানসের অভিজ্ঞতায় 'হুতোম প্যাঁচার নক্সায়' [১৮৬২] পরিণত হয়েছে। 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' সামাজিক বিদ্রূপমূলক নক্সা হ'য়েও খাঁটি রস-সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত হওয়ার দাবী করে। খণ্ড-খণ্ড চিত্রের মধ্যে ঔপন্যাসিক সমগ্রতা না থাকলে রূঢ় সত্যভাষণ, পর্যবেক্ষণদক্ষতা ও তীক্ষ্ণাগ্র বিদ্রূপের মধ্যে একটি বলিষ্ঠ প্রাণধর্ম আছে। কোন কোন স্থানে মাত্রাতিরেক থাকলেও মনুমেন্ট-শিখরে অধিষ্ঠিত হুতোমের নিম্নগামী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নবোদ্ভিন্না নাগরী কলকাতার গ্লানিমালিন্য সমস্ত কিছুই ধরা পড়েছে।

ভবানীচরণ, প্যারীচরণ ও কালীপ্রসন্নের সঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর কতকগুলি মূলগত প্রভেদ আছে। ভবানীচরণ স্পষ্টতই সমাজসংস্কারের জন্য লেখনী সঞ্চালন করেছিলেন। প্রমথ চৌধুরীর রচনায় ঠিক সে শ্রেণীর কোন উদ্দেশ্য ছিল না। কারণ তিনি জানতেন, 'সাহিত্য ছেলের হাতের খেলনাও নয় গুরুর হাতের বেতও নয়।'[৪] সাহিত্যের মাধ্যমে শিক্ষাবিধান বা মনোরঞ্জন কোনটিই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। দ্বিতীয়ত উনিশ শতকের এই খ্যাতনামা হাস্যরস-স্রষ্টাদের সঙ্গে তাঁর মূল প্রভেদ ছিল দৃষ্টিকোণের। কোন একটি বিশেষ পরিবার, ব্যক্তি বা কেলেঙ্কারীর কাহিনীকেই তাঁরা মূলত তাদের আলোচনার

বিষয়বস্তু ক'রে তুলেছিলেন। 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌সা'র মধ্যে এমন এক একটি ছবি আছে, যা অবিকল বাস্তবের ছবি। প্রমথ চৌধুরীর দৃষ্টি প্রশস্ততর ও ক্ষেত্রও বৃহত্তর। আঘাত-প্রবণতার চেয়ে মনের কৌতুকোচ্ছল ক্রীড়াশীলতাই অধিকতর পরিস্ফুট। সবচেয়ে বড় কথা বাংলা গদ্যের সেই প্রাথমিক পর্যায়ে বিশেষ কোন স্টাইল গড়ে ওঠে নি। তাই ভাষাও বাঁকাপথে মোড় ফেরার কৌশল আয়ত্ত করতে পারে নি। প্রমথ চৌধুরীর ছিল বৈঠকী খোশগল্পের মেজাজ, মন ছিল নিরাসক্ত শিল্পীর. বিজ্ঞানসম্মত যুক্তি ছিল প্রধান অস্ত্র। নূতন গড়ে ওঠা কলকাতা সহরের ঘিঞ্জী গলি, ময়লা নর্দমা, পূজা-উৎসবের অন্তরালে যদৃচ্ছ কামোন্মত্ততা—তারই টীকাকার সেকালের এই লেখকগোষ্ঠী। তারপর প্রায় একশো বছর চলে গেছে—সেদিনের বাদ-প্রতিবাদের বিষয়বস্তু পুরাণো ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। উনিশ শতকের শেষ দশকের লণ্ডন, প্যারিসের নাগরিক জীবনযাত্রা, অক্‌সফোর্ডে পার্কের বসন্ত-বিহ্বলতা, জ্যোৎস্না-মূর্ছিত সীন নদী, গর্ডন স্কোয়ারে রূপসী পরিচারিকার গোপন প্রেম, ইউরোপীয় জীবনযাত্রার বিচিত্র প্রাণস্পন্দন একালের নাগরিক জীবনের ভাষ্যকারকে নূতন রসে দীক্ষিত করেছে। এবারে সমাজরক্ষার জন্য লেখনী সঞ্চালন নয়, বিষাক্ত নৈতিক জীবনকে রসিয়ে রসিয়ে বলার কৌশলও নয়—এবারের পথ স্বতন্ত্র। পরিচ্ছন্ন ড্রয়িং রুমে বাঁ হাতের দু' আঙুলের ফাঁকে সিগারেট ধরিয়ে অবসর সময়ে দু'চার জন নির্বাচিত বিদগ্ধ জনের সঙ্গে নিজের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা পালিশ ক'রে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে রমণীয় করে বলা! হাসি সশব্দ ও উচ্চকণ্ঠ নয়—কথার মারপ্যাঁচে, চোখের আলোকে, ওষ্ঠাধরের বঙ্কিম রেখায় উইট্, স্যাটায়ার, প্যারাডক্স প্রভৃতি সবগুলি বীরবলী হাস্যরসের প্রকরণ আভাসিত হ'য়ে ওঠে। ভবানীচরণ-প্যারীচরণ-কালীপ্রসন্নের হাসিতে এ আভিজাত্য থাকা সম্ভব নয়।

তিন

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক রচনা নক্‌সা বা খণ্ড-চিত্রকে অতিক্রম ক'রে ধীরে ধীরে উপন্যাসের বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছে। 'পঞ্চানন্দ' ছদ্মনামধারী ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু ও হাস্যরসিক ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উনিশ শতকের শেষার্ধে ইন্দ্রনাথের অভিনব ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক রচনা

বাংলা সাহিত্যে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছিল। ইন্দ্রনাথের ঔপন্যাসিক প্রতিভা বড় ছিল না; চুট্‌কি রচনা, সংক্ষিপ্ত টীকা-টিপ্পনীর মধ্যেই যেন তাঁর প্রতিভার স্বরূপধর্মের পরিচয় ছিল। 'ভারত-উদ্ধার' খণ্ডকাব্য, 'কল্পতরু' ও 'ক্ষুদিরাম' উপন্যাস এবং 'পাঁচুঠাকুর' নামক তিনখণ্ডের টীকা-টিপ্পনী তাঁর রচনার মধ্যে সর্বাধিক খ্যাতি অর্জন করেছে।[৫] বঙ্কিমচন্দ্র পর্যন্ত তাঁর হাস্য-রসকে টেকচাঁদ, হুতোম এবং দীনবন্ধুর হাস্যরসের চেয়ে উচ্চাসন দিয়েছেন।[৬] ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী বা ব্রাহ্মধর্মের অনুরাগীদের ব্যঙ্গ চিত্রই তিনি এঁকেছেন। ইন্দ্রনাথের হাস্যরস সৃষ্টি সে যুগে আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। হাস্যরস সর্বত্র সমানভাবে রসোত্তীর্ণ হয় নি, কিন্তু হাস্যরস সৃষ্টির অন্তরালে তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী ও আন্তরিকতা ছিল। নবহিন্দুধর্ম-আন্দোলনের ব্রাহ্মধর্ম-বিরোধী স্বর ইন্দ্রনাথের রচনায় পাওয়া যায়। ইন্দ্রনাথের হাস্যরসের মধ্যে কিছু অভিনবত্ব ছিল—তিনি পাশ্চাত্ত্য হাস্যরসের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাঁর একখানি চিঠি তাঁর হাস্যরস-সম্পর্কিত ধারণা সম্পর্কে আমাদের সচেতন ক'রে তোলে: 'আমি Satire-টাকে বাঙ্গালীর উপভোগ্য করিবার চেষ্টা পাইয়া-ছিলাম। ফরাসী Satirist-দিগের বহি পড়িয়া আমার এই সাধটা হইয়াছিল। বঙ্কিমবাবু De-Quincey-র মোলায়েম রসিকতা, বাঙ্গলার গাছমরিচ মিলাইয়া কমলাকান্তের আকারে বাঙ্গালীর হাটে চালাইতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। বঙ্কিমবাবুর কমলাকান্ত বঙ্কিমবাবুর জীবনের সরসতা শুকাইতে না শুকাইতে যেন কোথায় মিলাইয়া গেল। আমার বিদেশী-আমদানী Satire আমার জীবনের মাধুরীর সঙ্গে শুকাইয়া গিয়াছে। কোনটাই বাঙলায় টিকিল না। তোমার দ্বিজেন্দ্রলাল Humourist বটে; পরন্ত বেজায় emotional; নির্বেদ হইয়া সংসারের উদ্ভটতা ও উৎকটতাকে দেখাইতে পারে না; একটু যেন নিজে মাতিয়া উঠে। বিধাতার কশাঘাত যখন তাহার পিঠে পড়িবে, তখন তাহার এই অপূর্ব Humour এবং নির্মল তটিনীকল্লোল একেবারেই স্তব্ধ হইয়া যাইবে। কাজেই বলিতে হয়, আমাদের এই নূতন আমদানীর মাল বর্তমান বাঙ্গালার হাটে বিকাইল না।'[৭] ইন্দ্রনাথের এই মন্তব্যটির মধ্যে একটি প্রচ্ছন্ন খেদোক্তি আছে, কিন্তু হাস্যরস সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব মন্তব্যটির একটি স্বতন্ত্র মূল্য আছে। ইন্দ্রনাথের আর যাই হোক, হাস্যরস সম্পর্কে মূলগত ধারণা সুস্পষ্ট ছিল।

'বঙ্গবাসী' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু ইন্দ্রনাথের প্রভাবেই বিদ্রূপাত্মক রচনায় হাত দিয়েছিলেন। 'বঙ্গবাসী' পত্রিকা প্রতিষ্ঠা তাঁর একটি

মহৎ কীর্তি—কারণ তিনি এই পত্রিকার মাধ্যমে রীতিমত একটি বিশেষ ধরণের 'স্কুল' স্থাপন করেছিলেন। 'মডেল ভগিনী' [১৮৮৬-৮৮], 'কালাচাঁদ' [১৮৮৯], 'চিনিবাস-চরিতামৃত' [১৮৯০], 'নেড়া হরিদাস' [১৯০১] প্রভৃতি রচনায় তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর আছে। যোগেন্দ্রচন্দ্রের হাস্যরসে কিছু অদ্ভুত উদ্ভট চিত্রণ, বীভৎস রস ও আতিশয্যের পরিচয় আছে। 'মডেল ভগিনী'র শেষাংশ হাস্যরসের সীমা ছাড়িয়ে বীভৎস রসে পর্যবসিত হ'য়েছে। যোগেন্দ্রচন্দ্রের রচনায় হিন্দুধর্ম ও শাস্ত্র ব্যাখ্যার একটি দিক আছে। সে যুগের বঙ্কিম-প্রভাবিত নব্য-হিন্দুধর্মের আন্দোলন বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে দূরপ্রসারী হয়েছিল—এই শ্রেণীর উদ্দেশ্যমূলকতা যোগেন্দ্রচন্দ্রের রচনায় অনুপস্থিত নয়। অধ্যাপক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যোগেন্দ্রচন্দ্রের প্রশংসা করতে গিয়ে প্রকারান্তরে তাঁর সংস্কার-প্রবণতার কথাই বলে ফেলেছেন 'অনেক পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তির বিশ্বাস যে, বিদ্রূপাত্মক সাহিত্যের প্রয়োজন কেবল নরনারীকে দন্ত-বিকাশে পটুতা লাভ করাইবার জন্য; কিন্তু ইহা নিতান্ত অসার বিশ্বাস। ধর্মোপদেষ্টা অন্বয়মুখে ধর্মের মাহাত্ম্য খ্যাপন করেন, ব্যঙ্গরসিক ব্যতিরেকমুখে ধর্মের মাহাত্ম্য সুপ্রমাণ করেন। উভয়ের একই সাধু উদ্দেশ্য, প্রণালী স্বতন্ত্র।'[৮] তথাপি হাস্যরসাত্মক কথাসাহিত্যের কাহিনীর মধ্যে উদ্ভট প্লটের সৃষ্টি, হাস্য-রসাত্মক আচার-আচরণ, ডেপুটি রামচন্দ্র, কৈলাসচন্দ্র, সনাতনদাস, শিয়াল-মারা, কাশীবাসী প্রভৃতি কতকগুলি চরিত্র-সৃষ্টিতে তিনি দক্ষতা দেখিয়েছেন। অতিরঞ্জন-চিত্রণ বা 'ক্যারিকেচার চিত্রণে' তিনি বাংলা সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছেন। যোগেন্দ্রচন্দ্রের বৈশিষ্ট্য ব্যঙ্গের সঙ্গে অদ্ভুত রসের মিশ্রণ-প্রচেষ্টায়। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যোগেন্দ্রচন্দ্রের হাস্যরস-সৃষ্টির প্রকৃতিটিকে সামান্য দু-একটি ইঙ্গিতে সুন্দর করে ফুটিয়ে তুলেছেন 'এই সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি mock-heroic প্রণালী অনুসরণের অবশ্যম্ভাবী ফল। Byron-এর Don-Juan বা Beppo-র রসিকতা, এমন কি Dickens-এর হাস্যরস-সৃষ্টি Lamb-এর মত এত সূক্ষ্ম ও নিগূঢ় হইতে পারে না—ইহাদের মধ্যে কতকটা ভাঁড়ামি, কতকটা সভ্যরুচি-বিগর্হিত উচ্চহাস্যধ্বনির অশোভন তীব্রতা ও অসংযমের প্রাধান্য থাকিবেই।'[৯]

সমকালীন লেখক ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের পথ ছিল একটু স্বতন্ত্র ধরণের। তাঁকে ঠিক স্যাটায়ারিস্ট বলা সঙ্গত নয়। তাঁর হাস্যরস কৌতুকহাস্যের সমপর্যায়ভুক্ত, মাঝে মাঝে হিউমারের শুভ্রোজ্জ্বল বিচ্ছুরণ প্রসন্ন শরতাকাশের

মুক্তপক্ষ বলাকার মতো সঞ্চরণশীল। 'কঙ্কাবতী' ত্রৈলোক্যনাথের শ্রেষ্ঠ রচনা। রূপক, রূপকথা, অসম্ভব-উদ্ভট চরিত্র ও ঘটনাসংস্থানের সঙ্গে সহজ কৌতুকরসের সমন্বয়ে ত্রৈলোক্যনাথ রসসৃষ্টি করেছেন। তা ছাড়া তিনি ব্যক্তিবিশেষকে আক্রমণ করেন নি, তিনি প্রধানত টাইপ চরিত্রকেই অবলম্বন করেছেন। অদ্ভুত পর্যবেক্ষণ শক্তি ও পরিচ্ছন্ন প্রকাশরীতি তাঁর হাস্যরসকে উপভোগ্য ক'রে তুলেছে। কথাসাহিত্যে হাস্যরস সৃষ্টির আর একটি মাধ্যম নূতন নূতন অসঙ্গত পরিস্থিতির উদ্ভাবনকৌশল। ত্রৈলোক্যনাথ এ বিষয়ে নিপুণ শিল্পী। কিন্তু তাঁর হাস্যরসে জ্বালা নেই, সর্বত্র সহৃদয়তা ও করুণা একটি স্নিগ্ধ-মধুর পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেছে। তাঁর ভাষার পরিচ্ছন্নতাও হাস্যরস-সৃষ্টির অনুকূল। হৃদয়াবেগপূর্ণ বাষ্পবিহ্বল অপরিস্ফুট কণ্ঠ তাঁর নয়,—স্পষ্ট, পরিষ্কার, ঋজুগতি তাঁর ভাষা। সরল প্রাঞ্জল, ও কারুকার্যবিরল হয়েও এ ভাষার একটি বিশেষত্ব আছে। এ ভাষা একই আধারে সাধুভাষা ও কথ্যভাষার দাবী মিটিয়েছে। ভাষার ক্রিয়াপদ এবং বহিরঙ্গ নিঃসন্দেহে সাধুভাষার, কিন্তু ভাবে-ভঙ্গীতে এ ভাষা মৌখিক ভাষারই দোসর। তাই ভাষা যেমন ক্ষিপ্রগতি ও অব্যর্থলক্ষ্য, তেমনি সাধুভাষা চলিত ভাষার অর্ধনারীশ্বর ভঙ্গীটি হাস্যরস সৃষ্টির বিশেষ অনুকূল। ত্রৈলোক্যনাথ বাংলা সাহিত্যের হাস্যরসিকদের মধ্যে একক ও অনন্য। ইন্দ্রনাথ ও যোগেন্দ্রচন্দ্রের নির্মম ব্যঙ্গবিদ্রূপের পথ তাঁর নয়, তার পথ রূপক-রূপকথায় নির্দোষ উদ্ভট রসের সঙ্গে বিশুদ্ধ কৌতুক মিশিয়ে এক স্নিগ্ধ সহৃদয় হাসির পথ। হাসির নিষ্ঠুর তীক্ষ্ণতা এখানে বড় নয়, কারণ তাঁর হাসিতে আছে এক করুণ লাবণ্য।[১০]

ইন্দ্রনাথের চুটকি-প্রিয়তা প্রমথ চৌধুরীর রচনার মতোই উপভোগ্য। প্রমথ চৌধুরী 'ধ্রুপদ-ধামার' ছেড়ে দিয়ে চুটকির ওপরে যে ভরসা রেখেছিলেন, তা বহুবার নানাভাবে বলেছেন। 'পঞ্চানন্দ' ছদ্মনাম নিয়ে ইন্দ্রনাথ সমসাময়িক সামাজিক জীবনের ওপর নানা সরস মন্তব্য করেছেন। 'বীরবলের টিপ্পনী' রচনায় প্রমথ চৌধুরীও সমসাময়িক রাজনীতির ওপর তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে টিপ্পনী করেছেন। অবশ্য এ দু'য়ের মধ্যে প্রকারভেদ আছে নিশ্চয়ই। ইন্দ্রনাথ ফরাসী স্যাটায়ারের রস বাংলায় পরিবেশন করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর যতটা সাধ ছিল, ততটা সাধ্য ছিল না। ফরাসী স্যাটায়ারকে তিনি বাংলা সাহিত্যের অতি-নমনীয় পলিমাটির সঙ্গে মিলিয়ে দিতে পারেন নি। তার কারণ ফরাসী স্যাটায়ার শুধু 'বহি পড়িয়া' লেখা সম্ভব নয়। ফরাসী

জীবনচর্যার সঙ্গে পরিচিত না হ'লে ফরাসী স্যাটায়ার আয়ত্ত করা সম্ভব নয়—ফরাসী সাহিত্যের হাস্যরস ফরাসী জীবনেরই একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এই কারণেই ফরাসী হাস্যরসের বৈচিত্র্য, প্রসারতা ও প্রাণধর্ম এত বেশী। ইন্দ্রনাথ ও যোগেন্দ্রচন্দ্রের হাস্যরসের বিষয়বৈচিত্র্য খুব বেশী নেই—তার কারণ বৃহত্তর জীবনের স্পর্শ সেখানে পড়ে নি। ফরাসী সাহিত্যের হাস্যরস তার শব্দভেদী বাণ দিয়ে জীবনের মর্মতলকে শুধু বিদ্ধই করে না, উদ্ভাসিতও ক'রে তোলে।[১১] হাস্যরসের এই প্রকৃতিকে প্রমথ চৌধুরী অভ্রান্তভাবেই বুঝেছিলেন। ব্যক্তিগত আক্রমণ বা অপরকে অপ্রিয় কথা বলার মধ্যে থাকে ক্রোধান্ধতা। কিন্তু প্রমথ চৌধুরীর পক্ষে যুদ্ধও ছিল আর্ট। তাই তিনি বাক্যকেই মেজে-ঘষে হাতিয়ার তৈরী করেছেন—কারণ তিনি হাসির শক্তি সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তাই তিনি বলেছেন 'ফরাসী জাতি হাসতে জানে তাই তাঁরা কথায় কথায় ক্রোধান্ধ হ'য়ে ওঠেন না। তীক্ষ্ণ হাসির যে কি মর্মভেদী শক্তি আছে, এ সন্ধান যারা জানে তাদের পক্ষে কটুকাটব্য প্রয়োগ করা অনাবশ্যক।'[১২] নব্য-হিন্দুধর্ম ও ব্রাহ্মধর্মের মধ্যে যে বাদ-প্রতিবাদ চলেছিল, তারই অনিবার্য ধারক এ যুগের ব্যঙ্গবিদ্রূপ-রচয়িতারা। প্রমথ চৌধুরীর আমলে সংস্কার-আন্দোলনের উন্মত্ততা থেমে গিয়েছে। তথাকথিত ধর্মসম্পর্কে তাঁর এমন কোন ব্যক্তিগত মতামত ছিল না। কোন কিছু তারস্বরে প্রতিপাদন করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না, কিন্তু যে কোন বিষয়কে সরস ক'রে বলতে তিনি ছিলেন ওস্তাদ। হাস্যরস-স্রষ্টার অনেকেরই মতো অদ্ভুত ও উদ্ভটের দিকে তাঁর আকর্ষণ ছিল, কিন্তু ত্রৈলোক্যনাথের সহজমুগ্ধ স্নিগ্ধহাসি তাঁর রচনায় অনুপস্থিত। ত্রৈলোক্যনাথের হাসি সরল, নির্দোষ কৌতুকহাস্য—কতকটা শিশুর নিষ্কলুষ হাসির মতো। তাই বোধ হয় তাঁর 'কঙ্কাবতী' শিশুরাই একচেটে ক'রে নিয়েছে। কিন্তু প্রমথ চৌধুরীর হাসি বুদ্ধিনির্ভর, চতুর ও মর্মভেদী—হিউমার জাতীয় হাসি তাই তাঁর স্বভাব-বিরুদ্ধ। ত্রৈলোক্যনাথের হাসি সহৃদয়, স্নিগ্ধ ও প্রসন্ন—সম্ভব-অসম্ভবের রাজ্য ছাড়িয়ে মানুষ-পশু-ভূত-প্রেতকে এক ক'রে দিয়ে 'একঠেঙোমুল্লুকে' তাঁর জ্যোৎস্নারঞ্জিত দীর্ঘছায়া বিস্তার করেছে। প্রমথ চৌধুরীর হাসি বুদ্ধিধর্মী, বাক্‌চাতুর্য-নির্ভর—অসম্ভব ও অবাস্তবকে আমাদের পরিচিত পৃথিবীতে নামিয়ে আনা হয়। ত্রৈলোক্যনাথের জগৎ তাঁর এলাকার বাইরে ছিল। তিনি বলেছেন 'আমরা রূপকথা লিখতে বসলে হয়তো কিছুই হবে না, নয় রূপক হবে ; কেননা রূপকথার জন্ম সত্যযুগে, আর রূপকের জন্ম

সভ্যযুগে। এই রূপকের মধ্যে হাজারে একখানা ছেলেদের কাছে নবরূপকথা হ'য়ে দাঁড়ায়,—যথা Don Quixote, Gulliver's Travels ইত্যাদি।'[১৩]

চার

উনবিংশ শতকের শ্রেষ্ঠ হাস্যরসিক বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং। শুধু তাই নয়, হাস্যরস-স্রষ্টা হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই একটি শ্রেণী। হাস্যরসের কৌলীন্যের ও আভিজাত্যের সর্বপ্রথম রূপকার প্রকৃতপক্ষে বঙ্কিমচন্দ্রই।[১৪] বঙ্কিমচন্দ্র যখন সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভূত হন, কবিগান-তর্জা-হাফ্আখড়াই-এর যুগ তার খুব দূরবর্তী কালের কথা নয়। তাঁর সাহিত্যগুরু গুপ্তকবির প্রভাবও তাঁকে আচ্ছন্ন করতে পারে নি। দীনবন্ধুর অভিন্নহৃদয় বন্ধু হ'য়েও বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর রসিকতার আভিজাত্য হারান নি। বঙ্কিমচন্দ্রের রুচিবোধ ও মাত্রাজ্ঞান ছিল অসাধারণ, তাই হাস্যরসকেও ভারসাম্য ঠিক রেখে শিল্পে পরিণত করতে পেরেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের হাস্যরস প্রহসন মাত্র নয়, বহিরাশ্রয়ী কতকগুলি রঙীন বুদ্বুদ্‌বহুল হাল্‌কা-হাসির লীলামাত্র নয়, এমন কি নব-হিন্দুধর্মের সংরক্ষকের বিদ্রূপতীক্ষ্ণ কটাক্ষও নয়। তাই বঙ্কিমের হাস্যরসকে সমকালীন কোনো লেখকের হাস্যরস-সৃষ্টির সঙ্গে তুলনা করে চলে না। তাঁর উপন্যাসের হাস্যরসের কথা ছেড়ে দিলেও 'কমলাকান্তের দপ্তর' 'মুচিরাম গুড়' ও 'লোকরহস্য'-এর মধ্যে অবিমিশ্রভাবেই হাস্যরস সৃষ্টির প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। 'মুচিরাম গুড়' কাহিনীর উপন্যাস-ধর্ম আছে। কিন্তু এই কাহিনীর উদ্ভাবনকৌশলের মধ্যে তেমন কিছু মৌলিকতা নেই। ইন্দ্রনাথ-যোগেন্দ্রচন্দ্র-দীনবন্ধুর কোন কোন রচনার সঙ্গে মুচিরাম গুড়ের কিছু সাদৃশ্য আছে। তবে তৎকালীন সমাজের ব্যঙ্গাত্মক চিত্রণ হিসেবে এর মূল্য আছে। দীনবন্ধু মিত্রের ঘটিরাম ডেপুটির [সধবার একাদশী] প্রভাব এখানে পরিস্ফুট। 'লোকরহস্য' এক হিসেবে 'কমেডি অব্ ম্যানার্স'। কিন্তু এই শ্রেণীর হাস্যরসকে কতদূর উন্নীত করা সম্ভব বঙ্কিমচন্দ্র তা' দেখিয়েছেন। রূপক, টুক্‌রো গল্প, স্কেচ, প্যারোডি প্রভৃতি নানারকম পদ্ধতি 'লোকরহস্য' রসরচনায় ব্যবহার করা হয়েছে। নিছক কৌতুকহাস্যের চেয়ে সূক্ষ্ম সুচতুর বিদ্রূপই 'লোকরহস্যে'র প্রাণ। হাস্যরসিকের পক্ষে উদ্ভাবনের ক্ষমতা চাই—বঙ্কিমচন্দ্র অনায়াসে এই দুরূহ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। পর্যবেক্ষণদক্ষতা, নিপুণ বিশ্লেষণশক্তি, সামান্যতম ত্রুটি-বিচ্যুতির মধ্যেও অসঙ্গতির রন্ধ্রপথ আবিষ্কার, 'লোকরহস্য'-রচয়িতা বঙ্কিমচন্দ্রের অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য।

বঙ্কিমচন্দ্রের হাস্যরস-সৃষ্টি প্রসঙ্গে সর্বপ্রথম মনে পড়ে তার অনন্যসাধারণ বৈচিত্র্য ও কল্পনা-প্রাচুর্য। 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এর মধ্যে এমন অনেক অংশ আছে, যা বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ 'হিউমার' হিসেবে স্বীকৃত হওয়ার দাবী রাখে। এক 'কমলাকান্তের দপ্তরে'ই সম্ভবত সর্বশ্রেণীর হাস্যরসের নিদর্শন আছে।[১৫] শুধু বুদ্ধির কৌশল নয়, হৃদয়ের স্বতস্ফূর্ত অভিব্যক্তি তাঁকে শ্রেষ্ঠ 'হিউমারিস্ট' ক'রে তুলেছে। উচ্চশ্রেণীর হিউমারের মধ্যে কল্পনা-প্রসারতা ও গীতিকাব্যোচিত একটি মূর্ছনা থাকে—কমলাকান্তের হাস্যরস মাঝে মাঝে শেক্সপীয়র ও ল্যাম্বের ক্লাসিক হিউমারের পর্যায়ে উঠেছে। হাস্যরসিক বঙ্কিমচন্দ্র নিরাসক্ত হ'তে পারেন নি, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করতে গিয়ে নিজেই যেন জড়িয়ে পড়েছেন। ব্যক্তিগত আবেগ, অনুভূতিই বঙ্কিমচন্দ্রের হাস্যরসাত্মক রচনার মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের হাস্যরসের অনেক স্থলেই ব্যক্তি-বঙ্কিমচন্দ্রের হৃদয়ের স্পন্দন অনুভব করা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র ও চৌধুরী মহাশয় সম্পূর্ণ ভিন্ন মার্গের পথিক। হাস্যরসিক বঙ্কিম বুদ্ধি ও হৃদয় দু'পথই সমানভাবে ব্যবহার করেছেন, প্রমথ চৌধুরী সেখানে পরিমার্জিত বুদ্ধির পথই অবলম্বন করেছেন—তাই তাঁর হাসিতে উইট, স্যাটায়ার পান্, ফান্, প্যারাডক্স প্রভৃতি সব কিছুই আছে, কিন্তু বিশুদ্ধ হিউমার নেই। তিনি জীবনে বা সাহিত্যে কোথায়ও ভাবালুতা বা হৃদয়াবেগের সমর্থক ছিলেন না, দৃষ্টিভঙ্গীর দিক দিয়ে তিনি ছিলেন রোম্যাণ্টিকতা-বিরোধী। তাই বঙ্কিমের হাস্যরসের সঙ্গে তাঁর হাস্যরসের প্রকৃতিগত প্রভেদ আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের হাস্যরসে তাঁর হৃদয়াবেগ কল্পনার উত্তাপে বিগলিত হ'য়ে সাতরঙা রামধনুর মতো মনের আকাশে ছড়িয়ে পড়ে—তাঁর কল্পনাসমৃদ্ধ মনই হাসির আলোড়নে ময়ূরের মতো বিচিত্র বর্ণের কলাপ বিস্তার করে। এই কল্পনার সম্পদ প্রমথ চৌধুরীর ছিল না—বরং অনেক সময় কল্পনাকে নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপই করেছেন। কিন্তু হাস্যরসিকের নিরাসক্ত বস্তুনিষ্ঠা তাঁর মনে পূর্ণমাত্রায় সক্রিয় ছিল—তাই তিনি সকলকে হাসিয়েও নিজে অভিভূত হন নি। তাঁর গল্পগুলির মধ্যে কথনো কথনো ট্র্যাজিক্ সুরও আছে, কিন্তু সেখানেও তিনি নিরাসক্ত স্রষ্টা মাত্র। প্রমথ চৌধুরী তাঁর ফরাসী গুরুদের মতো মূলত 'Critical observer of the human comedy.' বঙ্কিমচন্দ্রও সমাজের ও ব্যক্তির ত্রুটি-বিচ্যুতিকে নিপুণভাবেই পর্যবেক্ষণ করেছিলেন, সেখানেও তিনি অনেক সময় নিরাসক্ত দ্রষ্টার আসন থেকে নীচে নেমে এসেছেন। প্রমথ চৌধুরী যে কোন বিষয় নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেছেন, কিন্তু অদ্ভুত তাঁর নির্লিপ্ততা! তাঁর ছোটগল্পগুলির চরিত্র

হাস্য-পরিহাসে আন্দোলিত বিচিত্র ঘটনাচক্রে সঞ্চারিত, কিন্তু এর কোনটিই যেন তাঁকে স্পর্শ করে না। বঙ্কিমের কমলাকান্ত অর্ধোন্মাদ, নেশাখোর বিচিত্র চরিত্রের মানুষ—সমাজ-রাষ্ট্র-সংস্কৃতি, সব জিনিষের ওপরেই তাঁর সন্ধানী দৃষ্টির আলো পড়েছে। কিন্তু কমলাকান্তের ছদ্মবেশের আড়ালে বঙ্কিমকে চিনতে অসুবিধে হয় না। প্রমথ চৌধুরীর নীললোহিত ও ঘোষাল অন্য জগতের মানুষ। তাঁরা যেমন বাক্‌চতুর, তেমনি বানিয়ে বাড়িয়ে বলতে ওস্তাদ। গল্প তাঁরা তৈরী করতে পারেন, মিথ্যে কথাকে রঙীণ ক'রে সত্যের মতো হৃদয়গ্রাহী ক'রে তুলতে পারেন। গল্পের শেষে সেই মায়াময় রঙীণ আবরণটি যখন সরে যায়, তখন কথক আর সভাস্থলে নেই—আবার কোথায়ও হয়তো নূতন আসর পেতে বসেছেন। কমলাকান্ত নেশাখোর ও অর্ধোন্মাদ হ'য়েও মিথ্যে কথার জাল বুনতে অপারগ—যা দেখেছেন যা বাস্তবিকই ঘটেছে, তাকেই অবলম্বন ক'রে তিনি তাঁর অহিফেন-নেশাগ্রস্ত কল্পনাকে উচ্ছ্বাসে-আবেগে ফেনায়িত ক'রে তোলেন। যত তুচ্ছই হোক না কেন, সামান্যতম বাস্তব ভিত্তি অন্তত থাকা চাই—সেটুকুও না থাকলে কমলাকান্তের পক্ষে দপ্তর রচনা করা অসম্ভব। কিন্তু নীললোহিত ও ঘোষালের পথ স্বতন্ত্র—তাঁরা শূন্যে মিথ্যের সৌধ রচনা করতেই পারদর্শী। বাক্-চাতুর্য, ঘটনা-সাজানোর কৌশল ও মিথ্যেকে সত্যের মতো প্রতিপন্ন করানোই তাঁদের মূল উদ্দেশ্য। প্রমথ চৌধুরীর হৃদয়াবেগ-বর্জিত বুদ্ধি-কৈবল্য verbal wit-এর ওপরেই নির্ভরশীল—তাই তাঁর সবটুকুই আলোকোজ্জ্বল—বঙ্কিমচন্দ্রের মতো আলোছায়ার লীলা এখানে নেই। প্রমথ চৌধুরীর শব্দের খেলা যেন উজ্জ্বল কঠিন-ধাতব-টঙ্কার, বঙ্কিমচন্দ্রের শব্দধ্বনিতে জল-তরঙ্গের মৃদু-মূর্ছনা।

পাঁচ

বিশেষ উদ্দেশ্য-প্রবণতা ছাড়াও হাস্যরসের যে একটি স্বতন্ত্র রসমূর্তি আছে তা প্রকৃতপক্ষে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাতেই সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ করেছে। তা ছাড়া হাস্যরসের কৌলীন্য ও আভিজাত্যেরও একটি বিশেষ মানদণ্ড বঙ্কিমচন্দ্রই নির্ধারণ ক'রে দিয়েছেন। বিংশ শতাব্দীর হাস্যরসপ্রধান সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ সামাজিক বিদ্রূপের পটপরিবর্তন। 'সোশ্যাল স্যাটায়ার' উনিশ শতকের শেষদিকে এমন কি বিংশ শতকের প্রথম দুই দশকে কিছু কিছু ছিল, কিন্তু তারপরে নূতন দিকে মোড় ফিরেছে। উনিশ শতকের শেষ দিক থেকেই বাংলা

সাহিত্যে হাস্যরসের একটি নূতন দিক উন্মুক্ত হলো। খুব সচেতনভাবে ফরাসী হাস্যরসের প্রাণবন্ত উৎসকে উন্মুক্ত ক'রে দিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মৌলিক নাটক রচনায় খুব বেশী কৃতিত্ব দেখাতে অসমর্থ হ'লেও অনুবাদ-নাটকে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। মোলিয়েরের একাধিক নাটকের অনুবাদের মাধ্যমে তিনি বিশ্ববিশ্রুত ফরাসী হাস্যরসিকের হাস্যরস-সৃষ্টির রূপ ও রীতি বাংলা নাটকে পরিবেশন করেন।[১৬] মোলিয়েরের সার্থক অনুবাদের ফলে বাংলা সাহিত্যে বিশেষত বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে হাস্যরস নূতন প্রকৃতি পেল। পরবর্তীকালে মোলিয়ের থেকে অমৃতলাল, গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, প্রমথনাথ বিশী তাঁদের হাস্যরসের অনেক রসদ সংগ্রহ করেছেন। অমৃতলাল জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রহসন থেকেই সম্ভবত মোলিয়েরকে অনুসরণের প্রয়াস পান। 'কৃপণের ধন' প্রহসনটিতে মোলিয়েরের প্রত্যক্ষ প্রভাব আছে।[১৭] প্রহসন ও ব্যঙ্গ রচনায় অমৃতলাল বাংলা নাটককে সমৃদ্ধ করেছেন। গিরিশচন্দ্রের 'যায়সা-কা-ত্যায়সা' [১৩১৩] প্রহসনটি মোলিয়েরের প্রহসনের প্রভাবজাত। দ্বিজেন্দ্রলালের প্রহসনগুলির বিচিত্র-সংস্থানকৌশল, চরিত্র ও সংলাপসৃষ্টি অনেক ক্ষেত্রেই মোলিয়েরের নাটকের প্রত্যক্ষ প্রভাবের ফল। বাংলা সাহিত্যের পূর্বতন ধারার সঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর যোগাযোগের যে কয়েকটি সেতু আছে, মোলিয়ের-রসিকতা তার মধ্যে অন্যতম। প্রমথ চৌধুরী ভাষার দিক থেকে যেমন ভলতেয়ারকে ফরাসী প্রতিভার চরম বলে স্বীকার করেছেন, তেমনি সামগ্রিক প্রতিভার দিক থেকে মোলিয়েরকে ফরাসী প্রতিভার চূড়ান্ত বিকাশ ব'লে স্বীকার করেছেন, 'বৈজ্ঞানিক যে ভাবে যে পদ্ধতি অনুসরণ ক'রে জড়বস্তুর তত্ত্ব নির্ণয় করেন, ফরাসী সাহিত্যিকেরাও সেই ভাবে সেই পদ্ধতি অনুসরণ ক'রে মানবতত্ত্ব নির্ণয় করেন। তাঁরা মানবজাতিকে চরিত্র অনুসারে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করেন, মানবের কার্যকারণের আভ্যন্তরিক নিয়মাবলী ও যোগাযোগ আবিষ্কার করতে চান। এই কারণে মোলিয়েরের নাটক ফরাসী প্রতিভার সর্বোচ্চ নিদর্শন। মোলিয়ের ধর্মের আবরণ খুলে পাপের, বিদ্যার আবরণ খুলে মূর্খতার, বীরত্বের আবরণ খুলে কাপুরুষতার, প্রেমের আবরণ খুলে স্বার্থপরতার মূর্তি পৃথিবীর লোকের চোখের সুমুখে খাড়া ক'রে দিয়েছেন।'[১৮] উনিশ শতকের শেষার্ধের সংস্কৃতিবান বাঙালীদের মধ্যে ফরাসী সাহিত্য চর্চার যে ধারা লক্ষ্য করা যায়, প্রমথ চৌধুরীতে এসে তাই পরিণাত লাভ করেছে।

সমসাময়িক সাহিত্যিকদের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলালের হাস্যরসের প্রভাব প্রমথ চৌধুরীর রচনায় লক্ষ্য করা যায়। গদ্য রচনায় দ্বিজেন্দ্রলালের প্রভাব ছিল না, কিন্তু কবিতা দ্বিজেন্দ্র-প্রভাবমুক্ত নয়। দ্বিজেন্দ্রলালের 'হাসির গান'-কে তিনি একাধিকবার সপ্রশংস অভিবাদন জানিয়েছেন। প্রমথ চৌধুরীর সমসাময়িকদের মধ্যে আর একজনের নাম উল্লেখযোগ্য, তিনি হলেন কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। কেদারনাথ মূলত কথাশিল্পী, উপন্যাস ও ছোটগল্পের মধ্যেই তাঁর হাস্যরসের মূলসূত্র লুকিয়ে আছে। তিনি বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ হিউমারিস্ট। তাঁর হাস্যরসের নিগূঢ় মর্মমূলে কোথায় যেন বেদনার উৎস আছে। ত্রৈলোক্যনাথ ও প্রভাতকুমারের মতো তিনি হিউমারের অন্তরালে 'kindly feeling'-এর সন্ধান পেয়েছেন। কেদারনাথ যেখানেই হাস্য-রসসৃষ্টিতে জীবনের গভীরে প্রবেশ ক'রেছেন, সেখানেই হাস্যরস ও করুণার সংমিশ্রণ ঘটেছে—চরিত্র-সৃষ্টিতে ও ঘটনার সূত্র-বয়নে কেদারনাথের সুরসিক মন হাসির একটি বিস্তৃতক্ষেত্র আবিষ্কার করেছে। তাঁর হাস্যরসে প্রমথ চৌধুরী বা পরশুরামের মতো সূক্ষ্ম পরিমিতিবোধ ও সুমার্জিত কারুকরণ নেই সত্য, কিন্তু বিস্তৃতি ও গভীরতার দিক থেকে তিনি তাঁর সমকালীন দু'জন হাস্যরসস্রষ্টাকে অনায়াসে অতিক্রম করেছেন। তাই তাঁর হাস্যরস অত্যন্ত সহজে সকলের কাছে আবেদনশীল হ'য়ে উঠেছে। কেদারনাথের হাস্যরসের বড় বৈশিষ্ট্য এই যে, তার মধ্যে বাঙালী জীবনের সংযোগ অত্যন্ত নিবিড়—এমন কি অশীতিবর্ষীয় লেখকের সুপ্রচুর রসধারা, প্রাণধর্মে ও মৌলিকতায় সমুজ্জ্বল। বাক্-সংক্ষিপ্ততার মধ্যে সুদূরপ্রসারী ব্যঞ্জনাধর্ম তার ছোট-গল্পগুলিকে অসাধরণত্বে মণ্ডিত করেছে। প্রমথ চৌধুরীর ছোটগল্পগুলির মধ্যে শাণিত-দীপ্ত উইট্ ও প্যারাডক্সের এক একটি চতুর শরাঘাত বর্ণনা ও সংলাপের মধ্যে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠেছে। কেদারনাথের গল্পগুলিতে পূর্ণাঙ্গ ও সুবলয়িত একটি গল্পাংশ থাকে, প্রমথ চৌধুরীর গল্পগুলিতে আখ্যায়িকার অংশ নিতান্ত ক্ষীণ-কলেবর। মূলগল্পের চেয়ে তর্কবিতর্কের অংশই বেশী, মনে হয় গল্পের চেয়ে এই তর্ক-বিতর্কের মূল্য বেশী, এবং এই বিতর্কধর্মী কথার খেলার ওপরেই তাঁর গোটা গল্পের কাঠামো ও হাস্যরসের ভিত্তি। বার্ণার্ড শ'র নাটক সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'His greatest gift was his verbal wit. It was also his greatest temptation.'[১৯] এই মন্তব্যটি প্রমথ চৌধুরীর হাস্যরস প্রসঙ্গেও প্রযোজ্য হ'তে পারে। গল্পের

স্বচ্ছন্দ প্রবাহকে পদে পদে খণ্ডিত ক'রে বাদ-প্রতিবাদ, অবান্তর প্রসঙ্গ, তীক্ষ্ণাগ্র মন্তব্য-পূর্ণ সংলাপই প্রাধান্য লাভ করেছে। সর্বত্রই একটি বক্র-তির্যক দৃষ্টি গল্পাংশকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। 'ফরমায়েসী গল্প'-এ সূত্র-সংক্ষিপ্ত গল্পাংশটুকু চরম দুর্দশাগ্রস্ত হ'য়ে তর্ক-বিতর্কের ধূলিজালে শঙ্কিত ও শীর্ণ অবশেষটুকুও হারিয়ে ফেলেছে। মূল গল্পটির চরিত্র-চিত্রণ বা ভূমিকার দীর্ঘ-বিন্যস্ত চমকপ্রদ বিতর্ক তাঁর গল্পগুলির প্রাণ। হাস্যরস-সৃষ্টিতে ও ছোটগল্প রচনার দিক দিয়ে তিনি বার্ণার্ড শ'-র পন্থা অনুসরণ করেছেন, 'আমি ঘোষালের মুখে এ প্রস্তাব শুনে বুঝলুম কথাটা নেহাৎ বাজে। সে বলতে চায় গল্প। আর এ প্রস্তাব তার গল্পের ভূমিকা মাত্র। ও সে-ভূমিকা G.B.S.-এর নাটকের ভূমিকার মত, যার অস্থায়ীর সঙ্গে অন্তরার কোন সম্বন্ধ নেই।'[২০] কেদারনাথের মতো তিনি হাস্যরসের সঙ্গে করুণরসের সমন্বয় করার চেষ্টা করেন নি। করুণ রসের অপূর্ব-সুন্দর সম্ভাবনাকে তিনি এমন একটি অবিশ্বাস্য পরিণতির মধ্যে মোড় ফিরিয়ে দিয়েছেন, যা স্বভাবতই হাস্যরসের উদ্রেক করেছে। 'ছোটগল্প' গল্পটির মধ্যে যে করুণ রসাত্মক আবহাওয়া জমে উঠেছিল, তাঁকে তিনি গল্পের শেষাংশে একটি দীর্ঘ তর্কের কণ্টকিত পুচ্ছ যোগ ক'রে দিয়ে অঙ্কুরেই বিনাশ করেছেন।

প্রমথ চৌধুরীর হাস্যরস-সৃষ্টির প্রসঙ্গে সমকালীন আর একজন শক্তিশালী হাস্যরস-স্রষ্টার কথা মনে পড়ে,—তিনি হ'লেন 'গড্ডলিকা', 'কজ্জলী', 'হনূমানের স্বপ্ন', 'কৃষ্ণকলি', প্রভৃতির সুবিখ্যাত রচয়িতা রাজশেখর বসু, ওরফে পরশুরাম। বাংলা সাহিত্যের হাস্যরসের ইতিহাসে পরশুরাম একটি নূতন সুর সংযোজিত ক'রেছেন, হাস্যরসের এমন একটি দুরূহ উৎসমূল আবিষ্কার ক'রেছেন, যা হাস্যরসকে একটি নূতন স্তরে উন্নীত করেছে। তির্যক মন্তব্য ও কথার খেলা পরশুরামের রচনায় যে নেই, এমন কথা বলা যায় না। কিন্তু প্রমথ চৌধুরীর মতো তার ওপর তিনি অতিরিক্ত জোর দেন না—পরশুরামের সংলাপ প্রমথ চৌধুরীর সংলাপের মতো জটিল ও প্যাঁচালো নয়। বাক্‌চাতুর্যের চেয়ে তিনি মনুষ্যচরিত ও ঘটনার অসামঞ্জস্যের ওপরেই বেশী জোর দিয়েছেন। পরশুরামের হাস্যরসের ধারা যেমন স্বতস্ফূর্ত, তেমনি প্রাণবন্ত। অনেক ক্ষেত্রে জীবন-সমালোচনার, অভ্রান্ত ইঙ্গিতও তাঁর গল্পগুলির মধ্যে বিদ্যমান। চমকপ্রদ আকস্মিকতা, চরিত্র ও ঘটনা-সৃষ্টির মৌলিকতা বিস্ময়কর। পুরাণকে অবলম্বন ক'রে তিনি যে সমস্ত

গল্প লিখেছেন, তার অন্তরালে একটি বিশেষ ধরণের ব্যাখ্যা থাকে। পুরাণকে আধুনিক কালের লৌকিক জগতে দাঁড় করিয়ে আধুনিক কালের কোন কোন সমস্যাকেও তিনি আলোকিত ক'রে তুলেছেন। নূতন উদ্ভট শব্দ ও নামকরণ বিষয়েও তাঁর মৌলিকতা অস্বীকার করা যায় না। অথচ এই নামগুলি শুধু কৌতুককর শব্দসৃষ্টির মোহমাত্র নয়, চরিত্র ও ঘটনার দিক থেকে এর সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া যায়। অতি আধুনিক জীবনের নানা কৌতুককর অসঙ্গতিই পরশুরামের নিপুণ ক্যারিকেচারে শিল্পিত হ'য়ে উঠেছে। স্যাটায়ারের নির্মমতার চেয়ে কৌতুকহাস্যের সূক্ষ্ম-চিক্কণ রজতরেখাটুকু যেন এখানে লোভনীয় হ'য়ে উঠেছে। প্রমথ চৌধুরী প্রধানত বাক্-চাতুর্যের ওপরেই তাঁর ভিত্তি রচনা করেছেন, পরশুরামের হাস্যরসের মূল ভিত্তি উদ্ভট পরিস্থিতির উদ্ভাবনে ও বিচিত্র পরিবেশ-সৃষ্টির মৌলিকতায়। তাই যেখানে প্রমথ চৌধুরীর গল্পগুলি একই বিন্দুতে কথার কসরতে মত্ত, পরশুরামের গল্প সেখানে স্বচ্ছন্দগতিতে পরিণতির শেষ বিন্দুতে এসে সশব্দ হাসিতে ফেটে পড়েছে। হাস্যরস-রচনায় পরশুরামের আভিজাত্য কম নয়। কিন্তু প্রমথ চৌধুরীর চেয়েও তিনি নির্লিপ্ত। প্রমথ চৌধুরীর হাস্যরসের কথার কত ভ্রূভঙ্গী, কত বহুবঙ্কিম আবর্ত—এখানে প্রবাহের চেয়ে আবর্তই যেন বড়, সূর্যকরোজ্জ্বল জলের অতি চতুর বহুরেখ-ভ্রূবিলাসই সেখানে লক্ষণীয়। পরশুরামের ছোটগল্পে কথার স্বচ্ছন্দপ্রবাহ আছে, কিন্তু সম্ভব-অসম্ভবের মোড় ফেরার অতর্কিত কৌশল সে প্রবাহের অনায়ত্ত নয়—প্রবাহ যেখানে বৃহত্তর পরিণতির সমুদ্রের সঙ্গে মিশেছে সেখানে দেখা দেয় শুভ্রোজ্জ্বল ফেন-রেখায় সূক্ষ্ম স্মিত-বুদ্ধির আলোকচক্র।

ছয়

প্রমথ চৌধুরীকে নাগরিক জীবনের ভাষ্যকার বললেও যেন তাঁর বৈশিষ্ট্যের সবটুকু বলা হয় না। 'নাগরিকতা' অর্থ শুধু ড্রয়িংরুমে বসে বিদগ্ধজনের সাহচর্য লাভ করাই নয়। 'নাগরিকতা'র মধ্যে বিকৃতি, অবক্ষয় ও ক্লেদ-পঙ্কিলতাও আছে। জয়দেবের কাল থেকে নাগরিকতার অভ্যন্তরে জীবনের কলুষিত অন্ধকারের দিকটিও আত্মপ্রকাশ করেছে। আসল কথা প্রমথ চৌধুরীর সৃষ্ট নরনারীর চরিত্র যুদ্ধোত্তরকালের নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চরিত্র নয়। তাঁর নরনারীরা যে জগতের অধিবাসী, সেখানে খুব বেশী আধুনিক জীবনের

সমস্যা প্রবেশ করতে পারে না। পরিবেশ ও চরিত্র সব, কিছুই একটি অসাধারণ সুরে বাঁধা। আধি-ব্যাধিগ্রস্ত জীবনের প্রতি আকর্ষণ তাঁর ছিল না। এ বিষয়ে তাঁর গল্প ও প্রবন্ধের মধ্যে দৃষ্টিকোণের পার্থক্য আছে। প্রবন্ধের চিন্তাধারায় তিনি আধুনিক ভাবধারার সারথ্য করেছেন, কিন্তু গল্পগুলির পটভূমিকা-সৃষ্টিতে তিনি যেন আধুনিক জগৎ থেকে অনেকটা দূরে সরে গেছেন। অনেকগুলি গল্পে পুরাণো পৃথিবীর স্বাদ পাওয়া যায়। গল্পগুলির মধ্যে একটি তীব্র ও বক্র সমালোচনাত্মক দৃষ্টি আছে, কিন্তু গল্পগুলি যেন পুরাণো দিনের মূল্যবান ফ্রেমে সযত্নে বাঁধানো। গল্পগুলি নৈমিত্তিকের নয়, অথবা আজকেরও নয়, ক্ষীণ-সুরভি রোমান্সও যে না আছে, এমন নয়। কিন্তু সে রোমান্সকে যেন আকস্মিকভাবে চরম আঘাত হানার জন্যই আনা হয়েছে। জীবনের সমগ্র রূপ অথবা কোন গভীর জীবন-জিজ্ঞাসা গল্পগুলির মধ্যে অনুপস্থিত। জীবনের খণ্ডাংশের দু'একটি মুহূর্ত তাঁর তীক্ষ্ণধার লেখনীর বিদ্যুৎ-লেখায় সজীব হ'য়ে ওঠে। প্রমথ চৌধুরীর ছোটগল্পগুলির প্রাণ প্যারাডক্সের আকস্মিক আঘাত। গল্পগুলির রচনারীতির দিক থেকে এই প্যারাডক্স-প্রবণতার একটি বিশিষ্টতা লক্ষ্য করা যায়। মকদমপুরের রায় মহাশয়ের সান্ধ্য-মজলিশ, বিচিত্র চরিত্রের ক'জন অবিবাহিত তরুণ মিলে মধ্যরাত্রিতে রায়গড় স্টেশনে বসে হুইস্কির নেশায় গল্প ফেঁদে বসা, কখনও বা সুরাট-সুন্দরীর রহস্যময় জীবনযাত্রার কাহিনী, আবার কোথাও বা রুদ্রপুরের ধ্বংসাবশেষের অন্তরালে প্রেত-পিঙ্গল মর্মান্তিক ইতিহাস, আবার কখনও বা বুন্দেলখণ্ডের দেশীয় রাজার সঙ্গীতশালায় রাঙ্কব আসনে উপবিষ্টা বিগাঢ়-যৌবনা, শ্বেতবসনা সঙ্গীত-সরস্বতীর অদ্ভুত আত্মকাহিনী, প্রভৃতি অতীতাশ্রয়ী রোমান্স-গুলির অধিকাংশেরই [সামান্য কিছু কিছু ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে] প্রারম্ভে ও শেষে এমন বাস্তবঘেঁষা তীব্র সমালোচনা আছে—যা সহজেই একটি বিপরীত প্রবাহের সৃষ্টি করে। এই দ্বন্দ্বই প্রমথ চৌধুরীর গল্পগুলির প্রাণ।

প্রমথ চৌধুরীর গল্পগুলির মধ্যে যে মজলিশী আবহাওয়া আছে, তা তাঁর মেজাজের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। বেশীর ভাগ গল্পেই মূল বক্তা লেখক স্বয়ং—কোন কোন গল্পে মূল বক্তা না হ'লেও তিনি আসরে যোগ দিয়েছেন। এই বৈঠকী-মেজাজ তাঁর প্রবন্ধগুলির মধ্যেও আছে। সেখানেও প্রবন্ধের প্রচলিত পদ্ধতি লঙ্ঘিত হয়েছে। প্রবন্ধের বস্তুনিষ্ঠা তাঁর রচনায় খুব বেশী নেই, এক অন্তরঙ্গ রীতিতে সহজ আলোচনার পদ্ধতি তিনি অনুসরণ করেছেন।

তুচ্ছ বিষয়গুলিও বলার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে অপরূপ হ'য়ে উঠেছে। বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের ইতিহাসে এই রীতিটিকে প্রমথ চৌধুরী প্রতিষ্ঠিত ক'রে গিয়েছেন। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে ব্যক্তিগত প্রবন্ধ রচনার যে প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়, প্রমথ চৌধুরী তাঁর প্রথম প্রবর্তক না হ'লেও তিনিই যে এই রীতিকে বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সাধারণ প্রবন্ধের মধ্যে যে একপ্রকার বন্ধন আছে, তিনি তা স্বীকার করতে চান নি। এইজন্য সাহিত্য, সংস্কৃতি থেকে আরম্ভ ক'রে 'রায়তের কথা' পর্যন্ত নানা বিষয় নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন, কিন্তু সর্বত্রই তাঁর বলার অন্তরঙ্গ ভঙ্গীটিই পরিস্ফুট। 'তু'-ইয়ারকি' পুস্তিকাটির মধ্যে তিনি সমসাময়িক [১৯১৬-'২০] রাজনৈতিক সমস্যার ওপর আলোকপাত করেছেন। প্রবন্ধগুলির ভূমিকায় তিনি যে মন্তব্য করেছেন, তা নানাদিক দিয়ে প্রণিধানযোগ্য, 'এ প্রবন্ধ ক'টি যতদূর পারি সহজ ক'রে সরল ক'রে লেখবার অভিপ্রায় আমার ছিল, কিন্তু ফলে দাঁড়িয়েছে এই যে, শিক্ষিত সম্প্রদায় ব্যতীত অপর কোন সম্প্রদায়ের নিকট এ প্রবন্ধগুলি সহজবোধ্য হবে না। আমার লেখা যে সর্বজনবোধ্য হয় নি, তার জন্য যতটা দোষী আমি, তার চাইতে বেশী দোষী আলোচ্য বিষয়।'[২১] অপেক্ষাকৃত জটিল বিষয়কে তিনি সহজভাবে লিখতে চেয়েছিলেন। সব সময় অবশ্য তিনি তাঁর এই সদভিপ্রায়কে সিদ্ধ করতে পারেন নি। তার জন্য তাঁর রচনারীতিকে সব সময় দায়ী করা চলে না, বিষয়বস্তুর দায়িত্বও অনেকখানি। 'রায়তের কথা' পুস্তিকায় বাংলা দেশের রায়তের অবস্থা ও সে অবস্থার ইতিহাসের বিশদ বর্ণনা আছে। কিন্তু কত সহজে গুরুতর বিষয়কে ঝরঝরে ক'রে লেখা!

প্রমথ চৌধুরীর রচনায় ইতিহাস, অর্থনীতি, রাজনীতি, দর্শন প্রভৃতি নানা বিষয়ের আলোচনা আছে। বহু বিদ্যাচর্চায় তাঁর মন বিশ্ববিদ্যার তীর্থভূমি হ'য়ে উঠেছিল। লাইব্রেরীর আবহাওয়ায় তিনি মানুষ—নিজে বই কিনতে ও পড়তে ভালবাসতেন। পৈতৃক লাইব্রেরী থেকে তাঁর লাইব্রেরী করার অদম্য আকাঙ্ক্ষা জাগে—তিনি অবশ্য সেই আকাঙ্ক্ষাকে বলেছেন 'বাতিক'। তিনি নিজেই বলেছেন, 'এই লাইব্রেরীর প্রসাদে ইংরেজী সাহিত্যের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। আমি বহু ইংরেজী বই-এর নাম জানতুম। এর ফলে দাদার, সেজদার, আমার ও আমার ছোট ভাই অমিয়র বই কেনার বাতিক হয়। পরে আমরা

প্রত্যেকেই এক একটি লাইব্রেরী সংগ্রহ করি। সব চাইতে বড় লাইব্রেরী ছিল দাদার, তারপর আমার, তারপর সেজদার ও অমিয়র'[২২]। অধ্যয়নের তুলনায় তাঁর রচনার পরিমাণ নিতান্ত স্বল্পই বলতে হয়। কিন্তু তাঁর রচনায় কোথায়ও পাণ্ডিত্য প্রকাশের চেষ্টা নেই। টীকা-কণ্টকিত গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ রচনার পথকে তিনি সচেতনভাবেই বর্জন করেছেন। আধুনিকী ও পুরাতনী বিদ্যার রসে তাঁর মন ছিল সঞ্জীবিত, তবুও গুরুগম্ভীর গবেষণার মেজাজ তাঁর ছিল না। তিনি একবার স্পষ্টই বলেছিলেন, 'ভগবান আমাকে কোন বিষয় গবেষণা করার জন্য এ পৃথিবীতে পাঠান নি।'[২৩] তাই তাঁর দুরূহ বিষয়ের আলোচনাও সরস কথকতার গুণে রমণীয় হ'য়ে উঠত। ফরাসী সাহিত্যের সংস্কার চৌধুরী মশায়কে জ্ঞান-প্রকাশ সম্পর্কে নির্লোভ ক'রে তুলেছিল। কোন বিষয়েই অতি-নিবদ্ধতা তাঁর স্বভাবের অনুকূল ছিল না, তাই বলে তাঁর কৌতূহল কম ছিল না। যে কোন বিষয়ই হোক না কেন, তাকে নানা ভাবে তিনি সরস ক'রে তোলার চেষ্টা করেছেন। স্বাভাবিকভাবে যতটুকু রস নিষ্কাশিত হ'তে পারে, তার সুযোগ তিনি পুরোপুরিই নিয়েছেন। তা ছাড়া বাঁকা চোখের তির্যক চাহনি দিয়ে, দুমড়ে মুচড়ে নানাভাবে তিনি রস নিষ্কাশিত করেছেন। মূল বিষয় থেকে দূরে সরে গিয়ে বিচিত্র প্রসঙ্গের অবতারণার মধ্যেও বিষয়টিকে নানা মাল-মশলা দিয়ে উপাদেয় ও সহজ-পাচ্য ক'রে তুলেছেন।

প্রমথ চৌধুরী সাহিত্যসৃষ্টিতে প্রেরণাবাদের চেয়ে যত্নকৃত কলা-কৌশলে বিশ্বাসী ছিলেন। কলাবিধির চর্চা, আঙ্গিকের পরীক্ষা-নিরীক্ষা, সযত্ন-শিল্পিত ফর্ম-নিষ্ঠা তাঁর গদ্য ও কবিতা, দ্বিবিধ রচনাতেই পরিস্ফুট। 'সনেট-পঞ্চাশৎ' ও 'পদচারণ'-এর কবিতাগুলির মধ্যে তাঁর বিচিত্র কলাবিধি-চর্চার পরিচয় পাওয়া যায়। কবিতার ক্ষেত্রেও গদ্যের মতোই reason বা যুক্তিকেই বড় ক'রে তুলেছেন।[২৪] কল্পনা থাকলেও মাটি ছেড়ে বেশী দূরে উড়তে পারে না —'মন-ঘুঁড়ি বুঁদ হ'লে ছাড়িনে লাটাই।'—ইতালীয় ও ফরাসী সনেট, তেরজা রিমা, ত্রয়েলেট-এর রূপ-রীতি বাংলায় আনার চেষ্টা করেছেন। স্তবক-বিন্যাসেও তিনি নূতনত্ব আনার চেষ্টা করেছেন। এ বিষয়ে ইতালী ও ফরাসী সাহিত্যের বিচিত্ররূপিণী কবিতার তিনি অনুশীলন করেছেন। আবেগ বা প্রেরণা তাঁর কাছে বড় ছিল না, নানাভঙ্গির রূপচর্চাকেই তিনি স্বীকার ক'রে নিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন চূড়ান্ত ধরণের ফর্মবাদী—ফর্মের খাতিরে তিনি

বিষয়কে পর্যন্ত অনেক সময় তুচ্ছ করেছেন। ফরাসী সাহিত্য থেকেই তিনি এই ফর্ম-নিষ্ঠার মন্ত্র পেয়েছিলেন। উনিশ শতকের ফর্ম-নিষ্ঠার সম্রাট ছিলেন ফ্লবেয়র। তরুণ মোপাসাঁর লেখাকে নির্মমভাবে তিনি সংশোধন ক'রে দিতেন, এতটুকু শিথিলতা তিনি সহ্য করতে পারতেন না। তাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'There has never been a writer who took his art with such a passionate seriousness, who struggled so incessantly towards perfection and who suffered so acutely from the difficulties, the disappointments, the desperate furious efforts of an unremitting toil. His style alone cost him boundless labour. He would often spend an entire day over the elaboration and perfection of a single sentence, which perhaps, would be altogether obliterated before the publication of the book.[২৫] ফরাসী সাহিত্যাচার্যদের এই যত্নপরায়ণ কলাকৌশল প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্য-সাধনার সম্মুখে আদর্শ হিসাবে চিরদিন উজ্জ্বল ছিল। অভ্রান্ত আঙ্গিক ও সুঠাম কলাবিধির প্রবর্তনায় তাঁর রুচিশীল শিল্পী মন নানা পরীক্ষার বন্ধুর পথ ধ'রে চলেছে। যারা সাহিত্যক্ষেত্রে প্রধানত ফর্ম-নিষ্ঠ কলাসাধক তাঁরা তাঁর সানন্দ অভিনন্দন পেয়েছেন।

সাত

সাহিত্যের ক্রমবর্ধমান অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে পূর্বতন শ্রেণীবিভাগগুলির কিছু কিছু পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী হ'য়ে ওঠে। তার কারণ মানুষের মনোজীবন ক্রমশই জটিল হ'য়ে উঠছে। সাহিত্যের সংজ্ঞা, শ্রেণী-নির্ণয় এই অনিবার্য কারণেই পরিবর্তিত হতে বাধ্য। এককালে বাল্মীকির রামায়ণ, কালিদাসের রঘুবংশ ও মধুসূদনের মেঘনাদবধ-কাব্য,—তিনখানি কাব্যই মহাকাব্য হিসেবে চিহ্নিত হ'তো। কিন্তু সহজেই বোঝা যায়, চিহ্নটি নিতান্তই স্থূল ও বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির বিরোধী। আচার্য রামেন্দ্রসুন্দরের মনে মহাকাব্যের সংজ্ঞা ও শ্রেণী-নির্ণয় সম্পর্কে নূতন প্রশ্ন জাগে। তেমনি সাহিত্যের অপরাপর বিভাগ নিয়েও পরবর্তীকালে এই ধরণের প্রশ্ন জেগেছে। রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' ও 'শেষের কবিতা'—দু'টিই উপন্যাস-পদবাচ্য কিনা, ডিকেন্সের উপন্যাসকে যে সংজ্ঞা ও প্রকৃতি-ধর্মের মানদণ্ডে বিচার করা যায় হাক্সলি কিম্বা জয়েসের উপন্যাস

সম্পর্কেও সেই পদ্ধতি প্রযোজ্য কিনা, এই জাতীয় সংশয় পশ্চিমী সমালোচনার ক্ষেত্রে আজ খুব নূতন নয়। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে কথাসাহিত্য ও প্রবন্ধ সম্পর্কে যে ধারণা ছিল, তাও পরিবর্তিত হ'তে বসেছে। প্রবন্ধের বিষয়নিষ্ঠ আত্মকথনে, অন্তরঙ্গ আলাপচারিতায়, লেখকের ব্যক্তিসত্তার উন্মোচনে নূতন ধরণের শিল্পসৃষ্টির সূচনা করেছে। ইংরেজীতে অবশ্য 'Formal' ও 'Informal'—এই দু'টি বিভাগের মাধ্যমে বহু পূর্বেই প্রবন্ধ-সাহিত্যের শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে। কিন্তু বর্তমান কালের সাহিত্য-বিচারের মানদণ্ডে এই দু'টি মূল বিভাগের মধ্যে কতকগুলি ছোট ছোট উপ-বিভাগ দেখা দিয়েছে।

এই দু'বিভাগের সারথ্য করেছেন ইউরোপের দুজন কৃতকর্মা গদ্যলেখক —মোঁতেন ও বেকন। এলিজাবেথীয় যুগের ইংরেজী সাহিত্যের সমৃদ্ধি যেমন একদিকে শেক্সপীয়রের কাব্যে-নাটকে অসাধারণত্ব লাভ করেছিল, তেমনি বেকনের গদ্যরচনাবলীতে তার আর এক দিকের পরিচয় ফুটে উঠেছে। বেকন এক হিসেবে রেনেসাঁ-ইংল্যাণ্ডের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি। জ্ঞান-বিজ্ঞান-চর্চা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, পার্থিব দৃষ্টি, যুগোচিত চিন্তা—নানা দিক দিয়েই তিনি তাঁর কালের সারথ্য করেছেন। তাঁর প্রবন্ধাবলীর বিষয়বৈচিত্র্য ও বাহুল্যবর্জিত গদ্যরীতি প্রবন্ধ-সাহিত্যকে নূতন কৌলীন্য দিয়েছে। মোঁতেনের রচনাবলী বেকনের রচনাবলীর প্রায় সমসাময়িক। দু'জনই রেনেসাঁ-র মানুষ,—কিন্তু তাঁদের রচনাপদ্ধতি স্বতন্ত্র। প্রমথ চৌধুরী ছিলেন মোঁতেন-পন্থী। বিশেষত তাঁর প্রবন্ধাবলীতে মোঁতেন-প্রভাবিত রীতির পরিচয় আছে। তিনি বেকনের বিষয়নিষ্ঠ প্রবন্ধের পথ অনুসরণ না ক'রে, ফরাসী গুরুর পথই অনুসরণ করেছেন। প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধের প্রকৃতি জানতে হ'লে মোঁতেনের প্রবন্ধা-বলীর স্বরূপ জানা প্রয়োজন। ষোড়শ শতকের এই সুভদ্র, অন্তরঙ্গ মানুষটি যেভাবে কথা বলেছেন, আজকের দিনেও তার দোসর খুঁজে পাওয়া কঠিন। যে কালের তিনি মানুষ, তখনও নিজের নিজের কথা বলার পদ্ধতি সাহিত্যে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হ'য়ে ওঠে নি। বেকনের রচনায় বিজ্ঞানবুদ্ধি, ইহ-সর্বস্বতা ও জ্ঞানসমুজ্জ্বল প্রদীপ্ত মননশীলতা উদ্ভাসিত—কিন্তু রচনাগুলি বিষয়মুখী, বেকনের অন্তর্জীবন সেখানে নেই। তাঁর সমসাময়িক ফরাসী লেখক মোঁতেন কিন্তু ভিন্নমার্গের সাধক। তাঁর রচনায় বিষয়বৈচিত্র্য নেই, তাঁর বিষয় দু'টি। প্রথমত, মোঁতেনের জীবন-দর্শনের নানাশ্রেণীর আলোচনা। দ্বিতীয়ত,

ব্যক্তি-মোঁতেনের অন্তরঙ্গ চরিত্রের অকুণ্ঠিত উদ্‌ঘাটন। মোঁতেনের জীবন-দর্শন সংশয়বাদীদের মতো, কি স্টোয়িক মতবাদের প্রভাবাধীন, এ প্রশ্ন আজকের দিনে খুব বড় কথা নয়। তাঁর সম্পর্কে সবচেয়ে বড় কথা তাঁর রচনার মধ্যে তিনি তাঁর মধুর ব্যক্তিত্ব ঢেলে দিতে পেরেছিলেন। সহজ আলাপনের রীতি পাঠকের সঙ্গে লেখকের ব্যবধান ঘুচিয়ে দিয়েছে। বিষয়টি এখানে বড় নয়, কিন্তু তাকে ঘিরে রচয়িতার ব্যক্তি-হৃদয়ের স্পন্দনগুলি একটি দুর্লভ শিল্পের মতো দেখায়। ক্লাসিক্যাল সাহিত্য, বিশেষত, সেনেকা ও প্লুটার্ক তিনি গভীর-ভাবে অনুশীলন করেছিলেন, কিন্তু কোথায়ও পাণ্ডিত্যের আস্ফালন নেই। তাই অনায়াসেই বলতে পেরেছিলেন, 'আমিই আমার রচনার বিষয়বস্তু।'[২৬] মোঁতেনের হাতে ফরাসী গদ্য একটি পরিচ্ছন্নতা ও সাবলীলতার অধিকারী হয়েছে। প্রবন্ধের বন্ধনটিকে শিথিল ক'রে দিয়ে তিনি সব কিছুর ভেতরে নিজেকেই রেখে গেলেন—যিনি আমাদের সহৃদয় বন্ধু, চরিত-মাধুর্যে আমাদের অত্যন্ত কাছের মানুষ।[২৭] মনটাকে বন্ধনমুক্ত ক'রে খেয়াল-খুশীর ঝলকে অনুরূপ ক'রে তুলতে পারলেই পাঠকের অন্তরঙ্গ হ'য়ে ওঠা সম্ভব। মোঁতেন গোটা ফরাসী জাতকেই যেন এই অন্তরঙ্গ দীক্ষা দিয়েছেন। প্রমথ চৌধুরী তাঁর এই শ্রেণীর রচনার নাম করেছেন 'খেয়ালখাতা'। কিন্তু যেমন-তেমন খেয়াল তাঁর এলাকাভুক্ত নয়—খেয়ালকেও আর্ট ক'রে তোলা চাই, খেয়ালের মধ্যেও যেন একটি ছন্দ ও সুষমা থাকে। তাই তিনি বলেছেন, 'খেয়ালের স্বাধীন ভাব উচ্ছৃঙ্খল হ'লেও যথেচ্ছচারী নয়। খেয়ালী যতই কার্দানী করুক না কেন তালচ্যুত কিংবা রাগভ্রষ্ট হবার অধিকার তার নেই।'[২৮] ব্যক্তিগত প্রবন্ধের এর চেয়ে আর কোন ভালো সংজ্ঞা হ'তে পারে না।

প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে মোঁতেন ছাড়াও আরো কয়েক-জন বিদেশী লেখকের কথা মনে পড়ে। অষ্টাদশ শতকের ইংরেজী ও ফরাসী সাহিত্যের মূলধারাটির সঙ্গে তাঁর মনোজীবনের সংযোগ অত্যন্ত বেশী। অষ্টাদশ শতকের ইউরোপীয় সাহিত্যের এই ক্লাসিক্যাল ভাববৃত্তির সঙ্গে অষ্টাদশ শতকের ভারতচন্দ্রীয় যুগাদর্শের একটি অদ্ভুত মিল আছে। মোটামুটি মানস-প্রবণতা ও নিরুত্তাপ তীক্ষ্ণাগ্র বাক্-বৈদগ্ধ্য যেন দেশ-কালের ভৌগোলিক বন্ধনকে অতিক্রম ক'রে এই যুগের লেখককে একই পথের পথিক ক'রে তুলেছে। উত্তেজনাহীন, সংযত, নিরুত্তাপ অথচ ভাস্কর্য-সুঠাম ফর্ম-নিষ্ঠা এ যুগের অধিকাংশ লেখকেরই মানস-জীবনের মূল উপাদান। ইংরেজী সাহিত্যে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ

থেকেই মানসিকতার দিক থেকে ক্লাসিক্যাল মনোভঙ্গি ক্রমশ স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছিল, কল্পনা-প্রসারতা ও দার্শনিক জিজ্ঞাসা দূর অতীতের পরিত্যক্ত স্মৃতির মতোই পড়ে রইলো। কাব্য তার অসাধারণত্ব হারিয়ে কতকটা প্রবন্ধধর্মী হ'য়ে উঠল। এই যুগটিকে মূলত গদ্যের যুগ বলা যেতে পারে। সর্বভাব-প্রকাশক এই গদ্যসাহিত্যের কল্পনাদৈন্য যতই থাক না কেন, আধুনিক মনোভাবের সর্বপ্রধান লক্ষণ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণী দৃষ্টি এই যুগের গদ্যরীতিতেও প্রথম পাওয়া যায়। এর তুলনায় এলিজাবেথীয় গদ্যরীতিকে নিতান্ত প্রাথমিক স্তরের বলা যেতে পারে।[২৯] অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরেজী সাহিত্যের ক্লাসিক্যাল গদ্যরীতি ভাষাকে একটি সুনিয়ন্ত্রিত আদর্শের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল। ব্যঞ্জনা অথবা সাঙ্কেতিকতার পথ তাঁরা অনুসরণ করেন নি, কিন্তু শব্দপ্রয়োগে তাঁরা বিশিষ্টতা দেখিয়েছেন। তাই এই যুগের লেখকেরা সহজ গদ্য-রীতির মাধ্যমে জড়তাহীন সুস্পষ্ট চিন্তাকেই পরিবেশন করেছেন। সাহিত্যের ক্লাসিক্যাল যুগ প্রসঙ্গে আর একটি বৈশিষ্ট্যও বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। সাধারণত ব্যঙ্গবিদ্রূপ-প্রবণতা ক্লাসিক্যাল সাহিত্যের সহচর। ক্লাসিক্যাল যুগের সাহিত্যের মেজাজ প্রধানত সামঞ্জস্য, সৌশীল্য, পরিমিতি, সংযম ও ভারসাম্যের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। তাই জীবনের অসঙ্গতি, ত্রুটি-বিচ্যুতি স্বভাবতই এই যুগে বিদ্রূপের বিষয় হ'য়ে ওঠে। ড্রাইডেন ও পোপের রচনায় যে রীতি ধীরে ধীরে পল্লবিত হ'য়ে উঠেছে তাই অ্যাডিসন, স্টিল ও সুইফ্‌টের রচনায় সম্প্রসারিত হয়েছে। 'স্পেক্টেটর' পত্রিকার মাধ্যমে এই যুগের সামাজিক জীবনকে কখনও নির্মম ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে আবার কখনও বা মৃদু পরিহাসে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। জ্ঞানানুশীলনের মাধ্যমে অলস মনকে সজাগ ক'রে তোলার বহু উপাদান তাঁরা পরিবেশন করেছেন। এই যুগের ইংরেজ লেখকদের বুদ্ধি-মার্জিত ক্ষুরধার গদ্যরীতি, দীপ্ত বাচনভঙ্গী, সুশৃঙ্খলিত যুক্তি-পারম্পর্য ও হাস্য-পরিহাসনৈপুণ্য নূতন যুগ সৃষ্টি করেছে। শিথিলতাকে যতদূর সম্ভব পরিহার ক'রে ভাষার বাঁধুনিকে তাঁরা যতদূর সম্ভব দৃঢ় করার চেষ্টা করেছেন। অষ্টাদশ শতকের ইংরেজী সাহিত্যের এই জাতীয় মনোভাবের জন্য ফরাসী সাহিত্যেরও খানিকটা দায়িত্ব আছে। তবে এই কালে ফরাসী সাহিত্যের যে বৈশিষ্ট্য সূচিত হয়েছিল, তার পূর্ণতা ইংরেজী সাহিত্যে মিলবে না।

চতুর্দশ লুই-এর যুগের ফরাসী সাহিত্য বিশ্বসাহিত্যেরই একটি গৌরব-মণ্ডিত অধ্যায়। এই যুগেরই মধ্যমণি মোলিয়ের। অব্যর্থলক্ষ্য ফরাসী গদ্যের

সচলতা ও সজীবতা এই যুগে প্রায় পূর্ণতার শেষ সীমায় উঠেছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরেজী গদ্য ফরাসী সাহিত্যেরই অনুকরণজাত। ফরাসী বিপ্লব পর্যন্ত ফরাসী ক্লাসিসিজমের এই ধারা অব্যাহত ছিল। পাসকাল, লা ব্রুইয়ের, বস্যুয়ে, মোলিয়ের, রাসীন প্রভৃতির হাতে ফরাসী গদ্য ধারালো ও পরিচ্ছন্ন হ'য়ে উঠেছিল। ভলতেয়ারে গিয়ে সেই রীতি চূড়ান্ত সীমায় উঠেছে। প্রমথ চৌধুরী ফরাসী গদ্যের এই বিশেষ কালটির ভক্ত ছিলেন। তাঁর মন-মেজাজের সঙ্গে এইকালের ফরাসী গদ্যসাহিত্যের প্রবণতার মিল আছে। ক্লাসিসিজমকে তিনি সাহিত্যের প্রধান ধর্ম হিসাবে স্বীকার করেছেন। ল্যাটিন সাহিত্যের সঙ্গে গভীর পরিচয়ের ফলে ফরাসী গদ্যরীতিও ক্লাসিক্যাল রীতিকেই শ্রেষ্ঠ রীতি হিসেবে মেনে নিয়েছে। লঘু, তীক্ষ্ণ, পরিচ্ছন্ন অথচ বলিষ্ঠ বাঁধুনিযুক্ত এই রীতি চৌধুরী মহাশয়ের একমাত্র আদর্শ হ'য়ে উঠল। চৌধুরী মহাশয়ের ক্লাসিক মনোবৃত্তির কথার সুন্দর পরিচয় দিয়েছেন অন্নদাশঙ্কর রায়, 'ক্লাসিক মনোবৃত্তির প্রধান লক্ষণ প্রসাদগুণ। আয়াসের চিহ্ন কোথাও নেই। কিছু বাগ্‌বাহুল্য আছে, সেটা তাঁর বক্তব্যকে অস্পষ্ট করে না। বরং অতিরিক্ত স্পষ্ট করে। তা যদি দোষের হয় তবে বীরবলের একমাত্র দোষ, হাতে কিছু না রেখে হাতখালি ক'রে ছড়ানো, অর্থাৎ তিনি যা বলেন তার বেশী ব্যঞ্জিত করেন না, বলায় আনন্দে বলা নিঃশেষ করেন। কিন্তু এই বাহুল্যও প্রসাদগুণান্বিত। তাঁর রচনার প্রসাদগুণ তাঁর মনেরই প্রতিফলন, আর তাঁর মনের পশ্চাতে রয়েছে বহুদিনের মনন ও রোমন্থন। চৌধুরী মহাশয় তাঁর মনটিকে তৈরি করেছেন সক্লেশে, তাই তাঁর বাগ্‌বিস্তার এত অক্লেশ এবং তাঁর ভাষিত-গুলির মধ্যে এতগুলি সুভাষিত'।[৩৫]

আট

প্রমথ চৌধুরীর মনোধর্ম বিশ্লেষণ করতে গিয়ে চেস্টারটনের [১৮৭৪—১৯৩৬] সঙ্গে তাঁর তুলনা করেছেন। শুধু চেস্টারটন কেন, বিংশ শতাব্দীর কয়েকজন ইংরেজ গদ্যলেখকের সঙ্গে তাঁর রচনারীতির কিছু কিছু মিল খুঁজে পাওয়া যায়, এ বিষয় কোন সন্দেহ নেই। বর্তমান কালের বুদ্ধিধর্মী শ্লেষাত্মক সাহিত্যের ধারার কোন কোন লেখকের সঙ্গে যেন তাঁর আত্মিক যোগাযোগ আছে। সর্বক্ষেত্রেই যে তিনি অনুকরণ করেছেন এমন কথা বলা যায় না। তবে চৌধুরী মহাশয়ের মানসিক বৈশিষ্ট্য আলোচনা প্রসঙ্গে বৈদেশিক সাহিত্যের

সমকালীন ধারার আলোচনা অবশ্যম্ভাবী হ'য়ে ওঠে। একালের সর্বশ্রেষ্ঠ ইংরেজ নাট্যকার বানার্ড শ'-র রচনারীতির সুস্পষ্ট প্রভাব প্রমথ চৌধুরীর রচনায় বিগুমান। বানার্ড শ'-র নাটকে সমাজ-সমালোচনার উদ্দেশ্য তীব্রভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। প্রচলিত নাট্যরীতির অনুসরণ না ক'রে তিনি নূতন পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। তাঁর নাটকের প্রধান ঐশ্বর্য সূক্ষ্মচতুর বুদ্ধি-মার্জিত সংলাপ। মর্মভেদী ব্যঙ্গ ও অদ্বিতীয় বাক্-বৈদগ্ধ্য এই সংলাপকে তাঁর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের উপযুক্ত বাহন ক'রে তুলেছে। প্রমথ চৌধুরীর গল্পগুলির মধ্যে শ'-সুলভ দীর্ঘ ভূমিকা সংযোজনের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। তাছাড়া শ'-র ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের হাতিয়ারের ওপরেও তাঁর আকর্ষণ ছিল। কিন্তু ভল্‌তেয়ার বা শ'-র বাক্-চাতুর্য ও বাচনভঙ্গীর অনুরূপ কিছু বাংলা গদ্যরীতিতে গ'ড়ে তোলা সম্ভব নয়। শ'-র ভাষা লঘুগতি, বৈদ্যুতিক দ্যুতি ও তীক্ষ্ণাগ্র বাক্যাংশ-গুলির মননশীলতার তুলনায় প্রমথ চৌধুরীর এই জাতীয় প্রচেষ্টা নিতান্ত প্রাথমিক ধরণের মনে হয়। শেভিয়ান প্যারাডক্স-গুলির মৌলিকতা অতুলনীয় —কিন্তু কথার চাতুরীর গভীরে শ'-র জীবনদর্শন প্রমথ চৌধুরীর রচনায় কোথায়? শ'-র তুলনায় চৌধুরী মহাশয়ের রচনাকে নিতান্ত ভঙ্গি-সর্বস্ব ব'লেই মনে হয়। শ'-র সমসাময়িক [১৮৫৬—১৯০০] আর একজন আইরিশ লেখক অস্কার ওয়াইল্ডের তীক্ষ্ণাগ্র মন্তব্য ও প্যারাডক্স-প্রবণতার কথা মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু ইংরেজ লেখকের কাব্যধর্মী গদ্যরীতির সঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর কোন মিল ছিল না। সূক্ষ্ম-ব্যঞ্জনাধর্মী লিরিক-প্রবণতা প্রমথ চৌধুরীর মনোজীবনের বিরোধী ছিল। অস্কার ওয়াইল্ডের মতো তাঁর কথার সঙ্গে সুরের মদিরা ছিল না।

জি. কে. চেস্টারটন [১৮৭৪—১৯৩৬] ও ম্যাক্স বিয়ারবম্-এর সঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর তুলনা নানাদিক দিয়ে প্রণিধানযোগ্য। জি. বি. এস-এর মতো জি. কে. সি-ও ইংরেজী সাহিত্যে এক নূতন ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন। ঔপন্যাসিক, কবি, সমালোচক, লঘুগুরু-প্রবন্ধলেখক চেস্টারটন বিচিত্র মননের অধিকারী ছিলেন। সাহিত্যের বিভিন্ন শ্রেণীর আঙ্গিক নিয়ে তিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষাও ক'রেছেন। সংলাপের চাতুর্য, মন্তব্যের সূক্ষ্মতা, উপস্থিত বুদ্ধির চোখ-ধাঁধানো জৌলুস চেস্টারটনের রচনারীতিকে সজীব ও অন্তরঙ্গ ক'রে তুলেছে। রচনারীতি ও মনোজীবনের এই বিশিষ্টতার জন্যই সম্ভবত তিনি বানার্ড শ'-র অন্তর্জীবনকে[৩১] এত অভ্রান্তভাবে বুঝেছিলেন। তিনি যুগ-

সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে মূলত ঐতিহ্যের পথকেই সমর্থন করেছেন—বিশেষত ধর্মবিষয়ক প্রবন্ধে প্যারাডক্স-প্রবণতা তাঁর রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য সন্দেহ নেই—কিন্তু এটুকু তো তাঁর রচনারীতির একটি সাধারণ বহিরাশ্রয়ী রূপ মাত্র। তাঁর রচনা সম্পর্কে যথার্থই বলা হয়েছে 'He makes his defence of common sense attractive by clothing it in the outward form of Paradox. His method is to deliver a raking fire of unexpected arguments supported by an unfailing wealth of vigorous imagery and comparison'[৩২] এই মন্তব্য থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে চেস্টারটনের হাস্য-পরিহাস একটি গভীর সত্যকেই ফুটিয়ে তোলার উপায় মাত্র, নিজের চিরপোষিত আকাঙ্ক্ষা ও বক্তব্যকে প্রতিপাদন করার জন্যই তাঁকে বিদূষকের মুখোস পরতে হয়েছিল। চেস্টারটনের তুলনায় প্রমথ চৌধুরী এইদিক দিয়ে যথার্থই লঘু ও তারল্যধর্মী,—চেস্টারটনীয় স্ফুলিঙ্গের কাছে প্রমথ চৌধুরীকে অনেকটা নিষ্প্রভ ব'লে মনে হয়। 'He is a humourist who amuses and dazzles his reader but wearies him in the long run by constant repetition of the same tricks.' চেস্টারটনের প্রতিভার এই সীমা প্রমথ চৌধুরীর সমালোচকেরও মনে পড়বে।

বিচিত্র প্রতিভাধর ম্যাক্স বিয়ারবম্ [১৮৭২—১৯৫৬] উনিশ শতকের শেষ দশকেই খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, কিন্তু বিংশ শতাব্দীর মধ্যাহ্নেও এই কলাকুশলী লেখকের খ্যাতি বিন্দুমাত্র কমে যায় নি। খুব কম লেখকই এই দু'শতাব্দীর পাঠককে একই সঙ্গে পরিতৃপ্ত করতে পেরেছেন। বিয়ারবম্ সেই মুষ্টিমেয় লেখকদের একজন। ক্যারিকেচারের শিল্পকে তিনি তাঁর প্রথম গ্রন্থেই চূড়ান্ত ক'রে তুলেছিলেন। বর্ণময় কার্টুন-সুশোভিত তাঁর এই ক্যারিকেচারগুলি প্রথম আবির্ভাব-লগ্নেই [১৮৯৬] অভিনন্দিত হয়েছিল। 'জুলিকা ডবসন' [১৯১১] কাহিনীটিতে তিনি সূক্ষ্মতর কৌতুকরস পরিবেশন করেছেন। চেস্টারটনের মতো কথাসাহিত্য-রচনায় তিনি কথাসাহিত্য ও প্রবন্ধের মিশ্রধর্মী পথ অবলম্বন করেছেন। এই প্রসঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর গল্পগুলির মিশ্রধর্মী বৈশিষ্ট্যের কথা মনে হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক। বার্নার্ড শ'-র পরে তিনি 'স্যাটারডে রিভিউ' পত্রিকার নাট্যসমালোচক হন। সমালোচক হিসেবেও তিনি প্রথাবদ্ধ পথ অনুসরণ করেন নি, প্যারোডিকে সমালোচনার মাধ্যমে

হিসেবে গ্রহণ করেছেন। প্যারোডি খুব উচ্চতর শিল্প হিসেবে গণ্য হত না। বিয়ারবম্ প্যারোডির আতিশয্যের মধ্যে এমন একটি সংযত সুন্দর আদর্শ নিয়ে এলেন, যা সহজেই প্রথম শ্রেণীর সমালোচনার মাধ্যম হ'য়ে উঠল। সাধারণ সমালোচকদের সঙ্গে এই ধরণের সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গির তুলনা করতে গিয়ে ইংরেজ সমালোচক বলেছেন, 'The parodist makes no direct comment. Unlike the formal critic, he creates : he has ceased to be an analyst, a breaker-down, a separator of part from part, that was his chrysalis stage : he is now a synthesist, a builder-up, a combiner of part with part. He sets to work to make a new thing—similar to the already existing thing, but with differences. The texture is similar, but the peculiarities of patterning are slightly more pronounced.'[৩৩] বিয়ারবম্ সমকালীন যুগমানসের তীক্ষ্ণধী সমালোচক। মানসবৈচিত্র্যে ও মৌলিক উদ্ভাবনক্ষমতায় তিনি আধুনিক ইংরেজী গদ্যসাহিত্যের একজন বিশিষ্ট শিল্পী।

বিয়ারবমের মতোই প্রমথ চৌধুরী প্রচলিত সমালোচনার রীতি অবলম্বন করেন নি, 'বীরবলের হালখাতা' গ্রন্থের প্যারোডি-ভঙ্গিম রচনাগুলি বিয়ারবমের রচনার মতো অভ্রান্ত লক্ষ্য ও গভীর-সঞ্চারী নয়। প্রমথ চৌধুরীর রচনায় বক্তব্যের চেয়ে অনেক ক্ষেত্রেই মনের লঘুস্পর্শ সঞ্চরণের আধিক্য লক্ষণীয়। শ', চেস্টারটন বা বিয়ারবম্—এই তিনজন খ্যাতকীর্তি লেখকের মানসপ্রকর্ষের ছাপ তাঁর ওপরে পড়েছিল মাত্র, কিন্তু কতকগুলি বিশেষ জায়গা ছাড়া তাঁর রচনাকে অন্তত এ তিনজনের তুলনায় অপেক্ষাকৃত অগভীর ও ভঙ্গি-প্রধান বলেই মনে হয়। কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথাও মনে রাখতে হবে যে শ', চেস্টারটন বা বিয়ারবমের তুলনায় তাঁর অসুবিধে ছিল প্রচুর। প্রথমত, ইংরেজী গদ্যের একটি বুদ্ধিধর্মী ও বিচিত্র-চিন্তাকুশল ঐতিহ্য আছে, বিংশ শতাব্দীর সাহিত্যিকদের খুব বেশী বেগ পেতে হয় নি। প্রমথ চৌধুরীকে বাংলা সাহিত্যের অনভ্যস্ত মাটিতে নূতন ধরণের ফসল ফলাতে হয়েছিল। ইংরেজ লেখকদের তুলনায় বাংলা গদ্যের সহজ-নমনীয় ক্ষেত্রে তাঁর পক্ষে এ কাজটি আরও দুরূহ ছিল। দ্বিতীয়ত, এঁদের তুলনায় চৌধুরী মহাশয়ের মানসপরিধি ছিল অনেকখানি সংকীর্ণ। বৈচিত্র্যহীনতা ও পুনরাবৃত্তি-দোষ তাঁর রচনায়

সজীবতাকে সীমিত করেছে। তবু প্রমথ চৌধুরীর মনোজীবনের বলিষ্ঠতা কম নয়, তিনি বাংলা গদ্যের গীতিগন্ধী ও মন্থরগতি সুকুমার ধারাটির সঙ্গে শেভিয়ান ভ্রূভঙ্গি মেলাতে চেয়েছিলেন, চেস্টারটনীয় দীপ্তি আনতে চেয়েছিলেন, আর চেয়েছিলেন সুদীর্ঘ পাঁচশো বছরের বহু কর্ষণায় গড়ে-ওঠা ফরাসী গদ্যের মেজাজ আনতে। এই দিক দিয়ে তাঁর ব্যর্থতার মূল্যও কম নয়।

---

১. Pramatha Chaudhury, An acre of green grass, Page 14,
Buddhadeb Bose.

২. ভারতচন্দ্র, নানাচর্চা।

৩. 'অনেকেই এই মত দিয়েছে বিধান।
'অক্ষত যোনিয়' বটে বিবাহ বিধান॥
কেহ বলে ক্ষতাক্ষত, কিবা আর আছে?
একেবারে তবে যাক্, যত রাঁড়ী আছে॥
* * * *
জ্ঞানহারা হয়ে যাই, নাই পাই ধ্যানে।
কে পাড়িবে 'সংবাপ' মায়ের কল্যাণে?'—কবিতা সংগ্রহ, দ্বিতীয় ভাগ

৪. সাহিত্যে খেলা, বীরবলের হালখাতা।

৫. 'পাঁচুঠাকুরে'র প্রথম দু'খণ্ড 'পঞ্চানন্দ' থেকে, এবং তৃতীয় খণ্ড বঙ্গবাসীতে প্রকাশিত অল্প কিছু দিনের 'পঞ্চানন্দ' থেকে সংকলিত।

৬. 'রহস্যপটুতায়, মনুষ্যচরিত্রের বহুদর্শিতায়, লিপিচাতুর্যে, ইনি টেকচাঁদ এবং হুতোমের সমকক্ষ, এবং হুতোম ক্ষমতাশালী হইলেও পরদ্বেষী, পরনিন্দুক, সুনীতির শত্রু এবং বিশুদ্ধ রুচির সঙ্গে মহাসমরে প্রবৃত্ত।'

'ইন্দ্রনাথবাবু পরদুঃখে কাতর, সুনীতির প্রতিপোষক এবং তাঁহার গ্রন্থ সুরুচির বিরোধী নহে।... তাঁহার গ্রন্থে বঙ্গদর্শনপ্রিয়তার ঈষৎ, মধুর হাসি ছত্রে ছত্রে প্রভাসিত আছে, অপাঙ্গে যে চতুরের বক্রদৃষ্টিটুকু পদে পদে লক্ষিত হয়, তাহা না হুতোম, না টেকচাঁদে, দু'য়ের একেও নাই।...দীনবন্ধুবাবুর মতো তিনি উচ্চহাসি হাসেন না, হুতোমের মত 'বেলেল্লাগিরিতে'ও প্রবৃত্ত হয়েন না, কিন্তু তিলার্ধ রসের বিশ্রাম নাই।'—বঙ্গদর্শন, পৌষ, ১২৮১

৭. সাহিত্য-সাধকচরিতমালা, ৩৪ নং, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

৮. সাহিত্যে যোগেন্দ্রচন্দ্র, ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

৯. বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

১০. 'ভল্‌টেয়ারের হাসি শীতের তীব্র বাতাসের মতো জলকণাশূন্য, তাহা হাড়ের ভিতর পর্যন্ত কাঁপাইয়া তোলে। ত্রৈলোক্যনাথের হাসি শরতের প্রথম উত্তরের হাওয়া, তাহাতে শিশিরের স্পর্শ আছে।'—বাংলার লেখক, প্রমথনাথ বিশী

১১. মলিয়েরর সম্পর্কে বলা হয়েছে 'His art sweeping over the whole range of

comic emotions, from the wildest buffoonery to the grimmest satire and the subtlest wit, touches life too closely and too often to attain to that flawless beauty to which it seems to aspire.'—Landmarks in French Literature, Lytton Strachey.

১২. ফরাসী সাহিত্যের বর্ণপরিচয়।

১৩. শিশু-সাহিত্য, বীরবলের হালখাতা।

১৪. এই প্রসঙ্গে 'বঙ্কিমচন্দ্র' নামক রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

১৫. '...হাস্যরসও কোথাও অতি সংযত, অলক্ষিতপ্রায়, একটু বক্র-কটাক্ষ ও ওষ্ঠাধরের ঈষৎ বঙ্কিম-আন্দোলনে মাত্র প্রকাশিত; কোথায়ও farce-এর মত উতরোল, উচ্চকণ্ঠ; কোথায়ও বা comedy-র উদার প্রাণখোলা উচ্ছ্বাস, কোথায়ও বা Tragedy-র গম্ভীর-বিষণ্ণ আভাসে স্নিগ্ধ-সজল।'—বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

১৬. জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'হঠাৎ নবাব' প্রহসন [১৮৮৪] মোলিয়েরের 'Le bourgeois gentilhomme' অবলম্বন ক'রে লেখা। এর আঠার বছর পরে [১৯০২] মোলিয়েরের 'Marriage farce', 'দায়ে পড়ে দায়গ্রহ' নাম দিয়ে অনুবাদ করেন। অবশ্য মোলিয়ের ছাড়াও অন্যান্য লেখকের লেখাও তিনি অনুবাদ করেছেন—এগুলিকে তিনি 'ফরাসী প্রসূন' [১৩১১] নামে সঙ্কলিত করেন।

১৭. মোলিয়েরের L' Avare প্রহসনের প্রভাব আছে।

১৮. ফরাসী সাহিত্যের বর্ণপরিচয়।

১৯. A short history of English literature.—Ifor Evans.

২০. ঘোষালের হেঁয়ালি, ঘোষালের ত্রিকথা।

২১. দু'-ইয়ারকি, ভূমিকা।

২২. আত্মকথা, পৃঃ ২২।

২৩. ভারতচন্দ্র, নানাচর্চা।

২৪. 'কল্পনা রাখিনে আমি আকাশে তুলিয়ে,—
নহি কবি ধূমপায়ী, নহে ত্রিবক্কুর॥'—আত্মকথা, পদচারণ

২৫. Landmarks in French Literature.—Lytton Strachey.

২৬. 'I desire therein to be viewed as I appear in mine own genuine simple and ordinary manner, without study and artifice; for it is myself I paint...... Thus, reader, myself am the matter of my work'.

২৭. 'These essays are an attempt to communicate a soul. On this point at best he (Montaigne) is explicit. It is not fame he wants, it is not that men shall quote him in years to come, he is setting up no statue in the market-place, he wishes only to communicate his soul. Communication is health, communication is truth, communication is happiness.'

Montaigne : The common Reader, Virginia Wolf

২৮. খেয়ালখাতা, বীরবলের হালখাতা।

২৯. 'The stately pregnancy of Bacon, the labyrinthine windings of the Anatomy, the quips of Fuller, the dreamy harmonies of Browne, could never have been adopoted to novel-writing, to scientifiic exposition, to historical, political, and philosophical writing without rhetoric'.—A short history of English Literature.—George Saintsbury.

৩০. বীরবল : জীবনশিল্পী, অন্নদাশঙ্কর রায়।

৩১. চেস্‌টারটনের 'George Bernard Shaw' সমালোচনা দ্রষ্টব্য।

৩২. A short history of English Literature.—Emile Legouis.

৩৩. Max Beerbohm ; Twentieth century literature.—A. C. Ward.

কবিতা ও কাব্যরূপ

প্রমথ চৌধুরীর বুদ্ধি-মার্জিত গদ্যরীতি, সুকর্ষিত বাচনভঙ্গীর অভিনবত্ব, চিন্তাচারণার মৌলিকত্ব, বাংলাসাহিত্যে তাঁর একটি বিশেষ স্থান নির্দেশ ক'রে দিয়েছে। কথা-সাহিত্য ও বিচিত্রবিষয়াশ্রিত প্রবন্ধ—উভয় ক্ষেত্রেই তাঁর বৈশিষ্ট্য স্বীকৃত হয়েছে। আধুনিক গদ্যলেখকদের অনেকেই তাঁর এই বিদগ্ধ উত্তরাধিকারের আবহাওয়ায় লালিত। তাঁর সমৃদ্ধ গদ্যরচনার নীচে কবি-প্রতিভা অনেকখানি চাপা পড়েছে—এই জন্য তাঁর কবিপ্রতিভার আলোচনা খুব বেশী হয় নি। অবশ্য এ কথা অনস্বীকার্য যে তাঁর প্রতিভা মূলত গদ্যরচনার। এ সম্পর্কে তাঁর নিজেরও সুস্পষ্ট ধারণা ছিল। ৫।১১।৪১-এ অমিয় চক্রবর্তীকে তিনি লিখেছিলেন, 'আমি আসলে গদ্যলেখক তা আমি জানি। কিন্তু এই Rhyme-এর চর্চা করলে শব্দের পুঁজি বেড়ে যায়। অনেক শব্দ বাদ দিতে হয় আর একটি শব্দের সঙ্গে মেলে না বলে। আমার কবিতা লেখার ভিতর এ উদ্দেশ্যও বোধ হয় ছিল।'[১] কিন্তু প্রমথ চৌধুরী তাঁর কবিতা প্রসঙ্গে যাই বলুন না কেন, 'সনেট-পঞ্চাশৎ' ও 'পদচারণ' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে 'সাহিত্যের সাত সমুদ্রের নাবিক' প্রিয়নাথ সেন, কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, এমন কি রবীন্দ্রনাথের পর্যন্ত দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। প্রমথ চৌধুরীর কবিতার একটি বিশেষ ধরণের আস্বাদন আছে—সে আস্বাদন একমাত্র তাঁর গদ্যরচনার সহৃদয় পাঠকেরাই উপলব্ধি করতে পারবেন। তার কারণ তাঁর গদ্য ও কবিতার মধ্যে একটি নিগূঢ় আত্মিক সম্পর্ক আছে। প্রমথ চৌধুরী গদ্য ও কবিতার পার্থক্য স্বীকার করেন নি—তাই তাঁর কবিতাগুলি যেন তাঁর গদ্যরীতিরই ছন্দোবদ্ধ প্রকাশ ব'লে মনে হয়। পদ-চারণ-এর উৎসর্গ পত্রে কবি সত্যেন্দ্রনাথকে লিখেছেন; 'গদ্যের কলমে লেখা এই পদ্যগুলি যে আপনাকে উপহার দিতে সাহসী হয়েছি, তার কারণ আমার বিশ্বাস এগুলির ভিতর আর কিছু থাক না থাক, আছে Rhyme এবং সেইসঙ্গে কিঞ্চিৎ reason'—চৌধুরী মহাশয়ের এই মন্তব্য থেকেই তাঁর কাব্য-সরস্বতীর বিশেষ রূপ সম্পর্কে একটি ধারণা করা যায়। যুক্তিনিষ্ঠ গদ্যরচনা প্রমথ চৌধুরীর আগেও দুর্লভ ছিল না, কিন্তু কাব্যের ইতিহাসে এই জাতীয় বৈশিষ্ট্য বাংলাসাহিত্যে মাত্র একবারই দেখা দিয়েছে—সে হলো প্রমথ চৌধুরীর কাব্যে—'সনেট পঞ্চাশৎ' ও 'পদচারণ'-এ। তাঁর কবিতাগুলি যেন তাঁর গদ্যরীতিরই কাব্য-সংস্করণ! একই ব্যক্তির কাব্যে ও গদ্যে এমন অদ্বয় শিল্পী-পুরুষের সাক্ষাৎ কদাচিৎ মেলে।

'সনেট-পঞ্চাশৎ' [১৯১৩] প্রমথ চৌধুরীর সর্বপ্রথম গ্রন্থ। পঞ্চাশটি সনেটের বিচিত্র সংকলনটি নিয়ে যখন তিনি সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রবেশ করলেন, তখনও সবুজপত্রের সূচনা হয়নি। অবশ্য গদ্যের ক্ষেত্রে এর মধ্যেই তাঁর বৈশিষ্ট্য সাহিত্যিক মহলে স্বীকৃত হয়েছিল। মধুসূদন থেকে সুরু ক'রে আজ পর্যন্ত বাংলা সনেটের নানা প্রসাধন চোখে পড়েছে, কিন্তু প্রমথ চৌধুরীর সনেটের সঙ্গে তাদের কোন মিলই নেই। 'সনেট-পঞ্চাশৎ'-এর সগোত্র সনেট বাংলা সাহিত্যে নেই। প্রমথ চৌধুরী সনেট-রচনার প্রচলিত রীতি ও নীতি পরিত্যাগ ক'রে নূতন পথ ধরেছেন। মধুসূদনের সনেট-রীতি প্রবর্তনের পর প্রাক্-প্রমথ পর্বে দু'জন সনেট-রচয়িতা বিশেষত্ব দেখিয়েছেন—দেবেন্দ্রনাথ সেন ও রবীন্দ্রনাথ। দেবেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের সনেটকে 'রোম্যাণ্টিক সনেট' আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। বাংলা সনেটের ইতিহাসে মধুসূদনের ফর্ম-নিষ্ঠা বিস্ময়কর, কিন্তু কবি মধুসূদনের তখন মৃত্যু হয়েছে। কল্পনা-প্রসারতায় ও শিল্পসৌন্দর্যে তাকে 'moment's monument' ক'রে তোলা মধুসূদনের পক্ষে সম্ভব ছিল না,—তাই তিনি খাঁটি ক্ল্যাসিক্যাল রীতির সনেটের আদর্শটুকুই দিয়ে গিয়েছেন। দেবেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের হাতে সনেটের কল্পনা-প্রসারতা ও কাব্যগুণ সমৃদ্ধ হয়েছে—মধুসূদনীয় রীতির ব্যতিক্রমের ফলে অনেক সময় প্রচলিত রীতি লঙ্ঘিত হ'য়েও মনের আকাশ প্রকারান্তরে প্রসারিতই হয়েছে। দেবেন্দ্রনাথের রূপ-বিহ্বলতা ও রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যানুভূতির বাহক হ'য়ে উঠেছে এই বিশেষ রীতির কবিতাগুচ্ছ। 'সনেট-পঞ্চাশৎ' প্রকাশের সময় বাংলা সনেটের মোটামুটি ইতিহাস এই। কিন্তু এ ইতিহাসের সঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর সনেটের কোন নাড়ীর যোগ নেই। কারণ তিনি ফরাসী কবিদের অনুসরণ ক'রে সনেট রচনা সুরু করেন। অমিয় চক্রবর্তীর কাছে লেখা আর একখানি চিঠিতে তিনি 'সনেট-পঞ্চাশৎ' লেখার যে ইতিহাস দিয়েছেন তা সনেট-রচয়িতা প্রমথ চৌধুরীর প্রকৃতি-নির্দেশক, 'এখন আমার সনেটের জন্মকথা বলছি। চিত্তরঞ্জন দাশের ভ্রাতা পি. আর. দাশ আমাকে সনেট লিখতে অনুরোধ করেন, তাঁর কথামত আমি Renand প্রভৃতি ফরাসী কবিদের পদানুসরণ ক'রে সনেট লিখতে সুরু করি। ফরাসী সনেটের সঙ্গে ইতালীয় সনেটের প্রভেদ এই যে, দুই সনেটেই, প্রথম অষ্টক সমান। শেষ ষটকে একটু প্রভেদ আছে। ফরাসীরা ছয়কে দুই ভাগ করেছেন। প্রথম একটি দ্বিপদী, পরে একটি চতুষ্পদী।'[২]

পেত্রার্কা, সেক্সপীয়র, মিল্টন, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, রসেটি প্রভৃতি কৃতকর্মা সনেট-

রচয়িতাদের রূপরচনা অথবা ভাববিন্যাস, কোনটিকেই প্রমথ চৌধুরী গ্রহণ করেন নি—সাধারণ সনেটের অষ্টক ও ষটকের বিন্যাসপদ্ধতিও এই ফরাসী-প্রভাবিত সনেটে রক্ষিত হয়নি। প্রমথ চৌধুরীর সনেটগুলির অষ্টক প্রকৃতপক্ষে দুটি একই ধরণের চতুষ্পদীর গ্রন্থন [ক-খ-খ-ক, ক-খ-খ-ক]। কিন্তু ষটকের বিন্যাসই এর মূল বৈচিত্র্য—এখানে তিনি সেক্সপীয়রীয় বিপরীত রীতি গ্রহণ করেছেন। সেক্সপীয়রের সনেটের ষটক একটি চতুষ্পদী ও একটি দ্বিপদীর গ্রন্থন। সর্বশেষের দ্বিপদীটিই সেক্সপীয়রীয় সনেটের ঐশ্বর্য—পূর্ববর্তী তিনটি চতুষ্পদীর আবেগ-অনুভূতি এই দুটি চরণের মধ্যে ঘনীভূত হ'য়ে ওঠে, 'The Shakespearian sonnet is like a red-hot bar being moulded upon a forge, till—in the closing couplet—it receives the final clinching blow from the heavy hammer. While the Petrarchean, on the other hand, is like a wind gathering in volume and dying away again immediately on attaining a culminating force.'—কিন্তু ফরাসী সনেটের ষটক প্রথমে দ্বিপদী, পরে চতুষ্পদী।—ফলে সেক্সপীয়রীয় সনেটের আবেগ-ঘন উদাত্ততা এখানে থাকা সম্ভব নয়। প্রিয়নাথ সেন 'সনেট-পঞ্চাশৎ'-এর যে সমালোচনা করেন[৩] তার উত্তরে প্রমথ চৌধুরী নিজেই বিষয়টির উপর আলোকপাত করেছেন, 'ফরাসী ভাষায় ইতালীয় ভাষার ন্যায় পদে পদে ছত্র-ব্যবধান দিয়ে চরণে চরণে মিল সাধন করা স্বাভাবিক নয়; এইজন্য ফরাসী সনেটে ষটকের প্রথম দুই চরণ দ্বিপদীর আকার ধারণ করে।'[৪] প্রমথ চৌধুরী তাঁর সনেটগুলির অন্ত্যচতুষ্পদীতে সবচেয়ে বেশী বৈচিত্র্য দেখিয়েছেন: ক-ঘ-ক-ঘ (সনেট), ক-ঘ-ঘ-ক (ভাস), ঘ-ঙ-ঙ-ঘ (জয়দেব), ঘ-ঙ-ঘ-ঙ (ভর্তৃহরি), য-ঘ-ঘ-য (চোরকবি)—মোটামুটি এই পাঁচরকম রীতি-বৈচিত্র্য প্রমথীয় সনেটের শেষ চতুষ্পদীতে লক্ষণীয়।

ফরাসী কবিদের পদানুসরণ প্রসঙ্গে প্রমথ চৌধুরী লিখেছিলেন, 'ফরাসী সনেট গড়া অপেক্ষাকৃত সহজ। তাই আমি ওই form-টাই নিই। ওরি মধ্যে একটু সহজ বলে।'[৫] আসল কথা, ফরাসী মননের সঙ্গেই তাঁর একটি গভীর আত্মীয়তা ছিল। সহজ ব'লে ফরাসী সনেটের অনুসরণ করেছিলেন,—একথা তাঁর মানস-প্রবণতার দিক থেকে মোটেই সত্য নয়। প্রমথ চৌধুরীর ফরাসী সাহিত্য-রসিকতার কথা সুবিদিত। স্পষ্টতা, পরিচ্ছন্নতা ও আবেগ-বিরল বাক্-বৈদগ্ধ ফরাসী সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্য শুধু গদ্যে নয়, কাব্যের

ক্ষেত্রেও লক্ষণীয়। প্রমথ চৌধুরীর স্বীকৃতি থেকেই তাঁর এই মানসিক প্রবণতা সুস্পষ্ট হ'য়ে ওঠে, 'ফরাসী সাহিত্য এই অর্থে স্পষ্টভাষী যে, সে সাহিত্যের ভাষায় জড়তা কিংবা অস্পষ্টতার লেশমাত্রও নেই। যে বিষয়ে লেখকের পরিষ্কার ধারণা আছে, সেই কথা অতি পরিষ্কার ক'রে বলাই হচ্ছে ফরাসী সাহিত্যের ধর্ম। আমি পূর্বেই বলেছি যে, ফরাসী সাহিত্যের ভিতর সায়েন্স ও আর্ট দুই-ই আছে।'[৬] ফরাসী সাহিত্যের মিতবাক্ পদ-বিন্যাস, শ্লেষাত্মক মন্তব্য, বুদ্ধিদীপ্ত জীবনসমালোচনা, মার্জিত পরিহাস-রসিকতা বাংলাদেশের অপরিচিত মাটিতে নূতন ফসল ফলিয়েছে—প্রমথ চৌধুরীর সনেটগুলি সেই ফসল—তেমনি রৌদ্র-চিক্কণ ও ভাস্কর্য-সুঠাম। ফরাসী সনেটের রীতির অনুসরণই তাঁর সনেটের বড় কথা নয়, ফরাসী সনেটের মেজাজও তাঁর সনেটে দুর্লভ নয়। প্রচলিত সনেটের ভাব-গভীরতা, অবরুদ্ধ ভাবানুভূতি ও গীতিলাবণ্য এখানে অনুপস্থিত। সেক্সপীয়রীয় রোম্যান্টিক উন্মাদনা, মিল্টনীয় উদাত্ততা, রাবীন্দ্রিক কল্পনাবিস্তার, রসেটি-সুলভ বর্ণচিত্রণের পরিবর্তে বাক্‌চাতুর্য, পরিহাস-রসিকতা ও শ্লেষাত্মক রীতি প্রমথ চৌধুরীর সনেটের বাহন। লঘু-গুরু ভাবস্পন্দনের পরিবর্তনশীলতা, স্যাটায়ার, আয়রণি ও উইটের আকস্মিক দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠেছে। তর্ক-বিতর্ক, আলাপ-আলোচনা, অম্লমধুর সরস মন্তব্য, ইস্পাত-কঠিন শ্লেষ, পালিশ করা শব্দ নিয়ে খেলা করা, উজ্জ্বল কৌতুক-রস—সহজ আলাপের ঢঙে পরিবেশন করা হয়েছে। প্রমথ চৌধুরীর সনেটের ভাবরূপ স্থিতিশীল নয়—গভীর থেকে তরলে আসা, তুচ্ছতাকে অসাধারণ ক'রে তোলা—প্রমথ চৌধুরীর প্যারাডক্স-প্রবণতার পরিচয় বহন করে। প্রিয়নাথ সেন যথার্থই বলেছেন, 'তাঁহার অনেক সনেটেই তিনি গুরু বিষয়-সকলকে লঘুভাবে এবং লঘু বিষয়-সকলকে গুরুভাবে দেখিয়াছেন এবং তাঁহার লেখনীর স্পর্শ এমনই লঘু—তাঁহার ভাব ও ভাষার এমন একটি স্পর্শাতীত অনির্দেশভঙ্গী আছে যে, তুমি ঠিক বুঝিতে পারিবে না, কোন্ কথাটি তিনি প্রশংসাকল্পে এবং কোন্ কথাটিই বা অপ্রশংসাকল্পে বলিতেছেন।' অসাধারণ কথা-চতুর এই সনেট-রচয়িতার স্বরূপটি সমালোচকের সন্ধানী দৃষ্টিতে সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে।

বিষয়-নির্বাচনে ও ভাষা-প্রয়োগে তিনি চুট্‌কির পক্ষপাতী। বর্ধমান সাহিত্য-সম্মিলনে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর অভিভাষণের উত্তরে প্রমথ চৌধুরী যে মন্তব্য করেছেন, তা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, 'শাস্ত্রী মহাশয়ের বর্ণিত সংস্কৃত চুট্‌কির দু'-একটি নমুনার সাহায্যেই দেখানো যেতে পারে যে, আর্য-যুগেও চুট্‌কি

কাব্যাচার্যদিগের নিকট অতি উপাদেয় ও মহার্ঘ বস্তু ব'লে পরিগণিত হত।'* চুটকির প্রতি এই বিশ্বাস ছিল ব'লেই চৌধুরী মহাশয় ধ্রুপদী বিষয়বস্তু বাদ দিয়ে আপাত-তুচ্ছ চুটকিই অবলম্বন করেছিলেন,

'তাই আজ ছাড়ি যত ধ্রুপদধামার
চুটকিতে রাখি যত আশা ভালবাসা।'

দুই

বিষয়বস্তু হিসেবে 'সনেট-পঞ্চাশৎ'-এর সনেটগুলিকে মোটামুটি সাতটি ভাগে ভাগ করা যায়ঃ ক. ফুল সম্বন্ধীয় সনেট, খ. দেশী-বিদেশী কয়েকজন কবি-সাহিত্যিক-সম্পর্কিত সনেট, গ. প্রাচীন কাব্যের নায়িকা-বিষয়ক সনেট, ঘ. প্রেম ও আদর্শবাদের ব্যঙ্গাত্মক অনুকরণমূলক সনেট, ঙ. জীবনসমালোচনা-সম্পর্কিত সনেট, চ. আত্মবিশ্লেষণ ও আত্মপরিচয়মূলক সনেট, ছ. কল্পনাসমৃদ্ধ গভীর রসের সনেট।

প্রমথ চৌধুরীর ফুল-সম্পর্কিত সনেটগুলির মধ্যেও নূতনত্ব আছে। ইংরেজী সাহিত্যের রোম্যান্টিক কবিদের কাব্যে ফুলের কবিতাগুলির মধ্যে অসাধারণ কল্পনাবৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থের ফুলের কবিতাগুলি একজাতীয় আধ্যাত্মিক বিশুদ্ধির প্রতিফলনে বহিরাশ্রয়ী বর্ণ-গন্ধকে অতিক্রম করেছে—অতি সাধারণ অনভিজাত ফুলের মধ্যে ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থের ধ্যানদৃষ্টি এক শুভ্রোজ্জ্বল নৈতিক সত্য আবিষ্কার করেছে। শেলী ফুলের বহিরাশ্রয়ী বর্ণ-গন্ধের বর্ণনা করেছেন বটে, কিন্তু সেখানেও ক্ষণস্থায়ী মানবজীবনের ব্যঞ্জনায় ও বিশ্বসৌন্দর্য-চেতনার গ্রন্থনে এর নূতন অর্থপ্রতীতি ঘটেছে। কীট্‌সের ফুলের কবিতাগুলি পঞ্চেন্দ্রিয়ের পঞ্চপ্রদীপের দীপ্ত শিখায় মোহময় হ'য়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের কবিতাগুলি ফুলের বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনাকে গৌণ করেছে, কবিমনের সৌন্দর্যানুভূতির এক বিদেহী আকুতি যেন ফুলের কবিতাগুলির মধ্যে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠেছে। অতি তুচ্ছ সাধারণ ফুলের মধ্যে কবি বিশ্বসৌন্দর্যের আভাস পেয়েছেন—ক্ষণ-সুন্দরের বর্ণগন্ধময় রূপের দর্পণে চিরসুন্দরের ভাবচ্ছবি প্রতিফলিত হয়েছে। দেবেন্দ্রনাথ সেনের ফুলের কবিতায় কীট্‌সীয় ইন্দ্রিয়-সচেতন সৌন্দর্য-বিহ্বলতার আস্বাদন লাভ করা যায়।

প্রমথ চৌধুরীর রোম্যান্টিকতা-বিরোধী মন ফুল নিয়ে কোন আত্মনিষ্ঠ ভাব-কল্পনার ছবি আঁকেনি। অম্লমধুর বর্ণনা ও ক্লাইম্যাক্স-অ্যান্টি-ক্লাইম্যাক্সের

আকস্মিক চমকে কবিতাগুলির একটি নূতন রূপ ফুটেছে। 'কাঁঠালী চাঁপা' কবিতাটি অম্লমধুর। দেবেন্দ্রনাথের 'চম্পক' ও সত্যেন্দ্রনাথের 'চম্পা' কবিতার সঙ্গে তুলনা করলেই প্রমথ চৌধুরীর এই জাতীয় কবিতার বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করা যায়। দেবেন্দ্রনাথের কবিতার মোহমদির বর্ণোল্লাস ও গন্ধঘন ইন্দ্রিয়ানুভূতির অথবা সত্যেন্দ্রনাথের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অপ্সর-লাস্যের যে চিত্র পাওয়া যায় 'কাঁঠালী চাঁপা' কবিতায় তার বিন্দুমাত্র আভাসও নেই—এক নিপুণ পর্যবেক্ষণশীল বাস্তব-ধর্মী মন কবিতাটিতে লঘুরস সঞ্চার করেছে। প্রমথ চৌধুরীর পর্যবেক্ষণ-নিপুণ বিশ্লেষণী দৃষ্টি প্রত্যেকটি ফুলের বস্তুবৈচিত্র্য ও আকৃতিধর্মের সূক্ষ্মতর প্রভেদকেও উদ্‌ঘাটিত করেছে। প্রত্যক্ষ রূপের ওপরেই তিনি প্রধানত জোর দিয়েছেন—ইন্দ্রিয়াতীত অনুভূতির জগতে তিনি প্রবেশ করেননি। 'কাঠ-মল্লিকা' কবিতায় তিনি এক অপরূপ রূপসন্ধানী মনের পরিচয় দিয়েছেন,

'তুমি নহ মানবের নয়ন-বিলাস,
রতিভর তনু তব হিম-বিন্দুপারা,—
গন্ধ তব ভেদ করি শ্যামপত্র-কারা,
মুক্ত হ'য়ে ব্যক্ত করে মন অভিলাষ ॥'

সামান্য কাঠ-মল্লিকাকে নিয়ে রূপ-রেখার এই চিত্রটি অসামান্য! কবিতাটির মধ্যে একটি সহজ সৌন্দর্য-পিপাসু মনের পরিচয় পাওয়া যায়। 'গোলাপ' কবিতাটিতে প্রমথ চৌধুরীর স্বভাবসিদ্ধ প্যারাডক্স-প্রবণতা আশ্চর্যকৌশলে রূপায়িত হয়েছে। গোলাপ 'ফুলের নবাব' ও 'নবাবের ফুল'—তাই কবি ইরাণী রোম্যান্সের সূক্ষ্মসার গন্ধটুকু সঞ্চারিত করেছেন। কিন্তু বুলবুলের গানে, বেগমের সোহাগে ও আতরের সুগন্ধে যখন বাদশাহী রোম্যান্স জমে উঠেছে, তখন অ্যান্টি-ক্লাইম্যাক্সের তীব্র আঘাতে সেই স্বপ্নাবেশ মরীচিকার মতো মিলিয়ে গিয়েছে, 'নবাবের যোগ্য তুমি হকিমী জোলাপ!' 'ধুতুরার ফুল' কবিতাটিতে দৃষ্টিভঙ্গির নূতনত্ব আছে। ধুতুরা ফুলের সৌন্দর্যের কোন কবি-প্রসিদ্ধি বা কৌলীন্য নেই—কিন্তু প্রমথ চৌধুরী এক সূক্ষ্মদৃষ্টির বলে সেখানে এক অনাস্বাদিতপূর্ব 'গন্ধ-হলাহল' আবিষ্কার করেছেন। কবিতাটিতে বোদেলেয়ারের প্রভাব আছে ব'লে মনে হয়। 'রজনীগন্ধা' কবিতাটি গভীর রসের—এখানে ফুলের বস্তুরূপ নেই বললেই হয়। রজনীগন্ধার সঙ্গে কবি তাঁর জীবনের সন্ধ্যা মিশিয়ে দিয়ে একটি ক্লান্ত দীর্ঘশ্বাসের সৃষ্টি করেছেন। এই কবিতায় আত্মময় ভাবনার ব্যঞ্জনাটুকু রমণীয়।

'সনেট-পঞ্চাশৎ'-এ সঙ্গীত ও রাগরাগিনী-সম্পর্কিত তিনটি সনেট আছে। প্রাচীন 'হিন্দুসঙ্গীত'-এর ব্যাখ্যাতা প্রমথ চৌধুরী রাগরাগিণীর বিদেহী সত্তাকে রূপগ্রাহ্য ক'রে তুলেছেন। 'বাহার' কবিতাটির স্পষ্টোজ্জ্বল বর্ণময়তা রাজ-নর্তকীর মহিমায় উদ্ভাসিত। সুরকে রূপবতী করার যে সাধনা প্রাচীন মার্গসঙ্গীতসাধনায় মিলেছিল, প্রমথ চৌধুরীর এই কবিতাটিতে সেই রূপনিষ্ঠ আস্বাদন আছে—রেখাঙ্কনগুলি সুস্পষ্ট ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য,

—'নটীবেশে তুমি এস, রাগিনী বাহার।
অঙ্গরাগ ধরি নব উজ্জ্বল শ্যামল,
মালতীর মালা চুলে, করেতে কমল,
চরণে তাড়না করি শীতের নীহার।'

'গজল' কবিতা অনেকটা আত্মবিশ্লেষণ-মূলক। পারসিক রোম্যান্সকে চুটকি-প্রিয়তার বর্ণনায় সাধারণ গন্ধময় ভূমিতে নামানো হয়েছে। 'পূরবী' কবিতায় কবির হৃদয়ের অংশ অনেকটা যুক্ত হয়েছে—ছায়াম্লান, বিষাদনম্র, স্বপ্নময় একটি অনুভূতি কবিতাটির মর্মমূলে একটি অলস-রোমন্থনের সৃষ্টি করেছে।

'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'তে মধুসূদন দেশী ও বিদেশী সাহিত্য-প্রতিভার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। প্রমথ চৌধুরীর এই শ্রেণীর কবিতাগুলিতে চটুল শ্লেষোক্তির জন্য শ্রদ্ধার সুর ফুটে উঠতে পারেনি। 'ভাস' কবিতাটি বিশেষত্ববিহীন—কবিতাটিতে বিশেষ কোন বক্তব্যও নেই। 'তোমার নাটকে তাই জলে পরিহাস'—এই কারণেই বোধ হয় পরিহাসপটু সনেট-রচয়িতা ভাসকে তাঁর কাব্যের বিষয়বস্তু করেছেন। 'জয়দেব' কবিতায় কবির নিপুণ শ্লেষোক্তি লক্ষণীয়। কবিতাটির পূর্বাপর একটি বক্র-তির্যক কটাক্ষ আছে। জয়দেবের কাব্যের আদিরসের সঙ্গে তুর্কী-আক্রমণের সম্পর্ক দেখিয়ে কবি তাঁর বক্রোক্তিটিকে উপভোগ্য ক'রে তুলেছেন। জয়দেবের কবিতায় সেদিন বঙ্গভূমি রতিমন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিল, পাণির চাতুরী শুধু নীবীবন্ধন-মোচনেই প্রযুক্ত হয়েছিল, আর বাণীচাতুর্য কোমলকান্ত পদাবলী-সৃষ্টিতেই পর্যবসিত হয়েছিল—বাঙালীর সেই নৈতিক অধঃপতনের সুযোগ নিয়েই 'তুরস্ক সোয়ার' বাংলাদেশ জয় করেছিল। লঘুরসের হলেও বিশ্লেষণের মধ্যে মননশীলতার পরিচয় আছে। 'ভর্তৃহরি' কবিতায় ভোগ ও বৈরাগ্যের আপাত-বিরোধী দ্বৈতরূপের মাধ্যমে প্রাচীন কবির কবি-মানসটিকে বিশ্লেষণ করেছেন। কবিতাটি বিশেষ কবির জীবনদ্বন্দ্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত হ'লেও এর

মধ্যে মানব-জীবনের একটি সার্বজনীন আবেদন আছে। 'চোরকবি' কবিতাটি একটি নিটোল সনেট। সূক্ষ্ম কারুকরণে ও ভাস্করসুলভ রূপ-রচনায় এই সনেটটি প্রমথ চৌধুরীর একটি উল্লেখযোগ্য রচনা। 'অবিদ্যা-সুন্দরী'র রূপমূর্তি রচনায় চিত্র ও ভাস্কর্য যেন হাত মিলিয়েছে,

'সেই রক্তপুষ্পে করি শক্তি-আরাধনা,
করেছিলে মশানেতে নায়িকা-সাধনা।
দিয়েছিল দেখা বিশ্ববিদ্যারূপ ধরি,
কনক চম্পকদামে সর্বাঙ্গ আবরি,
সুপ্তোত্থিতা শিথিলাঙ্গী, বিলোলকবরী,
প্রমাদের রাশিসম অবিদ্যা-সুন্দরী'

'বানার্ড্ শ' কবিতাটিতে সনেটের ঘনবদ্ধ ভাবসংহতির অভাব—কিন্তু শ'-র নির্মম সমাজ-সমালোচনা স্বভাবতই প্রমথ চৌধুরীকে মুগ্ধ করেছে। বানার্ড শ'-র বুদ্ধিদীপ্ত জীবনসমালোচনা-পদ্ধতির তিনি অনুসরণ করতে চেয়েছেন,

'এ জাতে শেখাতে পারি জীবনের মর্ম,
হাতে যদি পাই আমি তোমার চাবুক।'

'সনেট-পঞ্চাশৎ'-এর প্রাচীন কাব্যের নায়িকা-সম্পর্কিত কবিতা দু'টি রবীন্দ্রনাথের 'কাব্যের উপেক্ষিতা' শ্রেণীর সহানুভূতি-সমুজ্জ্বল নবসৃষ্টি নয়, কবি এখানে 'নামহারা নায়িকার পুরাতন আকাঙ্ক্ষা-কাহিনী'কেও রূপায়িত ক'রে তুলতে চাননি। রোম্যান্টিক কবিদের কাব্যে এই শ্রেণীর পুরাতনী নায়িকাদের একটি স্বতন্ত্র আবেদন আছে—অতীত-চারিণীদের জীবনচারণাকে বর্ণরঞ্জিত কল্পনা ও বেদনাহত দীর্ঘশ্বাসে ভ'রে তোলা সম্ভব। কিন্তু প্রমথ চৌধুরী রোম্যান্স সৃষ্টির সেই প্রচলিত পথ বর্জন করেছেন। 'বসন্তসেনা' কবিতায় সনেটের কোন রীতিই রক্ষিত হয়নি। অষ্টকের মধ্যে ব্যতিক্রম আছে। 'মৃচ্ছকটিক' নাটকের বসন্তসেনা ও 'কাদম্বরী' কাহিনীর পত্রলেখা সংস্কৃত সাহিত্যের দুই অসাধারণ নায়িকা। প্রমথ চৌধুরী তাঁর স্বাভাবিক পরিহাস-পরায়ণ বক্রভঙ্গী বর্জন ক'রে এখানে খানিকটা হৃদয়াবেগের কাছে ধরা দিয়েছেন। 'পত্রলেখা' সনেট-টির কাব্যমূল্য অধিক। রবীন্দ্রনাথ 'কাব্যের উপেক্ষিতা'য় পত্রলেখার নারীত্ব ও জীবন-পরিণামের অভাবের জন্য বাণভট্টকে অভিযোগ করেছেন। পত্রলেখা চিরন্তন অষ্টাদশী, তার কোন পরিণতি নেই—তাই সবিস্ময় জিজ্ঞাসা দিয়ে সনেট-টির সুরু, 'অষ্টাদশ বর্ষদেশে আছ পত্রলেখা!'—এই সবিস্ময় প্রশ্নটিই

সনেটের নিটোল মর্মরশিলায় রূপায়িত হয়েছে। কবিতাটি একটি রসোত্তীর্ণ সনেট।

তিন

প্রেম ও আদর্শের লঘুরসের ব্যঙ্গাত্মক কবিতাগুলি বাংলাকাব্যের এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন। অমৃতলাল, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত প্রভৃতি কবি প্রথম শ্রেণীর প্যারডি ও হাস্যরসাত্মক কবিতা-লেখক হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছেন। প্রমথ চৌধুরী কোন বিখ্যাত কবিতার ব্যঙ্গাত্মক অনুকরণ করেননি। আমাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের নানা অসঙ্গতিকে তিনি নির্মম-নৈপুণ্যে উদ্‌ঘাটিত করেছেন। তাঁর বিদ্রূপ যেমন ব্যক্তিগত নয়, তেমনি কোন বিশেষ উদ্দেশ্য বা আদর্শগত দিকও তার মধ্যে নেই। এই সামাজিক জীবনের অসঙ্গতির কথা মনে রেখেই তিনি এক সময় বানার্ড্‌শ'কে গুরুর পদে বরণ করেছিলেন। 'বালিকা-বধূ' কবিতায় তিনি সামাজিক ত্রুটিকেই তুলে ধরেছেন। রবীন্দ্রনাথ 'মানসী' কাব্যে বাল্যবিবাহের কৌতুককর অসঙ্গতিকে তীব্র ব্যঙ্গে রূপায়িত করেছিলেন ঃ

'সানাই বাজায়ে আসি ঘরে লয়ে
আটবরষের বধূ,
শৈশব-কুঁড়ি ছিঁড়িয়া বাহির
করি যৌবন-মধু।'

প্রমথ চৌধুরীর শ্লেষ-চতুর মন্তব্য আরও এক ধাপ এগিয়েছে মাত্র,

'বলিহারি কবিভর্তা-M.A. আর B.A.
বালবধূ লতিকার ঝুলিবার তরু!
মানুষ মরুক সবে গলে রজ্জু দিয়ে,
বেঁচে থাক কবিতার যত কাম-গরু'

'একদিন' সনেটে কাব্যরচনার কৌতুক-স্পর্শ ইতিহাস লিখেছেন। 'রোগ-শয্যা' কবিতায় রোগজর্জরিত দেহমনের লঘুরসের বর্ণনার সঙ্গে কবিতার শেষ চার চরণ যুক্ত হ'য়ে একটি স্নিগ্ধ-মধুর কৌতুকরস ফুটেছে—ব্যঙ্গের তীব্রতা এখানে নেই। 'পাষাণী' কবিতায় লঘু-চটুল ভঙ্গীতে পাষাণী নায়িকার আচরণ রূপায়িত করা হয়েছে, 'খোল নি সরিয়ে কভু বুকের চাদর'। 'স্বপ্ন-লঙ্কা' কবিতায় স্বপ্নদর্শী রোম্যান্টিক মনের পরিণতিকে আকস্মিক বৈপরীত্যের

ধাক্কায় বাস্তবের কঠোর ভূমিতে নামানো হয়েছে—'সে শব্দে চমকি জাগি, হেরি নবডঙ্কা।'

প্রমথ চৌধুরীর গদ্যরচনায় ও ছোটগল্পে জীবন-সমালোচনার যে বুদ্ধি-দীপ্ত তীব্রতা লক্ষ্য করা যায়, তা তার সনেটেও অনুপস্থিত নয়। 'মানবসমাজ' সনেটে প্রতিদিনের প্রাত্যহিক পৃথিবীর সঙ্কীর্ণতার বেদনার সুর আছে, সর্বশেষে একটু মৃদু শ্লেষ, রচয়িতার শ্লেষ-নৈপুণ্যের পরিচয় বহন করে। 'বিশ্বরূপ', 'বিশ্বব্যাকরণ,' 'বিশ্বকোষ' সনেট-ত্রয়ীতে জীবন-সমালোচনার সুর তীব্রভাষায় রূপায়িত হয়েছে। পৃথিবীতে এক শ্রেণীর ব্যক্তি আছেন যাঁরা বিশ্বরহস্য নিয়ে অনুক্ষণ আলোচনায় মত্ত—তাঁরা জীবনরস-রসিক নন, জীবনের সহজ-সুন্দর রূপ তাঁদের সামনে উদ্‌ঘাটিত হয় না। এই শ্রেণীর কবিতায় সূচীতীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের সঙ্গে মৃদু-কৌতুকের রেখা মিশে আছে। কবি তাঁর স্বভাব-সিদ্ধ কণ্ঠে তথাকথিত বইপড়া-বিশ্বরহস্য-রসিকদের বলেছেন :

'ধরণীকে চূর্ণ করি, জ্ঞানের বটিকা
গ'ড়ে কিন্তু তিতো করি দর্শনে বিজ্ঞানে,
সেগুলি মূর্খে'তে গেলে, বুজে চোখ কানে,—
জানে না তাহার মূল্য নয় বরাটিকা।'

'অন্বেষণ' সনেট-টিরও মূল সুর জীবন-রসিকতার। জীবনকে বাদ দিয়ে একটি কল্পিত শ্রেয়ের অনুসন্ধান করা অর্থহীন। 'হাসি' কবিতার মধ্যেও জীবন-সমালোচনার সুর অলক্ষ্যগোচর নয়—কবি এখানে অনাসক্তভাবে জীবনের হাসিকান্নার রূপ দেখেছেন। জীবন-সমালোচনার কবিতাগুলির মধ্যে প্রমথ চৌধুরী বার বার জীবন-বিমুখতার প্রতিবাদ করেছেন। কবিতা-গুলির বক্তব্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' কাব্যের 'পরশ পাথর,' 'আকাশের চাঁদ,' 'মায়াবাদ' প্রভৃতি কবিতার আশ্চর্য মিল আছে।

'সনেট', 'ব্যর্থজীবন', 'হাসি ও কান্না,' 'উপদেশ,' 'আত্মকথা', 'বন্ধুর প্রতি' প্রভৃতি কয়েকটি সনেটে প্রমথ চৌধুরী তাঁর কবিধর্মের বৈশিষ্ট্য ও আত্মপরিচয় বিবৃত করেছেন। 'সনেট' কবিতায় তিনি তাঁর সনেটের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করেছেন—তাঁর কাব্যসরস্বতী যে বিদেশী রূপসজ্জায় সজ্জিতা একথা তিনি স্পষ্টই স্বীকার করেছেন 'সরস্বতী দেখা দিবে পরিয়া বনেট।' 'ব্যর্থজীবন' কবিতায় লঘুরসের আত্মপরিচয়ের ছলে তিনি যে অম্লমধুর মন্তব্য করেছেন তার তীক্ষ্ণতা ও বাঙালী জীবনের নির্মম সমালোচনা চিত্তগ্রাহী হ'য়ে উঠেছে,

'চাটুপটু বক্তা নহি, বড় এজলাসে।
উদ্ধার করিনি দেশ টানিয়া চরসে।
পুত্রকন্যা হয় নাই বরষে বরষে
অশ্রুপাত করি নাই মদের গেলাসে।'

শ্লেষ-বিদ্রূপের সুচতুর বিন্যাসে বাংলা সাহিত্যের কোন কবিই এমন বিচিত্র আত্মপরিচয় দেননি। 'হাসি ও কান্না' কবিতায় হাস্যরসিক কবি তাঁর হাস্যরস-প্রবণতার কারণ নির্দেশ করেছেন কবিতাটির মধ্যে চৌধুরী মহাশয়ের মনোধর্মের একটি মিতবাক্ অথচ সুস্পষ্ট পরিচয় ফুটেছে,

'আর আমি ভালবাসি বিদ্রূপের হাসি
ফোটে যাহা তুচ্ছ করি আঁধারের বল,
উজ্জ্বল চঞ্চল যার নির্মল অনল
দগ্ধ করে পৃথিবীর শুষ্ক তৃণরাশি।'

'উপদেশ' কবিতায় ব্যঙ্গের সুরে কবি তাঁর আত্মপরিচয় দিয়েছেন। পাঠক-সাধারণের স্থূলরুচিকে এবং 'দরকারী ভাব' ও 'সরকারী ভাষা'য় লেখা সস্তা কবিতাকে বাগ্‌বৈদগ্ধ্যে রূপায়িত করা হয়েছে। 'আত্মকথা' কবিতায় তথাকথিত কল্পনাপ্রবণতাকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। প্রমথ চৌধুরীর বুদ্ধিদীপ্ত জগৎটি একটি প্রত্যক্ষ জগৎ—অপ্রত্যক্ষের অতীন্দ্রিয় কল্পনা তাঁর কবিতায় নেই। তাই তিনি তাঁর রচনায় বহুস্থানেই রোম্যান্টিক কল্পবৃত্তিকে ব্যঙ্গ করেছেন। ভাবালুতা ও হৃদয়াবেগের আতিশয্য তাঁর মনোধর্মের বিরোধী। তাই তিনি অনায়াসেই বলতে পেরেছেন,

'হৃদয়ে জন্মিলে মোর ভাবের অঙ্কুর,
ওঠে না তাহার ফুল শূন্যেতে দুলিয়ে।
প্রিয়া মোর নারী শুধু, থাকে না ঝুলিয়ে,
স্বর্গ মর্ত্য মাঝখানে, মত ত্রিশঙ্কুর।'

'সনেট-পঞ্চাশৎ'-এর অধিকাংশ কবিতাই লঘুরসের, কিন্তু কয়েকটি সনেটে এইভাবের ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। এখানে কবি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ পরিহাস-রসিকতা ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের পথ ছেড়ে মানব-অনুভূতির গভীরে প্রবেশ করেছেন, শুধু তাই নয় কোন কোন কবিতায় বুদ্ধিকে অতিক্রম ক'রে হৃদয়াবেগ প্রকাশিত হয়েছে। 'ধরণী' কবিতায় যে মর্ত্যপ্রীতির সুর স্বতঃস্ফূর্ত হ'য়ে উঠেছে,—তাতে আবেগ-প্রাবল্য নেই সত্য, কিন্তু বুদ্ধির বাঁকা

তলোয়ার সেখানকার সহজ দৃষ্টিকে রোধ করতে পারেনি। কবিতাটির মধ্যে কীট্সের 'The poetry of the earth is never dead' কবিতাটির খানিকটা ভাবানুসরণ আছে—কিন্তু ইস্পাত-কঠিন বাক্‌রীতি কীট্সীয় সৌন্দর্য-তন্ময়তার কাছাকাছিও যেতে পারেনি। 'একদিন' 'প্রিয়া' 'ভুল' কবিতা তিনটিকে সাধারণভাবে প্রেমের কবিতা বলা যেতে পারে। 'একদিন' কবিতায় মাঝে মাঝে লঘুস্পর্শ মেজাজের ছোঁয়াচ আছে, কিন্তু তাতে কবিতাটির মূল সুর দ্বিধাগ্রস্ত হয়নি। 'ভুল' কবিতায় হারানো প্রেমের স্মৃতি-রোমন্থনে কবিকণ্ঠ গাঢ় হ'য়ে উঠেছে। ক্ষণ-মিলনের ছবিটুকু দু'একটি সার্থক উপমার গ্রন্থনে রূপময় হ'য়ে উঠেছে। 'হৃদয়ের ভুল শুধু জীবনের সার'—একটি ক্লান্ত দীর্ঘশ্বাসে কবিতাটির পরিসমাপ্তি ঘটেছে। 'পরিচয়' কবিতায় কবি রোম্যান্টিকতার বাহুবন্ধনে ধরা দিয়েছেন। কবিতাটির অঙ্গকে প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের পটভূমিকা থেকে কবি রস আহরণ করেছেন। কবিতাটির মধ্যে প্রেমের জন্মজন্মান্তরব্যাপী ভাব-প্রবাহের একটি বিশ্বব্যাপক উপলব্ধি আছে। বিশ্বসৌন্দর্যরূপিণী কবির মানসপ্রিয়া কোন দূর অতীতের মাধবীপার্বণে গন্ধর্বশালায় অথবা আলেখ্যভবনে দেখা দিয়েছিল—মেঘাচ্ছন্ন শ্রাবণের বিস্মৃত-প্রহরে প্রিয়ার অভিসারের কাহিনী স্মৃতিরসে সমুজ্জ্বল হ'য়ে আছে। চিরন্তনকালের অবিশ্রান্ত প্রবাহের মধ্যে কবি সেই যুগলের লীলাভিসারের কথা স্মরণ করেছেন। কবিতাটির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'অনন্ত প্রেম' কবিতার কিছু ভাবগত সাদৃশ্য আছে। 'প্রিয়া' কবিতায় কবির সৌন্দর্যানুভূতির আদর্শ রূপায়িত হয়েছে,

'সকল ইন্দ্রিয় মোর জ্যোতিতে ভরিয়া,
যোগাও প্রাণের মূলে রস নিরন্তর ॥'

'অপরাহ্ণ' কবিতায় গত-যৌবনের জন্য বেদনাবোধ ও অনুশোচনার সুর ধ্বনিত হয়েছে। জীবনের অপরাহ্ণিক বেদনাবোধ বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের দপ্তরের' কয়েকটি প্রসিদ্ধ রচনায় অপরূপ গীতিমূর্ছনায় রূপায়িত হয়েছে। 'পূরবী' থেকে আরম্ভ ক'রে রবীন্দ্র-কাব্যগোধূলির মধ্যে এই সুর বেদনার নীলরেখায় আভাসিত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথের মতো গীতিধর্মী না হ'লেও, প্রমথ চৌধুরীর এই শ্রেণীর কবিতায় একটি বিষণ্ণ-কোমল ভাব-গভীরতার পরিচয় পাওয়া যায়। 'স্মৃতি' কবিতায় 'অপরাহ্ণ' কবিতার মতো তীব্রতা নেই, কিন্তু অলস মনের একটি সুকুমার রোমন্থন আছে—বুদ্ধির স্পষ্টালোকিত জগৎ ছেড়ে কবি আত্মমুগ্ধ ভাবতন্ময়তার মধ্যে প্রবেশ করেছেন। 'প্রতিমা'

সনেট-টি নানা কারণে একটি উল্লেখযোগ্য কবিতা। প্রমথ চৌধুরীর বস্তুধর্মী দৃষ্টির একটি প্রধান আশ্রয়স্থল হলো তাঁর ইন্দ্রিয়-সচেতন রূপচেতনা। সৌন্দর্যের অপ্রত্যক্ষ ব্যঞ্জনা অথবা ইন্দ্রিয়াতীত অনুভব তাঁর মনোধর্মের বিরোধী, কিন্তু তিনি সেই ইন্দ্রিয়-সচেতনতার কাছেই দাসখত লিখে দেননি। তাই কীট্‌সের ইন্দ্রিয়-সচেতনতার সঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর ইন্দ্রিয়-সচেতনতার প্রভেদ আছে। রূপনিষ্ঠতা কীট্‌সের মনে এক শতবর্ণরঞ্জিত মোহাবেশের সৃষ্টি করেছে, কিন্তু প্রমথ চৌধুরীর বুদ্ধিমার্জিত অনাসক্ত মনে কোন নেশা ধরাতে পারেনি। প্রমথ চৌধুরী বর্ণগন্ধ ও রূপনিষ্ঠতার সাধক, কিন্তু তাতে তাঁর ভোগানুগ লালসা নেই। 'প্রতিমা' কবিতা তাঁর এই বিশেষ মানসিকতার সংবাদবাহী,

'প্রজ্জ্বলিত ইন্দ্রনীলে খচিত নয়ন,
প্রান্তে লগ্ন প্রবালেতে গঠিত শ্রবণ,
মুকুতা-নির্মিত যুগ্ম ঘন-পীন-স্তন,
সুকঠিন পদ্মরাগে গঠিত চরণ।'

বর্ণ-প্রদীপ্ত ভাস্কর্য-সুডৌল এই মানসপ্রতিমার বর্ণনা থেকেই প্রমথ চৌধুরীর রূপ-চেতনার পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতচন্দ্রের সুমার্জিত ক্লাসিক্যাল রূপকরণের কথা মনে পড়ে। তাঁর গল্পগুলিতে নারীরূপের বর্ণনার মধ্যে এই ইন্দ্রিয়বাদ আরও স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে। প্রমথ চৌধুরীর কবিতায় সনেটের এই নবীন মূর্তি দেখে রবীন্দ্রনাথ যে কথা বলেছিলেন তা প্রণিধানযোগ্য, 'বাংলায় এ জাতের কবিতা আমি তো দেখিনি। এর কোন লাইনটি ব্যর্থ নয়, কোথায়ও ফাঁক নেই—এ যেন ইস্পাতের ছুরী, হাতীর দাঁতের বাঁটগুলি জহুরির নিপুণ হাতের কাজ করা, ফলাগুলি ওস্তাদের হাতের তৈরি—তীক্ষ্ণধার হাস্য ঝকঝক করছে, কোথাও অশ্রুর বাষ্পে ঝাপসা হয়নি—কেবল কোথাও যেন কিছু কিছু রক্তের দাগ লেগেছে। বাংলার সরস্বতীর বীণায় এ যেন তুমি ইস্পাতের তার চড়িয়ে দিয়েচ।' ইতি ২২শে এপ্রেল, ১৯১৩।[৮]

চার

প্রমথ চৌধুরীর দ্বিতীয় ও শেষ কাব্যগ্রন্থ 'পদ-চারণ'। এই কাব্য-সঙ্কলনটিতে বিচিত্র ধরণের ছন্দের পরীক্ষা করেছেন। পয়ার ও ত্রিপদী ছাড়া সনেট, তেরজা রিমা (Terza Rima), ত্রয়োলেট (Triolet) প্রভৃতি নানা দেশী-বিদেশী ছন্দের অনুসরণ করেছেন। প্রমথ চৌধুরীর প্রতিভা স্বভাবকবির

প্রতিভা নয়, তাতে আত্মভাব-বিভোর তন্ময়তা নেই, তিনি যত্নকৃত শিল্পাচরণে বিশ্বাসী। ভাবালুতা ও শিথিলতার প্রতি তিনি ছিলেন নির্মম। তাই 'পদ-চারণ'-এর বিচিত্ররূপী কবিতাগুলির মধ্যেও বুদ্ধি-প্রদীপ্ত সংহতিগুণ লক্ষণীয়।

'পদ-চারণ' কাব্যগ্রন্থেরও অনেকগুলি কবিতাই সনেট। কতকগুলি সনেট 'সনেট-পঞ্চাশৎ'-এর আমলে লেখা—তবে সেগুলি 'সনেট-পঞ্চাশৎ'-এর অন্তর্ভুক্ত হয়নি। 'সনেট-পঞ্চাশৎ'-এর যেমন সবগুলি সনেটই ফরাসী সনেটের রীতিতে লেখা, 'পদ-চারণ'-এর কিছু সনেট ইতালীয় সনেটের পদ্ধতিতে লেখা; সবগুলি সনেটেই যে সমান ফর্ম-নিষ্ঠা আছে, একথা বলা যায় না, তবে একথা সত্য যে তাঁর সচেতন শিল্পবোধ ও যত্নকৃত কলাকৌশল-সনেট রচনায় সুস্পষ্ট। সনেটের কেন্দ্রঘন-সংহতি ও গাঢ়বন্ধতার আদর্শ তিনি যতদূর সম্ভব অনুসরণ করার চেষ্টা করেছেন। প্রমথ চৌধুরীর মতে সনেট হবে ভাস্কর্যধর্মী—ভাব-প্রবাহের উদ্দামতার জায়গায় সংহত ভাবঘনত্বই এর বিশেষত্ব হবে।[৯] 'সনেট-সুন্দরী' কবিতায় তিনি তাঁর এই গাঢ়বন্ধ কাব্যরীতিটির আকৃতি-ধর্ম ও প্রকৃতি-ধর্মের কথা বলেছেন,

'বিগাঢ়যৌবনা তন্বী, আকারে বালিকা,
পরিণত দেহখানি আটসাঁট ক্ষুদ্র।
শিশির ঋতুর স্নিগ্ধ মসৃণ রউদ্র।
ঘনীভূত ক'রে গড়া স্বর্ণ-পাঞ্চালিকা।'

সনেটের ষটকের মধ্যে তিনি সনেট-লেখককে কি কি বিষয় সাবধান হ'তে হবে, তাও সুকৌশলে বলেছেন। 'পদ-চারণ'-এর অনেকগুলি কবিতায় কবি কৌতুকছলে তাঁর কবিতা ও কাব্যরীতির আলোচনা করেছেন। 'সনেট চতুষ্টয়', কবিতা ও কাব্যরীতি-সম্পর্কিত চারটি লঘুরসের সনেটের সঙ্কলন, প্রথম সনেট-টিতে হাস্যরস চূড়ান্ত হয়ে উঠেছে,

'কবিতা লিখেছি সখি, হয়েছে কসুর।
প্রথম মুস্কিল মেলা চরণে চরণ,
দ্বিতীয় মুস্কিল শেখা একেলে ধরণ,
তৃতীয় মুস্কিল দেখি পাঠক শ্বশুর।'

'আমার সনেট' কবিতাটিতে তিনি তাঁর সনেট-সমালোচকদের মন্তব্যের কথা উল্লেখ করেছেন। এই জাতীয় কবিতায় প্রমথ চৌধুরী একাধারে কবি ও

সমালোচক। সনেটের গাঢ়বন্ধতার মধ্যে এক সদাজাগ্রত বুদ্ধিদীপ্ত সমালোচক-বৃত্তি আত্মপ্রকাশ করেছে। ঈষৎ শ্লেষের সঙ্গেই তিনি বলেছেন,

'আমার সনেট নাকি নিরেট সুন্দরী ?
বর্ণের প্রলেপে দেহ কঠিন চিক্কণ,
চরণের আভরণে নাহিক নিক্কণ,
বুকে নাই রাজযক্ষ্মা, উদরে উদরী।'

কবি যতই ব্যঙ্গ করুন না কেন, তাঁর 'সনেট-সুন্দরীর' যে বর্ণময় কঠিন-চিক্কণ দেহযষ্টি তাতে কোন সন্দেহ নেই। প্রচলিত বাংলা কবিতার বিরুদ্ধে প্রমথ চৌধুরীর বিদ্রোহ শেষ-চরণটিতে সুপ্রকট হ'য়ে উঠেছে। এ বিদ্রোহ ভাবালুতার বিরুদ্ধে, আতিশয্যের বিরুদ্ধে, সংহতি-হীনতার বিরুদ্ধে।

'সনেট-সপ্তক' কবিতাগুচ্ছ বাঙালীর ভাবাবেগপূর্ণ কাব্যের ব্যঙ্গাত্মক অনুকরণ। কবিতাটিতে প্রেমের আতিশয্য-প্রবণতাকে এক শ্লেষ-তির্যক দৃষ্টিতে রূপায়িত করা হয়েছে। কবিতাগুচ্ছের ভূমিকার মধ্যেই কবির মনোভাব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন তাঁহার 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থের পাতায় পাতায় এই মত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, মধুর রসে বিগলিত হইয়া অবিরল অশ্রু মোচন করিতে বাঙালী কবি যেরূপ জানে, পৃথিবীর অন্য কোন কবি তাহার সিকির-সিকিও জানে না। বুকের রক্ত জল হইয়া চক্ষু হইতে নির্গত হওয়ার উপরেই যদি বাঙালী কবির কবিত্ব নির্ভর করে, তাহা হইলে আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে, এই অপরিচিত যুবকটি বঙ্গদেশের একটি শ্রেষ্ঠ কবি।'[১০] প্রমথ চৌধুরীর ঋতু-সম্পর্কিত কবিতার মধ্যেও তাঁর রোম্যান্টিকতা-বিরোধী ব্যঙ্গদৃষ্টির তীক্ষ্ণতা লক্ষণীয়। 'বর্ষা' কবিতায় ধ্বনি-প্রধান ছন্দে লঘুরসের ছড়ার ঢঙে তিনি বর্ষার বাস্তবরূপ এঁকেছেন—এ বর্ষা কালিদাস-জয়দেব-বিদ্যাপতি-রবীন্দ্রনাথের রূপ-রুচিরা রোম্যান্টিক বর্ষা নয়। অন্যত্র তিনি বলেছেন, 'বর্ষার রূপ কালো, রস জোলো, গন্ধ পঙ্কজের নয়, পঙ্কের, স্পর্শ ভিজে এবং শব্দ বেজায়।'[১১] প্রকৃতি-বর্ণনায়ও সৌন্দর্যানুভূতির রোম্যান্টিক ও আত্মভাবমুগ্ধ ভাবুকতার রেশটুকু নেই—'পূর্ণিমার খেয়াল' নামে ত্রিপদী ছন্দের কবিতাটিতে গদ্যাত্মক কাব্যরীতি ও সংলাপধর্মিতায় পূর্ণিমা রাত্রির মোহাবেশটুকু নিঃশেষিত হয়েছে,

'ঝুলিছে আকাশে দেখ চাঁদের লণ্ঠন,
চারিপাশে তারে ঘিরি তারার দেয়ালগিরি,
গগনের গায়ে করে কিরণ বণ্টন।'

ফরাসী ত্রয়োলেট (Triolet) শ্রেণীর ছন্দও প্রমথ চৌধুরী বাংলা কবিতায় পরীক্ষা করেছেন—তিনি তার নাম দিয়েছেন 'তেপাটি'। এই বাংলা নামকরণের মধ্যে ছন্দটির মূলগত বৈশিষ্ট্যের কথাও যেন বলা হয়েছে। পঞ্চদশ শতাব্দী থেকেই 'Triolet' নামটি চলে আসছে 'possibly because, in the first place, it was originally a three part song.'[১২] এক সময় এই ছন্দে প্যারোডি ও ব্যঙ্গ-প্রধান কবিতা লেখা হ'তো। রাজনৈতিক জীবনে প্রতিপক্ষকে পর্যুদস্ত করার জন্য ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই ছন্দটিকে রাজনৈতিক বাক্-যুদ্ধের মাধ্যম হিসেবে প্রয়োগ করা হ'তো। অবশ্য ত্রয়োলেটের মাধ্যমে যে গভীর ভাব প্রকাশিত হ'তো না, এমন নয়—তবে লঘুভাবের কবিতাই যেন এই ছন্দটির স্বক্ষেত্র। প্রমথ চৌধুরী মূলত ত্রয়োলেট রচনায় লঘুস্বরকেই অবলম্বন করেছেন। তর্কবিতর্ক, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, সংলাপধর্মিতা আটটি বিচিত্র চরণ-বিন্যাসে গ্রথিত (ক-খ-ক-ক-ক-খ, ক-খ)। ত্রয়োলেট ছাড়া ইতালীয় তেরজা রিমা (Terza Rima) ছন্দ তিনি বাংলায় এনেছেন। প্রমথ চৌধুরী দুটি কবিতা লিখেছেন এই ছন্দে। কবিতা দুটি একটু দীর্ঘ। তার কারণ বোধ হয় এই ছন্দের প্রবাহ-গুণ। তিনটি চরণ-মধ্যে মাঝখানের চরণটি থাকে অমিল, প্রথম ও তৃতীয় চরণের মধ্যে মিল থাকে। কিন্তু এই ছন্দের সবচেয়ে অসুবিধে হ'লো এই যে অমিল চরণটির সঙ্গে আবার পরের ত্রিপদীর প্রথম ও তৃতীয় চরণের মিল রাখতে হয়। মোট কথা, প্রতি চরণেরই তিনটি করে মিল থাকে। দান্তে তাঁর 'ডিভাইনা কমেডিয়া' কাব্যে পূর্বাপর এই ছন্দই ব্যবহার করেছেন। প্রমথ চৌধুরী অবশ্য এই ছন্দে লঘুরসের আত্মপরিচয় লিখেছেন। কারণ তিনি স্পষ্টই জানতেন যে, তিনি দান্তে প্রভৃতি কবিদের বংশধর নন। 'দুয়ানি', পয়ার ছন্দের দ্বিপদী ছাড়া কিছু নয়, তবে দু'চরণের এক একটি ছোট স্তবক, তেমনি 'সিকি' চতুষ্পদী স্তবক।

প্রমথ চৌধুরীর কাব্যপ্রতিভা খুব বড় নয়, তিনি মূলত গদ্যলেখক। এ বিষয়ে তিনি নিজেও সচেতন ছিলেন। কিন্তু তৎকালীন বাংলা কাব্যের গতানুগতিকতা ও প্রথাবদ্ধতার ব্যর্থ অনুসরণ না ক'রে তিনি নূতন পথ ধরেছিলেন। কাব্যের ক্ষেত্রে তিনি প্রেরণাবাদী ছিলেন না, তাই তিনি জাগ্রতবুদ্ধির দীপ্তিতে তাঁর শিল্পকর্মকে সুমার্জিত ক'রে তুলেছিলেন। 'বীণাপাণিকে খড়্গপাণি' করার ব্রত তিনি নিয়েছিলেন। তিনি স্বভাবকবি ছিলেন

না সত্য, কিন্তু তাঁর মতো ফর্ম-নিষ্ঠ আর্টিস্ট বাংলা কাব্যের ইতিহাসে খুব বেশী নেই। আবেগ-বিরল বুদ্ধি-মার্জিত কবিতার ইতিহাসে নিঃসন্দেহে তিনি পুরোধা হিসেবে স্বীকৃত হবেন।

পাঁচ

প্রমথ চৌধুরীর কবিতা-প্রসঙ্গে একটি প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই মনে হয়। 'সনেট-পঞ্চাশৎ' ও 'পদ-চারণ' দিয়ে তিনি প্রায় একশোটি কবিতা লিখেছিলেন। 'পদ-চারণ'-এর কয়েকটি কবিতা বাদ দিয়ে প্রায় আশীটি সনেট তিনি লিখেছেন। সব সনেটে তিনি সমান সার্থক না হ'লেও, এই শ্রেণীর কবিতা রচনায় যে তাঁর বিশেষ প্রবণতা ছিল, তা বেশ বোঝা যায়। প্রমথ চৌধুরীর মনোজীবনের সঙ্গে সনেটের আত্মিক সম্পর্ক কতখানি সেইটুকু নির্ণয় করা প্রয়োজন। প্রমথ চৌধুরী জানতেন যে তাঁর কাব্যপ্রতিভা খুব বড় নয়, তাই তিনি কবিতার ক্ষেত্রে সৃষ্টির চেয়ে আঙ্গিক পরীক্ষার দিকেই প্রধানত নজর দিয়েছেন। তাই সনেট-রচনাতেও তিনি প্রচলিত পথ অনুসরণ করেননি— শুধু সনেট কেন, কোন কবিতার ক্ষেত্রেই বাংলা কবিতার প্রচলিত বিধি তিনি স্বীকার করেননি। দ্বিতীয়ত, তাঁর ক্লাসিক্যাল মন সনেটকেই মূল বাহন করেছিল। কারণ সনেট-সুন্দরীর 'বর্ণের প্রলেপে দেহ কঠিন চিক্কণ।' তা ছাড়া তাঁর শ্লেষাত্মক দৃষ্টির যথার্থ রূপায়ণের পক্ষে ফরাসী সনেটকেই তিনি উপযুক্ত মাধ্যম মনে করেছিলেন। বাংলা সনেটের ঐতিহ্যের সঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর তেমন কোন যোগ ছিল না। তবে দু'একটি জায়গায় 'কড়ি ও কোমল'-এর রবীন্দ্রনাথ ও অপেক্ষাকৃত বর্ণগাঢ় সনেটে দেবেন্দ্রনাথ সেনের ভঙ্গির কথাও হয়তো মনে পড়বে। প্রমথ চৌধুরীর সনেট সম্পর্কে আর একটি কথাও উল্লেখযোগ্য। তিনি সনেট-বিন্যাসে মধুসূদনীয় আদি-সনেটের চতুর্দশ-মাত্রিক চরণ-বিন্যাসকেই আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এবং পরবর্তীকালে অনেকেই [বিশেষত মোহিতলাল] অষ্টাদশ-মাত্রিক চরণ-সমন্বিত সনেট রচনা করেছেন। অষ্টাদশ মাত্রার চরণে সনেটের একটু ভাব-বিস্তৃতির সুবিধে হয়, সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই সঙ্গে একটি মারাত্মক ত্রুটি ঘটারও সম্ভাবনা। সনেটের ভাব-ঘনত্ব ও কেন্দ্রসংহতির বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটলেই আর যাই হোক না কেন, সনেট-ধর্ম ব্যাহত হয়। প্রমথ চৌধুরীর ক্লাসিক্যাল মন তাই চতুর্দশ-মাত্রিক চরণকেই সনেটের একমাত্র রূপ হিসেবে স্বীকার

করেছে। গাঢ়তা ও বাঁধুনি রক্ষার চেষ্টা তাঁর সর্বত্র। তাঁর তিনভাগে ভাগ করা ত্রিভঙ্গ সনেটের মধ্যে অবশ্য সর্বত্র এই রূপ ফুটে উঠতে পারেনি।

ইংরেজী সাহিত্যে সনেটের ঐতিহ্য খুব মহৎ সন্দেহ নেই, কিন্তু আয়তন ও রূপবৈচিত্র্যের দিক থেকে ফরাসী সনেটেরও মূল্য কম নয়। ষোড়শ শতাব্দী ফরাসী কাব্যের পক্ষে একটি অসাধারণ গৌরবমণ্ডিত যুগ। এই যুগের ভাব-প্রকাশের প্রধান মাধ্যম ছিল সনেট। সমালোচকেরা মনে করেন যে ষোড়শ শতকের শেষ দু'দশকের ইংরেজী সনেটের অসাধারণত্বের মূলে আছে ফরাসী সনেটের প্রভাব। ফরাসী সনেটের ইতিহাসে রঁস্যার্দ-এর (Ronsard, ১৫২৪-'৮৫) স্থান সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য। কারণ ফরাসী সনেটের ইতিহাসে তিনি এক যুগ স্বষ্টি করিয়াছেন, তাঁর অনুবর্তী কবিগোষ্ঠীর প্রচলিত নাম 'Pleiade'। এই যুগেরই আর একজন বিখ্যাত সনেট-রচয়িতা Joachim Du Bellay-র (১৫২২-'৬০) সনেটের মধ্যে ব্যঙ্গবিদ্রূপ ও শ্লেষ-প্রবণতার তীক্ষ্ণধার বাণী-ভঙ্গিমা সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে। কিন্তু Philippe Desports-এর (১৫৪৭—১৬০৬) হাতে ফরাসী সনেট শিল্প-সৌন্দর্যে রমণীয় হ'য়ে উঠল। উনিশ শতকে বোদলের, গোতিয়ে, ভার্লেন প্রভৃতি কবিদের হাতে ফরাসী সনেটের নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে। প্রমথ চৌধুরীর সনেটের সঙ্গে ষোড়শ শতকের ফরাসী সনেটের আঙ্গিকের যোগাযোগই সবচেয়ে বেশী। ফরাসী সনেটের মূল রূপেও নবম ও দশম চরণে মিল থাকে, অষ্টক—(ক, খ, খ, ক,)+(ক, খ, খ, ক), ষটক—(গ, গ, ঘ)+(ঙ, ঙ, ঘ)। প্রমথ চৌধুরীর সনেটের রূপ এই ধরণের, কিন্তু স্তবকবিভাগ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই একটু অন্যরকম, তিনি ষটককে দু'ভাগ করেছেন (প্রায়ই) ২+৪ হিসেবে, তা ছাড়া দশম চরণের পর ভাবের ছেদ পড়েছে, তারপরে [ঘ, ঙ, ঙ, ঘ] চতুষ্পদী সংযোগ করেছেন। এর ফলে সনেটের গাঢ়বদ্ধতা নষ্ট হয়েছে।

ফরাসী সনেটের এই গুরুতর ব্যতিক্রমটি সুরসিক প্রিয়নাথ সেনের দৃষ্টি এড়ায়নি। তিনি 'সনেট-পঞ্চাশৎ' আলোচনা প্রসঙ্গে যা বলেছেন, তা প্রণিধানযোগ্য, 'একাধিক সনেটে দশম চরণে আমরা দেখিতে পাই, তাহার ভাবতরঙ্গ পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া বিরাম লাভ করিয়াছে। প্রায়ই তাঁহার প্রত্যেক সনেটে নবম ও দশম চরণ একটি সম্পূর্ণ মিত্রাক্ষর পয়ারের আকারপ্রাপ্ত, এবং

অনেকস্থলে সেক্সপীয়রীয় সনেটের অন্তিম পয়ারের অনুরূপ। দৃষ্টান্তস্বরূপ "পত্রলেখা" নামক অপরপক্ষে সুন্দর সনেটের উল্লেখ করা যাইতে পারে। যদিও কোন কোন ফরাসী কবির রচিত সনেটে নবম দশম চরণ মিত্রাক্ষর পয়ারের আকারপ্রাপ্ত, কিন্তু দশম চরণে ভাবের ছেদ কোথাও দেখি নাই।'[১৪] প্রিয়নাথ সেনের এই মন্তব্যটি মোটেই অসঙ্গত নয়। মনে হয় প্রমথ চৌধুরীর সনেটের নবম, দশম চরণের মিত্রাক্ষর পয়ারটি অনিবার্য কারণেই এসেছে—এখানে অনেক ক্ষেত্রেই (সর্বত্র নয়) ভাবের ছেদ পড়েছে। এতে সনেটের সুবলয়িত ভাববৃত্তের মধ্যে দ্বিধার সৃষ্টি হয়। তবে ফরাসী সনেট-লেখকদের কেউ কেউ (বিশেষত সাঙ্কেতিক ধারার কবিদের কেউ কেউ) প্রচলিত বিধি অতিক্রম ক'রে যেমন নূতন নূতন রূপবৈচিত্র্যের সৃষ্টি করেছেন, প্রমথ চৌধুরীর সনেটে তা নেই। 'সনেট-পঞ্চাশৎ'-এর 'বসন্তসেনা' সনেটটিতে আসলে সনেটের কোন মিলক্রমই অনুসরণ করেননি—সনেট না হ'য়ে কবিতাটি একজাতীয় চতুর্দশপদী কবিতা হয়েছে।

'সনেট-পঞ্চাশৎ'-এর সনেটগুলির তুলনায় 'পদ-চারণ'-এর সনেটের দীপ্তি কম—কবিতা হিসাবেও অপেক্ষাকৃত দুর্বলতা পরিস্ফুট। কিন্তু বাংলা সনেটের ইতিহাসে তো বটেই ব্যঙ্গ-কবিতার ক্ষেত্রেও প্রমথ চৌধুরীর কবিতাগুলি নূতন সুর সংযোজিত করেছে। বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে মাধুর্যের তুলনায় অম্ল-মধুর শ্লেষোক্তি ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক সুর অনেকখানি গৌণ। সে ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে প্রমথ চৌধুরীর কবিতা নূতন আস্বাদনবাহী। 'কাঁঠালী চাঁপা'—সনেটটি উদ্ধার ক'রে মোহিতলাল প্রমথ চৌধুরীর সনেট সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, 'ইহার ভাববস্তু যে কাব্যবস্তু নয়, তাহা কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না; তীক্ষ্ণ ও মার্জিতবুদ্ধির যে বিজ্ঞতা, তাহাই নিখুঁত দৃষ্টান্ত সহযোগে একটি সদুপদেশকে হৃদয়গ্রাহী করিয়া তুলিয়াছে। এজন্য ইহার ভাষাও কবি-ভাষা নয়; বাক্‌পটুতাই ইহার প্রধান গুণ।...অতএব এ কবিতার এই গঠন ভাববস্তুর অতিশয় উপযোগী বটে, এবং সেইজন্য রচনাটিও সার্থক রচনা হইয়াছে। কিন্তু কি ভাবে, কি ভাষায়, কি ছন্দসঙ্গীতে এই রচনা যে আদৌ সনেট-পদবাচ্য নয়, আশা করি এতখানি আলোচনার পর তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে না। তথাপি, মূল সনেটের বিকৃতি হইলেও, ইহারও একটি নিজস্ব প্রকৃতি আছে, অতএব সনেট না হইলেও ইহা এক শ্রেণীর চতুর্দশপদী

বটে।'[১৫] মোহিতলালের বক্তব্যটির মূল্য স্বীকার ক'রেও বলা যায় যে ইংরেজী সনেটের সংস্কারই সমালোচকের মনে সক্রিয় ছিল। বাক্-পটুতা ও চিন্তার চমককেও ফরাসী সাহিত্যিকেরা সনেটের বিষয় বস্তু ক'রে তুলেছেন—ফরাসী-সাহিত্যের সুনিপুণ জহুরীরা একে সনেট বলতে আপত্তি করেননি। ফরাসী কবিতার বৈশিষ্ট্যগুলিই সনেটে সঞ্চারিত হয়েছে। শেক্সপীয়র, মিল্টন, ওয়ার্ডসওয়ার্থ বা রসেটির সনেটের সঙ্গে ফরাসী সনেটের তুলনা ক'রে লাভ নেই। কারণটি চৌধুরী মহাশয় সুন্দর ক'রে বলেছেন, 'ফরাসী জাতির ভিতর কোনো শেক্সপীয়র জন্মায়নি ও জন্মাতে পারে না। পাগল, প্রেমিক ও কবি যে এক জাত, এ কথা কোন ফরাসী কবি বলেনও নি, স্বীকারও করেননি। কেননা তাঁরা তাঁদের সংসারজ্ঞান ও তাঁদের শিক্ষিত ও মার্জিত বুদ্ধির উপরেই চিরকাল নির্ভর ক'রে এসেছেন। ফরাসী জাতির দেহে কিংবা মনে কোন ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় নেই এবং তাঁরা কস্মিনকালেও তাঁদের মগ্নচৈতন্যের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেননি। এই কারণে ফরাসী কবিতা ইংরেজী কবিতার তুলনায় আবেগহীন ও কল্পনার ঐশ্বর্যে বঞ্চিত, সে কবিতা মানবমনের গভীরতম দেশ স্পর্শ করে না।'[১৬] এই মন্তব্যটির যাথার্থ্য স্বীকার ক'রে নিলে প্রমথ চৌধুরীর সনেটের রসাস্বাদন সহজ হবে। একাল পর্যন্তও তিনিই একমাত্র বাঙালী লেখক যিনি ফরাসী কবির অনুসরণে সনেট লিখতে সাহসী হয়েছিলেন। কবিতার ক্ষেত্রে তাঁর কোন পূর্ণতর স্বাক্ষর নেই। তাঁর সঙ্কীর্ণপরিধি কাব্যজীবন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

১. দেশ, সাহিত্য-সংখ্যা, ১৩৬৩।
২. ৬. ১০.৪১-এ অমিয় চক্রবর্তীর কাছে লিখিত পত্র, দেশ, সাহিত্য-সংখ্যা, ১৩৬৩।
৩. সনেট-পঞ্চাশৎ, প্রিয়নাথ সেন, সাহিত্য, শ্রাবণ ১৩২০।
৪. সনেট কেন চতুর্দশপদী? নানাকথা।
৫. অমিয় চক্রবর্তীর কাছে লিখিত পত্র, দেশ, সাহিত্য-সংখ্যা, ১৩৬৩।

৬. ফরাসী সাহিত্যের বর্ণপরিচয়, নানাকথা।

৭. চুটকি, বীরবলের হালখাতা।

৮. চিঠিপত্র, পঞ্চম খণ্ড [প্রমথ চৌধুরীর কাছে লিখিত চিঠি]।

৯. 'সনেট হচ্ছে আমার মতে sculpture-ধর্মী—এর ভিতর উদ্দাম flow নেই, যেটুকু গতি আছে তা সংহত ও সংযত।...প্রতিমাধর্মী।'—অমিয় চক্রবর্তীর কাছে লিখিত চিঠি।

১০. 'সনেট-সপ্তক'-এর ভূমিকা, পদ-চারণ।

১১. বর্ষার কথা, বীরবলের হালখাতা।

১২. Lyric forms from France, Helen Louise Cohen, Page 36.

১৩. 'The actual impetus to the great outbreak of Sonnet writing in England during the last twenty years of the sixteenth century seems to have come from France.'—The English Sonnet, Enid Hamer.

১৪. সনেট-পঞ্চাশৎ, প্রিয়নাথ সেন, সাহিত্য, শ্রাবণ, ১৩২০।

১৫. বাংলা কবিতার ছন্দ, মোহিতলাল মজুমদার।

১৬. ফরাসী সাহিত্যের বর্ণপরিচয়, নানাকথা।

বাংলা সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরীর নিঃসঙ্গ একাকিত্ব বিস্ময়কর। এর প্রধান কারণ তাঁর রূপচেতনা ও রীতিকর্ষণার অভিনবত্ব এবং মানসিক অনন্যতা। আগেববিরল বুদ্ধিমার্জিত বাগ্‌বৈদগ্ধ্য, শ্লেষাত্মক ক্ষুরধার মন্তব্য ও এপিগ্রামের সূক্ষ্মচূড়-তীক্ষ্ণতা বাংলাসাহিত্যে একটি নূতন সুর সংযোজিত করেছে। অনন্য-মানস প্রমথ চৌধুরীর দৃষ্টিকোণের মৌলিকত্ব ও স্টাইলের নবীনত্ব তাঁর প্রবন্ধ, ছোটগল্প ও কবিতা—তিনটি ক্ষেত্রেই লক্ষণীয়। তাঁর কবিতার ক্ষেত্র স্বল্প-প্রসারিত, কিন্তু সেখানেও এই বৈশিষ্ট্যগুলি সুপ্রকট। তাঁর সুকর্ষিত প্রবন্ধগুলি সমগ্র রচনার বিস্তৃত অংশ জুড়ে আছে। প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যিক প্রভাব প্রধানত তাঁর প্রবন্ধগুলির ওপরেই নির্ভরশীল। কিন্তু তাঁর গদ্যরচনার সামগ্রিক মূল্যবিচারের পক্ষে তাঁর প্রবন্ধগুলি অনেক খানি হ'লেও সবটুকু নয়। প্রবন্ধ ও ছোটগল্প—এই দু'টি মিলিয়েই তাঁর গদ্যের সমগ্র রূপ। এই দিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে যে তাঁর প্রবন্ধ ও কথাসাহিত্যের মধ্যে এমন এক অবিচ্ছিন্ন ও অদ্বয়-সম্পর্ক আছে, যা অন্যত্র দুর্লভ। প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধ বিচার করতে হ'লে তাঁর গল্পগুলির কথা মনে রাখা দরকার, অপর পক্ষে গল্পগুলি বিচার করতে হ'লেও প্রবন্ধের সঙ্গে মিলিয়েই করতে হবে। কারণ প্রমথ চৌধুরীই সর্বপ্রথম গল্পলেখক যিনি প্রবন্ধ ও গল্পের ব্যবধান অনেকখানি ঘুচিয়ে দিয়েছেন—সাহিত্যের এই দু'টি প্রকরণের ভাসুর-ভাদ্রবউ সম্পর্ক মানেননি। তাঁর প্রবন্ধ ও ছোটগল্প তাই পরস্পরের পরিপূরক এবং সবটা নিয়েই প্রমথ চৌধুরীর গদ্য। তাঁর কথাসাহিত্য-আলোচনার এইটিই হ'ল মূল সত্য।

গল্পলেখক প্রমথ চৌধুরী ছোটগল্পের প্রচলিত রীতি-নীতিতে অগ্রাহ্য করেছেন। ছোটগল্পের নাটকীয়তা এখানে আছে, কিন্তু তার কাহিনী-অংশের দ্রুতসঞ্চারী প্রবহমানতা পদে পদে বাধা পেয়েছে। মূল গল্পের চেয়ে তার সুদীর্ঘ ভূমিকার দিকেই যেন গল্পকারের প্রধান আকর্ষণ। ভূমিকার বিতর্কবহুল উপলখণ্ড পার হ'য়ে সূত্রশরীরী গল্পাংশটুকুর পরিচয় পাওয়া যায়। আবার সেই ক্ষীণকায় গল্পের মধ্যেও একটি বাধাহীন স্বচ্ছন্দ প্রবাহ নেই। গল্পের মাঝে মাঝে নানা তর্ক-বিতর্ক ও বিচিত্রপ্রসঙ্গ এসে তার গতিরস খণ্ডিত ক'রে দিয়েছে। গল্পকার যেন তাঁর গল্পরসের প্রতি নির্মম, অনেক নিটোল গল্পাংশও আকস্মিক বিচার-বিতর্কের মন্তব্য তীক্ষ্ণ অসিফলকের আঘাতে টুকরো টুকরো হ'য়ে ঝরে

পড়েছে। তাই প্রচলিত ছোটগল্পের যে অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা থাকে, প্রমথ চৌধুরীর ছোটগল্পে তা অনুপস্থিত। এই কারণেই তাঁর গল্পগুলি মিশ্রধর্মী—গল্পরসের সঙ্গে বিচার-বিতর্ক ও সমালোচনাত্মক অংশগুলির অবাধ মিশ্রণ তাঁর ছোটগল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। প্রমথ চৌধুরীর কথাসাহিত্যের জগতে প্রবেশ করলে গল্পকারের একটি আপাতবিরোধী বিচিত্র ভূমিকা চোখে পড়ে—সে এক দ্বৈত ব্যক্তিত্বের রহস্য। একদিকে অপূর্ব কথারসিকতা, গল্প জমিয়ে তোলার আশ্চর্য গুণ,—কিন্তু ঠিক তার সঙ্গে সঙ্গেই সমালোচকের সদাজাগ্রত বিচারবুদ্ধিও আছে—এই দ্বিতীয় সত্তাটি অত্যন্ত চতুর সুযোগসন্ধানী—সামান্যতম সুযোগটুকু নিয়ে সে তার তর্কজাল বিস্তার ক'রে চলে।

প্রমথ চৌধুরীর ছোটগল্পগুলি প্রবন্ধ ও ছোটগল্পের এক বিচিত্র বর্ণ-সংকর। তাঁর ছোটগল্পের পাঠকের পক্ষে তাঁর প্রবন্ধের কথা মনে হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক—তার কারণ প্রবন্ধধর্মী সমালোচনাত্মক অংশের অনেকখানি ছোটগল্পের এলাকাভুক্ত। গল্প ও প্রবন্ধের প্রচলিত ব্যবধান ভেঙে গল্প থেকে প্রবন্ধের সীমায় বিচরণ করা অথবা প্রবন্ধ থেকে গল্পের সীমায় ফিরে আসা তাঁর পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক। গল্পের মধ্যে আর্ট, জীবন, সমাজ, তৎকালীন রাজনীতি, নরনারীর সম্পর্ক প্রভৃতি নানা বিষয়ে তিনি যে সমস্ত সরস মন্তব্য করেছেন, তার মূল্য কম নয়। অনেক সময় তিনি তাঁর নিজের রচনারই বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে বসেছেন। 'ঘোষালের হেঁয়ালী' গল্পের সখীরাণীর মুখ দিয়ে চৌধুরী মহাশয় তাঁর গল্পের বৈশিষ্ট্যের কথাই যেন সরসভাবে বলেছেন, 'তার দু'আনা গল্প, আর পড়ে-পাওয়া চোদ্দ আনা তর্ক ; অর্থাৎ বাক্যি।' 'গল্পলেখা' গল্পটিতে স্বামী-স্ত্রীর কথোপকথনের মধ্যে সুকৌশলে চৌধুরী মহাশয় তাঁর গল্পের বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন।

'এই ঘণ্টাখানেক ধ'রে বকর বকর ক'রে আমাকে একটা গল্প লিখতে দিলে না।—

—আমাদের এই কথোপকথন লিখে পাঠিয়ে দেও, সেইটেই হবে—

—গল্প না প্রবন্ধ ?

—একধারে ও দুই-ই।'

এই সামান্য কথোপকথন অংশে যেমন গল্প-প্রবন্ধের অর্ধনারীশ্বর বৈশিষ্ট্যের কথা আলোচিত হয়েছে, তেমনি প্রমথ চৌধুরীর গল্পগুলি যে প্রধানত সংলাপ-নির্ভর তার পরিচয়ও পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধিদীপ্ত শ্লেষাত্মক

সংলাপই প্রমথ চৌধুরীর গল্পগুলির প্রাণ। কাহিনী-বিন্যাসের দিকে ও গল্পরসের দিকে তাঁর আকর্ষণ ছিল কম, বিবৃতির মাধ্যমে কথার জাল বয়ন করার দিকেও তাঁর আগ্রহ খুব বেশী ছিল না—তাই অনিবার্যভাবেই তাঁর গল্পগুলি সংলাপ-বাহন হ'য়ে উঠেছে। তাঁর প্রায় সব গল্পেই তিনি নিজে উপস্থিত হ'য়ে হয় দ্রষ্টা না হয় ব্যাখ্যাতার স্থান অধিকার করেছেন, কখনও কখনও নিজে মুখেও গল্প বলেছেন--তাই তাঁর গল্পগুলিতে উত্তম পুরুষ একবচনের ব্যবহার লক্ষণীয়।

প্রমথ চৌধুরীর গল্পগুলির বিষয়বস্তু অসাধারণ। আমাদের বর্তমান কালের পরিচিত পৃথিবী থেকে এই জগৎ বহুদূরে। এখানে প্রবন্ধকার ও গল্পকার প্রমথ চৌধুরী দুই স্বতন্ত্র জগতের অধিবাসী। তাঁর প্রবন্ধের মনন ও মেজাজ আধুনিক কালের, 'সবুজপত্র' পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে তিনি আধুনিক চিন্তাবৈচিত্র্যের সারথ্য করেছেন। নব্যতন্ত্রী লেখকদের তিনি গুরুস্থানীয়। কিন্তু তাঁর গল্পগুলির অধিকাংশই একালের নয়, এক পুরাতন পৃথিবীর রোম্যান্সকেই যেন তিনি এক-একটি উদ্ভট ও বিচিত্র সংস্থানের কেন্দ্রে দাঁড় করিয়েছেন। বিষয়বস্তুতে পুরাতন পৃথিবীর গন্ধ, কিন্তু রচনারীতিতে আধুনিকতার আস্বাদন—প্রমথ চৌধুরীর গল্পগুলি এই বিপরীতের আন্দোলনে বিস্ময়কর। সমালোচক যথার্থ-ই বলেছেন, 'Though provokingly modern in his essays, his stories are of old-world romance of dangerous living and abounding animal spirits,'[১] একটি অসাধারণ আবহ ও উদ্ভট চরিত্র ছাড়া প্রমথ চৌধুরীর গল্প এক পাও চলতে চায় না। কথা-সাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরীর জগৎ শরৎচন্দ্রের সম্পূর্ণ বিপরীত। শরৎচন্দ্রের পৃথিবী অতিপরিচিত বাংলাদেশের নিম্ন-মধ্যবিত্তের সমাজ। কিন্তু প্রমথ চৌধুরীর গল্পে বিগত যুগের ক্ষীণ রেশটুকু যেন মিলিয়ে যায়নি, অষ্টাদশ শতকীয় রাজসভার বৈদগ্ধ্য স্মৃতি-ধূপের মতো এখনো ঘুরে বেড়ায়। চরিত্রগুলিও এক-একটি টাইপ—কোথায়ও গল্পপিপাসু জমিদার, কোথায়ও মধুর-মিথ্যাভাষী-বিদূষক, কোথায়ও অদ্ভুত চরিত্রের মাতাল সাহেব, কোথায়ও বা প্রণয়রসিক প্রেতাত্মা, আবার কোথায়ও বা অমানুষিক সৌন্দর্যময়ী পাথরে খোদাই করা এক একটি অসাধারণ নারীমূর্তি। প্রমথ চৌধুরীর চরিত্রগুলি যেন বিচিত্রবর্ণের শোভাযাত্রা। তাঁর গল্পগুলি জীবনরহস্যের নিগূঢ় সত্যকে উদ্ভাসিত করে না, শুধু বিস্ময়ের একটি আঘাতে সচকিত ক'রে তোলে।

কিন্তু কী অপূর্ব কর্ম-নিষ্ঠা! যেন ঘন-সংহত স্ফটিকবিন্দুর ওপরে একটি পরিচ্ছন্ন মানস-আকাশের উজ্জ্বল প্রতিফলন!

দুই

প্রমথ চৌধুরীর গল্পগুলি আলোচনা করতে হ'লে এর রচনাকালের কথা মনে রাখতে হবে। প্রাক্-সবুজপত্র যুগে প্রবন্ধকার ও কবি হিসাবেই তাঁর পরিচয় ছিল। অবশ্য অনুবাদ-গল্প ও দু'একটি মৌলিক গল্প তিনি লিখেছিলেন। এই অনুবাদ-গল্পটি সম্পর্কে তিনি তাঁর আত্মকথায় বলেছেন, 'এরপর সুরেশ সমাজপতি কর্তৃক সম্পাদিত 'সাহিত্য' পত্রিকায় Prosper Mérimée-র 'Etruscan Vase' নামক একটি গল্প তর্জমা ক'রে 'ফুলদানি' নাম দিয়ে প্রকাশ করি। সেটি প'ড়ে রবীন্দ্রনাথ 'সাধনা'য় আমাকে আক্রমণ করেন। দুটি কারণে, প্রথমত 'ফুলদানি'র মত গল্প বঙ্গসাহিত্যের অন্তর্ভূক্ত করা অনুচিত ব'লে; দ্বিতীয়ত, পাকা ফরাসী লেখকের লেখা কাঁচা বাংলা লেখকের অনুবাদে শ্রীভ্রষ্ট করা হয়েছে বলে। আমি শেষোক্ত আপত্তি গ্রাহ্য করি। কিন্তু এ জাতীয় গল্প যে বঙ্গসাহিত্যে চলতে পারে না, সে কথা মানিনি। ···সাহিত্যিক শুচিবাই প্রথম থেকেই আমার ধাতে ছিল না। এবং 'প্যুরিটানিজম'কে আমি কোনকালেই একটা গুণের মধ্যে গণ্য করিনি।'[২] চৌধুরী মহাশয়ের এই স্বীকৃতি থেকে দু'টি বিষয় খুব ভালভাবে জানা যায়; প্রথমত, ফরাসী গল্পের প্রতি তাঁর আকর্ষণ, দ্বিতীয়ত, একটি সংস্কারমুক্ত উদার দৃষ্টিভঙ্গি। প্রমথ চৌধুরী প্রথম থেকেই সংস্কারমুক্ত দৃষ্টির অধিকারী ছিলেন, কিন্তু তার জন্য রুচিবোধ ও মানসিক আভিজাত্য হারাননি। Prosper Mérimée-র গল্পের প্রতি আকর্ষণও তার বৈশিষ্ট্যকেই নির্দেশ করেছে। এরপর তিনি তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'কার্মেন' অনুবাদ সুরু করেছিলেন, কিন্তু তিনি শেষ ক'রে উঠতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথের সমালোচনার পরও একই লেখকের অন্য গল্প অনুবাদের মধ্যে একটি প্রচ্ছন্ন প্রতিবাদ ছিল। তিনি নিজেই লিখেছেন, 'কার্মেন অনুবাদ করার কারণ, তার বিষয়বস্তু 'ফুলদানি'র চেয়ে ঢের বেশী অসামাজিক।'[৩] চৌধুরী মহাশয় নিজে যে কারণ নির্দেশ করেছেন, তা ছাড়াও সম্ভবত Mérimée-ভক্তির অন্য কারণও ছিল। একালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফরাসী কথা-সাহিত্যিক স্তাঁদেল তাঁকে আকর্ষণ

করতে পারেনি, অথচ স্তাঁদেল-শিষ্য মেরিমেঁ তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। তার প্রথম কারণ, শেষোক্ত লেখকের অসাধারণ মাত্রাজ্ঞান ও সংযম—তাঁর গল্পের পক্ষে যেটুকু ঘটনা বা বর্ণনার প্রয়োজন, সেইটুকুই তিনি দিতেন, তদতিরিক্ত নয়। স্তাঁদেল-এর গল্পের বয়নকৌশল তেমন দৃঢ়-সংহত নয়, ঘটনা ও চরিত্রের আতিশয্যও আছে। অপর পক্ষে মেরিমেঁ-র গল্প যেমন ঘনীভূত, তেমনি আতিশয্য-বিবর্জিত। তাই তিনি মাত্র কয়েক পৃষ্ঠার মধ্যে 'মাটিয়ো ফ্যালকন' [Mateo Falcon]-এর মত গল্প এবং মাত্র পঞ্চাশ-ষাট পৃষ্ঠার মধ্যে 'কার্মেন' [Carmen] এর-মত উপন্যাস লিখতে পেরেছিলেন। দ্বিতীয়ত, প্লট নির্বাচনের মধ্যেও এমন একটি বৈশিষ্ট্য ছিল, যা গল্পলেখক প্রমথ চৌধুরীকে সহজেই মেরিমেঁ-ভক্ত ক'রে তুলেছিল। পরিচিত জগৎ থেকে দূরে এর পটভূমিকা—চরিত্রগুলিও বিচিত্র ধরণের।[৪] মেরিমেঁর গল্পগুলির মধ্যে নিপুণ পর্যবেক্ষণ-শক্তি, হাস্যরস ও 'ট্র্যাজিক আয়রনি'-র অসাধারণ দক্ষতা লক্ষ্য করা যায়। 'Etruscan Vase' গল্পটি 'ট্র্যাজিক আয়রনি' স্বষ্টির একটি বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত। তরুণ প্রমথ চৌধুরী উনবিংশ শতাব্দীর এই ফরাসী শিল্পীর (১৮০৩-'৭০] মানস জগতে অতি সহজেই প্রবেশাধিকার পেয়েছিলেন।

প্রমথ চৌধুরীর প্রথম মৌলিক গল্প 'প্রবাস-স্মৃতি' 'সবুজ পত্র' প্রকাশের প্রায় পনের ষোল বছর আগে 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।[৫] প্রথম যুগের মৌলিক ও অনুবাদ-গল্পের মধ্যে যত অপরিণতির চিহ্নই থাকুক না কেন, গল্পগুলির মধ্যে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার ইঙ্গিত পূর্ণস্ফুট। 'প্রবাস-স্মৃতি' গল্পটি সমাস-বহুল সাধুভাষায় রচিত হ'লেও এর একটি নূতন আস্বাদন আছে। নব-বসন্ত সমাগমে অক্সফোর্ড পার্কের সুরা-মদির পরিবেশ, ইংরেজ-দম্পতির ভাস্কর্য-সুঠাম রূপচিত্র ও সর্বশেষে অ্যান্টি-ক্লাইম্যাক্সের অতর্কিত আঘাত লেখকের পরিণত বয়সের গল্পগুলির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। অপরিচিত বৈদেশিক পরিবেশ, ভাস্কর্যধর্মী রূপ-রচনা, লঘুস্পর্শ কৌতুকরস ও সবশেষে গল্প-সমাপ্তির মুখে একটি আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত ধাক্কা—প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য প্রমথ চৌধুরীর গল্পের প্রকৃতি-ধর্ম। ক্রিয়াপদ সাধুভাষার অনুগত হ'লেও এর মধ্যে কথ্যভাষার মেজাজ লক্ষণীয়। জড়তাবিহীন, পরিচ্ছন্ন ও স্ফটিকস্বচ্ছ এর গদ্যরীতি। মোটকথা প্রাক্-সবুজপত্র যুগের মৌলিক ও অনুবাদ-গল্প, গল্পরচয়িতা প্রমথ চৌধুরীর যথার্থ ভূমিকা।

সবুজ-পত্রের যুগ প্রমথ চৌধুরীর গল্প রচনায় পরিণত যুগ। দীর্ঘকাল পরে তিনি গল্প রচনার জন্য কলম ধরেছিলেন। ভাষার স্পষ্টতা ও পরিচ্ছন্নতায় পুষ্পগন্ধের আবেশ নেই, ভাষা ইস্পাতের মত কঠিন ও দীপ্ত। 'প্রবাস-স্মৃতি'-র ইংরেজ-তরুণী-রূপমুগ্ধতার বর্ণনা দিতে গিয়ে লেখক বলেছেন, 'শেষকালে আমরা দুই উন্মত্ত জ্যোতির্বিদের মত নীলকৃষ্ণ-ধূসর-পিঙ্গল-পাটল চক্ষুতারকার জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর মধ্যে স্নিগ্ধ তীব্র রুষ্ট তুষ্ট স্থির চঞ্চল বিচিত্র রশ্মিজালে একেবারে নিরুদ্দেশ হইয়া গেলাম।' দীর্ঘকাল পরে সবুজপত্রের যুগে যখন তিনি গল্প লিখতে সুরু করলেন তখন রবীন্দ্রনাথ তাঁর অজাত গল্প সম্পর্কে যা মন্তব্য করেছিলেন তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য, 'তুমি একবার কোমর বেঁধে গল্পে লাগলে আমি ত খুসি হই। আমার বিশ্বাস তুমি পারবে —অবশ্য, সম্পূর্ণ তোমার নিজের ধাঁচার একটি জিনিস হবে—অর্থাৎ, ইস্পাতে গড়া মূর্তি হবে—ঝক্‌ঝক্ করবে অথচ কঠিন হবে—কড়া আগুনে গালাই করা ঢালাই করা জিনিস।'[৩] 'প্রবাস-স্মৃতি' গল্পটির মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্যটির প্রমাণ পাওয়া যায়। রচনার স্পষ্টতা, বুদ্ধির নির্ধূম ঔজ্জ্বল্য, বাহুল্যবর্জিত আবেগ-বিরল রীতি ও কথকতার অনন্যসাধারণ চাতুরী তাঁর প্রথম গল্পেই দেখা যায়। গল্পের ক্ষেত্রেও তিনি পরিণত মন নিয়েই কলম ধরেছিলেন।

তিন

'ছোট গল্প,' 'গল্পলেখা,' 'ফরমায়েশি গল্প', 'একটি সাদা গল্প'—এই গল্পগুলিতে লেখক ছোটগল্পের আর্ট সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। 'ছোট গল্প' গল্পটির সুদীর্ঘ ভূমিকা বাগ্‌যুদ্ধে ভারাক্রান্ত হ'য়ে উঠেছে। ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি-বিচার দিয়ে গল্পটি সুরু করা হয়েছে। এই তর্ক-কণ্টকিত সুদীর্ঘ সংলাপ-জাল অতিক্রম ক'রে ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সঠিক কোন মীমাংসায় উপস্থিত হওয়া যায় না—কারণ মীমাংসা বড় নয়, তর্কটাই বড়। প্রফেসারের গল্পটিকে ছোটগল্পের উদাহরণ হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। গল্পটিতে একটি আশাহত প্রণয়স্বপ্নের ওপর আদর্শবাদের আবরণ দেওয়া হয়েছে। গল্পের শেষে আবার তর্ক-বিতর্কের সৃষ্টির ফলে প্রেমের গৌরবটুকু ধূলিসাৎ হয়েছে। বক্তার জীবনের অদ্ভুত পরিহাসের ফলে যে সুন্দর গল্পটি গ'ড়ে উঠেছিল, গল্পের শেষে তর্ক-বিতর্কের পুনরাবির্ভাবের ফলে তার ওপরে রূঢ় আঘাত পড়েছে।

কিন্তু সংলাপের তীক্ষ্ণতা ও তর্কের জটিলতার মধ্যে ছোটগল্প সম্পর্কে দু' একটি মিতবাক্ মন্তব্য লক্ষণীয়। গল্পটির মধ্যেই পরিহাসের চাপা সুর আছে, অবশ্য সে পরিহাসটি নিয়তির। নিয়তিকৃত সেই ব্যঙ্গটিকেই প্রাত্যহিক জীবনের বক্র-পরিহাসের বিষয় ক'রে তোলা হয়েছে। প্রফেসারের জীবনে রোম্যান্সের কোন সম্ভাবনা আছে কিনা,—এ বিষয় বিচারযোগ্য ব'লে বিবেচিত হয়নি। ট্র্যাজেডি, কমেডি ও ট্র্যাজি-কমেডির নানা বিতর্কজাল সৃষ্টি ক'রে গল্পটির রস নষ্ট করা হয়েছে—তার বদলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সমাধানহীন বাগ্‌যুদ্ধের কুরুক্ষেত্র। 'গল্পলেখা' গল্পটি সংলাপ-সর্বস্ব, অবশ্য সংলাপের সূত্রে গাঁথা একটি গল্পের রেখাও এখানে আছে। ছোটগল্পের আঙ্গিক-সম্পর্কিত নানা আলোচনাও এখানে আছে। রূপকথার সঙ্গে গল্পের সম্বন্ধকে সূচ্যগ্র মন্তব্যের সাহায্যে উদ্‌ঘাটিত করা হয়েছে, 'রূপকথার অসম্ভবকে আমরা ষোল আনা অসম্ভব ব'লেই জানি, আর নভেল-নাটকের অসম্ভবকে আমরা সম্ভব ব'লে মানি।' 'ফরমায়েশি গল্পে' শিল্পবোধহীন বাস্তববাদীর সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিতে দুর্গেশ-নন্দিনীর মত প্রণয়কাহিনীর লেখক কিভাবে বিব্রত হতেন তার একটি কৌতুক-রসোচ্ছল কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। গল্পরসকে পদে পদে খণ্ডিত ক'রে, পণ্ডিত মশায়, রায় মশায়, উজ্জ্বলনীলমণি ও গল্পকথক ঘোষালের তর্ক-বিতর্কের জোয়ার চলেছে। নানা বাধাবিপত্তি ও তর্ক-বিতর্কের ভেতর দিয়ে গল্পটি কতদূর এগিয়ে যেতে পারে, 'ফরমায়েশি গল্প' তার একটি সুন্দর উদাহরণ। কতকগুলি টাইপ-চরিত্র গল্পটিকে উপভোগ্য ক'রে তুলেছে। নিছক কৌতুকরস পরিবেশন করাই লেখকের উদ্দেশ্য—গল্পের শেষে রায় মশাইয়ের গৃহিনী-আনুগত্য ও আকস্মিক অন্তর্ধান মৃদু কৌতুকহাস্যকে উচ্চনাদী হাসিতে পরিণত করেছে।

'একটি সাদা গল্প' গল্পলেখার আর্ট নিয়েই লেখা। ছোটগল্পের শিল্প সম্পর্কে প্রমথ চৌধুরী রীতিমত প্রবন্ধ লেখেননি বটে, কিন্তু কয়েকটি ছোট-গল্পের মধ্যে তিনি তাঁর মনোভাবকে সুস্পষ্টভাবেই ব্যক্ত করেছেন। গল্পটি যথার্থ-ই একটি সাদা গল্প ছাড়া আর কিছু নয়, কিন্তু একথাও যথার্থ যে, গল্পলেখার আর্ট নিয়ে যে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল, তা-ই এ গল্পটির জন্মলগ্ন। সদানন্দ তাঁর কাহিনী আরম্ভের সঙ্গেই গল্পের ভূমিকা স্বরূপ যে টিপ্পনী করেছেন তা বীরবলী গল্পের বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, 'আমি যে গল্প বলতে যাচ্ছি, তা অতি সাদাসিধে। তার ভিতর কোনো নীতিকথা কিম্বা

ধর্মকথা নেই, কোনো সামাজিক সমস্যা নেই—অতএব তার মীমাংসাও নেই, এমনকি সত্যকথা বলতে গেলে কোনো ঘটনাও নেই।' কোন কিছু প্রতিপাদন করা যেমন তাঁর গল্পের উদ্দেশ্য নয়, তেমনি তাঁর গল্পের মধ্যে তথাকথিত কোন প্লট নেই—পূর্ব-পরিকল্পিত কোন ঘটনা নেই—তর্ক-বিতর্ক ও আলাপ-আলোচনার সূত্র ধ'রে যতটুকু গল্পের রেখা তৈরী হয়, তার বেশী গল্প বলার কোন আগ্রহ নেই। শ্যামলালের বাস্তব-বিমুখ শুষ্ক পুঁথিচর্চাকে এই গল্পে তিনি বিদ্রূপ করেছেন। বাস্তব-জীবনের সমস্যার সঙ্গে যখন সংঘাত হয়েছে, তখন তাঁর পদে পদে পরাজয় ঘটেছে। প্রৌঢ় ক্ষেত্রপতির সঙ্গে যখন শ্যামলালের ষোড়শী কন্যার বিয়ে হ'ল তখনকার মন্তব্যটিই গল্পের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অংশ, 'আমার মনে হ'ল, আমি যেন দু'টি statue-এর বিয়ের অভিনয় দেখছি। বর-কনেতে যে মন্ত্র পড়েছিল, তা প্রথমে আমার কানে ঢোকেনি, তারপর হঠাৎ কানে এল, ক্ষেত্রপতি বলছেন, 'যদস্তু হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব।' এ কথা শোনামাত্র আমি উঠে চলে এলুম। বুঝলুম এ অভিনয় সত্যিকার জীবনের, তবে comedy কি tragedy তা বুঝতে পারলুম না।' গল্পটি যেভাবে আরম্ভ হয়েছিল, ঠিক সেভাবে শেষ হয়নি। শ্যামলালের যত দোষই থাকুক না কেন, কাহিনীটি একটি ভাগ্য- বিড়ম্বনার ইতিহাসে পরিণত হয়েছে। যতটুকু কৌতুকের অবকাশ ছিল, তাও যেন শেষদিকে মন্দীভূত হ'য়ে এসেছে, অথচ ট্র্যাজেডির গাম্ভীর্যও এখানে নেই। জীবনের অম্ল-মধুর পর্যালোচনাই তিনি করেছেন আর ছোটগল্পের মধ্যে আছে একটি নির্মম কঠিন 'আয়রনি'। জীবনের ট্র্যাজেডি এবং কমেডি সুস্পষ্ট-বিভাজ্য বস্তু নয়—এ দুটি ভাবকে স্বতন্ত্রভাবে দেখানোও সম্ভব নয়। একই সঙ্গে ট্র্যাজেডি ও কমেডির সম্ভাবনা জড়িত থাকে। ছোটগল্পের পরিমাণ-সামঞ্জস্য ও ইঙ্গিতময়তা এই গল্পেও আছে, কারণ শ্রীমতী কিভাবে ক্ষেত্রপতির সঙ্গে জীবন-যাপন করেছে, এই বিসদৃশ ও অসমান বয়সের নরনারীর পরবর্তী কালের ইতিহাস কি,—গল্পলোভী পাঠকের দৃষ্টিতে গল্পটির উপসংহার টানলে শুধু ক্লান্তিদায়কই হ'ত না, ছোটগল্পের স্বরূপধর্মটিই ব্যাহত হ'ত। সামান্য একটু হৃদয়াবেগের স্পর্শ পেলেই গল্পটির রূপ বদলে যেত, কিন্তু প্রথম চৌধুরী কবিতার মত গল্পেও লঘু বিষয়কে গুরু করেছেন, এবং গুরুতর বিষয়কে লঘুরূপ দিয়েছেন। এ তাঁর সাহিত্যিক প্রকৃতি।

চার

প্রথম চৌধুরীর কতকগুলি গল্পের মূলরস 'স্যাটায়ার' ও 'প্যারাডক্স'; বিদ্রূপাত্মক আলোচনা ও ব্যঙ্গচিত্র আঁকাই এই জাতীয় গল্পের মূল উদ্দেশ্য। এখানে ছোটগল্পের সমগ্রতা অনেক স্থলেই খর্ব হয়েছে। 'রাম ও শ্যাম' গল্পটিতে বিদ্রূপাত্মক অতি-চিত্রণ (Caricature) উচ্চগ্রামে উঠেছে। রাজনৈতিক জীবনকে কেন্দ্র ক'রে আমাদের দেশপ্রেমিকতা ও ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধিকে তীব্রভাবে বিদ্রূপ করা হয়েছে। গল্পটির শেষাংশে যে মন্তব্য আছে, তাতে লেখকের ব্যঙ্গাত্মক মনোভাবের সুস্পষ্ট কারণ জানা যায়, 'এ গল্প এ দেশে কবে যে স্বরু হয়েছে তা কারও স্মরণ নেই, আর কখনো যে শেষ হবে তারও কোনো আশা নেই। এ গল্প যদি কখনো শেষ হ'ত তা হ'লে ভারতবর্ষের ইতিহাস এ পৃথিবীর সব চাইতে বড় ট্র্যাজেডি হত না।'—গল্পটি আসলে রূপক, সমসাময়িক রাজনৈতিক জীবনের সমালোচনাই যেন এর মূল উদ্দেশ্য হ'য়ে উঠেছে। বাক্-চাতুর্য, শ্লেষের সুচতুর শরক্ষেপ ও তীক্ষ্ণচূড়-এপিগ্রামের অজস্র প্রয়োগ লেখকের মূল উদ্দেশ্যকে মাঝে মাঝে পথভ্রান্ত করেছে। এই শ্রেণীর গল্পকে গল্প না বলে নক্সা বা স্কেচ বলাই অধিকতর সঙ্গত। 'বড়বাবুর বড়দিন' গল্পটিতে পত্নীগতপ্রাণ বড়বাবুর আতিশয্যধর্মী আচরণকে এক বিসদৃশ অবস্থার মধ্যে স্থাপন ক'রে ব্যঙ্গ-কৌতুকের সৃষ্টি করা হয়েছে। বড়বাবুর পত্নীপ্রেমের আতিশয্য ও প্লটরচনার কৌশলই লেখকের হাস্যরস-সৃষ্টির ভিত্তিভূমি। এখানকার অসঙ্গতির মূল কারণ দু'টি—বড়বাবুর চরিত্র ও বিচিত্র সংস্থান (Situation) সৃষ্টি। 'অবনীভূষণের সাধনা ও সিদ্ধি' গল্পটিতে লেখক প্যারাডক্সকেই সমগ্রকাহিনীর কেন্দ্রমূলে স্থাপন করেছেন। অবনীভূষণের সমাজ-হিতৈষণাই ক্রমাগত সৌন্দর্য-সম্ভোগের পথ বেয়ে বনিতা-বিলাসে পরিণত হ'ল—বনিতা-বিলাসের রোগমুক্তি ঘটলে আধ্যাত্মিক-সাধনার সূত্রপাত হ'ল। জীবনের এই পরিবর্তনশীলতা ও বিচিত্রমুখী চলচ্চিত্ততার সঙ্গে তাঁর বন্ধু প্যারীলালের আপাতবিরোধী চরিত্রটির সম্পর্ক দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু প্যারীলাল যতই জীবন্ত প্যারাডক্স হোক না কেন, অবনীভূষণের নিগূঢ় পরিবর্তনগুলির জন্য তার দায়িত্ব খুব বেশী নেই—এইদিক থেকে গল্পটি দোষমুক্ত নয়। তীক্ষ্ণাগ্র সরস মন্তব্য ও প্যারাডক্সের চতুর প্রকাশই গল্পটির প্রাণকেন্দ্র।

'অ্যাডভেঞ্চার—স্থলে,' 'অ্যাডভেঞ্চার—জলে,' 'ভাববার কথা'—এই তিনটি

গল্পের কোনটিই গল্প হ'য়ে ওঠেনি। 'ভাববার কথা' গল্পটি বিচিত্র বাক্‌চাতুর্য ও তর্কজালের সমষ্টি মাত্র—প্রবন্ধধর্মী ও সংলাপসর্বস্ব। দু'টি অ্যাডভেঞ্চার কাহিনীর কোথায় যে অ্যাডভেঞ্চার তা উপলব্ধি করা দুরূহ। অবশ্য সরস মন্তব্য মাঝে মাঝে উপভোগ্য হয়েছে। গল্প না থাকার জন্য কাহিনীর শেষে লেখককে 'মর‍্যাল' টানতে হয়েছে। তিনি কিরণশঙ্কর রায়কে গ্রন্থ উৎসর্গ করতে গিয়ে একটি মূল্যবান আত্মবিশ্লেষণ করেছেন, 'সব ক'টিকে গল্প বলা যায় কিনা, সে বিষয়েও সন্দেহ আছে। তবে এগুলিকে গল্প বলছি এই কারণে যে, এ যুগে গল্প-সাহিত্যের কোন ধরাবাঁধা বিষয়ও নেই, রূপও নেই। একালে প্রবন্ধ হোক, ভ্রমণবৃত্তান্ত হোক, যে লেখার ভিতর মানুষের মনের কিংবা চরিত্রের কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায়, তাই গল্প বলে গ্রাহ্য হয়।'[৭] নিজের গল্প সম্পর্কে চৌধুরী মহাশয়ের এই মন্তব্যটি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। প্রমথ চৌধুরীর গল্পের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য তাঁর 'অদৃষ্ট' গল্পটির মধ্যে পাওয়া যায়। পালবাবুদের বিশাল বাড়ীর বিলুপ্তবৈভব বর্ণনার মধ্যে রোম্যান্স-সৃষ্টির যথেষ্ট অবকাশ ছিল, লেখকের দৃষ্টি সেদিকে মোটেই আকৃষ্ট হয়নি, তিনি বরং অতীত সমৃদ্ধির ক্ষয়িষ্ণু রূপটিকে নিয়ে কৌতুকই করেছেন। প্রাণবন্ধু দাস ও বড়বাবুর কাহিনীটিও তেমন জমে উঠতে পারেনি। হাস্যরসের প্রবাহটি এখানে যেন সহজ ও স্বাভাবিক হ'য়ে উঠতে পারেনি।

প্রমথ চৌধুরীর গল্পগুলির মধ্যে দু'টি চরিত্র সবচেয়ে বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করে—এই দু'টি চরিত্র হ'ল নীল-লোহিত ও ঘোষাল। নীল-লোহিত পর্যায়ের গল্পগুলির মধ্যে মিথ্যাকথার আর্ট চূড়ান্ত সীমায় উঠেছে। অতিরঞ্জিত মিথ্যাভাষণের অদ্বিতীয় শিল্পী নীল-লোহিত। লেখকের মতে নীল-লোহিতের মত আদর্শ কথক আর নেই, 'এ বর্ণনার ওস্তাদী ছিল এই যে, তার ভিতর অসংখ্য ছোট-খাট জিনিস ঢুকে পড়ত। অথচ তার একটিও অপ্রাসঙ্গিক নয়, অনাবশ্যক নয়।' 'নীল-লোহিত' গল্পটি এই পর্যায়ের গল্পগুলির প্রথম, শুধু তাই নয় পরবর্তী গল্পগুলির ভূমিকাও বটে। নীল-লোহিতের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য, তার গল্প বলার প্রারম্ভিক ইতিহাস ও গল্প বলা ছেড়ে দেওয়ার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। দু'টি কাহিনীই সমানভাবে কৌতুককর। নীল-লোহিতের গল্পগুলি 'শোনবার জিনিস, কিন্তু বিশ্বাস করবার জিনিস নয়।' নীল-লোহিতের সব চেয়ে বড় ক্ষমতা ছিল এই যে সম্ভব-অসম্ভব নানাজাতীয় বিষয়কে একই

সঙ্গে জুড়ে দিয়ে অদ্ভুত রসসৃষ্টি করতে পারতেন—কথা তিনি শুধু মুখ দিয়েই বলতেন না—হাত, পা, চোখ যেন একসঙ্গে কথা বলত। তাই নীল-লোহিতের অজস্র মিথ্যাভাষণও সত্য হ'য়ে উঠত। তিনি অপ্রত্যক্ষ, অবাস্তব ঘটনাকে চিত্রময় ক'রে তুলতে পারতেন। নীল-লোহিতের কল্পনাশক্তি ছিল যেমন স্বচ্ছন্দ, তেমনি সুপ্রচুর 'তিনি বাস করতেন কল্পনার জগতে। তাই নীল-লোহিত যা বলতেন, সে সবই হচ্ছে কল্পলোকের সত্যকথা। তাঁর সুখ, তাঁর আনন্দ, সবই ছিল ঐ কল্পনার রাজ্যে অবাধে বিচরণ করায়।'

'নীল-লোহিতের স্বয়ম্বর' গল্পটিতে অসম্ভব অতিরঞ্জন-চিত্রণ চরমে উঠেছে। রাজা ঋষভরঞ্জন রায়ের একমাত্র সন্তান মালশ্রীর স্বয়ম্বর-সভা-বর্ণনায় নীল-লোহিতের গল্পকথকের ভূমিকাটি অনন্যসাধারণ হ'য়ে উঠেছে। প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যের স্বয়ম্বর-সভার যে ব্যঙ্গাত্মক অনুকৃতি এই গল্পটিতে নিপুণ কলা-কৌশলের সঙ্গে বিবৃত হয়েছে তার তুলনা নেই। নীল-লোহিত আদর্শ কথক, তাই তাঁর মুখে হাসি নেই, কিন্তু শ্রোতৃমণ্ডলী সশব্দ হাসিতে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠেছেন। গল্পটি যথার্থই একটি 'roaring farce' 'নীল-লোহিতের আদিপ্রেম' গল্পটি একটি নির্দোষ কৌতুকরসের কাহিনী। নীল-লোহিত নাকি পাঁচ বছর বয়সে প্রেমে পড়েছিলেন এবং এই কাল্পনিক প্রেমকাহিনীটির ওপরে অসম্ভব রোম্যান্সকে চাপিয়ে রীতিমত একটি প্রেমের গল্প গ'ড়ে তোলার চেষ্টা এখানে আছে কিন্তু নীল-লোহিতের এই গল্পটির একটি অতি সামান্য বাস্তব-সূত্র ছিল।[৮] নীল-লোহিত পর্যায়ের গল্পগুলির মধ্যে 'নীল-লোহিতের সৌরাষ্ট্র-লীলা' গল্পটিই শ্রেষ্ঠ। ১৯০৭ -এর ডিসেম্বরে সুরাট কংগ্রেসে যে দক্ষযজ্ঞ ব্যাপার হয়েছিল, তা কংগ্রেসের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা—চরমপন্থী এবং নরমপন্থীদের মধ্যে বিতর্ক, মারামারি, এমন কি শেষ পর্যন্ত জুতো ছোঁড়াছুঁড়ি পর্যন্ত হয়েছিল। সুরাট কংগ্রেসের পাদুকানিক্ষেপ-ব্যাপারটিকে কেন্দ্র ক'রে অতিরঞ্জিত কল্পনার সাহায্যে লেখক একটি অপূর্ব রোম্যান্স সৃষ্টি করেছেন। সুরাট-কংগ্রেসের সুপরিচিত কাহিনী থেকে এক বিচিত্র কাহিনীসূত্র বয়ন করেছেন। সুরাটের নৈশ-অন্ধকার, রহস্যময় অপরিচিত গলিপথ, মধ্যযুগীয় ঐশ্বর্যমণ্ডিত পরিবেশ ও সর্বশেষে সুরাট-সুন্দরীর বিস্ময়কর ব্যক্তিত্ব—একটি রোম্যান্স ঘনিয়ে তুলেছে। চতুর লেখক সুকৌশলে এই অপরিচিত

রোম্যান্সটির সঙ্গে চির-পরিচিত রাজনৈতিক ঘটনাকে যুক্ত করেছেন। সর্বশেষে নূরজাহানের ছবির প্রসঙ্গ টেনে এনে গল্পটির একটি ব্যঞ্জনাময় পরিসমাপ্তি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এই গল্পটি প্রমথ চৌধুরীর ফর্ম-নিষ্ঠা ও সংযত শিল্পসৃষ্টির অন্যতম শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। গল্পটির কেন্দ্র-সংহত ঐক্য সুমসৃণ মুক্তার মত সুডৌল। কথা-গ্রন্থনে কোন শিথিলতা নেই, কোন ফাঁক নেই—এমন কি সুমার্জিত কথাসূত্রের মধ্যে কোনটি অযথা স্থূল নয়। গল্পটির শেষে যে আকস্মিকতার চমক সৃষ্টি করা হয়েছে, তাই এর প্রাণ। নীল-লোহিত মিথ্যাভাষণ ও অতিরঞ্জনের বাদশা—কেউ কোন প্রশ্ন করলে উত্তর তাঁর ওষ্ঠাগ্রে। তাঁর বলার মধ্যে এমন একটি বৈশিষ্ট্য আছে যে শ্রোতারা পর্যন্ত ক্ষণকালের জন্য সত্য-মিথ্যার ভেদটুকু ভুলে গিয়ে তৃষিতের মত তাঁর অসাধারণ কাহিনীর রস পান করে। আপাতবিরোধী কৌতুককর পরিবেশের মধ্যে অদ্ভুত সামঞ্জস্য-স্থাপনের মূলে আছে আত্মপ্রত্যয়বান কথকের প্রতিভা। 'নীল-লোহিতের আদিপ্রেম' গল্পটি তেমন রসোত্তীর্ণ হ'তে পারেনি—এখানে বক্তা তাঁর উদ্ভট-কাহিনীর ফাঁকগুলিকে যথারীতি ভরাট ক'রে তুলতে পারেননি।

পাঁচ

নীল-লোহিতের পরেই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য চরিত্র হচ্ছে ঘোষাল। নীল-লোহিত যেমন অসম্ভব ব্যাপারকেও স্বাভাবিকের মত রূপ দিতে পারতেন, ঘোষালেরও তেমনি কতকগুলি অসাধারণ গুণ ছিল—উপস্থিত বুদ্ধি ও বাক্‌চাতুর্যে তাঁর দক্ষতা কম নয়। বিতর্কের মধ্যে তিনি কখনও বেসামাল হ'য়ে পড়েননি—ঘোরতর বাগ্‌যুদ্ধের মধ্যেও তাঁর উদ্ভাবনী ক্ষমতা লুপ্ত হয়নি। ঘোষাল-চরিত্রটি পরিকল্পনার মধ্যে মধ্যযুগীয় দরবারী পরিবেশের ছাপ সুস্পষ্ট। কথা বেচে খাওয়াই তাঁর পেশা। তিনি মকদমপুরের রায় মশায়ের সান্ধ্য-মজলিশের বেতনভোগী কথক। শিল্পজ্ঞান-বিবর্জিত রায় মহাশয়ের মত অবসরপুষ্ট অপদার্থ জীবকে শুধু কথার সাহায্যে বশে রাখতে হ'লে রীতিমত প্রতিভার প্রয়োজন—'ফরমায়েশি গল্পে' তার প্রমাণ আছে। 'ঘোষালের হেঁয়ালি' গল্পটি যথার্থই হেঁয়ালি। এখানে গল্পের কোন রস নেই। কতগুলি বিচিত্র চরিত্রের নরনারীকে টেনে এনে পার্চামশেলী আলোচনা করা হয়েছে। গল্পটির আত্মসচেতন শ্রোতার

আসন দখল করেছেন লেখক নিজে—তাই গল্পটির শেষের মন্তব্যটিতে এর স্বরূপধর্মের আভাস পাওয়া যায়। 'পুতুলের বিবাহ-বিভ্রাট' গল্পটি জমে উঠতে পারে নি—ঘোষালের কথকতার সেই সম্মোহন-শক্তিও নেই। 'ঘোষালের ত্রিকথা' সঙ্কলনটির মধ্যে সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য গল্প 'বীণাবাই'। গল্পটির মধ্যে একটি গম্ভীর ধ্বনি আছে, যা নিঃসন্দেহে জীবন থেকে উদ্ভূত। সুরপুরের দরবারী পরিবেশ, মার্গসঙ্গীতের সাধন-তীর্থ, 'বিগাঢ়-যৌবনা শ্বেতবসনা, সঙ্গীত-সরস্বতী বীণাবাই—সব কিছু মিলিয়ে মধ্যযুগীয় রোম্যান্স-রঙীন একটি অসাধারণ পশ্চাৎপট। লেখকের রূপদক্ষতা এখানে পরিপূর্ণমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ভাবাবেগ-বর্জিত পরিচ্ছন্ন-কথন স্বচ্ছন্দ ও প্রগাঢ়। গল্পরস যে খুব নিবিড় এমন নয়—কিন্তু রচনারীতির ক্লাসিক্যাল বিশুদ্ধি ফরাসী গল্পকারদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ১৩৪৪-এর 'ভারতবর্ষে' গল্পটি প্রকাশিত হয়। সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায় গল্পটির সপ্রশংস আলোচনা হয়েছিল।[৯] গল্পটির একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। গল্পটি পড়ে মনে হয় যে ঘোষাল শুধু হাস্য-রসিকই নন, তিনি একজন দার্শনিক ও বেদনা-রসিকও বটেন। নীললোহিত কমিক, ঘোষাল সিরিয়ো কমিক—এইখানেই দু'জনের মূল পার্থক্য। সুবিখ্যাত ফরাসী সাহিত্যিক আন্দ্রে মরোয়া বলেছেন, 'The most civiliesd way of being sad is to be humourous,'—ঘোষালচরিত্রের মধ্যে সম্পূর্ণ না হ'লেও এই মন্তব্যের কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়।

নরনারীর সম্পর্ক-বৈচিত্র্য ও প্রেমানুভূতি নিয়ে প্রমথ চৌধুরী কয়েকটি গল্প লিখেছেন। 'ট্রাজেডির সূত্রপাত' গল্পটিতে একজন প্রৌঢ় অধ্যাপকের অতীত জীবনের স্বীকৃতির মাধ্যমে একটি উচ্ছ্বসিত প্রণয়াবেশের বর্ণনা আছে। তথাকথিত শিক্ষা ও সুনিয়ন্ত্রিত জীবনাচরণের বাঁধ ভেঙে কিরূপে প্রবৃত্তির বেগ উদ্দাম হয়ে ওঠে অধ্যাপক তাঁর নিজের জীবন দিয়ে সেই গূঢ় সত্য উপলব্ধি করেছেন। ইংরেজী সাহিত্যের স্বর্ণোজ্জ্বল প্রেমের কবিতা এই প্রণয়োন্মেষটিকে মোহমদির ক'রে তুলেছিল। কিন্তু লেখক এর ছবিকে দীর্ঘ করেননি, বাস্তব জীবনের কঠিন আঘাত দিয়ে তার আকস্মিক পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছেন। প্রেমের যে স্বপ্ন তরুণ ফুলের মতো সরস সতেজ ও বর্ণমদির হ'য়ে উঠেছিল, তাকে তীক্ষ্ণ পরিহাসের নির্মম আঘাতে ধূলিশায়ী করেছেন। এইভাবে ট্র্যাজেডির সম্ভাবনাটুকুকেও বিদ্রূপের রসে ভরে তোলা হয়েছে। 'সহযাত্রী' গল্পটিকে সহজেই ট্র্যাজেডিতে পরিণত করা চলত—কারণ গল্পটির মধ্যে একটি

ট্র্যাজেডির চমৎকার সম্ভবনা ছিল। সিতিকণ্ঠ সিংহ ঠাকুরের বিবাহিত জীবনের ব্যর্থতা, তৃতীয় পক্ষের স্ত্রীর অপরের সঙ্গে পলায়ন ও তার সন্ধানে গেরুয়া প'রে বন্দুক হাতে ক'রে গাড়ীতে গাড়ীতে ঘুরে বেড়ানো—সব কিছুর মধ্যেই ট্র্যাজেডির বীজ ছিল, কিন্তু নায়কচরিত্রের বিচিত্র বেশভুষা, আচার-আচরণ ও ব্যক্তিত্বের আড়ালে তা ঢাকা পড়েছে। আসল কথা, প্রমথ চৌধুরীর প্রেমজীবন সংক্রান্ত গল্পে অবিমিশ্র ট্র্যাজেডির স্থান নেই বললেই হয়। 'সহযাত্রী' গল্পটিকে প্রেম বা দাম্পত্য জীবনের গল্প না ব'লে চরিত্রপ্রধান গল্প বলাই সঙ্গত। 'সম্পাদক ও বন্ধু' গল্পটিতে সম্পাদকের স্বীকারোক্তি থেকে তাঁর নিজের বিবাহ-বিড়ম্বনার কাহিনী শোনা যায়। এখানেও স্পষ্টত কোন ট্র্যাজেডি নেই—লেখক ট্র্যাজেডির মূল উৎসটিকেই প্রচ্ছন্ন রেখেছেন। 'ছোটগল্প' গল্পটিতেও ট্র্যাজেডির সম্ভাবনাকে প্রায় একটি 'কমেডি অব এরর্স' করে তোলা হয়েছে। 'মেরি ক্রিসমাস' গল্পটিতে বিলাত-ফেরত বাঙালী তরুণের বিদেশিনীর প্রতি আকর্ষণকে অম্লমধুর ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্যের মধ্য দিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। বাঙালী তরুণের খেয়ালী-কল্পনা উজ্জ্বল দ্বিপ্রহরে চৌরঙ্গীতে নিতান্ত প্রাত্যহিকতার মধ্যে অতীত-প্রণয়িনীর গ্রীসিয়ান নাক ও ভায়োলেট চোখ আবিষ্কার করেছে। বাঙালী তরুণের বিদেশিনী-প্রীতিকে বক্রদৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করা হ'লেও গল্পটির শেষের দিকে খানিকটা সংবেদনশীলতার সুর ফুটেছে।

লঘু-চপল ব্যঙ্গের সুর প্রমথ চৌধুরীর অধিকাংশ গল্পেরই প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য। কিন্তু কয়েকটি গল্পে লেখক তাঁর স্বাভাবিক প্রবণতাকে অতিক্রম করেছেন, অবশ্য তাঁর রচনারীতির মুখ্য বৈশিষ্ট্যগুলি সেখানেও অনুপস্থিত নয়। 'দিদিমার গল্প'-এ বনজঙ্গল-সমাচ্ছন্ন শূন্য ভিটের অতীত ইতিহাস বিবৃত হয়েছে। ভৈরবনারায়ণের নৃশংসতমা, মহালক্ষ্মীর স্বামীর পাপকার্যের মৌন সমর্থন, নিষ্ঠুরতা ও পাপাচারণের একটি শ্বাস-রুদ্ধকারী পরিবেশ—গল্পটিকে অসাধারণত্ব দিয়েছে। প্রমথ চৌধুরীর রোম্যান্টিকতা-বিরোধী মন অতীতকে ঘিরে স্বপ্নজাল সৃষ্টি করেনি সত্য, কিন্তু একটি অভিশপ্ত পরিবেশের রেখাচিত্র ফুটেছে। এই শ্রেণীর গল্পের মধ্যে 'আহুতি' গল্পটি শ্রেষ্ঠ। রুদ্রপুরের পরিবেশ বর্ণনার নিপুণ রেখাঙ্কন, সিংহবাহিনীর পাষাণ প্রতিমার মতো রত্নময়ীর ব্যক্তিত্ব-কঠিন আভিজাত্য, কিরীটচন্দ্রের অসহায় আর্তকণ্ঠ—একটি বিলুপ্ত কাহিনীর ভীমকান্তশ্রী অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে। রঙ্গিনীর অন্ধ-সংস্কার ও অলীক সন্দেহ-পরায়ণতা রত্নময়ীর বাক্যহীন নিষ্ঠুর প্রতিহিংসা—তার সঙ্গে প্রকৃতির

ধ্বংসকরালময়ী ঝড় ভূমিকম্প মিলিত হ'য়ে এক আদিম, অসংস্কৃত ও বর্বর পৃথিবীর মারাত্মক ছবি ফুটে উঠেছে। এক আদিম প্রকৃতিসত্তারই যেন দুই রূপ—রত্নময়ী ও রঙ্গিনী। কিন্তু এই জাতীয় গল্পরচনায় রোম্যান্টিক গল্প-লেখকেরা যে শতবর্ণরঞ্জিত আবেগ-ঘন কবিত্বপূর্ণ বর্ণনা দিয়ে থাকেন, প্রমথ চৌধুরী সে পথে অগ্রসর হননি। তাঁর বর্ণনা নিরুত্তাপ, আবেগহীন, কথার মধ্যে কোথায়ও বাষ্পোচ্ছ্বাসের লেশমাত্র নেই। বিশেষত গল্পের প্রথমে পাল্কী-বেহারাদের আচার-আচরণ হাস্যরসের সৃষ্টি করেছে। এই শ্রেণীর গল্পের পরিবেশ ও পটভূমিকার মধ্যে যে একটি রোমাঞ্চিত শিহরণ থাকে, এ গল্পটিতে তা নেই। গল্পের ভূমিকার সঙ্গে মূল গল্পের স্বর্গ-মর্ত্য ব্যবধান। বহুকাল পরে তিনি আবার 'যখ' নামে এই ধরণের আর একটি গল্প লেখেন, অবশ্য সে গল্পটি মূলত ছোটদের জন্য লেখা। 'আহুতি'র সেই অসাধারণত্ব এখানে অনুপস্থিত। 'জুড়ি দৃশ্য' গল্পটির মধ্যে যত ক্যারিকেচারই থাকুক না কেন, গল্পটির শেষে একটি Pathos আছে—জীবনের একটি গভীর সত্য চকিতে উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে, 'মানুষের পক্ষে বেঁচে থাকাও কঠিন, মরাও সহজ নয়।' 'ভূতের গল্প' ও 'ফার্ষ্ট ক্লাশ ভূত'—গল্প দু'টিতে ভূতের প্রসঙ্গ আছে। প্রথম গল্পটিতে ভৌতিক কাহিনীর সুন্দর উপাদান আছে, খানিকটা ভৌতিক পরিবেশও আছে, কিন্তু অতি-প্রাকৃতের হিম-শীতল শিহরণ এখানে নেই। কার্য-কারণ সম্পর্কের এমন একটি ইস্পাত-বন্ধন আছে, যার ফলে অতি-প্রাকৃত-সম্ভব রোমাঞ্চকর অনুভূতি এখানে স্থান পায়নি। অবশ্য অতি-প্রাকৃতের প্রেতায়িত শিহরণ ফুটিয়ে তোলা লেখকের উদ্দেশ্য নয়। গল্পটি যে এঞ্জিনিয়ার সাহেবের কাছে শোনা, তিনি দিন-দুপুরে এই গল্পটি বলেছেন। লেখক সেইজন্যই সম্ভবতই গল্পের প্রথমেই এক আগুন-ঝরানো বেলা এগারোটার বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি গল্পারম্ভেই বলেছেন, 'আমি কখনো ভূত দেখিনি, আর যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা কি যে দেখেছেন বলতে পারেন না। তাঁদের কথা প্রায়ই অস্পষ্ট, তার কারণ ভূত হচ্ছে অন্ধকারের জীব—তার কোনই কাটাছাঁটা রূপ নেই। আমি একটি ভদ্রলোকের মুখে দিন দুপুরে রেলগাড়ীতে যে অদ্ভুত গল্প শুনেছি, তার প্রধান গুণ এই যে, ব্যাপার যা ঘটেছিল, তার একটা স্পষ্ট রূপ আছে।' এই মন্তব্যের ভেতর দিয়েই অসাধারণ বাক্‌নিপুণ লেখক তাঁর গল্পের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করেছেন। যিনি গল্প বলেছেন, তিনি রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পের বক্তার মত অসাধারণ নন। তাঁর একমাত্র

গুণ এই যে তিনি যে কোন পরিমাণে মদ গিলতে পারেন। এঞ্জিনিয়ারের অভিজ্ঞতা-লব্ধ গল্পটি যে নেহাৎ মদের নেশায় সৃষ্ট হয়েছে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। গল্পটির সম্ভাব্য উপাদান দু'টি—প্রথমত, মদের নেশা, দ্বিতীয়ত মিঃ রোজার্সের স্মৃতি-মন্দিরের সম্পর্কিত সংস্কার। ব্লু ভেনাস আর কিছুই নয়, হুইস্কির বোতল!—অদ্ভুত অ্যান্টি-ক্লাইম্যাক্স। নীল-পাথরের ভেনাসের বর্ণনাটি প্রমথ চৌধুরীর বিশিষ্টতার পরিচায়ক। গল্প-কথকের মাদ্রাজের কুলী মেয়েদের প্রতি আসক্তিই যে মদের নেশায় নীল ভেনাসের স্বপ্নে পরিণত হ'য়েছে এ বিষয় সন্দেহ নেই। লেখক তাই বলেছেন, 'সেই সব মাদ্রাজী হেলেন-ক্লিওপেট্রাদের কথা সত্য কিম্বা সাহেবের সুরাস্বপ্ন, তা বুঝতে পারলুম না।'

'ফার্ষ্ট ক্লাশ ভূত' গল্পের ভূতটি আসলে কিছুই নয়। লেখকের মূল উদ্দেশ্য একটি অসঙ্গত ও কৌতুকাবহ ঘটনার ভেতর দিয়ে হাস্যরস সৃষ্টি করা। এখানেও গাঁজার নেশার সুযোগ নেওয়া হয়েছে। ভূতের গল্প হিসেবে গল্পটির মূল্য নেই সত্য, কিন্তু এমন সহজ স্বতস্ফূর্ত ও অনাবিল হাস্যরস প্রমথ চৌধুরীর মত রসস্রষ্টারও বেশী গল্পে নেই। 'যখ', 'ঝোট্টন ও লোট্টন', 'স্বল্প-গল্প', 'প্রগতি রহস্য'—প্রভৃতি ঠিক গল্প বলা সঙ্গত নয়। গল্পের একটি আভাস আছে মাত্র, কিন্তু কাহিনীর কোন সুস্পষ্ট বিন্যাস নেই। এই কারণে তিনি এই শ্রেণীর গল্পকে 'অণুকথা' বলেছেন।[১০] এক সময় এই গল্পগুলি প'ড়ে রবীন্দ্রনাথের চেকভের গল্পের কথা মনে পড়েছিল, 'তোমার ছোট গল্প পড়ে চেকভের ছোট গল্প মনে পড়ল। যা মুখে এসেছে, তাই ব'লে গেছ হাল্‌কা চালে। এতে আলবোলার ধোঁয়ার গন্ধ পাওয়া যায়। এ রকম কিছুই-না লিখতে সাহসের দরকার করে। দেশের লোক সাহিত্যে ভূরিভোজন ভালবাসে—তারা ভাববে ফাঁকি দিয়েছ—কিম্বা ভাববে ঠাট্টা।'[১১]

ছয়

কবিতা ও প্রবন্ধের মত প্রমথ চৌধুরীর ছোট গল্পেরও একটি নিজস্ব আস্বাদন আছে। তাঁর স্বভাবসিদ্ধ বৈঠকী মেজাজের অনিবার্য বাহন হ'য়ে উঠেছে গল্পবলার লঘু-চপল রীতি। প্রমথ চৌধুরী কথক—কিন্তু তাঁর কথা বলার বিশেষ রূপ আছে। অধিকাংশ গল্পেরই গল্পাংশ অপ্রধান—মূল গল্পের চারিপাশে ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত নানা প্রসঙ্গ ও সংক্ষিপ্ত সুচতুর মন্তব্যই তাঁর গল্পগুলির প্রাণ। তাই তাঁর গল্পে গল্পরস গৌণ, আলোচনাই প্রধান। তাঁর বুদ্ধিধর্মী মন

এক অসাধারণ বিশ্লেষণ-ক্ষমতার অধিকারী। তাই তাঁর গল্পে একাধারে তিনি কথক ও ভাষ্যকার। কথক ও ভাষ্যকারের কাজ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র—লেখক যদি যুগপৎ কথক ও ভাষ্যকার হন, তাহ'লে আর যাই হোক না কেন গল্পাংশের দুর্গতি হয়। কথক হয়তো একটি গল্পের ভূমিকা করেছেন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ ভাষ্যকার গল্পের নটে গাছটির মূলোচ্ছেদ করলেন।

গল্প ও উপন্যাস অল্প-বিস্তর সমাজ-ঘনিষ্ঠ। কথাসাহিত্যে লেখকের নিজের কালের পরিচয়টিই মুখ্য হ'য়ে ওঠে। প্রমথ চৌধুরীর গল্পগুলির পটভূমিকা পরিচিত জগতের নয়—পরিচিত জগতকে ছাড়িয়ে এক একটি অদ্ভুত ও অপরিচিত পৃথিবীর আস্বাদন এখানে পাওয়া যায়। তাঁর গল্পগুলি যেমন গল্পের সমভূমি নয়—পরিচিত মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত জীবনের প্রাত্যহিক সমস্যাও তাঁর বক্তব্য নয়। কোথায়ও বাংলাদেশের বাইরে সুরাটের অপরিচিত গলিপথে এক মধ্যযুগীয় পরিবেশে অসাধারণ নারীর রহস্যময় চরিত্র, কোথায়ও রুদ্রপুরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে একটি নিষ্ঠুর কাহিনীর রেখাবিন্যাস, কোথায়ও রেলগাড়ীতে মদ্যপ দেশীয় সাহেবের মুখে নীল ভেনাসের বিচিত্র উপাখ্যান, আবার কোথায়ও প্রকাশ্য দিবালোকে গ্রীসিয়ান নাক ও ভায়োলেট চোখের 'স্বপ্ন' দেখা! আসল কথা প্লট ও পটভূমিকা-নির্বাচনে প্রমথ চৌধুরীর একটু নূতনত্বের প্রয়োজন। কিছু অসঙ্গতি, কিছু আপাতবিরোধ, কিছু স্থান-কাল ও ব্যক্তির বৈচিত্র্য ছাড়া যেন তাঁর পক্ষে গল্পলেখা সম্ভব নয়। তিনি চিন্তায় ও মননে প্রগতির পক্ষপাতী, কিন্তু তাঁর গল্পের পটভূমিকায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মধ্যযুগের আস্বাদন আছে। তাঁর চরিত্রগুলিও সাধারণ জগতের নয়। নারীচরিত্রের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য আরও বেশী আছে। শুধু চরিত্র নয়, তাদের রূপও নূতন ধরণের—বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই যেন তারা বাঙালী মেয়ে নয়। রূপবর্ণনাতেও তিনি প্রচলিত পদ্ধতি ব্যবহার করেননি—ভাস্করের মত খোদাই ক'রে তিনি এক একটি নারীমূর্তি রচনা করেছেন। নারীচরিত্রের চেয়ে নারীমূর্তি বলাই যেন অধিকতর সঙ্গত। প্রমথ চৌধুরীর নারী শুধু সুন্দরী নয়—তারা এক অদ্ভুত ও অপরিচিত সৌন্দর্যের অধিকারিণী। তাঁর কয়েকটি রূপ-বর্ণনার দৃষ্টান্ত :—

ক. 'তাঁর মূর্তি সিংহবাহিনীর প্রতিমার মত ছিল এবং সেই প্রতিমার মতই উপরের দিকে কোণ তোলা তাঁর চোখ দু'টি,—দেবতার চোখের মতই স্থির ও নিষ্পন্দ ছিল। লোকে বলত সে চোখে কখনও

পলক পড়েনি। সে চোখের ভিতরে যা জাজ্বল্যমান হ'য়ে উঠেছিল, সে হচ্ছে চারি পাশের নরনারীর উপর তাঁর অগাধ অবজ্ঞা।'—আহুতি

খ. '...যা দেখলুম তাতে মনে হ'ল সুন্দরী স্ত্রীলোক নয়,—শ্বেতপাথরে খোদা দেবীমূর্তি; তাঁর সকল অঙ্গ দেবতার মতই সুঠাম, দেবতার মতই নিশ্চল, আর তাঁর মুখ দেবতার মতই প্রশান্ত আর নির্বিকার।'—একটি সাদাগল্প

গ. 'আমার মনে হল সে আপাদমস্তক বিদ্যুৎ দিয়ে গড়া, তার চোখের কোণ থেকে, তার আঙুলের ডগা দিয়ে, অবিশ্রান্ত বিদ্যুৎ ঠিকরে বেরুচ্ছিল। Leyden jar-এর সঙ্গে স্ত্রীলোকের তুলনা দেওয়াটা যদি সাহিত্যে চলত, তা হ'লে ঐ এক কথাতেই আমি সব বুঝিয়ে দিতুম।' —ছোটো গল্প

ঘ. 'চমৎকার দেখতে, একেবারে নীলপাথরের ভেনাস। তার গলায় ছিল লাল রঙের পুঁতির মালা, দু'কানে দুটি বড় বড় প্রবাল গোঁজা, আর ডান হাতের কব্জায় একটি পুরু শাঁখের বালা। মাথার বাঁ দিকে চুড়ো বাঁধা ছিল, আর পরনে এক হাত চওড়া লাল পাড়ের সাদা শাড়ি।'—ভূতের গল্প

ঙ. 'সেখানে গিয়ে দেখি, যিনি একটি রাঙ্কব আসনে উপবিষ্ট আছেন, তিনি স্বয়ং সরস্বতী; তন্বী, গৌরী, বিগাঢ়-যৌবনা, শ্বেত-বসনা। ...এ সরস্বতী পাথরে কোঁদা নয়, রক্তমাংসে গড়া। আমার মনে হ'ল এ রমণী বাঙালী। কেননা তাঁর মুখচোখে 'নিমক' ছিল; সংস্কৃতে যাকে বলে লাবণ্য।' —বীণাবাই

চ. 'সেই গ্রীসিয়ান নাক, সেই ভায়োলেট চোখ। আর সেই ঠোঁট-চাপা হাসি, যার ভিতর আছে শুধু জাদু।' —মেরি ক্রিস্‌মাস্‌

শুধু নারীরূপ বর্ণনাতেই নয়, পুরুষচরিত্র বর্ণনাতেও কোথায়ও কোথায়ও অদৃষ্টপূর্ব রূপের ছবি এঁকেছেন। প্রমথ চৌধুরীকে সচরাচর রোম্যান্স-বিরোধী লেখক বলা হয়। কিন্তু অপরিচিত পরিবেশে অদৃষ্টপূর্ব নরনারীর জীবনের যে চিত্র এঁকেছেন, তার মধ্যে রোম্যান্সের আস্বাদন আছে। সম্ভবত এই কারণেই তিনি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ঢঙে বলেছেন, 'জীবনটা রোম্যান্স নয়, তাই ত রোমাণ্টিক সাহিত্যের এত আদর।'

গল্প-উপন্যাস রচনার মূল প্রণালী দু'টি। বেশীর ভাগ লেখক যে পদ্ধতির অনুসরণ করেন, সেখানে লেখক যেন সর্বজ্ঞ। তিনি নিজে

কোথায়ও উপস্থিত নেই, কিন্তু এক অদ্ভুত তিরস্করিণী শক্তির বলে তিনি সব কিছুই দেখতে পাচ্ছেন। তাঁর কাছে যে কোন চরিত্রই 'সে'। দ্বিতীয়ত আর একটি পদ্ধতি আছে, যেখানে পাত্রপাত্রী সকলেই নিজেদের কথা ব'লে থাকেন। কখনও কখনও একজন বলে থাকেন। কিন্তু উভয়ক্ষেত্রেই 'আমি'। সেই 'আমি' গল্পাংশের সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পর্কান্বিত। এ দু'টি ছাড়াও আর একটি পদ্ধতি আছে। সেখানেও গল্পকথক 'আমি'—কিন্তু সেই 'আমি' গল্পকাহিনীর সঙ্গে সম্পর্কান্বিত নয়—এক নির্লিপ্ত কথকমাত্র। প্রমথ চৌধুরীর গল্পগুলির মধ্যে এই শেষোক্ত রীতির অনুসরণ করা হ'য়েছে—তাঁর গল্পকথক 'আমি' নৈর্ব্যক্তিক বক্তা মাত্র। এই রীতির শ্রেষ্ঠ লেখক মোপাসাঁ। প্রমথ চৌধুরী সম্ভবত এই রীতির দীক্ষা নিয়েছেন এই অসাধারণ ফরাসী শিল্পীর কাছ থেকে।

নিপুণ পর্যবেক্ষণশক্তি ও সমালোচকের নিরাসক্ত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি মূলত তিনি উনিশ শতকের ফরাসী শিল্পীদের কাছ থেকে পেয়েছেন, 'The Novelist—whatever his subject or scene, his purpose is always the critical observation of human behaviour.'[১২] ইংরেজ লেখকদের মধ্যে চেস্টারটন, ম্যাক্স বিয়ারবমের মিশ্রধর্মী গল্পবলার পদ্ধতি ও বুদ্ধিধর্মী ইস্পাত-কঠিন বাণীনির্মিতির প্রভাব তাঁর গল্পগুলিতেও লক্ষণীয়। চেস্টারটনের বাক্-চাতুর্যের আড়ালে যে গভীর মননশীলতা, তার সমগ্র পরিচয় প্রমথ চৌধুরীর গল্পগুলিতে নেই—জীবন-রহস্যের অতলস্পর্শ গভীরতা এখানে অনুপস্থিত। তথাপি চেস্টারটনের রচনার দোষ ও গুণ তাঁর রচনারও বৈশিষ্ট্য, 'He is a humourist who amuses and dazzles his reader but wearies him in the long run by constant repetition of the same tricks.'[১৩] অতিরিক্ত চমক সৃষ্টি করতে তাঁর কোন কোন গল্প দুর্বল হ'য়ে পড়েছে। প্রমথ চৌধুরীর বিচিত্র জগৎ বুদ্ধির প্রখর দীপ্তিতে উদ্ভাসিত, সেখানে বিগত শতাব্দীর কত আঁকাবাঁকা পথ—লণ্ডন ও কলকাতার কত নাগরিক বৈদগ্ধ্য! নাগরিক পরিবেশ যেখানে নেই, সেখানেও নাগরিক মনটি উপস্থিত। লঘু-চপল শ্লেষ-বিদ্রূপ লেখকের দ্বিধাহীন ভাষণে। অথচ ঈর্ষা প্রতিহিংসা, প্রেম প্রভৃতি আদিম বৃত্তির বৃত্তান্ত তাঁর কণ্ঠে। জীবনের

সমতলভূমির গোষ্ঠিবদ্ধ মানবসংসারের লেখক তিনি নন—তাঁর চরিত্রগুলি 'চকিত অভাবনীয়ের ক্বচিৎ কিরণে দীপ্ত।' কিন্তু এই দীপ্তির আভিজাত্য রাজকীয়, অনন্যতা অননুকরণীয়। রবীন্দ্রনাথ এই রূপদক্ষ কথকের বৈশিষ্ট্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, 'গল্প-সাহিত্যে তিনি ঐশ্বর্য দান করেছেন। অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্যে মিলেচে তাঁর অভিজাত মনের অনন্যতা, গাঁথা হ'য়েছে উজ্জ্বল ভাষার শিল্পে।'[১৪]

সাত

কথাসাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরীর বাংলা সাহিত্যে স্থান কি, এ সম্পর্কে প্রশ্ন ওঠা অস্বাভাবিক নয়। কবিতায় তিনি নূতন রীতির আমদানী করেছেন। রস থেকে কলাবিধি পর্যন্ত সব কিছুর মধ্যেই ছিল নূতনত্ব। তবু একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে কবিতা তাঁর স্বক্ষেত্র নয়, মূলত তিনি গদ্যলেখক। কিন্তু গদ্যলেখক হিসাবে তিনি উভচর—গল্প ও প্রবন্ধ, দু'ক্ষেত্রেই তিনি অবিস্মরণীয় চিহ্ন এঁকেছেন। কিন্তু কোন্ ক্ষেত্রে তিনি অধিকতর সার্থক? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া দুরূহ। তবে একথা যথার্থ যে, তাঁর প্রবন্ধের পরিধি অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত। পরবর্তীকালেও যাঁরা প্রমথ চৌধুরী সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, তাঁরাও প্রবন্ধকার প্রমথ চৌধুরীর ওপরেই প্রধানত তাঁদের দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছেন। প্রমথ চৌধুরীর গল্পগুলির সম্যক সমাদর না ঘটার আর একটি কারণও আছে। কথা-সাহিত্যের ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব ও তাঁর গল্প-উপন্যাসের অসাধারণ জনপ্রিয়তা প্রমথ চৌধুরীর কথাসাহিত্যিক-খ্যাতিকে আচ্ছন্ন করেছিল। অবশ্য সুলভ জনপ্রিয়তার মোহও তাঁর কোনকালেই ছিল না। তবে একথাও স্বীকার্য যে, সমকালীন জনপ্রিয়তার মানদণ্ডে সব সময় শিল্পবিচার সম্ভব নয়—শুধু তাই নয়, এতে বিভ্রান্তির সম্ভাবনাও আছে।

সমকালীন কথাসাহিত্যের রূপ ও রীতির সঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর গল্পগুলির তুলনা করলেই এর অসাধারণত্ব সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠবে। যেকালে 'চার-ইয়ারী-কথা'র [১৯১৬] মত অসাধারণ কাহিনী প্রকাশিত হয়, তখন রবীন্দ্রনাথ ও প্রভাতকুমার—এই দু'জনের গল্পই ছিল বাংলা গল্পের আদর্শ। তখন অল্পকাল হ'ল শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব হয়েছে, সাহিত্য-সমাজে তখনও তাঁর প্রভাব পূর্ণরূপে স্বীকৃত হয়নি। রবীন্দ্রনাথ ও প্রভাতকুমারের একাধিপত্যের [illegible] [illegible]

চৌধুরী কথাসাহিত্যের ইতিহাসে বিস্ময়কর মৌলিকত্ব দেখিয়েছেন। তাই রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের প্রতিভার কথা মনে রেখেও পঁচিশ বছর আগের প্রমথ চৌধুরীর গল্প-সমালোচক যে মন্তব্য করেছিলেন, তা আজও প্রণিধানযোগ্য. 'আমি তো মনে করি তখনও যেমন ছিল রবীন্দ্র-যুগ, আজও মূলত চলেছে সেই যুগই, কিন্তু ওরই মধ্যে চৌধুরী মহাশয়ের গল্পে এমন কিছু আছে যা নূতন, যা শুধু পুরাতনের পদানুসরণ নয়।'[১৫] কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক-ব্যক্তিত্ব ও প্রভাতকুমারের জনপ্রিয়তাকে অতিক্রম করা সহজসাধ্য ছিল না।

চৌধুরী মহাশয়ের গল্পের যে বিরূপ সমালোচনা হয়নি, এমন নয়। তাঁর সবগুলি গল্পের রসমূল্যও যে সমান, একথাও বলা যায় না। তাঁর গল্পের কাহিনী-অংশ অত্যন্ত ক্ষীণ—বর্ণনা ও বিবৃতির দিকেও তাঁর কোন প্রবণতা নেই, কিন্তু সংলাপের দিকে তাঁর অসাধারণ আকর্ষণ। আসল কথা এই বুদ্ধিদীপ্ত সংলাপগুলিই তাঁর গল্পগুলির প্রাণ। কিন্তু সূক্ষ্ম-চতুর সংলাপ সৃষ্টির বিলাস যেখানে কাহিনী-বিন্যাস, চরিত্রসৃষ্টি, ঘটনার গতিবেগ প্রভৃতি অন্য সমস্ত বিষয়কে উগ্রভাবে ছাপিয়ে ওঠে, সেখানে গল্প হিসেবেও নিঃসন্দেহে ত্রুটি ঘটে। প্রসঙ্গক্রমে 'ভাববার কথা' গল্পটির কথা বলা যায়। এখানে গল্পাংশ নেই বললেই চলে—তর্ক-কণ্টকিত, সংলাপ-সর্বস্ব গল্পটিতে ছোটগল্পের মূল আস্বাদন ও স্বরূপ-ধর্মটিই নেই। নিতান্ত মামুলী ধরণের গল্পও আছে—সেখানে বিষয় ও বক্তব্যের রীতি কোনটিতেই প্রমথীয় মুন্সিয়ানার ছাপ নেই। যেমন 'পূজার গল্প' গল্পটির কথা বলা যেতে পারে। সমকালীন সমালোচকের চোখেও চৌধুরী মহাশয়ের এই জাতীয় গল্পের দুর্বলতা ধরা পড়েছে।[১৬] কোন কোন ক্ষেত্রে বলার ভঙ্গী গল্পগ্রাসী হ'য়ে উঠেছে—ভঙ্গীরও একটা নিজস্ব রূপ আছে, তার আড়ালে আর যাই থাকুক গল্পাভাসটুকু নিঃশেষে মুছে যায়।

গ্রীক নাটকের যুগ থেকেই প্রথম শ্রেণীর ট্র্যাজেডির শিল্পমূল্য স্বীকৃত হয়েছে—শেক্সপীয়রের ট্র্যাজেডি মানব-মনীষার সর্বোচ্চ কীর্তিস্তম্ভ। হাস্যরস, অম্ল-মধুর শ্লেষোক্তি ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ সৃষ্টির দিকেই প্রমথ চৌধুরীর প্রবণতা—হৃদয়াবেগ ও রোম্যান্টিক প্রেমও তার কাছে মূল্যহীন। ট্র্যাজেডি সৃষ্টির অনুকূল মুহূর্ত এলেও তিনি তার সুযোগ গ্রহণ করেন না। অনেক সময় আবার গল্প-শেষের মন্তব্যও নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হ'য়ে উঠেছে। এমনি একটি অসঙ্গতির [illegible] উল্লেখ করেছেন। 'বড়বাবুর বড়দিন' গল্পটি তাঁর

কাছে ভাল লাগেনি। তিনি গল্পটি সম্পর্কে চৌধুরী মহাশয়কে যে চিঠি লিখেছেন, তা অত্যন্ত মূল্যবান, 'আপনার 'বড়দিন'—শ্রীযুক্ত পাঁচকড়িবাবুরা যাকে বলেন 'মুন্সিয়ানা' তার যদিচ কোনো অভাব নেই [না থাক্‌বারই কথা!] আমার কিন্তু ভাল লাগল না। আমি জানি এ সম্বন্ধে আপনার অন্যান্য সমঝদারদের সঙ্গে আমার মতভেদ আপনি স্পষ্টই টের পাচ্ছেন। তাঁরা হয়ত আপনাকে বলেছেন একটা চরিত্রকে 'বাঁদর' বানিয়ে তোলবার ক্ষমতা আপনার অসাধারণ, আমিও যে তা বলি নে তা নয়। বিদ্রূপ-ব্যঙ্গের খোঁচায় মানুষের বিশেষ কোন একটা বাঁদরামি প্রবৃত্তিকে পাঠকের কাছে রিডিক্লাস ক'রে তুলতে আপনি ভারি পারেন, কিন্তু আমি দেখি মানুষকে মানুষ করে দেখাবার ক্ষমতা এর চেয়েও আপনার ঢের বেশী। এক একটা চাপা লোক যেমন তার বড় দুঃখটাকেও বলবার সময় এমন একটা তাচ্ছিল্যের সুর দেয় যে হঠাৎ মনে হয় যেন সে আর কারো দুঃখটা গল্প ক'রে বলে যাচ্ছে। এর সঙ্গে তার নিজের কোন সম্পর্ক নেই। আপনিও বলেন ঠিক তেমনি ক'রে।...কিন্তু 'বাঁদর' বানাবার সময় ওই চাপা তাচ্ছিল্যের সবটা লেখায় কোনমতেই থাকা সম্ভব নয়, থাকেও না। বোধ করি এজন্যেই 'বড়দিন' আমার ভাল লাগে নি। ওর মর‍্যালের তামাসাটা ধরতে পারলুম না।'[১৭]

শরৎচন্দ্র যখন এই মন্তব্য করেছেন, তখন 'বড়বাবুর বড়দিন'-এর সঙ্গে 'চার-ইয়ারী-কথা'র তুলনা করেছেন—চিঠিখানিতে 'চার-ইয়ারী-কথা' সম্পর্কেও সপ্রশংস উক্তি আছে। এক কথায় এই চিঠিতে শরৎচন্দ্র গল্পকার প্রমথ চৌধুরীর দোষ ও গুণ, দুয়ের কথাই বলেছেন। চরিত্রগুলিকে হাস্যাস্পদ ক'রে তুলতে গিয়ে কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছেন—সেখানে যে সূত্র-সূক্ষ্ম কৌশলটির ওপরে গোটা গল্পের ভিত্তি, তাই যেন নির্মম অনবধানতায় ছিন্ন হয়েছে। অবশ্য সব গল্প সম্পর্কেই একথা বলা চলে না—'নীল-লোহিত' পর্যায়ের গল্পগুলিও আছে। এই পর্যায়ের গল্পগুলিতে প্রমথ চৌধুরী তাঁর শিল্পাদর্শের সুউচ্চ সীমায় উঠেছেন। একজন বিদগ্ধ সমালোচক বলেছেন, 'নীল-লোহিত গল্প সমুদয়ের প্রধান লক্ষণ এই যে এগুলি একেবারে অলীক অথচ সত্যের মত খাঁটি···এইখানে অন্যান্য গল্পের সঙ্গে নীল-লোহিতের গল্পের কত তফাৎ, অন্যান্য গল্প অর্থাৎ বাংলা সাহিত্যের আধুনিক গল্প—প্রাণপণে বোঝাবার চেষ্টা করে যে তারা রিয়্যালিষ্টিক, তারা সাইকোলজিক্যাল, তারা সায়েন্টিফিক, আর নীল-লোহিতের গল্প পদে পদে থমকে দাঁড়িয়ে, পাঠকের কাঁধে হাত দিয়ে

নিজেকেই রহস্য ক'রে বলতে পারে—কেমন এ অলীক কাহিনী তোমার মনোরঞ্জন করল কি? ভাষায় ঘুমপাড়ানি কাব্যি নেই, অলঙ্কার অনুপ্রাসের বাহুল্য নেই, আছে স্বচ্ছতা ও অপূর্ব সরসতা।'[১৮]

রবীন্দ্রনাথ প্রমথ চৌধুরীর গল্প আলোচনা করতে গিয়ে চেকভের প্রসঙ্গ তুলেছেন—চৌধুরী মহাশয়ের গল্পে তিনি চেকভের ছোটগল্পের আস্বাদন পেয়েছেন। কিন্তু কবির সেই মন্তব্য থেকে প্রমথ চৌধুরী ও চেকভের ছোট-গল্পের তুলনামূলক আলোচনা করা খুব সঙ্গত হবে না। চেকভের প্রতিভা ছোটগল্প লেখকের প্রতিভা, ছোট কাহিনীর বা কাহিনীর ভগ্নাংশ ও স্বল্পরেখ কয়েকটি চরিত্র নিয়ে তিনি অসাধারণ শিল্পসৃষ্টি করতে পারতেন। প্রমথ চৌধুরীও জীবনের খণ্ডাংশের শিল্পী। কিন্তু চেকভের গল্পগুলির মধ্যে যে অতি সূক্ষ্ম গীতিস্পন্দন আছে, প্রমথ চৌধুরীর গল্পে তা অনুপস্থিত। চেকভের গল্পগুলির মধ্যে করুণ-লাবণ্য আছে, আছে এক মধুর বিষণ্ণতা[১৯] প্রমথ চৌধুরীর গল্পগুলির রেখাঙ্কন স্পষ্ট—গীতি-কাব্যোচিত ব্যঞ্জনাও নেই। চেকভের গল্পের সূক্ষ্ম সুরেলা রূপ এখানে নেই, কিন্তু দু'জনেই অত্যন্ত সামান্য উপাদান থেকেই অপূর্ব গল্প রচনা করতে পারেন। প্রমথ চৌধুরী যেখানে যুক্তিবাদী, রোম্যান্টিকতা-বিরোধী চেকভ সেখানে জীবনের করুণ-সুরের বিষণ্ণতার মধ্যে একজাতীয় গভীরাশ্রয়ী বেদনার উৎস আবিষ্কার করেছেন। চেকভের তুলনায় প্রমথ চৌধুরী গদ্যাত্মক। প্রমথ চৌধুরী চেকভ বা মোপাসাঁ নন, এর জন্য ক্ষোভ করার কিছু নেই, তিনি তাঁরই মত, এইটিই সবচেয়ে বড় কথা। প্রমথ চৌধুরী জীবনের গভীরে প্রবেশ করেছেন কিনা, এ তথ্য বিচারের আগে মনে রাখতে হবে যে তাঁর গল্প খাঁটি আর্টিস্টের গল্প। তার কারণ তিনি নিজেই ব'লেছেন, 'আর্টে Content-এর মূল্যের চাইতে Form-এর মূল্য ঢের বেশী।'[২০]

১. An acre of green grass, Buddhadev Bose

২. আত্মকথা।

৩. আত্মকথা, ৯৫ পৃঃ।

৪. 'This sober and restrained realism is. however counterbalanced by a romantic fondness for criminal and primitive heroes, who perform deeds of cruelty and violence, for exotic settings in distant and unfamiliar lands.' —A short history of French Literature : Laurence Bisson.

৫. ভারতী, কার্তিক, ১৩০৫।

৬. চিঠিপত্র, পঞ্চম খণ্ড, ৩৯ নং।

৭. 'নীল লোহিতের আদি প্রেম' গ্রন্থের উৎসর্গপত্র।

৮. 'আর আমি একটি বালিকা বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিলুম। একটি বালিকাকে আজও মনে আছে। মেয়েটি ছিল শান্তশিষ্ট, আর তার ছিল কপাল জোড়া দু'টি চোখ, নাক খাঁদা নয়, আর বর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম। পাঁচ বৎসর বয়সে যদি কেউ love-এ পড়ে, তাহলে আমি তার সঙ্গে love-এ প'ড়েছিলুম। ...এই মেয়েটিকে মন থেকে ঝেড়ে ফেলবার জন্য একটি ছোট গল্পও পরে লিখেছি।' —আত্মকথা, ৫ পৃঃ।

৯. 'মাসখানেক পূর্বে ঘোষালের বেনামিতে আমার লেখা—"বীণাবাই" নামক গল্পের প্রশংসা-সূত্রে 'বাতায়ন' পত্রিকায় যে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়, তার অন্তরে উক্ত প্রবন্ধের লেখক একটি প্রস্তাব করেন। তিনি বলেন, ঘোষালের গল্পগুলি একত্র ক'রে পুস্তকাকারে প্রকাশ করা উচিত।' মুখবন্ধ, ঘোষালের ত্রিকথা।

১০. রবীন্দ্রনাথ নিজে এই জাতীয় গল্পের নামকরণ করতে গিয়ে ব'লেছেন, 'ছোট ছোট গল্পকে 'কথান্‌' না ব'লে 'কথিকা' বলা যেতে পারে। 'গল্প-সল্প' বললে ক্ষতি কী?'

—চিঠিপত্র, পঞ্চম খণ্ড, ৮০ নং।

১১. চিঠিপত্র, পঞ্চম খণ্ড, ১২৮ নং।

১২. A short history of French Literature : Laurance Bisson.

১৩. A short history of Englih Literture : Emile Leguis.

১৪. ভূমিকা : গল্পসংগ্রহ।

১৫. 'নীল-লোহিতের আদিপ্রেম' গল্পসংগ্রহের সমালোচনা : গিরিজাপতি ভট্টাচার্য : পরিচয়, কার্তিক, ১৩৪১।

'পূজার গল্প', 'ভূতের গল্প' 'দিদিমার গল্প' এ পুস্তকে না দিলেও চইত, কেননা ইহাদের প্লট নিতান্তই মামুলী ধরণের এবং চৌধুরী মহাশয়ের সর্বজনবিদিত রচনা-চাতুর্যও ইহাতে বিশেষ প্রকাশিত হয় নাই।'—'নীল-লোহিত' গ্রন্থের সমালোচনা : চারুচন্দ্র দত্ত : পরিচয়, মাঘ, ১৩৩৯।

১৭. প্রমথ চৌধুরীকে লিখিত চিঠি : শরৎচন্দ্রের পত্রাবলী : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত।

১৮. 'নীল-লোহিতের আদিপ্রেম' গ্রন্থ-সমালোচনা : গিরিজাপতি ভট্টাচার্য : পরিচয়, কার্তিক, ১৩৪১।

১৯. 'Reading the works of Chekhov makes one feel as if it were a sad day in late autumn, when the air is transparent, the bare trees stand out in bold relief against the sky, the houses are huddled together, the people are drime and dreary. Everything is so strange, so lovely, motionles, powerless. —Literary Portraits : M. Gorky.

২০. সুধীরচন্দ্র সরকার-সম্পাদিত 'কথাগুচ্ছ' গল্প-সঙ্কলনের ভূমিকাটির নাম 'ছোট গল্প'।

চার-ইয়ারী-কথা

চল্লিশ বছরেরও বেশী হ'লো প্রমথ চৌধুরীর 'চার-ইয়ারী-কথা' লেখা হয়েছে।[১] ইতিমধ্যে বাংলা কথাসাহিত্যের সমৃদ্ধি ও বহুশাখায়িত পরিধি বিস্তার ঘটেছে। কিন্তু 'চার-ইয়ারী-কথা'র নিঃসঙ্গ মহিমা বিন্দুমাত্র ম্লান হয়নি। রূপসৃষ্টির অনন্যতায়, দীর্ঘ অনুশীলিত বিদগ্ধ মানসিকতায় ও মার্জিত ক্ল্যাসিক গুণের বাঁধুনীপনায়, কাহিনীটির চমকপ্রদ বৈশিষ্ট্য সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 'চার-ইয়ারী-কথা' আসলে চারটি বিচ্ছিন্ন ছোটগল্পের সমষ্টি—চারটি বিভিন্ন ছোটগল্প হিসেবেও এর মূল্য কম নয়—চারটি পরিচ্ছন্ন নাতিদীর্ঘ মুক্তা-নিটোল কাহিনী। কিন্তু বৃহত্তর অর্থে কাহিনীটি একটি চতুরঙ্গ উপন্যাস। চারটি বিচিত্র ধরণের প্রেম কাহিনী, একটি দীর্ঘ প্রসঙ্গের এক একটি অধ্যায় মাত্র। কাহিনীগুলির ফাঁকে ফাঁকে সরস মন্তব্য, সমালোচনা ও বিতর্কের অংশগুলি আপাত-বিচ্ছিন্ন কাহিনীর সংযোগরেখাকে ভরাট ক'রে তুলেছে। গল্প চারটির ভূমিকা অংশটির পরিবেশ-চিত্রণের মধ্যেও বৈশিষ্ট্য আছে—পরিবেশটিও যেন গল্পগুলির মধ্যে একটি সামগ্রিক ঐক্যের সৃষ্টি করেছে। মেঘ-মূর্ছিত ম্লান আকাশ ও চাঁদের রহস্যাচ্ছন্ন পাণ্ডুর আলো সমস্ত পৃথিবীর উপর যেন এক প্রেতায়িত ছায়া বিস্তার করেছে। পরিচিত পরিবেশের মধ্যে এক অনির্দেশ ও অপরিচিতসঙ্কেত 'কৌতূহল মিশ্রিত আতঙ্ক' সৃষ্টি করেছে। আসন্ন দুর্যোগের আতঙ্ক পাণ্ডুর পরিবেশে ক্লাবঘরে যে চারটি বন্ধু এতক্ষণ তাসখেলায় মগ্ন ছিল, আকস্মিক দুর্যোগে তারা বাড়ী ফিরতে পারেনি—তাই বৃষ্টি না ছাড়া পর্যন্ত তারা তাদের ব্যক্তিগত জীবনের প্রেমের অভিজ্ঞতার কথা বলেছে। কিন্তু তাদের অভিজ্ঞতালব্ধ কাহিনী বিবৃতির জন্য একটি বিশেষ ধরণের পরিবেশের প্রয়োজন ছিল। ম্লান আলোর স্পর্শে স্তম্ভিত ও মূর্ছিত পৃথিবী যেন ক্লাবঘরে সমবেত চারটি বন্ধুকে মুখর ক'রে তুলেছিল—যেন তারা আজ সম্পূর্ণ নূতন মানুষ। যা কিছু গোপনীয় ও অব্যক্ত—যা প্রাত্যহিকতার ধূলিজালে আচ্ছন্ন তা যেন এক মুহূর্তেই উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। আজ যেন তারা প্রতিদিনের নয়—প্রতিদিনের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী পেরিয়ে তারা যেন একই রসলোকের তীর্থপথিক। বহিঃপ্রকৃতির এই নিগূঢ় সঙ্কেত তাদের মানসলোকে গভীর প্রভাব বিস্তার ক'রেছে 'বাইরের ঐ আলো আমাদের মনের ভিতরও প্রবেশ করেছিল এবং সেই সঙ্গে আমাদের মনের রঙও ফিরে গিয়েছিল। মুহূর্ত মধ্যে আমরা নূতন ভাবের মানুষ হ'য়ে উঠেছিলুম। যে সমস্ত মনোভাব

নিয়ে আমাদের দৈনিক জীবনের কারবার, সে সকল মন থেকে ঝরে গিয়ে, তার বদলে দিনের আলোয় যা কিছু গুপ্ত ও সুপ্ত হ'য়ে থাকে, তাই জেগে ও ফুটে উঠেছিল।'—এই স্থমিত মন্তব্যটির সাহায্যে লেখক অপূর্ব ব্যঞ্জনাশক্তির পরিচয় দিয়েছেন। এই ব্যঞ্জনাটি কাহিনী-চতুষ্টয়ের কেন্দ্রীয় ঐক্যকে ঘনবদ্ধ করেছে।

ক্লাবঘরের সমবেত চার-ইয়ারের শুধু মনেই নয়, কাহিনীতেও ম্লান পাণ্ডুর মেঘ-মুর্ছিত প্রকৃতির অল্প-বিস্তর প্রভাব আছে। 'সোমনাথের কথা' অংশটির মধ্যে এই প্রভাব খুব নিগূঢ় নয়, কিন্তু অনিদ্রা-কাতর রুগ্ন দেহ-মনের ক্রিয়া যে গল্পটির ওপরে একেবারেই প্রভাব বিস্তার করেনি, একথা বলা যায় না। রিণীর মনের দু' একটি আকস্মিক ভাবান্তরের বর্ণনায় লেখক বহিঃপ্রকৃতির আলোছায়া-রঞ্জিত ধূসর রহস্যময় রূপের বর্ণনা দিয়েছেন; 'আমরা বনের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে দেখি, সুমুখের দিগন্তবিস্তৃত গোধূলি-ধূসর জলের মরুভূমি ধূ ধূ করছে। তখনও আকাশে আলো ছিল। সেই বিমর্ষ আলোয় দেখলুম, রিণীর মুখ গভীর চিন্তায় ভারাক্রান্ত হয়ে রয়েছে, সে একদৃষ্টে সমুদ্রের দিকে চেয়ে রয়েছে, কিন্তু সে দৃষ্টির কোনও লক্ষ্য নেই। সে চোখে যা ছিল, তা ঐ সমুদ্রের মতই একটি অসীম উদাস ভাব।'—'সেনের কথা'য় কাহিনী-অংশের চেয়ে স্বপ্ন-মদির পরিবেশ বর্ণনা অনেক বেশী স্থান অধিকার করেছে। ফেনিল জ্যোৎস্নায় রূপকথার পরীরাজ্যের অবাধ স্বপ্নজগৎ প্রসারিত হয়েছে—চারদিকে যেন অজস্র পুষ্পবর্ষণ। জ্যোৎস্নাফুলের মাঝখানে একটি চিরন্তনীর আকাঙ্খা শরীরিণী হয়ে উঠেছে। বাইরের পাণ্ডুবর্ণ ধূসর আলো গল্পটির জ্যোৎস্নালোকরঞ্জিত পরিবেশের বিপরীত—কিন্তু রহস্য-ব্যঞ্জনায় দু'টি ছবির মধ্যে যেন কোথায় একটি একাত্মতা আছে। 'সীতেশের কথা'য় লণ্ডনের নভেম্বর মাসের নিরানন্দ পরিবেশ, স্যাঁতে-সেঁতে বর্ষান্ধকার ও বৈচিত্র্যহীন অবকাশ গল্পটির উপযুক্ত পটভূমিকা রচনা করেছে। বাইরের প্রকৃতির সঙ্গে পরিবেশ-বর্ণনার সংযোগসূত্র একেবারে অনুপস্থিত নয়। চতুর্থ গল্পটিতে বহিঃপ্রকৃতির কোন মুখ্য প্রভাব নেই, কিন্তু গল্পটির যে পরিবেশ আছে তার সঙ্গে বাইরের প্রকৃতির একটি অদৃশ্য সংযোগসূত্র লক্ষণীয়। জনবিরল প্রকাণ্ড পুরী, নিস্তব্ধ রাত্রির প্রেতায়িত পরিবেশ ও নিশাচর ধ্বনি মিলে একটি অলৌকিক শিহরণ সৃষ্টি করেছে—এই পরিবেশই যেন টেলিফোনের প্রেতকণ্ঠকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। কাহিনী-বর্ণিত পরিবেশগুলির সঙ্গে গল্পের 'সেটিং'-এর একটি নিগূঢ় ঐক্য আছে। আপাত-বিচ্ছিন্নতার মধ্যে এইখানে সমন্বয়ের সূত্র আছে।

গল্পগুলির ভাবগত ঐক্যও অনুপস্থিত নয়। চারটি গল্পেই প্রেমের অসঙ্গতিকে রূপ দেওয়া হয়েছে। প্রেমানুভূতির সহজ সাবলীল প্রবাহটি এখানে আকস্মিকতার মরুবালির মধ্যে পথ হারিয়েছে। প্রেমের শান্ত ধীর মিলনাত্মক রূপ ফুটিয়ে তোলা যেন লেখকের কাম্য নয়—প্রেমকে তিনি একটি অসাধারণ বক্রতির্যক দৃষ্টির সাহায্যেই পর্যবেক্ষণ করেছেন। তার বিসর্পিল পথরেখা, উদ্ভট আকস্মিকতা ও নিষ্ঠুর পরিসমাপ্তি—রোম্যান্টিক প্রেমানুভূতির বিরুদ্ধে লেখকের ব্যঙ্গাত্মক মনোভাবেরই পরিচয় দেয়। জ্যোৎস্নালোক-মুগ্ধ রাত্রিতে যে কবি-কল্পিত মানসী মূর্তি গড়ে ওঠে, তাই উন্মাদিনীর নিষ্ঠুর অট্টহাসিতে খান খান হয়ে গিয়েছে। দ্বিতীয় গল্পে, রূপসী প্রণয়িনীর হীন চৌর্যবৃত্তিতে একটি মোহময় কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটেছে। তৃতীয় গল্পে, অস্থিরমতি বহুবল্লভ-প্রণয়িনী প্রেম-লীলার প্রৌঢ়-প্রহরে প্রেমিককে আকস্মিকভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে। চতুর্থ গল্পে, পরলোকবাসিনী প্রেমিকার অবরুদ্ধ ও অনুচ্চারিত প্রেমের বাণী টেলিফোনের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে নিবেদিত হয়েছে। প্রেমের রোম্যান্টিকতা ও নভোস্পর্শী আদর্শবাদের প্রতি শ্লেষ-চতুর তির্যক দৃষ্টি প্রতিবারই নির্মম আঘাত হেনেছে। প্রতি ক্ষেত্রেই প্রেমের মোহময় ও সুখালস পরিবেশ প্রথমে ঘনিয়ে তোলা হয়েছে, কিন্তু চূড়ান্ত মুহূর্তে সেই রঙীণ রসাবেশ ব্যর্থতার ধূলিশয্যায় আশ্রয় নিয়েছে। এ্যান্টিক্লাইম্যাক্সের আকস্মিক তীব্র আঘাতে প্রেমের অমৃতও বিষে পরিণত হয়েছে। রোম্যান্টিক প্রেম সম্পর্কে তাঁর ব্যঙ্গাত্মক মনোভাব অনেকগুলি গল্পের প্রাণ। প্রেমের ভাবগভীরতা ও হৃদয়াবেগকে তিনি নির্মম আঘাত করেছেন। তাঁর কবিতার মধ্যেও প্রেমানুভূতি সম্পর্কে এই বিশেষ মনোভঙ্গির পরিচয় মেলে।[২] প্রেমানুভূতির এই শ্লেষ-রঞ্জিত অভিব্যক্তিই গল্প-গুলির কেন্দ্রসংহত ঐক্যকে ঘনবদ্ধ করেছে।

দুই

'চার-ইয়ারী-কথা'র প্রথম গল্প 'সেনের কথা' আগাগোড়া যেন একটি 'ফ্যাণ্টাসি'। কবিতার ও কল্পনার জগতে যে স্বপ্নালস মায়ার সৃষ্টি হয়, তাকেই তিনি বাস্তবের রক্তমাংসের নারীর মধ্যে দেখতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছেন। ইউরোপীয় নাটক-নভেলের নায়ক-নায়িকারাই তাঁর কাছে সত্য হ'য়ে উঠেছিল, আর যারা বাস্তবের দেহধারী মানুষ তারাই হ'য়ে উঠেছে ছায়া। বাস্তব সম্পর্ক-বর্জিত আকাঙ্ক্ষা একটি অলক্ষিত ও অনির্দেশ ব্যাকুলতার কল্প-বাসরে আকাশ-

কুস্থম চয়ন করত—সেখানে বিয়াত্রিশ, মিরাণ্ডা, ডেসডিমনাদের পদচিহ্ন পড়ত। এমনি করেই ভাবপ্রবণ সেন একটি চিরন্তনী নারীর মূর্তি গড়ে তুলেছিলেন। কিন্তু মানস-স্থন্দরীর মূর্তি রচনা করেই তিনি থেমে থাকেননি, বাস্তবে তাকে শরীরিণী ক'রে দেখতে চেয়েছিলেন। আলোর মায়ায় বাঙালী রোমিও-র চোখে তাঁর বাসনালক্ষ্মী আবির্ভূতা হয়েছেন। কিন্তু আবেগ-বিহ্বল মুহূর্তে সেই নারীর করপল্লব স্পর্শমাত্র, সে সজোরে হাত ছিনিয়ে নিয়েছে—তার মুখ ভয়ে বিবর্ণ, কণ্ঠস্বর অস্বাভাবিক ও বিকৃত। বিমূঢ় প্রেমিক যেই দু'পা এগিয়েছেন অমনি একটি বিকট অট্টহাসিতে তাঁর স্বপ্নস্বর্গ খান খান হয়ে ভেঙে পড়েছে। মোহে ও মায়ায় যার সৃষ্টি, সেইখানেই তার চিরকালের স্বর্গ—মর্ত্যের মানবীর মধ্যে সেই চিরন্তনীকে অনুসন্ধান করা, আর বাস্তবের রূঢ় আঘাতে স্বপ্নভঙ্গ হওয়া একই কথা। সেন বলেছেন, 'আমার মনের প্রকৃতি এতটা অস্বাভাবিক হ'য়ে গিয়েছিল যে, মনে কোনও অবলা সরলা ননীবালার প্রবেশাধিকার ছিল না'—এই উক্তিটি সেনের মানসিকতা বিশ্লেষণের সহায়ক হয়েছে। 'সরলা ননীবালার প্রবেশাধিকার' থাকলে হয়তো কাল্পনিক ব্যাকুলতার কোন অবকাশ থাকতো না। বাস্তবস্পর্শ-শূন্য কল্পনাসর্বস্ব নভশ্চারী প্রেমানুভূতিকে উন্মাদিনীর অট্টহাস্যের নির্মম আঘাতে ধূলিসাৎ করা হয়েছে। গল্পটির পরিণতিতে যে শ্লেষের ইঙ্গিত আছে, তা যেমন অর্ধ-ব্যক্ত, তেমনি স্থচতুর, 'আমি সেই দিন থেকেই চিরদিনের জন্য Eternal Faminine-কে হারিয়েছি, কিন্তু তার বদলে নিজেকে ফিরে পেয়েছি।'—এই সাধারণ উক্তিটির মধ্যে যে তির্যক ও বক্রদৃষ্টির সহাস্য আলোক বিচ্ছুরিত হয়েছে, তাই গল্পটির প্রাণকেন্দ্র।

দ্বিতীয় গল্প, 'সীতেশের কথা'য় লেখকের অম্ল-মধুর শ্লেষের স্থর প্রথম থেকেই লক্ষ্য করা যায়, প্রথম গল্পের রোম্যান্টিক আমেজটুকু এখানে নেই। বক্তার চরিত্র ও তার বিশিষ্ট মানসিকতা তার জন্য দায়ী। সীতেশ দুর্বলচিত্ত নারীসঙ্গ-লোলুপ পুরুষ। সে নিজেই বলেছে, 'সেকালে আমার মনে দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে আমি হচ্ছি সেইজাতের পুরুষমানুষ, যাদের প্রতি স্ত্রীজাতি স্বভাবতই অনুরক্ত হয়। এ সত্ত্বেও যে আমি নিজের কিম্বা পরের সর্বনাশ করিনি, তার কারণ Don Juan হবার মত সাহস ও শক্তি আমার শরীরে আজও নেই কখনও ছিলও না।' এই চমৎকার আত্ম-বিশ্লেষণটি গল্পের সঙ্গে একই সূত্রে গাঁথা। সীতেশের তরল ও নারীসঙ্গ-লোলুপ সদাচঞ্চল মনের সঙ্গে নভেম্বর মাসের লণ্ডনের স্যাঁতসেঁতে পরিবেশের বেশ একটি ঐক্য খুঁজে পাওয়া যায়। 'পাঞ্চ' পত্রিকা ও

সত্তা উপন্যাসের ডিনারের বর্ণনার মধ্যে পাঠকের তরলরুচির পরিচয় পাওয়া যায়। এই তরল মানসিকতা ও স্যাঁতসেঁতে পরিবেশে প্রতারণাময়ী নায়িকার আবির্ভাব সুসঙ্গত। সে নারী তার বাক্‌চাতুর্যে ও প্রেমের বাস্তবনিষ্ঠ গভময় বিশ্লেষণে স্বভাব-নিপুণ। দীর্ঘকালের প্রণয়-অভিনয়ে তার সঞ্চিত অভিজ্ঞতাকেই সে কথাচাতুর্যে ও আকারে ইঙ্গিতে প্রকাশ করেছে। কিন্তু সীতেশ প্রণয়-মূঢ়, প্রণয়-ব্যবসায়িনীর হীন প্রতারণা ও চৌর্যবৃত্তিকে সে যেন বিশ্বাস করতে পারে নি। শ্যাম্পেনের নেশা আর প্রণয়ের মদিরা তার এক মুহূর্তেই অপসারিত হ'য়েছে। একদিকে বিশ্বাসমুগ্ধ প্রেমতৃষ্ণা, অন্যদিকে চটুল তরল ব্যবসায়ী মনোবৃত্তি—এই দুই বিপরীতের আকর্ষণে প্রমথ চৌধুরীর স্বভাব-সিদ্ধ পদ্ধতিটিই নিপুণ শিল্পকলায় রূপায়িত হয়েছে।

তৃতীয় গল্প 'সোমনাথের কথা'র ভূমিকা ও উপসংহার দুই-ই দীর্ঘ—মূল গল্পটিও অন্য গল্পগুলির চেয়ে শাখা-জটিল। সোমনাথ দার্শনিক, নারীসম্পর্কে চিরকালই উদাসীন। 'একটি বর্ণচোরা দৈহিক প্রবৃত্তিই যে পুরুষের নারীপূজার মূল'—এ বোধ তার ছিল। সোমনাথের চরিত্রে একটি ভারসাম্য আছে, তাই নারীকে নিয়ে প্রেমের আকাশ-কুসুম রচনা করা তার চরিত্রের বিরোধী। এহেন সংযতচরিত্র প্রণয়দ্বেষী-নায়ক যিনি জীবনে ভেনাস-ডি-মিলো-র জগদ্বিখ্যাত মূর্তি ছাড়া আর কিছুই ভালবাসতে পারেন নি—তার সম্মুখে রিণীর আবির্ভাব যেমন আকস্মিক, তেমনি অভাবনীয়। লেখক এই প্রণয়লীয়ার দীর্ঘছবি এঁকেছেন। রিণীর দ্রুত-পরিবর্তনশীল মনোভাবের পতঙ্গ-চপল রূপ তার কথা-বার্তায় ও চলন-বলনে, চমৎকার ফুটে উঠেছে। তার লঘু-চপল পরিবর্তনশীল মনোভাবের মাঝে মাঝে দু'-একটি ভাব-স্থির গভীর মুহূর্ত বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করেছে। রিণী চরিত্রের এই বৈচিত্র্য সোমনাথের সঙ্গে একটি ব্যবধান রচনা করেছে—সে ফাঁক কোনদিনই পূরণ হয় নি। তাই সে সোমনাথের কাছে ধরা না দিয়েও তাকে অনায়াসে জয় করেছে। দার্শনিক সোমনাথের চেয়ে রিণীর পর্যবেক্ষণ শক্তি ও মানবচরিত্র-অভিজ্ঞতা অনেক বেশী। তাই তার কাছে স্থূলবৃত্তি জর্জ ও অভিজাতরুচি সোমনাথ—দু'জনের মনোজীবনের ছবিই সমানভাবে স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে। গল্পটিতে দু'টি অংশ আছে—প্রথমার্ধে বিসদৃশ চরিত্রের নারীপুরুষের প্রণয়লীলার বর্ণনা, দ্বিতীয়ার্ধে তার হাস্যকর পরিণতি। জর্জের সঙ্গে নিজের বিবাহ সংবাদ দিয়ে রিণী যে চিঠি লিখেছে তাতে প্রমথীয় ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও বাক্-বৈদগ্ধ্যের ঘনিষ্ঠ

পরিচয় আছে। এই চিঠিতেই রিণীর চরিত্র সবচেয়ে বেশী ফুটেছে। রিণীর কাছে সোমনাথ কোনদিনই লক্ষ্য ছিল না—জর্জকে লাভ করার উপায় হিসাবেই সুকৌশলী নারী সোমনাথকে ব্যবহার করেছিল। রিণী স্পষ্ট-ভাবেই তার এই কৌশলের কথা জানিয়েছে, 'ওদের কাছে ভালবাসার অর্থ হচ্ছে jealousy; ওদের মনে যত jealousy বাড়ে, ওরা ভাবে ওরা তত ভালবাসে। ষ্টেশনে তোমাকে দেখেই George উত্তেজিত হ'য়ে উঠেছিল, তারপর যখন শুনলে যে তোমার একটা কথার উত্তর আমাকে কাল দিতে হবে, তখন সে কালবিলম্ব না ক'রে আমাদের বিয়ে ঠিক ক'রে ফেললে।' রিণী সোমনাথকে শুধু জর্জকে লাভ করার উপায় হিসাবেই ব্যবহার ক'রে নি—তার কাছে প্রেমের কোন ধ্রুবাদর্শের মূল্য যে নেই, তাও প্রমাণিত হয়েছে—প্রেম তার কাছে ক্ষণিকের খেয়াল ও খেলনামাত্র। সোমনাথের মূল কাহিনীটির একটি সংক্ষিপ্ত উপসংহার আছে। রিণী সোমনাথকে প্রতারণা করতে গিয়ে নিজেও প্রতারিতা হ'য়েছে—জর্জের সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদের পরে সে একটি কনভেন্টে আশ্রয় নিয়েছে। জীবনের এই অভিজ্ঞতার ফলে সোথনাথ প্রেমের স্বরূপ আবিষ্কার ক'রেছে: প্রেমের ধ্রুবনির্দিষ্ট একমুখী সত্য নেই—খাঁটি ভালবাসার মধ্যে রহস্য ও প্রবঞ্চনা দুই-ই থাকে, এই দুটিকে পৃথক করা সম্ভব নয়—'ভালবাসা হচ্ছে both a mystery and a joke'। রিণীর তুলনায় সোমনাথ চরিত্র যত ম্লানই হোক না কেন, নিরুত্তাপ অনাসক্ত সত্যজিজ্ঞাসা তার চরিত্রে অনুপস্থিত নয়।

চতুর্থ গল্পের প্রথমেই পূর্ব-কথিত তিনটি গল্পের সংক্ষিপ্ত আলোচনা আছে—এই আলোচনার মধ্যে বক্তার তীক্ষ্ণবিশ্লেষণ-কুশলতার পরিচয় পাওয়া যায়। চতুর্থ গল্পের বক্তা রায় বলেছেন, 'সেন কবিতায় যা গড়েছেন, জীবনে তাই পেতে চেয়েছিলেন। সীতেশ জীবনে যা পেয়ে-ছিলেন, তাই নিয়ে কবিত্ব করতে চেয়েছিলেন। আর সোমনাথ মানব-জীবন থেকে তার কাব্যাংশটুকু বাদ দিয়ে জীবন যাপন করতে চেয়েছিলেন। ফলে তিনজনই সমান আহাম্মক বনে গেছেন।'—রায়ের মতে প্রথম তিনটি গল্পে প্রেমের হাস্যকর অসঙ্গতির দিকটিই ফুটেছে, শুধু বক্তারা সেই হাস্যরসকে করুণরসে পরিণত করতে গিয়ে তাকে আরও অস্বচ্ছ ক'রে ফেলেছেন—দুষ্ট ক্লিষ্ট আলো তাদের মনের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে। চতুর্থ গল্পের কথক আশ্বাস দিয়েছেন যে তাঁর গল্পে আর

যা কিছু থাক না কেন 'কোনও হাস্যকর কিম্বা লজ্জাকর পদার্থ নেই। হাস্যকর কিম্বা লজ্জাকর অসঙ্গতি না থাকলেও শেষ গল্পটিতে প্রমথীয় প্যারাডক্সের চাতুর্য আকস্মিকতার চমকে প্রখর হ'য়ে উঠেছে।

প্রথম তিনটি গল্পের সঙ্গে শেষ গল্পটির আর একটি মৌলিক পার্থক্য আছে। প্রথম তিনটি গল্পে গল্পারম্ভের আগে বক্তারা তাঁদের ব্যক্তিচরিত্র ও মানসিকতার বিশ্লেষণ করেছেন এবং গল্পাংশের মধ্যে বক্তা-চরিত্রের সবটুকু প্রকাশিত হয়েছে। চতুর্থ গল্পে বক্তা নিজে ধরা দেন নি—এমন কি গল্পের ভূমিকাতেও নয়। শুধু তিনজন পূর্ববর্তী গল্প কথকের সমালোচনা থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে চতুর্থ বক্তার চরিত্রের ভারসাম্য অনেক বেশী। গল্পটি গড়ে উঠেছে টেলিফোনের মাধ্যমে—গল্পটি রচনা করেছে একটি লোকান্তরিতা নারী-কণ্ঠ। বিলাত প্রবাসের সময় রায় গর্ডন স্কোয়ারে মিসেস স্মিথের বাড়ীতে থাকতেন। সেই বাড়ীর রূপসী দাসী 'অ্যানি'র গোপন ও অবরুদ্ধ প্রেমের কাহিনী বিবৃত হয়েছে—'অ্যানি' নিজ মুখেই সেই কাহিনী বলেছে। একটি পরিচারিকার সলজ্জ হৃদয়ের গোপন ও অবরুদ্ধ প্রেমের প্রতিদান-প্রত্যাশাহীন অতন্দ্রসাধনার কাহিনী একটি করুণ ও কোমল ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করেছে। ফ্রান্সের যুদ্ধক্ষেত্রে তার আকস্মিক মৃত্যুর সংবাদ বেদনায় ও রোম্যান্সে গড়ে-ওঠা একটি কাহিনীর উপর নির্মম যবনিকা টেনে দিয়েছে। কাহিনীর মধ্যে একটি বিষণ্ণ-মধুর মৃদু সৌরভ আছে—হৃদয়ের চঞ্চল বিক্ষোভ এই সুন্দর ছবিটিকে আচ্ছন্ন করে ফেলে নি। কারণ কাহিনীটি এমন একটি সূক্ষ্মসূত্রের বন্ধনে গড়ে উঠেছে, যেখানে দ্রুততাল-মণ্ডিত হৃদয়াবেগ শুধু তালভঙ্গের কারণই হ'য়ে উঠত! গল্পটির আকস্মিক পরিসমাপ্তির মধ্যে একটি অবিশ্বাস্যকর অসঙ্গতির দিক আছে—পরলোকবাসিনী প্রেমিকাও বাস্তব উপায়ে এতকালের গোপনীয় কথা জানাতে চেয়েছে। লেখক সুকৌশলে শূন্যগৃহ, ভৌতিক নিশাচর ধ্বনি ও বক্তার সদ্যনিদ্রোত্থিত মনের তন্দ্রাতুর ভাবের সুযোগ গ্রহণ করেছেন। গল্পটিকে একটি অতিপ্রাকৃত কাহিনী ক'রে গড়ে তোলার অবকাশও ছিল—কিন্তু লেখক সে পথে অগ্রসর হন নি। অতি-প্রাকৃতের যে সূক্ষ্মশরীরী বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছিল, টেলিফোনের মাধ্যমে লৌকিক কাহিনীর অবতারণায় তা ক্ষণদৃষ্ট রামধনুর মতো শূন্যে মিলিয়ে গিয়েছে।

তিন

প্রমথ চৌধুরীর গল্পগুলির একটি নিজস্ব স্বরূপ আছে, এর প্রধান কারণ হ'ল তাঁর গল্প বলার নূতন ধরণ। বর্ণনা বা বিবৃতি তাঁর গল্পের পক্ষে বড় কথা নয়—কিন্তু সংলাপের প্রতিটি সুযোগ তিনি গ্রহণ করেন। কারণ তাঁর গল্পগুলি সংলাপ-নির্ভর—সংলাপ-বিন্যাসের কুশলতা তাঁর গল্প-গুলির অগ্রগতি ও কলেবর রচনার জন্য দায়ী। 'চার-ইয়ারী-কথা'-র গল্পাংশ রচিত হ'য়েছে চার ইয়ারের বক্তব্যে—তাঁরা নিজেদের প্রণয়ঘটিত অভিজ্ঞতা নিজেদের জবানীতেই ব'লেছেন। তা ছাড়া গল্পটির মধ্যে আর একজন 'আমি' আছে—এই 'আমি'ই লেখকের দ্বিতীয় স্বরূপ। অবশ্য চতুর্থ গল্পটির কথক সেই 'আমি'। প্রমথ চৌধুরীর এই গল্পগুলির বিশেষ ধরণের 'আমি' শুধু নীরব দর্শক নন, তিনি প্রয়োজন মতো ঘটনা ও চরিত্রের ওপর নানাজাতীয় মন্তব্য করে থাকেন ও গল্প-প্রবাহকে স্বচ্ছন্দ করে তোলেন। 'চার-ইয়ারী-কথা' চারটি 'বিশুদ্ধ গল্পে'র সমষ্টি মাত্র নয়—গল্পরস ছাড়াও গল্পের প্রারম্ভে, শেষে ও কখনও কখনও মাঝখানেও বিশ্লেষণ, মন্তব্য ও বিতর্কের ছড়াছড়ি। মূল গল্পের চেয়ে এই অংশগুলির মূল্য কম নয়—মূল গল্পের সঙ্গে বৈঠকী আবহাওয়াটি যেন 'উপরি পাওনা',—অবশ্য প্রমথ চৌধুরীর কোন কোন গল্পে 'উপরি পাওনা'-টিই আসল পাওনা হ'য়ে উঠেছে। 'চার-ইয়ারী-কথা'র কথকেরা অত্যন্ত আত্মসচেতন, তাঁদের পরিচ্ছন্ন আত্ম-বিশ্লেষণই কাহিনীটিকে যেন অনেকখানি এগিয়ে দিয়েছে। অভিজ্ঞতা-লব্ধ প্রণয় কাহিনীর বর্ণনা করতে গিয়ে প্রথমেই বক্তা কি ধরণের মানুষ এবং প্রেম ও নারী সম্পর্কেই বা তাঁর ধারণা কি—এর নিপুণ বিশ্লেষণ ক'রেছেন।

'চার-ইয়ারী-কথা' প্রেমের চতুরঙ্গ রূপের কাহিনী। 'সেন' কাব্য-নাটক ও কল্পকাহিনীর মধ্যে তাঁর চিরন্তনীকে পেয়েছিলেন, কিন্তু এতে সন্তুষ্ট না হ'য়ে সেই চিরন্তনীকে বাস্তবের মধ্যে খুঁজতে এলেন। এইখানেই হ'ল রোম্যান্সের চরমতম অপমান। সীতেশ আত্মরক্ষায় অক্ষম দুর্বলচিত্ত প্রেমিক—চটুল প্রণয়িণীর হীন চৌর্যবৃত্তির মধ্যে তার প্রেমস্বপ্নের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। সোমনাথ বিচারশীল, প্রণয়দ্বেষী দার্শনিক—কিন্তু প্রতারণাময়ী প্রেমিকার ফাঁদে পড়ে তার চরিত্রগৌরব নিষ্প্রভ হ'য়েছে, প্রেমিকা তাকে নিজ স্বার্থ-সিদ্ধির কৌশল হিসেবে ব্যবহার করেছে। শেষ গল্পের নায়ক চরিত্রের ভারসাম্য

বেশী, কিন্তু এর ফলশ্রুতি এমন কিছু স্বতন্ত্র নয়। পরলোকবাসিনী দাসীর অবরুদ্ধ প্রেমানুভূতি টেলিফোন সহযোগে বিবৃত হ'য়েছে। আপাতদৃষ্টিতে চতুর্থ গল্পটিতে একটি সহজ সুন্দর করুণ অভিব্যক্তি আছে—কিন্তু সমগ্র কাহিনীর সঙ্গে অন্বিত হ'য়ে এই গল্পটিও প্রেম-জীবনের প্যারাডক্সকে নিঃসন্দিগ্ধ ক'রেছে। প্রেমের গভীর হৃদয়াবেগ ও রোম্যান্টিক স্বপ্নের ধারণা কাহিনীগুলির মধ্যে পদে পদে খণ্ডিত হয়েছে।

'চার-ইয়ারী-কথা'র গদ্যরীতি প্রমথ চৌধুরীর সার্থকতম কলাকৃতির নিদর্শন। প্রবন্ধ ও কথাসাহিত্যের ভাষার মধ্যে সচরাচর কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে। গল্পের নিজস্ব একটি রস আছে, তাই প্রকাশরীতির দুর্বলতা অন্যান্য কারণেও ঢেকে যেতে পারে। অনেক সময় দুর্বল ভাষা ও দুর্বলতর স্টাইল খ্যাতনামা কথা-সাহিত্যিকদের রচনায় লক্ষ্য করা যায়—কিন্তু রচনার অন্যান্য গুণে তারা রসোত্তীর্ণ হয়। কিন্তু প্রবন্ধ লেখকের পক্ষে ভাষাচর্চার প্রয়োজনীয়তা আবশ্যিক, কথাসাহিত্যিকের পক্ষে এই চর্চা অনেকটা গৌণকর্ম।[৩] প্রবন্ধ ও কথাসাহিত্য—উভয় ক্ষেত্রেই প্রমথ চৌধুরীর স্টাইল ও ভাষা-কর্ষণার প্রমাণ সমান ভাবেই পাওয়া যায়। তিনি বাংলা সাহিত্যে সেই দুর্লভ সাহিত্যিকদের অন্যতম যাদের প্রবন্ধ ও কথাসাহিত্যের গদ্য স্টাইল একই প্রযত্নে গড়ে উঠেছে। প্রবন্ধ ও কথা-সাহিত্যের ভাষা ও স্টাইলগত ব্যবধান যে একেবারেই নেই তার উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত প্রমথ চৌধুরীর রচনাবলী। এর কারণ একাধিক। প্রথমতঃ, প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধ যেমন প্রচলিত প্রবন্ধের রীতিকে লঙ্ঘন করেছে, তেমনি তাঁর গল্পও প্রচলিত গল্পের মতো নয়। এখানে যেন লেখককে এই দুটি স্বতন্ত্র মার্গের জন্য স্বতন্ত্র শিল্পনীতির আশ্রয় নিতে হয়নি। দ্বিতীয়ত, প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধাবলীতে যে বৈঠকী মেজাজ ও আলাপচারিতার রীতি সুস্পষ্ট লক্ষ্য, গল্পগুলিতে এর ব্যতিক্রম হয় নি। কথার রসে কথা সৃষ্টি হ'য়েছে। সূক্ষ্ম সুচতুর বুদ্ধি-মার্জিত সরস কথকতায় প্লট রচিত হ'য়েছে। গল্পটি যেন আগে থেকেই তৈরী থাকে না, আলাপ-আলোচনার বিশেষ মুহূর্তে গল্পরস ধীরে ধীরে জমে উঠে—পদ্ধতি অনেকটা একাঙ্কিকা রচয়িতার। গল্পের ভাষাতেও এখানে সুকর্ষণা ও প্রযত্নের চিহ্ন বিদ্যমান। 'চার-ইয়ারী-কথা'র গদ্যরীতির মধ্যে আতিশয্য নেই। পরবর্তী কালের কোন কোন গল্পে আতিশয্য আছে।

সুবিন্যস্ত শব্দ-গ্রন্থন, গাঢ়বন্ধ পরিমার্জিত প্রকাশ-নিপুণ বাক্‌রীতি,—মাঝে মাঝে শ্লেষের লাবণ্য ও অলঙ্কারের দ্যুতি ছড়িয়ে দিয়ে আকর্ষণীয় ক'রে তোলা

হ'য়েছে। কখনও কখনও তীক্ষ্ণ-দীপ্ত জীবন-সমালোচনা লেখকের মনোভাব সুপরিস্ফুট করেছে, 'আমার চোখে আমাদের সামাজিক জীবন একটা বিরাট পুতুল নাচের মত দেখাত। নিজে পুতুল সেজে আর একটি সালঙ্কারা পুতুলের হাত ধরে, এই পুতুল সমাজে নৃত্য করবার কথা মনে মনে করতেও আমার ভয় হত।' সীতেশ তাঁর আত্মকাহিনীর বর্ণনায়, যে ভাষায় নিজের চরিত্র বিশ্লেষণ করেন তার মধ্যে প্রমথীয় পরিহাসের চূড়ান্ত সিদ্ধি আছে, 'স্ত্রীজাতির দেহ ও মনের ভিতর এমন একটি শক্তি আছে, যা আমার দেহ মনকে নিত্য টানে। সে আকর্ষণী শক্তি কারও বা চোখের চাহনিতে থাকে, কারও বা মুখের হাসিতে, কারও বা গলার স্বরে, কারও বা দেহের গঠনে। এমন কি শ্রীঅঙ্গের কাপড়ের রঙে, গহনার ঝঙ্কারেও, আমার বিশ্বাস, যাদু আছে। মনে আছে, একদিন একজনকে দেখে আমি কাতর হ'য়ে পড়ি, সেদিন সে ফলসাই-রঙের কাপড় পরেছিল—তারপর তাকে আশমানি রঙের কাপড় পরা দেখে আমি প্রকৃতিস্থ হয়ে উঠলুম।'—বীরবলের পরিহাস-রসিকতা, বাক্‌-বৈদগ্ধ্য, তীক্ষ্ণাগ্র এপিগ্রাম প্রয়োগ 'চার-ইয়ারী-কথা'কে বিশিষ্ট শিল্পরূপ দিয়েছে। বিদ্রূপাত্মক মনোভাবের প্রকাশ সর্বত্র সমান নয়। অবশ্য উচ্চকণ্ঠ প্রবল হাস্যবেগের মুহূর্ত খুব কমই আছে—কিন্তু সর্বত্রই একটি প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ ও চাপা হাসির বিদ্যুৎ অতি সূক্ষ্ম তাড়িতক্রিয়ার মত সঞ্চারিত। এখানেই খাঁটি বীরবলী রসিকতার বৈশিষ্ট্য।

চার

'চার-ইয়ারী-কথা' প্রমথ চৌধুরীর কথাসাহিত্য রচনার প্রথম পর্বে রচিত হয়। 'চার-ইয়ারী-কথা'র পূর্বে তিনি গল্প লিখেছিলেন, কিন্তু গ্রন্থাকারে প্রকাশিত সর্বপ্রথম গল্পগ্রন্থ 'চার-ইয়ারী-কথা।' অবশ্য প্রবন্ধ ও কবিতার সঙ্কলন পূর্বেই প্রকাশিত হ'য়েছিল। সবুজপত্র-পর্বের প্রথম দিকেই এই অসাধারণ গ্রন্থটি রচিত হ'য়েছিল। শিল্পকর্ম ও রূপ রচনার অনন্যতায় 'চার-ইয়ারী-কথা' প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্য সাধনার মধ্যমণি। এমন নিটোল ও সম্পূর্ণাঙ্গ গল্প তিনি পরেও আর লেখেননি। তাঁর শিল্পকর্ম লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, এখানে একটি প্রৌঢ় পরিণতির ছাপ আছে। মানসিক অনুশীলন তাঁর দীর্ঘকালের। 'চার-ইয়ারী-কথা'র পূর্বে তাঁর সুদীর্ঘ সাহিত্যচর্চার ধারাবাহিক ইতিহাস নেই সত্য, কিন্তু কাঁচা হাত ও অপরিণত মন নিয়ে যে তিনি গল্প লিখতে বসেন নি, তার বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। আসল কথা তিনি দীর্ঘকালের সাধনা ক'রেছেন—মনকে তৈরী করার

সাধনা। চিন্তা, বিচার ও বুদ্ধির মধ্যে কোথায়ও জড়তা নেই—এই পরিচ্ছন্ন মন তার লেখনীর সঞ্চালনেও ফুটেছে—এখানে ক্রোচে বর্ণিত 'ইনটুইশ্যান' ও 'এক্সপ্রেশ্যান' পার্বতী-পরমেশ্বর একাত্মতায় গ্রথিত। তাই পঞ্চাশ বছরের কাছাকাছি এসে তিনি যখন চার ইয়ারের প্রেমের অভিজ্ঞতা বর্ণনা ক'রেছেন, তখন পাঠক-সাধারণের মনেও বিস্ময়ের সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু লেখার লোভ দমন করে কতকাল ধ'রে যে তিনি তাঁর ক্ল্যাসিক মনটি সযত্নে তৈরী করেছেন, তা ভাবলে আরও বিস্মিত হ'তে হয়।[8] দীর্ঘকালের মানস-প্রস্তুতির ফলেই 'চার-ইয়ারী-কথা'র মতো এমন একটি অসাধারণ শিল্প গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছে।

'চার-ইয়ারী-কথা'র চারটি গল্পের পটভূমিকা হয় কলকাতা না হয় লণ্ডন—কিন্তু লণ্ডনের চিত্রই যেন স্পষ্টতর। কারণ কলকাতার গল্পেও লণ্ডনের স্মৃতিই প্রাধান্য লাভ করেছে। প্রথম ও শেষ গল্পের পটভূমিকা কলকাতার, কিন্তু প্রভাব যেন লণ্ডনেরই বেশী। প্রতিদিনের প্রাত্যহিক জীবন, বাঙালী মধ্যবিত্ত তরুণদের প্রণয়-কাহিনী ও জীবন-চর্যা থেকে তাঁর কাহিনীর জগৎ বহুদূরে। প্রমথ চৌধুরী নব্যতন্ত্রী লেখকদের গুরুস্থানীয়, তাঁর প্রবন্ধাবলীতে তিনি আধুনিক জীবনের ভাষ্য রচনা করেছেন, কিন্তু কথাসাহিত্যের জগৎটি মোটেই আধুনিক নয়। হয় প্রাচীনবাংলার জমিদার-অধ্যুষিত গ্রামজীবনের জমিদারের বৈঠকখানা, না হয় দেশীয়রাজ্যের মার্গ সঙ্গীতের কলাবতী-পরিবেশ, আর না হয় কলকাতা লণ্ডনের উনিশ শতকের বিচিত্র জীবনধারা—প্রমথ চৌধুরীর কাহিনীগুলির পক্ষে এই পরিবেশ যেন অত্যাবশ্যক। অথচ একে ঠিক অবাস্তব বলাও সঙ্গত হবে না—কারণ এ জগতও ঠিক তাঁর অদেখা ও অজানা নয়। 'চার-ইয়ারী-কথা'র মূলকাহিনীটির পরিবেশ অজানা নয়ঃ কলকাতার একটি ক্লাবঘরে চারবন্ধুর তাসের আসর। কিন্তু তাদের কথাবলার ভঙ্গি ও বিষয়বস্তু অ-সাধারণ অর্থাৎ আমাদের সাধারণের নয় ও প্রত্যাহিকের নয়। চরিত্র, ঘটনা ও পরিবেশ সব কিছুই অসাধারণ—ক্ল্যাসিক্যাল মানসিকতায় ও রূপচর্যার (Aesthetics) স্পষ্টোজ্জ্বল প্রতিফলনে চার ইয়ারের অভিজ্ঞতালব্ধ কাহিনীগুলির একটি নূতন ধরণের আস্বাদন আছে।

নূতন ধরণের আস্বাদনটি কি? সাধারণ অর্থে 'চার-ইয়ারী-কথা' চারটি প্রেমকাহিনীর সঙ্কলন, কিন্তু সাধারণ প্রেমের কাহিনীর সঙ্গে এর পার্থক্য আছে। মনস্তত্ত্বের দীর্ঘ-বিসর্পিল বর্ণনার চেয়ে তিনি যেন ইন্দ্রিয়জ রূপজ্ঞানের সাধনারই পক্ষপাতী। প্রেমের গভীর হৃদয়াবেগের আলোড়নকে তিনি বিদ্রূপ ক'রে একটি

বিশেষ ধরণের রূপরসচর্চাকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বলাকা' কাব্যে ও 'ফাল্গুনী' নাটকে 'ভোগের ভোগবতী পার হয়ে', অনাসক্ত যৌবনের তটসীমায় উপস্থিত হয়েছেন। প্রমথ চৌধুরীও তাঁর 'কৈফিয়ৎ' কবিতায় তাঁর এই দ্বিতীয় যৌবনের বর্ণনা দিয়েছেন :

'হারানো প্রাণের ফের করিতে সন্ধান,
সভয়ে চলিল ফিরে বাণীর ভবনে,
হেথায় উঠিছে চির-আনন্দের গান।
আবার ফুটিল ফুল হৃদয়ের বনে,
সে দেশে প্রবেশি, গেল মনের আক্ষেপ,
করিলাম পদার্পণ দ্বিতীয় যৌবনে।'[৫]

ইন্দ্রিয়জ রূপের তিনি ভক্ত ছিলেন, কিন্তু সে রূপের মধ্যে একটি অনাসক্ত মহিমা ছিল, তাই তাঁর রূপ-চেতনা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়েও ইন্দ্রিয়-বিহ্বল নয়। রূপ-চেতনায় তিনি অতীন্দ্রিয়তা ও রুচিহীনতার বিরোধী। তিনি রূপজ্ঞানের কথা বলতে গিয়ে গ্রীকো-ইতালীয় সভ্যতা ও সংস্কৃত সাহিত্যের কথা উল্লেখ করেছেন, 'সে সভ্যতারও শুধু আত্মা নয়,—দেহ ছিল—এবং সে দেহকে আমাদের পূর্ব-পুরুষেরা সুঠাম ও সুন্দর করে গড়তে চেষ্টা করেছিলেন। সে দেহ আমাদের চোখের সম্মুখে নেই বলেই আমরা মনে করি যে, সেকালে যা ছিল তা হচ্ছে অশরীরী আত্মা।'[৬] অথচ এই রূপজ্ঞানের সঙ্গে তাঁর স্থূল সম্ভোগআকাঙ্ক্ষা কোথায়ও জড়িয়ে নেই, এইজন্যই সম্ভবত ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠেছে। 'চার-ইয়ারী-কথা'য় নারীরূপের বর্ণনায় তিনি তাঁর বিশেষ ধরণের রূপজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন :

[ক] 'দেখি, কিছুক্ষণ আগে যে চোখ হীরার মত জ্বলছিল, এখন তা নীলার মত সুকোমল হয়ে গেছে ;—একটি গভীর বিষাদের রঙে তা স্তরে স্তরে সজ্জিত হ'য়ে উঠেছে ;—এমন কাতর এমন করুণ দৃষ্টি আমি মানুষের চোখে আর কখনও দেখি নি।'

[খ] 'ইস্পাতের মত নীল, ইস্পাতের মত কঠিন দুটি চোখের কোণ থেকে সে হাসি ছুরির ধারের মত চিকমিক করছে।'

[গ] 'তার মুখের আধখানা ছায়ায় ঢাকা পড়াতে বাকি অংশটুকু স্বর্ণমুদ্রার উপর অঙ্কিত গ্রীকরমণীর মূর্তির মত দেখাচ্ছিল—সে মূর্তি যেমন সুন্দর, তেমনি কঠিন।'

প্রকৃতির বর্ণনাতেও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য চিত্র ও ভাস্কর্যের রীতিই অবলম্বিত হয়েছে, 'মাথার উপরে সোনার আকাশ, পায়ের নীচে সবুজ মখমলের গালিচা, চোখের সুমুখে হীরেকষের সমুদ্র, আর ডাইনে বাঁয়ে শুধু ফুলের-জহরৎ-খচিত গাছপালা—সে পুষ্পরত্নের কোনটি বা সাদা, কোনটি বা লাল, কোনটি বা গোলাপী, কোনটি বা বেগুনী।'—আসল কথা রূপবর্ণনাতে তিনি ক্ল্যাসিক্যাল মার্গের পথিক—রঙে ভঙ্গিতে ও স্পষ্টতায় এর স্বাক্ষরই পরিস্ফুট। প্রমথ চৌধুরীর ক্ল্যাসিক্যাল রূপজ্ঞান তাঁকে মোহাবিষ্ট করতে পারে নি, তার কারণ তাঁর অতন্দ্র বুদ্ধি ও অনাসক্ত দৃষ্টি। তাই ইন্দ্রিয়-নির্ভর রূপজ্ঞানের পরিচয় দিলেও তাঁর রূপজ্ঞান কীট্সীয় সৌন্দর্যচেতনা থেকে স্বতন্ত্র। 'চার-ইয়ারী-কথা' প্রেম-বৈচিত্র্যের কাহিনী হয়েও রূপ-রসচেতনার আলোকে উদ্ভাসিত—সে রসচেতনা প্রথম-যৌবনে হওয়া সম্ভব নয়, 'কল্পনা থেকে কামনার খাদ গিয়ে বাকী থাকে স্বর্ণাভা'—একমাত্র দ্বিতীয় যৌবনের দৃষ্টি ছাড়া যাকে দেখা যায় না।

পাঁচ

'চার-ইয়ারী-কথা' আলোচনা প্রসঙ্গে সবচেয়ে বেশী মনে পড়ে প্লেটোর সুবিখ্যাত 'সিম্পোসিয়াম'-এর কথা। মানব-মনীষার সর্বশ্রেষ্ঠ যুগেও প্লেটোর এই গ্রন্থটি তাঁর চূড়ান্ত সিদ্ধি হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে। এথেন্সের তৎকালীন এই শ্রেণীর ভোজসভা ও আলোচনায় তাঁদের মানসিক উৎকর্ষেরও পরিচয় পাওয়া যায়। প্রেমকে অবলম্বন করে তৎকালীন শ্রেষ্ঠ জ্ঞানীগুণীদের আলোচনা ও বিতর্ক নাটকীয় সংলাপের মাধ্যমে গ্রথিত হয়েছে। সংলাপগুলির বৈশিষ্ট্য থেকে বক্তার ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। একই বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করে বিভিন্ন বক্তা তাঁদের নিজস্ব বক্তব্য নিবেদন করেছেন। সর্বশেষে সক্রেটিস সকলের বক্তব্য সমন্বয় করেছেন—গ্রন্থের মধ্যে এই অংশটুকু সবচেয়ে মূল্যবান। 'চার-ইয়ারী-কথা' আর 'সিম্পোসিয়াম' এক নয়—সক্রেটিসের সময়ের গৌরবোজ্জ্বল এথেন্স ও উনিশ শতকের লণ্ডন-কলকাতা এক নয়। প্লেটোর গ্রন্থে প্রেমতত্ত্বের দার্শনিক গভীরতা আছে, আর প্রমথ চৌধুরী প্রেমের অসঙ্গতি ও ব্যঙ্গাত্মক দিককেই প্রধানত দেখিয়েছেন। তথাপি প্রাচীন এথেন্সের জীবনচর্যা, বৈদগ্ধ্য ও পরিশীলিত ভাবজীবন কলকাতা বা লণ্ডনের উনিশ শতকের পরিবর্তিত সমাজ জীবনের মধ্যেও যেন কিঞ্চিৎ ছায়াপাত ক'রছে। 'চার-ইয়ারী-কথা'র নায়কেরা সক্রেটিস, অ্যারিস্টোফিনিসের মত অসাধারণ

নন, কিন্তু অভিজাতরুচি, মার্জিত বুদ্ধি ও পরিশীলিত মনন তাঁদের চরিত্রকে আভিজাত্য দিয়েছে। সিম্পোসিয়াম সম্পর্কে বলা হ'য়েছে, 'The company, many of them suffering from the drinking bout of the previous evening, welcomes the suggestion that this evening be spent in praise of love. Each speaks according to his lights, and as personalities and opinion contrast and interweave, the diologue comes to life.'[৭]—'চার-ইয়ারী-কথা' পড়ে শরৎচন্দ্র সেদিন যে মন্তব্য ক'রেছিলেন তা অত্যন্ত মূল্যবান, 'আপনার লেখার এই সহজ শান্ত রিফাইণ্ড বলার ভঙ্গিটাই আমাকে সবচেয়ে মুগ্ধ করে। তাইতেই সেদিন লিখেছিলুম ওই চার-ইয়ারী-কথাগুলো ঠিকমত বোঝবার জন্য পাঠকের Education এবং কালচার একটা বিশেষ পর্যায়ে পৌছান দরকার। তা না হ'লে এর সমস্ত সৌন্দর্যই তার কাছে ঝুটা হয়ে যাবে।'[৮]

'চার-ইয়ারী-কথা' সংলাপ-চতুর প্রমথ চৌধুরীর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি—সংলাপ বৈচিত্র্যই বিভিন্ন বক্তার চরিত্র-বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলেছে। সংলাপগুলির পেছনে আছে দীর্ঘদিনের প্রযত্ন ও সাধনা, কিন্তু কত সহজ ও কত অক্লেশ এর প্রকাশ। প্রমথ চৌধুরী একালের হ'য়েও পরিচ্ছন্ন চিন্তায় ও সুস্পষ্ট প্রকাশে ক্ল্যাসিক্যাল। এ কালের কলকাতার মানুষ হ'য়েও মানসিকতায় তিনি গ্রীকো-রোমান ভাবুকতার অনুসারী—তাই 'চার-ইয়ারী-কথা' প্রসঙ্গে সিম্পোসিয়ামের কথা মনে হওয়া স্বাভাবিক। অস্কার ওয়াইল্ড-এর সংলাপ-বাহন সাহিত্যিক ও রসতাত্ত্বিক আলোচনাগুলির কথাও[৯] এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা চলতে পারে। কিন্তু ইংরেজ লেখকের গদ্যরীতির গীতি-সুষমা প্রমথ চৌধুরীর রচনায় অনুপস্থিত। 'চার-ইয়ারী-কথা'র পাঠকের কাছে মার্কিন লেখক অলিভার ওয়েন্ডেল হোমস-এর Autocrat of the Breakfast table-এর কথা মনে পড়বে। গ্রন্থটি সংলাপ-মুখ্য ও বৈঠকী রীতিতে লিখিত—একাধিক পাত্রপাত্রী থাকলেও বক্তা প্রধানত একজন। তবে এ ধরণের লেখাগুলিতে প্রধানত আলোচনা, উত্তর-প্রত্যুত্তর ও বিতর্কের মধ্যে শিল্প-সংস্কৃতি ও সাহিত্য সম্পর্কে মূল্যবান প্রসঙ্গ থাকে। কিন্তু 'চার-ইয়ারী-কথা'র মধ্যে যে নিটোল গল্পাংশ আছে অস্কার ওয়াইল্ড বা হোমসের রচনার মধ্যে তা অনুপস্থিত। অভিজাতরুচি বৈঠকী আলাপের স্বাদ ও

গন্ধ এই সমস্ত ইংরেজী রচনার খুব বড় সম্পদ—প্রমথ চৌধুরী বাংলাসাহিত্যে এই শ্রেণীর মানসিকতায় অগ্রগণ্য। কিন্তু গল্প হিসাবেও চারটি গল্পের মূল্য কম নয়। পরবর্তী কালেও এ শ্রেণীর গল্প তিনি খুব কমই লিখেছেন।

'চার-ইয়ারী-কথা' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'এখন মনে হচ্ছে তোমার গল্পগুলো উল্টো দিক দিয়ে সুরু হলে ভালো হ'ত। তোমার শেষ গল্পটা সবচেয়ে human। গল্পে প্রথম পরিচয়ে সেইটে সহজে লোকের হৃদয়কে টানত—তারপর অন্য গল্পে মনস্তত্ত্ব এবং আর্টের বৈচিত্র্য তারা মেনে নিত। এবারকার দু'টি নায়িকাই ফাঁকি—একটি পাগল আর একটি চোর, কিন্তু নায়িকার প্রতি, অন্তত পুরুষ পাঠকের যে স্বাভাবিক মনের টান আছে, সেটাকে এমনতর বিদ্রূপ করলে নিষ্ঠুরতা করা হয়। সব পাঠকের সঙ্গেই তো তোমার ঠাট্টার সম্পর্ক নয়—এজন্যই তারা চটে ওঠে। তাদের পেট ভরাবার মত কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন দিলেও ইতরে জনাঃ খুসি থাকত। তুমি করালে কিনা 'ঘ্রাণেন অর্দ্ধভোজনং'—কিন্তু কথাটা একেবারে সত্য নয়—বস্তুত, ঘ্রাণেন দ্বিগুণ উপবাস। মানুষ যখন ঠকে তখন সহজে একথা বলতে পারে না যে, ঠকেছি বটে কিন্তু চমৎকার।'[১০] রবীন্দ্রনাথের মতে 'চার-ইয়ারী-কথা'র শেষ গল্পটি সবচেয়ে human, মন্তব্যটি অযথার্থ নয়। কিন্তু প্রমথ চৌধুরী যে ঘ্রাণেন অর্দ্ধভোজনং করিয়েছেন—তাতে হয়ত তিনি পাঠক সাধারণের সুলভ মনোরঞ্জন করেন নি, কিন্তু তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছেন। পাঠককে মিলন-মধুর গল্প পরিবেশন করেন নি সত্য, কিন্তু প্রেম-রোম্যান্সের প্রতি একটি ব্যঙ্গাত্মক মনোভাব ও অব্যর্থ প্যারাডক্স প্রয়োগ ক'রেছেন। রোম্যান্স বিরোধী শ্লেষাক্ত দৃষ্টিভঙ্গি প্রমথ চৌধুরীর মানসিকতার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য।

ছোটগল্প হিসাবে চারটি গল্পই প্রথম শ্রেণীর ছোটগল্পের লক্ষণাক্রান্ত। গল্পগুলি কোথায়ও শিথিলবন্ধ নয়, বহুভাষণের দুর্লক্ষণ কোথায়ও নেই। গল্প বলতে খুব বেশী উপাদানের প্রয়োজন হয় না—দুজনের কথার কুশলী বিন্যাসে গল্প জমে উঠতে পারে। গাঢ়বন্ধ, সংযত সুডৌল—বুনোনির মধ্যেও একটি সমতা আছে, কুশলী হাতের যাদু আছে। কথার সূক্ষ্ম সোনার সুতো মনকে যখন স্পর্শ করে তখন সুমসৃণ স্পর্শানুভব জাগে ;—আবার গল্পগুলির অবিচ্ছিন্ন ধারার প্রতি যখন দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় তখন মনে হয় কথার জরির অলঙ্করণ

অনায়াসে এগিয়ে চ'লেছে, তার চারিদিকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে পরিমার্জিত বুদ্ধির রৌদ্র-পিচ্ছিল আলো।

ছয়

'চার-ইয়ারী-কথা' কথাশিল্পী প্রমথ চৌধুরীর শ্রেষ্ঠ রচনা। যেদিন এই অসাধারণ কাহিনীটি 'সবুজপত্রের' পৃষ্ঠায় আত্মপ্রকাশ ক'রেছিল, সেদিন সোল্লাস জনপ্রিয়তা হয়তো তার ভাগ্যে জোটে নি, কিন্তু মুষ্টিমেয় কিছু পাঠকের মনে ও বিদগ্ধ সমাজে আলোড়ন তুলেছিল। অন্নদাশঙ্কর রায় তাঁর কৈশোর অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন, 'সবুজপত্র যেদিন বিনুর মতো অবুঝের হাতে প্রথম পড়ল সেদিন সেই দ্বাদশবর্ষীয় বালক আর সব বাদ দিয়ে পড়তে আরম্ভ করল 'চার-ইয়ারী-কথা'। তখন বোধ হয় রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' চলছিল, কিন্তু বিনুর সেদিকে দৃষ্টি ছিল না।'[১১] 'চার-ইয়ারী-কথা'র সঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর মনোজীবন এমন গভীরভাবে সংযুক্ত যে, রচয়িতার অন্তর্জীবনের স্বরূপ উপলব্ধি না করলে এর পূর্ণ রসাস্বাদন সম্ভব নয়। শিল্পীর দীর্ঘকালের সুকর্ষিত রস-সাধনার একটি ইতিহাস এই কাহিনীটিকে গ'ড়ে তুলেছে। তিনি একখানি চিঠিতে এর পরিচয় দিয়েছেন,

'আমি কৈশোর উত্তীর্ণ না হ'তে হ'তেই টের পেয়েছিলুম যে জীবনে কোন্ কোন্ জিনিষ আমাকে অধিকার ক'রে নেবে—beauty, mind—এবং এটাও বুঝতে বাকি ছিল না যে আমার মনোজগতের কেন্দ্র হবে The Eternal Feminine—তবে তখন বিশ্বাস ছিল যে সাহিত্য জগতেই ঐ জিনিস পাব—এবং realise করব! Shelley-র Alastor-এর মতো একটি মানসী রমণীর আজীবন উপাসনা করব। যদি কখন মনে হত শুধু কল্পনা জগতে যদি মনের আশ না মেটে—তা হ'লেও ঠিক বুঝতে পারতুম না যে Danteর Beatrice-এর মতো একটি মর্ত্যরমণীতে সমগ্রভাবে Eternal Feminine-এর সাক্ষাৎ পাব, না Don Juan-এর মতো আংশিকভাবে তা খুঁজে বেড়াব। এ কথা বোধ হয় তোমাকে বুঝিয়ে বলতে হবে না যে Dante এবং Don Juan এক হিসেবে এক জাতির লোক, উভয়েই স্ত্রীগত প্রাণ—অমিল শুধু স্বভাবের অন্য অংশে, এবং অবস্থার বৈচিত্র্যে। কথাটা হঠাৎ শুনতে হয়তো একটু খারাপ লাগে,—কারণ সামাজিক শিক্ষার প্রভাবে যে সংস্কারটি আমাদের মনে বসে গেছে তাতে অবাক লাগে। কিন্তু

আমি কিভাবে বলছি বোধ হয় বুঝতে পারছ—কেবল খাঁটি মনোবিজ্ঞানের হিসাবে—সামাজিক কিম্বা নৈতিক কিম্বা spiritual হিসেবে নয়—তাতে ও উভয়ের ভিতর আসমান জমিন্ ফারাক্।'[১২] এই জাতীয় উপলব্ধির সঙ্গে বিলাত প্রবাসের স্মৃতি মিশে 'চার-ইয়ারী-কথা' রচিত হ'য়েছে।

১৯৪৪-র জুন মাসে 'Tales of four friends' নামে 'চার-ইয়ারী-কথা'র ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়। অনুবাদ ক'রেছিলেন ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী। এই অনুবাদ গ্রন্থটি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তৎকালীন 'টাইমস লিটারেরি সাপ্লিমেণ্ট' লিখেছেন: '...the Indian's attempt to write the Counterpart of such tales as Mr. Kipling's 'without benifit of clergy' and Pierre Loti's accounts of exoitc amours.' —পিয়ের লোতি ও কিপলিং-এর গল্পের আস্বাদন প্রমথ চৌধুরীর গল্পে পাওয়া যায় কিনা তাও এই প্রসঙ্গে বিচার্য। পিয়ের লোতি [১৮৫০—১৯২৩] উনিশ শতকের বাঙালী সাহিত্যিকদের কাছে একজন অত্যন্ত প্রিয় লেখক ছিলেন। সেকালে তাঁর রচনার অনুবাদও হয়েছিল।[১৩] তিনি পেশায় নৌ-বিভাগের কর্মচারী কিন্তু তাঁর নেশা ছিল সাহিত্যচর্চা। তাঁর কাহিনীগুলির পটভূমিকা যেমন বিচিত্র, তেমনি বর্ণময়। সমাজ-জীবনের সমতলবাহিত ধারা তাঁকে কোনক্রমেই আকৃষ্ট করতে পারে নি—তাঁর উপন্যাসগুলি যেন যন্ত্র-জীবিত পশ্চিমী জীবনের তীব্র প্রতিবাদ।[১৪] তাই তাঁর কাহিনী-গুলির সংস্থান বিচিত্র দেশ-কালের পটভূমিকায়। —বিশেষত সমুদ্রচারী মানুষের জীবনচর্যা ছিল তাঁর নখ-দর্পণে। তাঁর অধিকাংশ প্রেম-কাহিনীই বিয়োগান্ত—সম্পূর্ণ অপরিচিত বৈদেশিক পটভূমিকায় জাতি-ধর্মের বৈষম্যই নর-নারীর মিলনের পক্ষে দুস্তর অন্তরায় হ'য়ে উঠেছে। পিয়ের লোতির সঙ্গে ইংরেজ কবি ও কথাসাহিত্যিক রাডিয়ার্ড কিপলিং (১৮৬৫—১৯৩৬)-এর দু'একটি ক্ষেত্রে মিল আছে, আত্মিক সম্পর্কও যে না আছে এমন নয়। কিপলিং-এর কাহিনীগুলিরও ঘটনাস্থল প্রাচ্য ভূখণ্ড। ভারতীয় জীবনের পটভূমিকায় প্রধানত প্রবাসী সৈনিকদের জীবনকে তিনি অন্তরঙ্গ ভঙ্গির সাহায্যে ফুটিয়ে তুলেছেন। সৈনিক জীবনের নির্মমতা, রুক্ষতা, স্থূলরুচি ও সরলতাকে জীবন্ত ক'রেছেন। লোতির মতো তাঁর রচনাতেও বিচিত্র চরিত্র সৃষ্টির প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের মুখপাত্র হিসাবে

কিপলিং-এর যত কুখ্যাতিই থাকুক না কেন, বর্ণনাশক্তি, চরিত্রাঙ্কন ও ভাষা-শিল্পের জন্য সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর প্রতিভা স্বীকৃত হ'য়েছে।

লোতি ও কিপলিং-এর মত প্রমথ চৌধুরীরও বিচিত্র পটভূমি ও অদ্ভুত চরিত্র অঙ্কনের প্রতি প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। পিয়ের লোতি পূর্ণমাত্রায় রোম্যান্স-লেখক—ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতাই তাঁর রোম্যান্টিক গল্পগুলির প্রাণ। কিন্তু তাঁর কোন কোন গল্প খণ্ড চিত্র—তাকে ঠিক গল্প বলা সম্ভব নয়। 'চার-ইয়ারী-কথা'র নায়কেরা যে উন্নতরুচি ও মননশীলতার অধিকারী, লোতি বা কিপলিং এর চরিত্রগুলির মধ্যে তার কোন ছাপই নেই। লোতির মদ্যপ নাবিক ও কিপলিং-এর রুচিহীন বর্বর সৈনিক তাদের বেপরোয়া ও উচ্ছৃঙ্খল জীবন-কাহিনী ব'লেছে—চার-ইয়ারের সুমার্জিত বিদগ্ধ-জীবনের সঙ্গে তার কোন তুলনাই চলে না। প্রমথ চৌধুরী তাঁর একটি গল্পে ব'লেছেন, 'আমি তো আর কিপলিং নই যে, মাতালের মুখের ভূতের গল্প দা-কাটা ইংরেজীতে আপনাদের কাছে বলতে পারব।'[১৫] কিপলিং সৈন্য বা নাবিকদের 'শ্ল্যাং' রচনায় দক্ষতা দেখিয়েছেন। প্রমথ চৌধুরীর চরিত্রগুলি সাধারণত সমাজের উচ্চকোটির—তবুও তাঁর কোন কোন গল্পে কিপলিং এর ছায়া পড়ছে, যদিও তার পটভূমিকা ভিন্নতর।

'চার-ইয়ারী-কথা' প্রমথ চৌধুরীর শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্ম। প্রমথ চৌধুরী সম্পর্কে কথা-কোবিদ অন্নদাশঙ্করের মন্তব্য এই প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য, 'চার-ইয়ারী থাকবে। শুধু রচনার স্বাদের জন্যে নয়, সৃষ্টির আর্টের জন্যে নয়, চিত্তের রসের জন্য নয়, যদিও এর প্রত্যেকটি আপনাতে আপনি মূল্যবান। মন দিয়ে অধ্যয়ন করলে অনুভব করা যায় একটি বিদগ্ধ-জীবন রয়েছে ওর পশ্চাতে। ওর অনেকখানি হয়তো কাল্পনিক বা পড়ে পাওয়া। কিন্তু ওর যেটুকু শাঁস সেটুকু একটি রক্তিম হৃদয়ের পদ্মরাগমণি, যেমন উজ্জ্বল তেমনি করুণ। ইচ্ছা করলেই আর একখানা 'চার-ইয়ারী' লেখা যায় না, কেননা ইচ্ছা করলেই আর একবার তরুণ হওয়া যায় না, আর একবার fool হওয়া যায় না। দ্বিতীয় যৌবনে পদার্পণ ক'রে প্রথম যৌবনের swan song গাওয়া হ'য়েছে ওতে।'[১৬]

১. জানুয়ারী, ১৯১৬।

২. কল্পনা কম্বোজ ঘোড়া, বয়সে হ'য়েছে খোঁড়া
চলে তিন পায়ে।
ভোঁতা হ'ল পঞ্চবাণ প্রেমের উজান বান
নাহি ডাকে মনে। —পত্র : পদচারণ।

আবার অন্যত্র বলেছেন :

প্রিয় কবি হতে চাও, লেখ ভালবাসা,
যা পড়ি গলিয়া যাবে পাঠকের মন।
তার লাগি চাই কিন্তু দু'টি আয়োজন,
জোর-করা ভাব, আর ধার করা ভাষা। —উপদেশ : সনেট পঞ্চাশৎ।

৩. বালজাক, ডিকেন্স, টলস্টয়, ডষ্টয়েভস্কির ভাষা ও ষ্টাইল-গত দুর্বলতার উল্লেখ ক'রে সমারসেট মম ব'লেছেন, 'It looks as though to write well were not an essential part of the novelist's equipment ; but that vigour and vitality, imagination, creative froce, observation, knowledge of human nature, with an interest in it and sympathy with it, fertility and intelligence are more important.' (Great Novelists and their novels).

৪. 'তাঁর রচনার প্রসাদগুণ তাঁর মনেরই প্রতিফলন আর তাঁর মনের পশ্চাতে করেছে বহুদিনের মনন ও রোমন্থন। চৌধুরী মহাশয় তাঁর মনটিকে তৈরী ক'রেছেন সক্লেশে, তাই তাঁর বাগবিস্তার এত অক্লেশ। তাই তাঁর ভাষিতগুলির মধ্যে এতগুলি সুভাষিত।...আমার অনুমান তিনি তাঁর মনের অনুশীলন ক'রেছেন কথোপকথনে।' বীরবল : জীবনশিল্পী : অন্নদাশঙ্কর রায়।

৫, কৈফিয়ৎ : পদচারণ।

৬. রূপের কথা : বীরবলের হালখাতা।

৭. Dialogues of Plato : Edited by J. D. Kaplan,

৮. ১১. ১০. ১৬তে লেখা শরৎচন্দ্রের চিঠি : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত।

৯. The critic as artist.

১০. চিঠিপত্র : পঞ্চম খণ্ড।

১১. বীরবল : জীবনশিল্পী : অন্নদাশঙ্কর রায়।

১২. ৩. ১০. ৯৮-এ লেখা ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীকে লেখা চিঠি, বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ—আষাঢ়, ১৩৫৪।

১৩. জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রিয়নাথ সেন, প্রমথ চৌধুরী তাঁদের একাধিক রচনায় লোতির উল্লেখ ক'রেছেন। লোতি একসময় ভারত ভ্রমণ ক'রেছিলেন। তাঁর ভারতভ্রমণের অভিজ্ঞতা গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর 'ইংরেজ-বর্জিত ভারতবর্ষ' নাম দিয়ে এর একটি অনুবাদ প্রকাশ করেন (১২ই মার্চ, ১৯০৯)।

১৪. 'In his day, Loti represented a sentimental protest against the mechanical progress of the West, an understandable escape into the calm of Asia and elsewhere which world events have terribly dated'.—A short history of French Literature : Geoffrey Brereton.

১৫. ভূতের গল্প : নীল-লোহিত।

১৬. বীরবল : জীবনশিল্পী : অন্নদাশঙ্কর রায়।

কবিতা, কথাসাহিত্য ও প্রবন্ধ—প্রমথ চৌধুরীর রচনাবলীকে স্থূলত এই তিনটি ভাগেই ভাগ করা যায়। কিন্তু রচনাপরিধির দিক থেকে তাঁর প্রবন্ধ অন্য দু'টি বিভাগকে অতিক্রম ক'রেছে। তা ছাড়াও প্রবন্ধকার প্রমথ চৌধুরীর প্রভাবই ব্যাপকতর। চণ্ডীপাঠ থেকে জুতো সেলাই পর্যন্ত যাবতীয় বিষয় প্রবন্ধ-সাহিত্যের এলাকাভুক্ত, তাই বীরবলের বিচিত্র-রসিক মন সম্ভবত প্রবন্ধের মাধ্যমেই অধিকতর সার্থক হ'য়েছে। বীরবলী গদ্য স্টাইল বলতে যা বোঝায় প্রবন্ধাবলীই তার শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। কবিতা ও গল্প যেন তিনি প্রবন্ধকারের মেজাজ নিয়েই লিখতে বসেছিলেন। সুতরাং প্রবন্ধকার প্রমথ চৌধুরীই যেন সাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরীর স্বরূপ। বিষয়ের নানামুখী বৈচিত্র্যে ও প্রকাশ-রীতির অভিনবত্বে তিনি বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের ইতিহাসে একটি নূতন অধ্যায় সংযোজিত ক'রেছেন। আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের পরেই সবচেয়ে বেশী প্রভাব প'ড়েছে প্রমথ চৌধুরীর।

প্রবন্ধ সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরীর স্বকীয়তা ও বৈশিষ্ট্যকে স্বীকার ক'রেও একথা অনায়াসেই বলা যায় যে প্রাক্-সবুজপত্র অধ্যায়ে প্রবন্ধ সাহিত্যের পূর্ণ সমৃদ্ধিই ঘটেছিল। অনলঙ্কৃত বিষয়াশ্রিত প্রবন্ধ দিয়েই বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের সূত্রপাত হ'য়েছিল। বঙ্গদর্শনের পূর্বে বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে সাহিত্যিক মেজাজটি সম্পূর্ণরূপে আত্মপ্রকাশ করতে পারে নি। রামমোহন রায়ের শাস্ত্রালোচনায় ও ধর্মবিষয়ক বিতর্কাদিতে সাহিত্যরস ছিল অনুপস্থিত। তার কারণ রামমোহনের ভাষা ছিল প্রধানত বিতর্কের ভাষা—বক্তব্যটি সেখানে বড় ছিল, বলার কৌশলটি নয়।[১] বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বাংলা গদ্যের জনক বলা হয়—কিন্তু বিদ্যাসাগরের সমাজ-সংস্কারমূলক প্রবন্ধের মধ্যেও ঠিক সাহিত্যিক গদ্যের পূর্ণতর নিদর্শন পাওয়া যায় না। অক্ষয়কুমার দত্ত, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রাক্-বঙ্কিমপর্বের প্রবন্ধকার হিসাবে খ্যাতি লাভ ক'রেছিলেন। অক্ষয়-কুমারের প্রবন্ধাবলী বিষয়নিষ্ঠ—জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়কে তিনি সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় প্রকাশ করেন। তাঁর পদ্ধতি ছিল সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। অক্ষয়কুমারে রচনার মধ্যে সাহিত্যরস খুব বেশী ছিল না, কিন্তু বহুবিচিত্র জ্ঞানের মূল্যবান সঞ্চয়নে তিনি প্রবন্ধ সাহিত্যকে সমৃদ্ধ ক'রেছেন। দেবেন্দ্র-নাথের প্রবন্ধাবলীর আস্বাদন অক্ষয়কুমারের প্রবন্ধের আস্বাদন থেকে স্বতন্ত্র—

তাঁর রচনায় তৎসম শব্দপ্রয়োগ অনেক কম, ভাষাও সহজ ও সুকুমার, ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্মসমাজ সম্পর্কিত প্রবন্ধাবলীর ভঙ্গি সরল ও হৃদয়গ্রাহী। দেবেন্দ্র-নাথের আত্মজীবনী এই যুগের একটি স্মরণীয় গ্রন্থ। ব্যক্তি ও বিষয়ের অদ্বৈতসিদ্ধির ফলে এই গ্রন্থটিতে বাংলা গদ্যে একটি নূতন স্টাইলের সূত্রপাত ঘটেছে। রাজনারায়ণ বসু দেবেন্দ্রনাথের বাংলা রচনা সম্পর্কে ব'লেছেন, 'দেবেন্দ্রবাবু ধর্মপ্রবর্তক বলিয়া বিখ্যাত, কিন্তু বঙ্গভাষা তাঁহার নিকট উক্ত ব্যাখ্যান প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ প্রণয়ন নিমিত্ত এবং অন্যান্য কারণ জন্য কতই উপকৃত তাহা বলা যায় না।'[২]

প্রাক্-বঙ্কিম যুগে হিন্দুকলেজগোষ্ঠীর প্রবন্ধকারদের মধ্যে রাজনারায়ণ বসু ও ভূদেব মুখোপাধ্যায় একটি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। রাজনারায়ণের রচনায় বিষয়-বৈচিত্র্য কম ছিল না। তাঁর ধর্মসম্পর্কিত প্রবন্ধ ছাড়াও 'সেকাল আর একাল', 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব,' 'বৃদ্ধ হিন্দুর আশা', 'গ্রাম্য উপাখ্যান', 'আত্মচরিত' প্রভৃতি গ্রন্থে গদ্য রচনার সাবলীল ভঙ্গি চমৎকার ভাবে ফুটে উঠেছে। স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি অনুরাগ গভীর আবেগ ও অন্তরঙ্গতা রাজনারায়ণের ব্যক্তিমানসের ছবি ফুটিয়ে তুলেছে, 'প্রত্যেক ব্যক্তির সম্বন্ধে পৃথিবীর সকল স্থান অপেক্ষা কোন এক বিশেষ স্থান মনোহর।··সেই স্থান তাঁহার স্বদেশ।···সেই স্বদেশ নিরুর্বর ও প্রমোদজনক দৃশ্যশূন্য হইলেও উৎকৃষ্ট অন্য কোন দেশ—এমন কি কাশ্মীরের নির্মল হ্রদ ও মনোহর উদ্যান ও সিরাজের গোলাপ-পুষ্পের উপবন ও নেপলস্-সন্নিহিত জলের ও তটের নয়ন-বিমুগ্ধকর শোভায় হাস্যমান বিখ্যাত উপসাগর পর্যন্ত তাঁহার মনকে আকৃষ্ট করিয়া রাখিতে পারে না ; এমন স্বদেশ ও স্বজাতির ভাষার প্রতি যাহার অনুরাগ নাই তাহাকে কি মনুষ্য মধ্যে বলা যাইতে পারে ?'[৩] ভূদেব মুখোপাধ্যায়ও এ যুগের একজন খ্যাতনামা প্রবন্ধকার ছিলেন। ভূদেবের প্রবন্ধের মধ্যে এক মননশীল, স্থিতধী আত্মস্থ ছবি ফুটে উঠেছে। উনবিংশ শতাব্দীর সেই প্রবল বিপর্যয়ের যুগে, তাঁর খ্যাতনামা সতীর্থ মধুসূদনও রাজনারায়ণ যথাক্রমে খ্রীষ্টান ও ব্রাহ্ম হয়েছিলেন, কিন্তু ভূদেব খাঁটি হিন্দুই রয়ে গেলেন। প্রাচীন হিন্দুধর্ম ও সংস্কারকে তিনি বিচার-বিবেচনাহীন অন্ধ-সংস্কারের বশেই গ্রহণ করেন নি, বিচার বিশ্লেষণ করেই গ্রহণ করেছেন। ভূদেবের প্রবন্ধাবলীর মধ্যে আবেগ কম,—সরল, ঋজু ও নিভূর্ষণ তাঁর গদ্যরীতি। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা, নীতিকথাকেও সাহিত্যিক মর্যাদা দিয়েছে।

ভূদেবের রচনায় কাব্যগুণ নেই—কিন্তু বিষয়-নিষ্ঠায় ও মননশীলতায় তাঁর রচনাবলী বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের ইতিহাসের এক অমূল্য সম্পদ।

প্রাক্-বঙ্কিম যুগের বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের ইতিহাসে এর বিষয়াশ্রিত গুরুত্ব নিঃসন্দেহে একটি প্রধান স্থান অধিকার ক'রেছে। কিন্তু এই বিষয়নিষ্ঠ প্রবন্ধের পাশাপাশি আর এক শ্রেণীর রচনার ধারা লক্ষ্য করা যায়—সামাজিক ব্যঙ্গ-বিদ্রূপমূলক নক্সা। এই শ্রেণীর রচনাকারদের মধ্যে 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'র কালীপ্রসন্ন সিংহের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কালীপ্রসন্নের পূর্বেও এই শ্রেণীর কিছু কিছু রচনার নিদর্শন পাওয়া যায়—তার মধ্যে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ই খ্যাততম। কালীপ্রসন্নের এই খ্যাতনামা গ্রন্থটি তথাকথিত বিষয়নিষ্ঠ প্রবন্ধের প্রচলিত পদ্ধতি অনুসরণ করে নি, কিন্তু অন্যান্য দিক থেকে এই গ্রন্থটি বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। কালীপ্রসন্নের রচনার স্টাইলটিও এই ধরণের রচনার বিশেষ উপযোগী—চলতি ভাষার স্বচ্ছন্দ-প্রয়োগে ও সহজ আলাপচারিতায় তিনি বিস্ময়কর কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। প্রাক্-বঙ্কিম যুগের বাংলা গদ্য—তখনও তার জড়তা সম্পূর্ণ কাটেনি। এই যুগের লেখক হয়েও কালীপ্রসন্ন বিদ্রূপাত্মক সমাজ-চিত্রণে, গাল্পগল্প রচনায় ও আঞ্চলিক 'শ্ল্যাং' ব্যবহারে অনায়াস-সাবলীলতার পরিচয় দিয়েছেন।

দুই

উপন্যাস বাদ দিলেও বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্যরচনায় বৈচিত্র্য ও প্রসারতা কম নয়। বিষয়মুখী ও আত্মমুখী—দু'জাতীয় গদ্যরচনাতেই বঙ্কিমচন্দ্র কলা-কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন। গভীর পাণ্ডিত্য, মননশীলতা ও বিশ্লেষণী দৃষ্টির সঙ্গে উন্নত রসবোধের সহজ সমন্বয় বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধাবলীর বৈশিষ্ট্য। ধর্মতত্ত্ব, ইতিহাস, অর্থনীতি, বিজ্ঞান-বিষয়ক বিচিত্র প্রবন্ধাবলীর মধ্যে অনেকক্ষেত্রেই তাঁর গবেষক-বৃত্তির ছাপ পড়েছে। ভাষা, সাহিত্যবিষয়ক আলোচনার মধ্যেও তাঁর নৈয়ায়িক মনীষার একটি পরিচ্ছন্ন রূপ ফুটে উঠেছে। সংস্কৃতসাহিত্য ও সমসাময়িক বাংলাসাহিত্য সম্পর্কিত আলোচনা ও তুলনামূলক বিচার-পদ্ধতি বঙ্কিমচন্দ্রই প্রবর্তন ক'রেন,—একথা ঐতিহাসিক দিক থেকে গ্রাহ্য নয়, কিন্তু একথা নিঃসন্দেহে স্বীকার করা যায় যে বঙ্কিমচন্দ্রের হাতেই বাংলাসমালোচনা সাহিত্য সর্বপ্রথম একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ পেয়েছে।

শুধু বিষয়-নিষ্ঠ প্রবন্ধ ও সমালোচনাই নয়, বঙ্কিমচন্দ্রের 'লোকরহস্য' 'কমলা-

কান্তের দপ্তর' ও কিছু লঘু-গুরু রচনাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, কারণ এই জাতীয় রচনায় আপাতদৃষ্টিতে লঘু মেজাজের চিহ্ন থাকলেও ব্যক্তি বঙ্কিমকে সবচেয়ে বেশী পাওয়া যায়। বিষয়-নিষ্ঠ প্রবন্ধের বিষয়-বন্ধনের মধ্যে ব্যক্তির পরিচয়টি তেমন ফুটে উঠতে পারে না। Formal Essay ছাড়াও আর এক জাতীয় প্রবন্ধ আছে, যাকে বলা হয় Personal Essay। বিখ্যাত ফরাসী লেখক মেঁাতেন তাঁর প্রবন্ধকে বলেছেন 'Consubstantial'। 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এর বঙ্কিমচন্দ্র সবচেয়ে জীবন্ত—কারণ, আর কোন রচনায় ব্যক্তি বঙ্কিমের অন্তর্জীবন এমনভাবে প্রকাশিত হয় নি। হাস্য-পরিহাস, হৃদয়াবেগ, অন্তর্জ্বালা, স্নিগ্ধ-করুণ বিষন্নতা বঙ্কিম-ব্যক্তিত্বেরই নিবিড় সান্নিধ্য উদ্ভাসিত করে তুলেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের কোন কোন রচনা অতি তুচ্ছ বিষয়কে নিয়ে লেখা—এই জাতীয় Familiar Essay-র পথ-প্রদর্শক প্রকৃতপক্ষে তিনিই। বিংশ শতাব্দীতেও এই ধারা অনেকেই অনুসরণ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম লেখক যিনি গবেষণাধর্মী বিচিত্র বিষয়াশ্রিত প্রবন্ধ, এমন কি 'বেল লেত্যর' জাতীয় রচনা পর্যন্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্বচ্ছন্দ বিচরণ করেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালী লেখকদের সম্মুখে যে রসজগৎ উন্মুক্ত করে দিলেন তার ব্যর্থ ফল হয় নি। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, রামদাস সেন, যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতির মত বিষয়নিষ্ঠ গবেষণাধর্মী প্রবন্ধলেখক যেমন এই যুগে খ্যাতিলাভ করেছিলেন, তেমনি আত্মগতসুরের যে দীক্ষা বঙ্কিমচন্দ্র দিয়েছিলেন, তাতেও বাংলাসাহিত্যে নূতন ভাবের ফসল ফলেছিল। সঞ্জীবচন্দ্রের 'পালামৌ', চন্দ্রশেখরের 'গঙ্গাধর শর্মা ওরফে জটাধারীর রোজনামচা', অক্ষয়চন্দ্র সরকারের লঘু-গুরু রচনা এই যুগের গদ্যরচনার মধ্যে বিশিষ্ট পর্যায়ের অধিকারী—রচনা গুলি ব্যক্তিহৃদয়ের বর্ণে রঞ্জিত হয়েছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ইতিহাস 'বঙ্গ-দর্শন' পর্বে মোটেই সীমাবদ্ধ নয়। কারণ এই শতাব্দী একটি মহাজাতির আত্মপ্রকাশের শতাব্দী। রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সমাজ ও সংস্কৃতিমূলক নানা আন্দোলন এই শতাব্দীর মানস ইতিহাসকে নব সৃষ্টির প্রেরণায় সক্রিয় করে তুলেছিল—প্রবন্ধ সাহিত্য ও বিচিত্র গদ্য রচনা তার ছিল প্রধানতম মাধ্যম। এই যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের রচনায় মননশীলতার দীপ্তির সঙ্গে সুগভীর উপলব্ধি ও হৃদয়া বেগ সমন্বিত হয়েছে। 'বান্ধব'-সম্পাদক কালীপ্রসন্ন ঘোষ এ যুগের একজন খ্যাতনামা প্রবন্ধকার ছিলেন। কালীপ্রসন্নের আবেগের আতিশয্য ও উচ্ছ্বাসের

ফেনিলতা অনেক সময় তাঁর বক্তব্যকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলেছে। তথাপি বহু-পঠনশীল মনের মৌলিক চিন্তাশক্তি ও রসবোধ তাঁর রচনায় অনুপস্থিত নয়। রবীন্দ্র-প্রভাবের পূর্ববর্তী যুগের প্রবন্ধকারদের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শিবনাথ শাস্ত্রীর নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। দ্বিজেন্দ্রনাথ একটি অসাধারণ মানুষ ছিলেন। উচ্চতর গণিত ও তত্ত্ববিদ্যা ছিল তাঁর প্রধান আকর্ষণের বস্তু—কিন্তু সব কিছু ছাপিয়ে তাঁর সদানন্দময় রসিকসত্তাই প্রধান হ'য়ে উঠেছে। শিবনাথ শাস্ত্রীর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' ও 'আত্মচরিত' বাংলা সাহিত্যের দু'টি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। নিজের দেশ-কালের কথাও তিনি অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে ব'লেছেন। নির্মল রসিকতা ও অকপট স্বীকারোক্তি মানুষ শিবনাথকে পাঠকের কাছের মানুষ করে তুলেছে।

সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগের মত প্রবন্ধ সাহিত্যেও রবীন্দ্রনাথ এক নূতন যুগ সৃষ্টি ক'রেছেন। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধগুলির মধ্যে তাঁর কবি-মনীষার অভ্রান্ত স্বাক্ষর আছে। বিষয় যাই হোক না কেন, কবি-মনের রোমাঞ্চিত অনুভূতির স্পর্শে সব-কিছুই অনবদ্যসৃষ্টি হ'য়ে উঠেছে।[৪] ধর্ম, সমাজ, রাজনীতি, সাহিত্য-সমালোচনা, বিজ্ঞান প্রভৃতি নানা বিষয় তাঁর কবিত্বের সোনার কাঠির স্পর্শে অপরূপ হ'য়ে উঠেছে। রবীন্দ্র-প্রতিভা প্রধানত আত্মভাব নিমগ্ন গীতিকবির প্রতিভা—তাই তাঁর নিজের ভাষাতেই বলা যায়, 'যত কথা মোর হইল কবিতা, শব্দ হইল গান।'—রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ সম্পর্কেও এই উক্তিটি প্রযোজ্য। রবীন্দ্রনাথের মনে এক সময় প্রশ্ন জেগেছিল—বিষয়বস্তু ও প্রকাশভঙ্গি, সাহিত্যের পক্ষে কোনটি বড় ? কবির আলোচনা থেকে স্পষ্টই তাঁর অভিপ্রায় বোঝা যায়, 'সাহিত্যে বহুকাল ধরিয়া একটি তর্ক চলিয়া আসিতেছে যে, বলিবার বিষয়টা বেশি না বলিবার ভঙ্গিটা বেশি। আমি এ কথাটা লইয়া অনেকবার ভাবিয়াছি ভালো বুঝিতে পারি না। আমার মনে হয় তর্কের খেয়াল অনুসারে যখন যেটাকে প্রাধান্য দেওয়া যায় তখন সেইটাই প্রধান হইয়া উঠে।'

'ব্যোম মাথাটা কড়িকাঠের দিকে তুলিয়া বলিতে লাগিল,—সাহিত্যে বিষয়টা শ্রেষ্ঠ, না বলিবার ভঙ্গিটা শ্রেষ্ঠ ইহার বিচার করিতে হইলে আমি দেখি কোন্‌টা অধিক রহস্যময়। বিষয়টা দেহ, ভঙ্গিটা জীবন। দেহটা বর্তমানেই সমাপ্ত, জীবনটা একটা চঞ্চল অসমাপ্তি তাহার সঙ্গে লাগিয়া আছে, তাহাকে বৃহৎ ভবিষ্যতের দিকে বহন করিয়া লইয়া চলিয়াছে, সে

যতখানি দৃশ্যমান তাহা অতিক্রম করিয়াও তাহার সহিত অনেকখানি আশাপূর্ণ নব নব সম্ভাবনা জুড়িয়া রাখিয়াছে। যতটুকু বিষয় রূপে প্রকাশ করিলে ততটুকু জড় দেহ মাত্র, ততটুকু সীমাবদ্ধ. যতটুকু ভঙ্গির দ্বারা তাহার মধ্যে সঞ্চার করিয়া দিলে তাহাই জীবন, তাহাতেই তাহার বুদ্ধিশক্তি তাহার চলৎশক্তি সূচনা করিয়া দেয়।'

'সমীর কহিল—সাহিত্যের বিষয়মাত্র অতি পুরাতন, আকার গ্রহণ করিয়া সে নূতন হইয়া উঠে।'[৫]

ভাষা ও ভঙ্গির অসাধারণত্ব, উপমাদি সৃষ্টির রাজকীয় বিলাস বক্তব্যকে উপস্থিত করার অপরূপ কলা-কুশলতা রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধাবলীকে দুর্লভ ঐশ্বর্যে মণ্ডিত ক'রেছে। পাণ্ডিত্য, তত্ত্ব, তথ্য—যাই থাকুক না কেন, সব কিছুকে অতিক্রম ক'রে স্রষ্টার রসদৃষ্টি। সে ভাষা-ছন্দ-ব্যাকরণ হোক্, কিংবা উচ্চতর আধ্যাত্মিক আত্মোপলব্ধিই হোক—বিষয়টা সেখানে মোটেই বড় নয়। সামান্য পত্রাংশ পর্যন্তও কবি-কল্পনার দীপ্তিতে উদ্ভাসিত। সেখানে বিষয় নিতান্ত তুচ্ছ এমন কি, নেই বল্লেই হয়, সেখানেও কবির হৃদয়-গভীরের নিভৃত-ভাবনা এক অপূর্ব রূপলোকের সৃষ্টি ক'রেছে। 'বাজে কথা' প্রবন্ধে কবি এই জাতীয় রচনার স্বরূপ নির্দেশ করেছেন, 'অন্য খরচের চেয়ে বাজে খরচেই মানুষকে যথার্থ চেনা যায় কারণ, মানুষ ব্যয় করে বাঁধা নিয়ম অনুসারে, অপব্যয় করে নিজের খেয়ালে। যেমনি বাজে খরচ, তেমনি বাজে কথা। বাজে কথাতেই মানুষ আপনাকে ধরা দেয়।...এক-একটি দুর্লভ মানুষ এইরূপে স্ফটিকের মতো অকারণ ঝলমল করিতে পারে। সে সহজেই আপনাকে প্রকাশ করিয়া থাকে তাহার কোন বিশেষ উপলক্ষের আবশ্যক হয় না। তাহার নিকট হইতে কোনো বিশেষ প্রয়োজন সিদ্ধ করিয়া লইবার গরজ কাহারও থাকে না—সে অনায়াসে আপনাকে আপনি দেদীপ্যমান করে, ইহা দেখিয়াই আনন্দ।'[৬] এই মন্তব্যের আলোকে রবীন্দ্রনাথের গদ্যরচনার স্বরূপধর্ম উপলব্ধি করা সম্ভব।

রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতপক্ষে বিষয়ের গুরুভার থেকে প্রবন্ধকে মুক্ত ক'রে যথার্থ রস-সাহিত্যে পরিণত ক'রেছেন। এক সময় ধারণা ছিল যে প্রবন্ধ রচনার পক্ষে কোন প্রতিভার প্রয়োজন হয় না—দ্বিতীয় শ্রেণীর লেখক এই জাতীয় লেখায় সাধারণ পাঠক সম্প্রদায়ের চাহিদা মেটান।[৭] রবীন্দ্রনাথের রচনা পড়লে এই জাতীয় ধারণা যে কত ভ্রান্ত, তা উপলব্ধি করা যায়। তিনি বস্তুর

গুরুভার থেকে মুক্ত ক'রে প্রবন্ধকে রচয়িতার মানস-লীলার মাধ্যম ক'রে তুলেছেন। তবু রবীন্দ্রনাথের পথ একা রবীন্দ্রনাথেরই—তাঁকে অনুকরণ করার প্রবৃত্তি যেমন স্বাভাবিক, তেমনি তাঁকে অনুকরণ করা সম্ভব নয়।

রবীন্দ্রযুগের আর একজন প্রবন্ধ লেখক সমালোচকের বিস্ময়-মিশ্রিত শ্রদ্ধা আকর্ষণ ক'রেছেন—তিনি হ'লেন আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বহু-শাখায়িত পথে তাঁর গতি ছিল অবাধ—কত স্বচ্ছন্দগতিতে ও অবলীলাক্রমে তিনি সে পথে বিচরণ ক'রেছেন! তাঁর প্রবন্ধের এই দুর্লভ বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে একজন বিদগ্ধ সমালোচক ব'লেছেন, 'তাঁর বিশাল জ্ঞান ছিল তাঁর মনের লীলাক্ষেত্র, তাকে বহন করতে হত না। তাঁর লেখা প্রবন্ধ তাঁর মনের প্রতিচ্ছবি। জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা তিনি ব'লেছেন অতি সহজে; তার পরিধির কথা ভাবলে তবে মনে বিস্ময় আসে। তাঁর গভীর চিন্তা পাঠকের মনে চিন্তা আনে কিন্তু তার প্রকাশ গম্ভীর নয়। ভাষা অবলীলায় ভাবকে প্রকাশ করছে, কিন্তু তার গতি লঘু নয়। পদক্ষেপে মহার্ঘ শালীনতা। গভীর জ্ঞান ও চিন্তা প্রকাশের উপযুক্ত ভাষা। কিন্তু তার মধ্যে দেখা দিয়েছে অনাবিল হাসি। জ্ঞানীর বিমুক্ত মনের পরিচয়।'[৮]

তিন

বাংলাসাহিত্যে Formal ও Familiar—দু'ধরণের রচনার ধারাই পাশাপাশি চ'লেছিল। রবীন্দ্রযুগে শেষোক্ত ধারাটি নানা বৈচিত্র্যে মণ্ডিত হ'য়ে উঠেছে। এই ধারার নূতন প্রতিশ্রুতি প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধে ফুটে উঠেছে। প্রত্নতত্ত্ব থেকে সমসাময়িক রাজনীতি পর্যন্ত এমন কোন বিষয় নেই যা তাঁর প্রবন্ধে স্থান পায় নি। কিন্তু তাঁর মনে এমন আলো আছে, বলার এমন কৌশল আছে—যা সব-কিছুকেই পরিচ্ছন্ন ক'রে তুলতে পারে। এত জেনেও তাঁর জানানোর তাগিদ ছিল না কোন দিনও—তাই অকারণ পাণ্ডিত্যের রূঢ়তা কোথাও উগ্র হ'য়ে ওঠে নি। তারস্বরে কোন কিছু প্রমাণ করা যেমন তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না, তেমনি অর্ধ-স্বগত আত্মমগ্ন মৃদু-ভাষণও তাঁর অধিগত ছিল না। তাঁর প্রবন্ধগুলি Table talk বা বৈঠকী আলাপ ধরণের। তাই তাঁর প্রবন্ধগুলির সঙ্গে Formal Essay-র তফাৎ আছে। Formal Essay বিষয়নিষ্ঠ—নির্দিষ্ট বিষয়কে নিয়ে বক্তব্য-পরম্পরার সুশৃঙ্খল-গ্রন্থন চাই—

এর অভাবে প্রবন্ধটির ঘনবদ্ধতা ব্যাহত হয়। কিন্তু প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধের বিষয়ানুগত্য অনেক সময়ই লঙ্ঘিত হ'য়েছে। মূল বিষয়ের চেয়ে প্রাসঙ্গিক আলোচনার দিকেই তাঁর ঝোঁক বেশী। মনকে স্বচ্ছন্দচর করতে না পারলে এই শ্রেণীর লেখা সম্ভব হয় না। অনুচ্চ অথচ স্পষ্ট কণ্ঠ, যুক্তি আছে কিন্তু উষ্মা নেই—বিতর্ক ও প্রতিবাদ ক'রেছেন, কিন্তু কখনও মেজাজ হারান নি। তাঁর অনেকগুলি প্রবন্ধ বিতর্কমূলক—আলোচনায় শ্লেষ, বিদ্রূপ এমন কি তির্যক কটাক্ষও আছে—কিন্তু কত সংযত ও সুভদ্র তাঁর বলার ধরণ। শরৎচন্দ্র তাঁর এই ধরণের আলোচনাকেই ব'লেছেন 'সহজ শান্ত রিফাইণ্ড' বলার ভঙ্গি। আবেগের আতিশয্য বক্তব্যকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলে, কিন্তু এখানে আবেগ নেই, তাই বক্তব্য পরিচ্ছন্ন। প্রবন্ধ রচনাতে তিনি কথকের রীতিকেই বেছে নিয়েছেন, কারণ ঐ রীতির সঙ্গেই তাঁর মানসিকতার যোগ। বিষয় যত দুরূহই হোক না কেন, তিনি সোজা গল্প ক'রেই তা অক্লেশে বলে যেতে পারেন—তাই 'রায়তের কথা'-ও সুখপাঠ্য হ'য়ে উঠেছে।

প্রমথ চৌধুরী তাঁর একটি প্রবন্ধে তাঁর প্রবন্ধাবলীর স্বরূপ বিশ্লেষণ ক'রেছেন। তিনি এই জাতীয় লেখার নাম দিয়েছেন 'খেয়াল খাতা'। তিনি ব'লেছেন, 'খেয়ালী লেখা বড় দুষ্প্রাপ্য জিনিস। কারণ সংসারে বদ্‌খেয়ালী লোকের কিছু কম্‌তি নেই, কিন্তু খেয়ালী লোকের বড়ই অভাব।...খেয়াল অনির্দিষ্ট কারণে মনের মধ্যে দিব্য একটি সুস্পষ্ট সুসম্বদ্ধ চেহারা নিয়ে উপস্থিত হয়। খেয়াল রূপ-বিশিষ্ট, দুশ্চিন্তা তা নয়।'[৯] প্রবন্ধটিতে খেয়ালী লেখার দুরূহতা সম্পর্কেও তিনি সচেতন ক'রে দিয়েছেন। প্রমথ চৌধুরীর এই নির্দেশ অত্যন্ত মূল্যবান। কারণ শক্তিহীন লেখকের দুর্বল লেখনী যখন আর কিছু না পায় তখন এই জাতীয় রচনায় তৎপর হয়, সে সময় এর গুরুদায়িত্ব সম্পর্কে লেখকরাই অবহিত থাকেন না। আর একটু স্পষ্ট ক'রে বললে বলা যায় যে, সাহিত্যের অন্যান্য ক্ষেত্রে যাঁদের গতিপথ স্বাভাবিকভাবেই রুদ্ধ, তাঁরা যদি মনে করেন যে খেয়ালী লেখার ক্ষেত্রটিই একমাত্র তাঁদের সম্মুখে প্রসারিত, তা হ'লে অত্যন্ত ভুল করা হবে। কারণ খেয়ালী লেখা যা-তা নিয়ে লেখা হ'লেও যা-তা লেখা নয়—তার জন্যও একটি প্রস্তুতির প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে চৌধুরী মহাশয়ের সতর্কবাণী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, '...কিন্তু খেয়ালের স্বাধীনভাব উচ্ছৃঙ্খল হ'লেও যথেচ্ছাচারী নয়। খেয়ালী যতই কর্দানী করুক না কেন,

তালচ্যুত, কিম্বা রাগভ্রষ্ট হবার অধিকার তাঁর নেই।...আমার কথার ভাবেই বুঝতে পারছেন যে, আমি খেয়াল বিষয়ে একটু হাল্‌কা অঙ্গের জিনিসের পক্ষপাতী। চুট্‌কিও আমার অতি আদরের সামগ্রী, যদি সুর খাঁটি থাকে ও ঢং ওস্তাদী হয়। আমার বিশ্বাস আমাদের দেশের আজকাল প্রধান অভাব গুণপনাযুক্ত ছিব্‌লেমি।'

'গুণপনাযুক্ত ছিব্‌লেমি'—কথাটির মধ্যে একটি প্রবল বিরোধ আছে বলে মনে হবে। তার কারণ 'ছিব্‌লেমি' যে কখনও 'গুণপনাযুক্ত' হয় এ ধারণাই আমাদের নেই। প্রমথ চৌধুরী যে ধরণের ছিব্‌লেমির কথা ব'লেছেন, তার মধ্যে মার্জিতবুদ্ধি, অভিজাতরুচি ও সুভদ্র শালীনতার কোন অভাব নেই—এ ক্ষেত্রে ছিব্‌লেমি একটি বাইরের মুখোস মাত্র, আসলে তার আড়ালে আছে এক বিদগ্ধ ও পরিশীলিত মানস-জীবন। সবুজপত্র-পত্রিকা প্রকাশের ন' বছর আগেই তিনি মনে ক'রেছিলেন যে, আমাদের দেশে তথা আমাদের সাহিত্যে একটা হাওয়া-বদলের প্রয়োজনীয়তা আছে। করুণ সুর ও সুলভ ভাবালুতার আতিশয্য আমাদের বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। আমাদের বাষ্প-মন্থর মেঘাচ্ছন্ন জীবনাকাশে হাসির বিদ্যুৎ ছড়িয়ে দেওয়ার প্রয়োজন্। কারণ চৌধুরী মহাশয় মনে করতেন হাসি প্রাণশক্তির প্রধান লক্ষণ।

ইউরোপীয় সাহিত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফলে তিনি তাঁর এই মানস-প্রবণতার পোষকতা পেয়েছিলেন। তিনি প্রধানত ফরাসী সাহিত্যের 'বেল্‌-লেত্‌র' জাতীয় রচনার দ্বারা প্রভাবিত হ'য়েছিলেন। ফরাসী লেখকদের যে কোন বিষয়ের রচনাকেই স্বাদু ও রমণীয় ক'রে তোলার ক্ষমতা অসাধারণ। তিনি ব'লেছেন, 'ফরাসি মনের এই প্রসাদগুণপ্রিয়তার ফলে সে দেশের দর্শন-বিজ্ঞানের ভিতরও সাহিত্য-রস থাকে। পাণ্ডিত্য না ফলিয়ে অসাধারণ বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় একমাত্র ফরাসি লেখকরাই দিতে পারেন। জ্ঞান-বিজ্ঞানের ঐকান্তিক চর্চাতেও ফরাসি পণ্ডিতদের সামাজিক বুদ্ধি ও রসজ্ঞান নষ্ট হয় না।'[১০] এ ক্ষেত্রেও তিনি ফরাসী গুরুদের সুকর্ষিত পথ অনুসরণ ক'রেছিলেন। প্রচলিত প্রবন্ধে মোটামুটি সর্বশেষে একটি মীমাংসা থাকে। প্রমথ চৌধুরীর বিতর্ক-মূলক রচনাগুলিতে বিতর্ক ও বিতর্কের প্রকৃতি-ই মুখ্য, মীমাংসা করার দিকে যেন কোন নজর নেই। তাই বিষয়-প্রধান প্রবন্ধের সংস্কার নিয়ে প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধ বিচার সম্ভব নয়।

চার

প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধাবলী বিচিত্র-বিষয়াশ্রিত। সাহিত্য-সম্পর্কিত প্রবন্ধের পরিধিই বোধ হয় সর্বাপেক্ষা বিস্তৃত। বাংলা সাহিত্যে তিনি সাহিত্য-সমালোচক হিসেবেই সর্বপ্রথম দেখা দেন। তিনি যখন এম. এ. ক্লাসের ছাত্র তখন জয়দেবের ওপর একটি সমালোচনা লেখেন। জয়দেবের কবিপ্রতিভাকে তিনি খুব উচ্চে স্থান দেন নি। এতে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ খুব ক্ষুণ্ণ হ'য়েছিলেন। কিন্তু কবি অক্ষয়কুমার বড়াল এই তরুণ লেখককে উৎসাহিত ক'রে ব'লেছিলেন 'এতকাল পরে বাংলায় একটি নূতন লেখকের আবির্ভাব হল।'[১১] 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদিকা স্বর্ণকুমারী দেবী প্রবন্ধের কিয়দংশ বাদ দিয়ে ছেপেছিলেন। পরে পূর্ণাঙ্গ রচনাটি সবুজপত্রে প্রকাশিত হয়।

'জয়দেব' প্রমথ চৌধুরীর প্রথম প্রবন্ধ। কিন্তু সেই প্রথম প্রবন্ধেই লেখকের চিন্তাশক্তির মৌলিকতা ও বলিষ্ঠতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি কাব্য হিসেবে গীতগোবিন্দের বিচার ক'রেছেন। এই কাব্যে তিনি কোন আধ্যাত্মিকতার সন্ধান পান নি—রাধা-কৃষ্ণও সম্ভোগে মত্ত মানব-মানবী ছাড়া আর কিছুই নয়। তাঁর মতে দেহজ আকাঙ্ক্ষা, বিচ্ছেদজনিত শারীরিক কষ্টই এই কাব্যের মূল বক্তব্য। দ্বিতীয়ত, জয়দেবের বিরহাদি বর্ণনার মধ্যেও কোন সজীবতা নেই। কালিদাসের যক্ষবধূর বিরহ-চিত্রের তুলনায় জয়দেবের বিরহ-চিত্র ম্লান ও নিতান্ত প্রথা-নির্ভর। জয়দেবের অভিসার বর্ণনাও বৈচিত্র্যহীন—কেবল বাইরের বেশভূষাই সেখানে প্রাধান্য লাভ ক'রেছে—সেখানে অভিসারিকার বিচিত্র হৃদয়াবেগের বর্ণনা নেই। বসন্ত বর্ণনাও কতকগুলি কবি-প্রসিদ্ধির সমুচ্চয় মাত্র। সমালোচক জয়দেবের উপমার মধ্যেও নূতনত্ব দেখতে পাননি। কালিদাস যেখানে একটি মাত্র সামান্য উপমায় তাঁর বক্তব্যের নিগূঢ় অন্তস্থলে প্রবেশ ক'রেছেন, জয়দেব সেখানে শব্দের চাতুর্যই দেখিয়েছেন, তা ছাড়া উপমাগুলিও সুপ্রযুক্ত হয় নি। প্রমথ চৌধুরীর 'জয়দেব' প্রবন্ধের বক্তব্য তাঁর নিজের ভাষাতেই বলা যাক, 'যাঁহার কাব্যের বিষয় প্রেমের তামসিকতার ভাব, মানব দেহের সৌন্দর্য যাঁহার দৃষ্টিতে ততটা পড়ে না, যিনি মানব-দেহকে শুধু ভোগের বস্তু বলিয়াই মনে করেন, প্রকৃতির সৌন্দর্যের সহিত যাঁহার সাক্ষাৎ পরিচয় নাই, যিনি বর্ণনা করিতে হইলেই শোনা কথা আওড়ান, যাঁহার ভাষায় কবিত্ব অপেক্ষা চাতুরী অধিক—এক কথায়, যাঁহার

কাব্যে স্বাভাবিকতা অপেক্ষা কৃত্রিমতাই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, তাঁহাকে আমি উৎকৃষ্ট কবি বলিতে প্রস্তুত নহি।'

উদ্ধৃত মন্তব্যের মধ্যেই জয়দেব-সম্পর্কে সমালোচকের সুস্পষ্ট মনোভাব ফুটে উঠেছে। তাঁর মতে জয়দেব প্রথম শ্রেণীর কবি নন, তথাপি জয়দেবের কাব্য কেন যে জনচিত্ত হরণ ক'রেছে—তার তিনটি কারণ নির্দেশ ক'রেছেন প্রবন্ধটির শেষদিকে, তার প্রথম কারণ, 'সুরতসুখালস' বর্ণনার উপযুক্ত ভাষা তাঁর ছিল। দ্বিতীয় কারণ, সাধারণ পাঠকের সংস্কৃত সাহিত্যের অজ্ঞতা—তারা ভাষার লালিত্য থেকে ভাবের গভীরতা অনুমান ক'রে নিয়েছে। তৃতীয় কারণ, অভ্যাস ও সংস্কার। জয়দেবের কাব্যে যমুনার জল, তমালের বন, বৃন্দাবন, মথুরা, শ্রীকৃষ্ণের বাঁশী প্রভৃতির কথা আছে। চণ্ডীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিদের কাব্যপাঠে যে সংস্কার বাঙালী-চিত্তে দীর্ঘকালব্যাপী সক্রিয়, তা-ই জয়দেবের কাব্যকেও জনপ্রিয় ক'রেছে।

বাংলাসাহিত্যে প্রমথ চৌধুরীই আদি জয়দেব সমালোচক নন। উনিশ-শতকের সমালোচকদের কেউ কেউ গীতগোবিন্দের কাব্য-সৌন্দর্য ও এর নৈতিকতা সম্পর্কে আলোচনা ক'রেছেন। তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনা।[১২] অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্র জয়দেবের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করেন নি। কাব্যতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে বিদ্যাপতি ও জয়দেবের কবি-প্রতিভার তুলনামূলক আলোচনা ক'রেছেন মাত্র। বঙ্কিম-চন্দ্রের মতে জয়দেবের কবিতায় বাহ্য-প্রকৃতির প্রাধান্য। তিনি তাঁর স্বভাব-সিদ্ধ ভাষায় বলেছেন, 'বিদ্যাপতির দল মনুষ্য হৃদয়কে বহিঃপ্রকৃতি ছাড়া করিয়া কেবল তৎপ্রতি দৃষ্টি করেন, সুতরাং তাঁহাদের কবিতা ইন্দ্রিয়ের সংস্রবশূন্য, বিলাসশূন্য, পবিত্র হইয়া উঠে। জয়দেবের গীত রাধাকৃষ্ণের বিলাসপূর্ণ, —বিদ্যাপতির গীত রাধাকৃষ্ণের প্রণয়পূর্ণ।…জয়দেবের গান মুরজবীণ-সঙ্গিনী স্ত্রীকণ্ঠগীতি—বিদ্যাপতির গান সায়াহ্ন-সমীরণের নিঃশ্বাস।' মূলত বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর মতের কোন বিরোধ নেই। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে জয়দেবের কাব্যে 'ইন্দ্রিয়পরতা-দোষ' আছে, প্রমথ চৌধুরীও তাকে 'দেহজ আকাঙ্ক্ষা'র কাব্য বলেছেন। কিন্তু একটি বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর পার্থক্য আছে। জয়দেবের কবিতার বাহ্য-প্রকৃতি সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র সপ্রশংস মন্তব্য ক'রেছেন—কিন্তু প্রমথ চৌধুরীর মতে জয়দেবের বসন্ত বর্ণনা পূর্ববর্তী কবিদের বসন্ত বর্ণনার পুনরাবৃত্তি ও কতকগুলি প্রথাবদ্ধ কবিপ্রসিদ্ধির অনুসরণ মাত্র।

প্রমথ চৌধুরীর সমকালীনদের মধ্যে বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'জয়দেব' প্রবন্ধটিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।[১৬] প্রবন্ধটি প্রমথ চৌধুরীর 'জয়দেব' রচনার তিন বছর পরে লেখা। বলেন্দ্রনাথ তাঁর প্রবন্ধের প্রথমেই প্রেমতত্ত্ব দিয়ে তাঁর আলোচনার ভূমিকা ক'রেছেন। শৃঙ্গার সম্ভোগই যে গীতগোবিন্দের দেহ ও প্রাণ একথা তিনিও স্বীকার ক'রেছেন। কিন্তু কাব্যাংশে তিনি গীতগোবিন্দকে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কাব্যই ব'লেছেন। তিনি কাব্যের সম্ভোগ-বিলাস-সম্পর্কেও একটি কৈফিয়ৎ দিয়েছেন,'···জয়দেব যে হরিস্মরণ এবং বিলাসকলা, উভয় দিকেই দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে দুর্বল মানবহৃদয় এরূপ সঙ্কটস্থলে হরিস্মরণ অপেক্ষা বিলাসকলার দিকেই সাধারণতঃ কিছু আকৃষ্ট হইয়া পড়ে।'—বলেন্দ্রনাথের এই কৈফিয়ৎ যথেষ্ট বিচারসহ ব'লে মনে হয় না। অথচ প্রবন্ধের উপসংহারে তিনি ব'লেছেন, '··গ্রীসীয় প্রস্তর মূর্তির পার্শ্বে ফরাসী চিত্রশালার একখানি নগ্নদেহ চিত্র স্থাপিত কর, সে অকুণ্ঠিত সম্ভ্রম নাই, সে দীপ্ত গৌরব নাই।···বৈদিক পুরুরবা ও উর্বশীর চিত্রের পার্শ্বে জয়দেবের সম্ভোগ চিত্রাবলী এইরূপ। এবং হরিস্মরণ ত দূরের কথা, মনুষ্যত্বের বিকাশ এখানে অত্যন্ত সঙ্কুচিত। এই গীতগোবিন্দে গীত থাকিতে পারে, কিন্তু গোবিন্দ আছেন কিনা, আমাদের সম্পূর্ণ সন্দেহ আছে।' বলেন্দ্রনাথ গীতগোবিন্দের আধ্যাত্মিকতা স্বীকার করেন নি, কিন্তু এর কাব্যসৌন্দর্যের উৎকর্ষ সম্পর্কে তাঁর কোন সন্দেহ ছিল না। প্রমথ চৌধুরীও জয়দেবের কাব্যের শেষোক্ত বৈশিষ্ট্যের কথা স্বীকার করেন নি।

জয়দেব-সম্পর্কিত তাঁর এই মনোভাবকে তিনি পরবর্তী কালে স্পষ্টত এবং কখনও কখনও আকার ইঙ্গিতে নানাভাবে প্রকাশ ক'রেছেন। কবিতাতেও তিনি জয়দেবকে ব্যঙ্গ করতে ছাড়েন নি। তাঁর মতে ললিতলবঙ্গলতা, বসন্ত ও অনঙ্গ জয়দেবের কাব্যকুঞ্জবনকে সুখালসতৃপ্ত ইন্দ্রিয়জ কামনায় বিহ্বল ক'রে তুলেছিল। জয়দেব বাংলা দেশের রতিমন্ত্রের দীক্ষাগুরু। তাতে পুরুষের পৌরুষ পরিণত হ'ল নারীসম্ভোগ-কৈবল্যে—যুদ্ধ ভুলে গিয়ে গোটা জাত নীবির বন্ধন মোচনে উন্মত্ত হ'য়ে উঠল। আদিরসের বন্যায় যখন সমস্ত দেশ নিমজ্জমান সেই সুযোগে এই পৌরুষহীন সম্ভোগ-মত্ত দেশ 'তুরস্ক সোয়ারে'র পদানত হ'ল :

"উন্মদ মদনরাগ জাগালে যৌবনে,
রতিমন্ত্রে কবিগুরু দীক্ষা দিলে বঙ্গে।

রণক্ষত-চিহ্ন তাই অবলার অঙ্গে
পৌরুষের পরিচয় অশ্লেষে চুম্বনে ॥

*　　　*　　　*

আদিরসে দেশ ভাসে, অজয়ে জোয়ার !
ডাকো কল্কি, মেচ্ছ আসে, করে করবাল,
ধূমকেতু কেতু সম উজ্জ্বল করাল,
বঙ্গভূমি পদে দলে তুরুস্ক সোয়ার ।[১৪]

জয়দেবের বসন্ত-বর্ণনা নিয়ে অন্যত্র তিনি শ্লেষাত্মক মন্তব্য ক'রেছেন, 'জয়দেব যখন চোখে দেখে বর্ণনা করেন নি, তখন তিনি অবশ্য তাঁর পূর্ববর্তী কবিদের বই থেকে বসন্তের উপাদান সংগ্রহ ক'রেছিলেন এবং কবিপরম্পরায় আমরাও তাই ক'রে আসছি ।'[১৫]

প্রমথ চৌধুরীর মতামত কতদূর গ্রহণযোগ্য, তার চেয়েও বড় কথা তাঁর প্রবন্ধটির স্বরূপধর্ম। বক্তব্য ও স্টাইল—দু'দিক থেকেই প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যিক প্রকৃতি সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে। প্রবন্ধটিতে পূর্বাপর একটি শ্লেষাত্মক সুর লক্ষণীয়। পরবর্তী কালে তাঁর প্রবন্ধে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও শ্লেষাত্মক সুর আরও প্রবল হ'য়ে উঠেছে। 'জয়দেব' প্রবন্ধটি তার ভূমিকা মাত্র। জয়দেবের কাব্যের বিরুদ্ধে তাঁর প্রধান অভিযোগ এই যে, এখানে ভাষার বাঁধুনী নেই। বলেন্দ্রনাথও এই শিথিলতার কথা ব'লেছেন, কিন্তু বলতে গিয়ে তিনি নিজেই কবিত্ব ক'রে ফেলেছেন, সে ক্ষেত্রে প্রমথ চৌধুরীর অভিযোগের ভাষা ভাবাবেগহীন ও নির্মম-কঠিন, প্রমথ চৌধুরী চিরকাল ক্ল্যাসিক্যাল বাঁধুনির পক্ষপাতী। ভাষার অসংযম ও শিথিলতা তাঁর কাছে অমার্জনীয় অপরাধ। তাই জয়দেবের ভাষা প্রসঙ্গে তিনি তীক্ষ্ণধার শ্লেষোক্ত মন্তব্য ক'রেছেন, যখন রূপসীদিগের কবরী শিথিল হইয়া যাইতেছে, নীবিবন্ধন খসিয়া পড়িতেছে, যখন সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির বন্ধন শ্লথ হইয়া আসিতেছে তখন আর ভাষার বাঁধুনি কি করিয়া প্রত্যাশা করা যায় ?' 'জয়দেব' প্রবন্ধের প্রমথ চৌধুরীর আর একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। এখানকার স্টাইলের মধ্যে সবুজপত্রের যুগের প্রমথ চৌধুরীকে পাওয়া যায়। বহিরঙ্গ লক্ষণের দিক থেকে এ ভাষা সাধুভাষা—ক্রিয়াপদও সাধুভাষার। কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে এই গদ্যরীতির আড়ালে আছে চলতি ভাষার মেজাজ চলতি ভাষার ছন্দ। ভাষা কোথাও আতিশয্যধর্মী নয়, মেদ-বহুল অলসগতিও তার নয়—স্পষ্টতা স্বচ্ছতা ও উজ্জ্বলতা এর তৈল-পিচ্ছিল

মসৃণ চলার ছন্দে। প্রায় একই কালে একই বিষয়ে লেখা বলেন্দ্রনাথের গন্থরীতির সঙ্গে এর আকাশপাতাল প্রভেদ। বলেন্দ্রনাথের গন্থরীতিতে রোম্যান্টিক কবির কল্পনা-প্রসারতা। তাঁর সমালোচনা বিশ্লেষণী নয়। এক একটি উপমা বা চিত্রের বর্ণময় রেখাঙ্কনে তিনি তার বক্তব্যকে ফুটিয়ে তোলেন। প্রমথ চৌধুরী সে ক্ষেত্রে বিপরীত মার্গের পথিক। বিশ্লেষণ, বিতর্ক, ভাবাবেগমুক্ত বুদ্ধিধর্মী বিচার তাঁর নিজস্ব স্টাইলটিকেই সুনিশ্চিত ক'রে তুলেছে। শ্লেষাত্মক তির্যকদৃষ্টি তাঁর প্রথম প্রবন্ধেও অনুপস্থিত নয়। সুতরাং 'জয়দেব' প্রবন্ধে প্রমথ চৌধুরীর বাংলা লেখার হাতে-খড়ি হ'লেও, এখানেও তাঁর নিজস্ব ভঙ্গি আত্মপ্রকাশ ক'রেছে।

পাঁচ

বর্তমান বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যে সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনা কদাচিৎ চোখে পড়ে। তার মধ্যেও সুখপাঠ্য সাহিত্যিক প্রবন্ধ থাকে না বললেই হয়, বেশীর ভাগই উদ্ধৃতি-সর্বস্ব পাণ্ডিত্যপূর্ণ নীরস প্রবন্ধ। ফলে এদের বেশীর ভাগই সাধারণের আকর্ষণ থেকে বঞ্চিত হ'য়ে টেক্‌নিক্যাল আলোচনায় পরিণত হ'য়েছে। তা ছাড়া সাম্প্রতিক বাংলা সমালোচনার ক্ষেত্রে যে পরিমাণ ইউরোপীয় সাহিত্যের দিকে দৃষ্টি রাখা হ'য়েছে, সে পরিমাণে তো নয়ই, এদিকে সামান্যতম নজরও দেওয়া হয় নি। সংস্কৃত-সাহিত্যের পঠন-পাঠনের মত সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনাও অতীত স্মৃতিতে পরিণত হ'য়েছে। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর দিকে দৃষ্টিপাত করলে বিস্মিত হ'তে হয়। নব-শিক্ষার আলোকে উদ্ভাসিত হ'লেও, ইংরেজী সাহিত্যের সুবর্ণ মদিরা পান করেও, সেকালের বাঙালী সমালোচক যেভাবে নূতন দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে সংস্কৃত সাহিত্য আলোচনা ক'রেছিলেন, তার পরিধি ও প্রকৃতি আজও বিস্মিত করে। ঐতিহাসিক দিক থেকে 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' থেকেই বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের সূত্রপাত হ'য়েছে বলতে হয়। সমালোচনা-সাহিত্যের সেই প্রথম পর্ব থেকেই সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনা সুরু হ'য়েছে।

ভূদেব, বঙ্কিম প্রভৃতি সেকালের কৃতকর্মা প্রবন্ধকার ও সমালোচকেরা সংস্কৃত সাহিত্য আলোচনায় আত্মনিয়োগ ক'রেছিলেন। 'মৃচ্ছকটিক' 'উত্তরচরিত' ও 'রত্নাবলী'[১৬]—এই তিনটি প্রবন্ধে ভূদেবের মৌলিক চিন্তাশক্তি ও বিশ্লেষণ-নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। ভূদেবই বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের

ক্ষেত্রে নূতন দৃষ্টিতে সংস্কৃত সাহিত্য বিচারের পদ্ধতিটি প্রতিষ্ঠিত করেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'বিবিধ প্রবন্ধ' সঙ্কলন দু'টিতে সংস্কৃত-সাহিত্য-সম্পর্কে আলোচনা ক'রেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'উত্তরচরিত' বাংলাভাষায় সংস্কৃত সাহিত্য সমালোচনার ইতিহাসে একটি সমুন্নত মানদণ্ড নির্দেশ ক'রেছে। শকুন্তলার সঙ্গে মিরাণ্ডা ও ডেসডিমোনার তুলনা ক'রে তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের তুলনামূলক সমালোচনা পদ্ধতিকে দক্ষতার সঙ্গেই প্রয়োগ ক'রেছেন। বঙ্গদর্শনপর্বের ও রবীন্দ্র প্রভাবের পূর্ববর্তী যুগের অনেক প্রবন্ধকার সংস্কৃত সাহিত্যবিচারে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের 'প্রাচীন সাহিত্য' বাংলাভাষায় সংস্কৃত-সাহিত্য সমালোচনার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। সংস্কৃত সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রচনাকে তিনি শুধু বিচারই করেন নি, ব্যাখ্যাও ক'রেছেন—স্রষ্টার মনোলোকের অপরূপ আলোকে তারা উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠেছে। তাই আলোচনা করতে ব'সে তিনি প্রকৃত পক্ষে নূতন সৃষ্টিই ক'রেছেন—যাকে অস্কার ওয়াইল্ড ব'লেছেন—'A creation within a creation.'

ইউরোপীয় সাহিত্যের 'সাতসমুদ্রের নাবিক' হ'য়েও প্রমথ চৌধুরী সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চায় বিন্দুমাত্র পশ্চাৎপদ ছিলেন না। তাঁর সূক্ষ্ম রসবোধ ও মৌলিক বিশ্লেষণী শক্তি দিয়ে তিনি এই সাহিত্যকে নূতনভাবে বিচার ক'রেছেন। প্রমথচৌধুরী ছিলেন 'বিদ্যা-নগরের নাগরিক'—তাই আধুনিক বিদ্যার মত প্রাচীন বিদ্যার দিকেও ছিল তাঁর প্রবল আকর্ষণ। এম-এ পাশ করার পর নানা জায়গায় ঘুরেছেন, আর মনকে তৈরী করার জন্য অনেক প'ড়েছেন, '···বেকার সময়টাতে আমি কতকটা স্বশিক্ষিত হই। এই সময় আমি আবার সংস্কৃত পড়তে আরম্ভ করি। ইস্কুলে মুখস্থ ক'রেছিলুম বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপক্রমণিকা ও কলেজে ব্যাকরণ কৌমুদী। এ দু'খানি ব্যাকরণের যে অংশ আমার মনে ছিল, তাতে সংস্কৃত পাঠের বিশেষ সাহায্য হ'য়েছিল।'[১৭] সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি অনুরাগের আর একটি কারণও ছিল। তাঁর ছিল সযত্নে গড়ে তোলা একটি 'ক্ল্যাসিক্যাল মনোবৃত্তি'—সুস্পস্ট ও বুদ্ধিগ্রাহ্য জগৎ তাঁকে চিরকালই আকর্ষণ ক'রেছে—ইন্দ্রিয়াতীত অনুভূতির জগৎকে আগাগোড়াই পরিহার ক'রে চ'লেছেন। তা ছাড়া প্রথম শ্রেণীর সংস্কৃত-সাহিত্যিকদের রচনায় ভাষার বাঁধুনিপনা ও গাঢ়বন্ধতার যে রূপ ফুটেছে, তিনি ছিলেন তার একান্ত অনুরাগী। সবচেয়ে অনুরাগী ছিলেন সংস্কৃত ভাষ্যকার ও টীকাকারদের। প্রমথ চৌধুরীর বিদগ্ধ সমালোচক অতুল গুপ্ত একটি ব্যক্তিগত

ঘটনার উল্লেখ ক'রেছেন, '...ভারতবর্ষের ভাষ্যকার ও টীকাকারদের তিনি পরম অনুরাগী ছিলেন। এঁদের মধ্যে যাঁরা বড় তাঁদের সূক্ষ্ম অথচ বস্তুনিষ্ঠ যুক্তির ধারা, এবং বিপুল শব্দ সম্পদের প্রয়োগ-নৈপুণ্য এই প্রোজ্জ্বল বুদ্ধি অসাধারণ শব্দকুশলী বাঙালি লেখককে মুগ্ধ ক'রেছিল। প্রমথ বাবু তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্. এল্. ক্লাশে Private International Law পড়াচ্ছেন, এ বিষয়বস্তুটি Confiict of Law নামেও পরিচিত; এবং ইংরেজি ভাষায় এ সম্বন্ধে একখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থের ঐ নাম। মেধাতিথির মনুভাষ্যে যেদিন এর চমৎকার প্রতিশব্দ 'ধর্মসংকট' কথাটি পেলেন তাঁর সেদিনের আনন্দ বেশ মনে আছে। বঙ্গবাসী সংস্করণের মেধাতিথির ভাষ্যসমেত যে মনুসংহিতার পুঁথিটি তিনি ব্যবহার করতেন তার দুই-খণ্ডের একখণ্ড আমার কাছে আছে। কি যত্নের সঙ্গে তিনি এই সুবিস্তীর্ণ ভাষ্যটি প'ড়েছিলেন! তার চিহ্ন এর সর্বত্র।'[৯৮]

'মহাভারত ও গীতা' [নানা-চর্চা] প্রবন্ধটির উপলক্ষ হ'ল লোকমান্য তিলকের সুবৃহৎ গীতাভাষ্যের জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কৃত বঙ্গানুবাদ। তিলক বিভিন্ন শাস্ত্র-পুরাণ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার ক'রে তাঁর এই মহাভাষ্য রচনা ক'রেছেন। তাঁর এই গ্রন্থের নাম কর্মযোগ। গীতাকে যাঁরা ব্যাখ্যা ক'রেছেন, তাঁরা স্ব-সম্প্রদায় অনুযায়ীই ক'রেছেন। তিলক নিজে ছিলেন কর্মযোগী, তাঁর গীতাভাষ্যও তাই তাঁর জীবন-দৃষ্টিরই অনুকূল হ'য়ে উঠেছে। প্রবন্ধটিকে মোটামুটি দু'ভাগে ভাগ করা যায়—প্রথমাংশে প্রবন্ধকার তিলক গীতাভাষ্যের বৈশিষ্ট সম্পর্কে আলোচনা ক'রেছেন—গীতার অন্যান্য ভাষ্যের সঙ্গে এই ভাষ্যের প্রভেদ কোথায়, তা-ও সংক্ষেপে ব'লেছেন। প্রবন্ধটির দ্বিতীয়াংশই আসল,—সেখানে মহাভারত এক হাতের লেখা কি না, এর প্রক্ষিপ্ত অংশ কতখানি, এ সম্পর্কে চিত্তাকর্ষক আলোচনা ক'রেছেন। গীতা মহাভারতের প্রক্ষিপ্ত কিনা আলোচনা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মূল আলোচনা চাপা পড়ে, গৌণ বিষয়টিই প্রাধান্য লাভ ক'রেছে।

মহাভারতের বিশাল কলেবর ইউরোপীয় পণ্ডিতদের স্তম্ভিত ক'রেছে। কিন্তু বর্তমান মহাভারত যে আসল মহাভারতের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ মাত্র—মহাভারতের গোড়াতেই উগ্রশ্রবা এ কথা ব'লেছেন। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা মহাভারতকে শুধু কাব্য হিসেবে বিচার করতে গিয়েই বিভ্রান্ত হ'য়েছেন, আসলে মহাভারত হচ্ছে একটি বিপুল-কলেবর এনসাইক্লোপিডিয়া। মহাভারত একাধারে কাব্য ও এনসাইক্লোপিডিয়া। পণ্ডিত মণ্ডলীর মতে এই কাব্যের

নাম ছিল ভারত, তারপরে নাম হয়েছে মহাভারত। বর্তমানে আমরা মহাভারত পাচ্ছি, কিন্তু ভারত গেল কোথায়? তিলকের মন্তব্য উদ্ধার ক'রে সমালোচক ব'লেছেন, 'জয় ওরফে ভারত কাব্য লুপ্ত হয় নি, মহাভারতের অন্তরেই তা গা-ঢাকা দিয়ে রয়েছে। ...ভারত যে লুপ্ত হয় নি, এ বিষয়ে আমি মহাত্মা তিলকের মত শিরোধার্য করি, কারণ সে কাব্য লুপ্ত হবার কোনো কারণ নেই।' প্রমথ চৌধুরী মহাভারতের প্রাচীন অংশ ও অর্বাচীন অংশের মধ্যে একটি সীমারেখা টানার চেষ্টা ক'রেছেন। এই প্রচেষ্টার মধ্যেও প্রমথ চৌধুরীর তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়।

তিনি মহাভারতের প্রথম নয় পর্বকে প্রাচীন ভারত ব'লেছেন, আর বাদ-বাকি নয় পর্বকে ব'লেছেন অর্বাচীন মহাভারত। তিনি আরও মনে করেন যে প্রথম নয় পর্ব অর্থাৎ ভারত অংশটিতে অনেক প্রক্ষিপ্ত বিষয় আছে, কিন্তু শেষ নয় পর্বের ভিতর সম্ভবতঃ এমন একটি কথাও নেই, যা পূর্বে ভারতকাব্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।' মহাভারতকে এইভাবে দ্বিখণ্ডিত করার মূলে যুক্তি ছিল। ভারতকাব্যের এক নাম ছিল জয়কাব্য—কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ও যুদ্ধজয়ের কথাই সেখানে বর্ণিত হ'য়েছে, কিন্তু যুদ্ধজয়ের পরবর্তী কোন ঘটনা সেখানে ছিল না। মহাভারতের সুবিখ্যাত টীকাকার নীলকণ্ঠও বলেছেন যে, মহাভারত হচ্ছে যুদ্ধপ্রধান গ্রন্থ, এবং 'ও কাব্যের প্রধান বিষয় যা, তা শেষ হ'য়েছে সৌপ্তিক পর্বে'। প্রমথ চৌধুরী বলেছেন, 'বর্তমান মহাভারত অবশ্য এ দেশের ওঅর অ্যাণ্ড পীস্ নামক মহাকাব্য। কিন্তু মূল ভারত ছিল ইলিঅডের মত শুধু যুদ্ধকাব্য।' সৌপ্তিক পর্ব পর্যন্ত ভারতকাব্যের পরিধি ধরলে দুটো অংশ সমান হয় না—প্রথমাংশে থাকে দশ পর্ব, দ্বিতীয়াংশে থাকে অবশিষ্ট আটটি পর্ব। তিনি এই অসমান দু'টি অংশকে সমান সমান ক'রেছেন। তিনি আদি পর্বকে মহাভারতের অন্ত্যপর্ব বলতে চান। এর খুব সঙ্গত কারণই তিনি দেখিয়েছেন, 'ও পর্বের প্রথম অধ্যায় হচ্ছে আমরা যাকে বলি Preface, দ্বিতীয় অধ্যায় Table of Contents এবং তার পরবর্তী কথাপ্রবেশ পর্ব হচ্ছে Introduction।' প্রাচীন ও অর্বাচীন মহাভারতের বিভাগ সম্পর্কে তাঁর আর একটি বক্তব্য আছে—তিনি মনে করেন স্ত্রীপর্ব অর্বাচীন ভারতের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত; কারণ 'যাঁরা শান্তিপর্ব ও অনুশাসনপর্ব লিখেছেন, তাঁরা শতসহস্র শ্লোক লিখলেও এর তুল্য শ্লোক লিখতে পারতেন না।' স্ত্রীপর্বকে রেখে বন-পর্বকে তিনি উত্তর-ভারতের অন্তর্ভুক্ত করতে চান।

প্রমথ চৌধুরী একটি জায়গায় তিলকের অভিমতকে স্বীকার করেন নি—তিলক বলেছেন মহাভারত একই হাতের লেখা। কিন্তু চৌধুরী মহাশয়ের মতে এ গ্রন্থ এক হাতের লেখা নয় এবং এক সময়ের লেখাও নয়। তিনি কতকটা গাণিতিক বিশ্লেষণ ক'রে তাঁর বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত ক'রেছেন। মহাভারতের প্রক্ষিপ্ত অংশ বিচার প্রসঙ্গে সম্ভবত তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থের দ্বারাও প্রভাবিত হ'য়েছেন, অন্তত বিচারপদ্ধতির মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের মতের কিঞ্চিৎ প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। আদিপর্ব সম্পর্কে প্রমথ চৌধুরী বঙ্কিম-প্রদর্শিত পথেরই অনুসরণ ক'রেছেন। বঙ্কিম বলেছেন, 'আদিপর্বের দ্বিতীয় অধ্যায়ের নাম পর্বসংগ্রহ অধ্যায়। মহাভারতে যে যে বিষয় বর্ণিত বা বিবৃত আছে, ঐ পর্বসংগ্রহ অধ্যায়ে তাহার গণনা করা হইয়াছে। উহা এখনকার গ্রন্থের সূচিপত্র বা Table of contents সদৃশ।"[১৯] বঙ্কিমচন্দ্র মহাভারতের মধ্যে তিনটি স্তরের রচনার উল্লেখ ক'রেছেন—প্রথম স্তরের রচনার কবিত্ব অসাধারণ, দ্বিতীয় স্তরের রচনা অনুদার এবং কাব্যাংশে নিকৃষ্ট. তৃতীয় স্তরে 'যে যাহা যখন রচিয়া "বেশ রচিয়াছি" মনে করিয়াছে, সে তাহা মহাভারতে পুরিয়া দিয়াছে।' প্রমথ চৌধুরী মহাভারতের দু'টি স্তর নির্দেশ ক'রেছেন। তবে বঙ্কিমচন্দ্র প্রমথ চৌধুরীর মতো প্রথমার্ধ, দ্বিতীয়ার্ধ—এই সরল গাণিতিক বিভাগ করেন নি, অথচ তিনি আরও স্পষ্ট ও নির্দিষ্ট ক'রে ব'লেছেন। রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের এই স্তর বিভাগ সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ ক'রেছেন, কিন্তু বিভিন্ন সময়ে নানা লোকের রচনা যে মহাভারতে স্থান পেয়েছে একথা তিনিও অস্বীকার করেন নি।[২০]

কৃষ্ণচরিত্র প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র মহাভারতের যে আলোচনা ক'রেছেন, তাতে তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও গবেষণা-কুশলতার পরিচয় আছে। এ ক্ষেত্রে প্রমথ চৌধুরীর দৃষ্টিভঙ্গি স্বতন্ত্র—গবেষণা ক'রে কোন কিছু প্রতিপন্ন করা তাঁর মোটেই কাম্য ছিল না। অতন্দ্র বুদ্ধি ও নিপুণ বিশ্লেষণী শক্তি তাঁর প্রবন্ধের ছত্রে ছত্রে তীক্ষ্ণ-রশ্মি সূর্যালোক ছড়িয়েছে। কিন্তু তিনি তাঁর বক্তব্যকে উপযুক্ত ও সুপ্রচুর প্রমাণ-প্রয়োগের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত করেন নি। অনুমান. নজির ও সাধারণ বুদ্ধিই (Common sense) তাঁর আলোচনাটির ভিত্তিভূমি। প্রবন্ধটির সঁবচেয়ে বড় দুর্বলতা এই যে, এর বক্তব্যের সঙ্গে নামকরণের কোন সন্তোষজনক মিল নেই। এর নাম 'মহাভারত ও গীতা'। 'মহাভারত' অংশের আলোচনা আছে, কিন্তু 'গীতা' অংশের কোন আলোচনা নেই বললেই হয়।

অথচ মহাভারতে 'গীতা' প্রক্ষিপ্ত কিনা—এই বিষয়টি ছিল প্রবন্ধের মূল আলোচ্য বিষয়। কিন্তু বিতর্ক-প্রিয় সমালোচক নিজের কথার স্রোতে ভেসে গিয়েছেন, ফলে আসল পথটি কথা বলার নেশায় কখন যে হারিয়ে ব'সেছেন, তা নিজেই বোধ হয় বুঝতে পারেন নি। শেষে যখন মূল বিষয়ের কথা উঠেছে, তখন সময়ান্তরে আলোচনার দোহাই দিয়ে প্রবন্ধটি শেষ করতে হ'য়েছে। আলোচনাটি প্রমথীয় কথা-বিস্তার কৌশলে সুখপাঠ্য হ'য়ে উঠেছে—দুরূহ গবেষণার বিষয়টিকেও চায়ের টেবিলের গুণী অথচ রসিক বন্ধুর মতো গল্প ক'রে শুনিয়েছেন। প্রবন্ধটিতে কথার মারপ্যাঁচের আতিশয্য নেই, কিন্তু প্রমথীয় শ্লেষ ও চাপা-বিদ্রূপ তীক্ষ্ণ রেখার মতো ঝলসে উঠেছে। বিষয়কে মাঝে মাঝে কৌশলে পাশ কাটিয়ে নানা কথার অবতারণা ক'রেছেন।

ছয়

প্রমথ চৌধুরীর 'হর্ষচরিত' আলোচনাটি রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ের হর্ষবর্ধন-সম্পর্কিত ইংরেজী গ্রন্থের সমালোচনা উপলক্ষে লেখা হ'য়েছিল। হর্ষবর্ধনের ওপর দু'জন লেখক দু'টি বই লিখেছেন—একজন চৈনিক পরিব্রাজক ইউয়ান চোয়াং, আর একজন বাণভট্ট। এই দু'টি গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদের সাহায্যে রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় রুলার্স অব ইণ্ডিয়া সিরিজের জন্য ইংরেজীতে একটি 'নব-হর্ষচরিত' রচনা করেন। প্রমথ-চৌধুরী এই বইটির আলোচনা প্রসঙ্গেই 'হর্ষচরিত' প্রবন্ধের অবতরণা ক'রেছেন। বাণভট্টের গ্রন্থের কথাবস্তু সামান্য, অথচ রাধাকুমুদবাবু একেই অবলম্বন ক'রে ইতিহাস লিখেছেন—ফলে কাব্যের মাল-মশলা বর্জন ক'রে তিনি অনেকক্ষেত্রে বাণভট্টের ক্ষীণ-কলেবর কথাবস্তুর ওপরেই নির্ভর ক'রেছেন। রাজ্যশ্রীর স্বামী গ্রহবর্মার মৃত্যুর পরে বিন্ধ্যারণ্যে রাজ্যশ্রীকে হর্ষবর্ধন যেখানে আত্মবিসর্জন থেকে নিবৃত্ত ক'রে বৈরনির্যাতনের সঙ্কল্প করলে, সেখানেই বাণভট্টের কাহিনীর উপসংহার। প্রবন্ধের এই অংশের মধ্যে নূতনত্ব কিছু নেই—বাণভট্ট ও রাধাকুমুদবাবুর গল্পাংশকেই চৌধুরী মহাশয় সাজিয়ে গুছিয়ে ব'লেছেন মাত্র।

প্রবন্ধটির শেষাংশে কয়েকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হ'য়েছে। প্রথমত, হর্ষের মাতা যশোবতীর পরিচয়, দ্বিতীয়ত, হর্ষের রাজ্যশাসন, তৃতীয়ত, হূণ প্রসঙ্গ। হর্ষবর্ধনের মাতুলপুত্র ভণ্ডি ছিলেন তাঁর friend, philosopher and guide. কিন্তু যশোবতী কে ছিলেন, এ বিষয় বাণভট্ট নীরব। রাধাকুমুদবাবু

বলেছেন, যশোবতী হূণারি যশোবর্মণের কন্যা—যশোবর্মণের পুত্র শিলাদিত্যই নাকি ভণ্ডির পিতা! কিন্তু প্রমথ চৌধুরী রাধাকুমুদবাবুর এই মত স্বীকার করেন নি। তার প্রথম কারণ, যশোবর্মণ ছিলেন সেকালের একজন সার্বভৌম রাজচক্রবর্তী, কিন্তু বাণভট্ট এই হূণ-বিজয়ী খ্যাতকীর্তি রাজার নাম গোপন করলেন কেন? চৌধুরী মহাশয়ের দ্বিতীয় আপত্তি কালগত। যশোবর্মণ হূন-নিপাত ক'রেছিলেন ৫২৮ খ্রীষ্টাব্দে, আর হর্ষের জন্ম হ'য়েছিল ৫৯০ খ্রীষ্টাব্দে। কিন্তু দু'টি যুক্তির কোনটিই খুব বেশী বিজ্ঞানসিদ্ধ নয়। প্রথমটি একটি আনুমানিক সিদ্ধান্ত মাত্র। দ্বিতীয়টি সিদ্ধান্ত হিসেবে দুর্বল। কারণ হূণ-নিপাতের সময় যশোবর্মণের বয়স কত ছিল, যশোবতীর জন্মের সময়ই বা তাঁর বয়স কত এবং হর্ষবর্ধনের জন্মের সময়ই বা যশোবতীর বয়স কত ছিল—এ সমস্ত তথ্য সম্পূর্ণ না জানা পর্যন্ত কোন সিদ্ধান্ত করা সঙ্গত নয়। রাধাকুমুদবাবুর মত যদি 'প্রমাণাভাবে অসিদ্ধ' হয়, তা হ'লে চৌধুরী মহাশয়ের মতামতও প্রমাণাভাবে তুল্যরূপেই অসিদ্ধ। ইতিহাস এমন একটি বিষয়, যা তথ্যের অভাবে সুন্দর উপন্যাস হ'তে পারে কিন্তু সত্যনিষ্ঠ ইতিহাস হয় না।

রাধাকুমুদবাবু তাঁর গ্রন্থে হর্ষের শাসনপদ্ধতি সম্পর্কে একটি অধ্যায় লিখেছেন—কারণ যে সিরিজের বই লিখেছেন, তার প্রকৃতির সঙ্গে এর বক্তব্যকে মেলাতে হ'য়েছে। এখানেও উপযুক্ত তথ্যের অভাবে তাঁর বক্তব্য অনেকটা অনুমান-নির্ভর হ'য়েছে। তিনি পূর্ববর্তী গুপ্তযুগের শাসনপদ্ধতিকে হর্ষযুগের ওপর আরোপ ক'রেছেন। সমালোচকের তীক্ষ্ণদৃষ্টি এক্ষেত্রেও এড়ায় নি। তৃতীয়ত হূণ-প্রসঙ্গ। বাণভট্ট হূণদের বলেছেন 'হূণ-হরিণী'—সমালোচক পরিহাস-তরল কণ্ঠে বলেছেন—'কিন্তু তারা হরিণ-জাতীয় ছিল না, না রূপে, না গুণে।' মনে হয় এই বর্বর জাতির অসাধারণ ক্ষিপ্রগতির জন্যই বাণভট্ট তাদের 'হরিণী' আখ্যা দিয়েছেন। সমালোচক ঐতিহাসিক ভিন্‌সেণ্ট স্মিথের গ্রন্থ থেকে হূণদের রূপ-গুণের একটি দীর্ঘতালিকা উদ্ধার ক'রেছেন। প্রমথ চৌধুরীর 'হর্ষচরিত'কে পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধ বলা সম্ভব নয়—একে আমরা সমালোচনা বা 'রিভিউ' শ্রেণীর লেখা বলতে পারি। মূল গ্রন্থের কথা সংক্ষেপে বর্ণনা ক'রে কয়েকটি সংশয়স্থল নির্দেশ করেছেন মাত্র।

সংস্কৃত কবি ও নাট্যকারদের মধ্যে প্রমথ চৌধুরীর কাছে সব চেয়ে প্রিয় ছিলেন ভাস।[২১] কিন্তু তাঁর সবচেয়ে প্রিয় নাটক ছিল সম্ভবত মৃচ্ছকটিক। 'মৃচ্ছকটিক' নাটক সম্পর্কে তিনি একাধিকবার আলেচনা ক'রেছেন। এর

থেকেই প্রমাণ পাওয়া যায় যে এই নাটকটি তাঁর কতখানি প্রিয় ছিল! ১৩৫০ সালে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কৃত মৃচ্ছকটিকের বঙ্গানুবাদের পুনর্মুদ্রণের প্রস্তাব হলে উক্ত গ্রন্থের ভূমিকা স্বরূপ তিনি একটি প্রবন্ধ লেখেন। প্রবন্ধটি সংক্ষিপ্ত এবং গ্রন্থ-পরিচয় মাত্র। তথপি এই প্রবন্ধে নাটকটির মূল বৈশিষ্ট্যগুলি উদ্ঘাটিত হ'য়েছে।[২২] 'মৃচ্ছকটিক' নাটক যে প্রমথ চৌধুরীর ভালো লেগেছিল, তার প্রথম কারণ হ'ল এর অসাধারণ স্বাতন্ত্র্য—এর স্বাতন্ত্র্যে মুগ্ধ হ'য়ে য়ুরোপীয় 'সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরা এর বিষয় দেদার প্রবন্ধ লিখেছেন।' মৃচ্ছকটিক নাটকের রচয়িতা শূদ্রকের পরিচয় ও বিদ্যাবুদ্ধির সুদীর্ঘ তালিকা নাটকের প্রথমেই আছে, এমন কি নাটকে কি কি বিষয় থাকবে, তারও একটি ফর্দ নাটকের প্রথমেই পাওয়া যায়। এর থেকে প্রমথ চৌধুরী অনুমান ক'রেছেন, 'আমি কোন বাংলা, ইংরেজী বা সংস্কৃত নাটকে এ রকম table of contents দেখি নি। এর থেকে মনে হয়, মৃচ্ছকটিকের লেখকের সুমুখে আর একখানি নাটক ছিল, যার থেকে এই বিষয়ের ফর্দ সংগ্রহ ক'রেছেন।'

মৃচ্ছকটিক নাটকের বহিরঙ্গের মধ্যে যেমন স্বাতন্ত্র্য আছে তেমনি বিষয়বস্তুর মধ্যেও নূতনত্ব আছে। অন্যান্য নাটকের মতো এর নায়িকা বসন্তসেনা রাজ-কন্যা বা রাজবংশ-সম্ভূতা নন, গণিকা। চারুদত্তও কোন রাজপুত্র নন। তিনি প্রথমে ছিলেন ধনী, পরে দৈবদুর্বিপাকে দরিদ্র হ'য়ে পড়েন। দরিদ্র নায়ক ও গণিকা নায়িকাকে নিয়ে সেই যুগে নাট্যকার যে নাটক লিখতে পেরেছেন, তাতে সাহসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। 'মৃচ্ছকটিক'-এর নবম অঙ্ক সমালোচককে সবচেয়ে বেশি মুগ্ধ ক'রেছে। মামলা-মোকর্দমা ও বিচারের বর্ণনায় এই অঙ্কটির একটি নিজস্ব রূপ আছে। চৌধুরী মহাশয়ের মতো রসিক সমালোচকও ব'লেছেন, 'ব্যবহারদুষ্টতা এক মিথ্যা মোকর্দমায় আদালতের বর্ণনা ও বিচার একটি পুরো অঙ্কে দেখানো হ'য়েছে। একে ইংরাজীতে trial scene বলে। Merchant of Venice-এ রকমের একটি দৃশ্য আছে। কিন্তু মৃচ্ছকটিকের trial scene-এর তুলনায় সেটি নগণ্য আর এক রকম ছেলেখেলা বললেই হয়। আমি যতবার মৃচ্ছকটিক পড়ি, ততবারই আমার মৃচ্ছকটিকের এই নবম অঙ্ক সম্বন্ধে একটি নাতিহ্রস্ব প্রবন্ধ লেখবার লোভ হয়।'—শার্বিলকের চুরির বর্ণনা, রাজশ্যালক শকার ও শকারের মোসাহেব বিটের চরিত্র, সমালোচকের বিস্ময়-মিশ্রিত শ্রদ্ধা আকর্ষণ ক'রেছে। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে ভাসের কিছু কিছু গ্রন্থ আবিষ্কৃত হ'য়েছে—তার মধ্যে দরিদ্র চারুদত্ত নামক একটি

নাটকের মাত্র চার অঙ্ক পাওয়া গিয়াছে—প্রমথ চৌধুরী অনুমান করেছেন যে বাকি ছ'অঙ্ক কোন চোরকবি কিছু পরিবর্তন ক'রে মৃচ্ছকটিক নাম দিয়ে চালিয়ে দিয়েছেন। এই অজ্ঞাতকুলশীল কবির কাল নিয়ে যত গবেষণাই চলুক না কেন, ভাস যে একজন অসাধারণ নাট্যকার এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। মৃচ্ছকটিক আলোচনা করতে গিয়ে ভাসের প্রতিভা সম্পর্কে প্রমথ চৌধুরী অধিকতর সচেতন হ'য়েছেন। 'ভারতের নাটকের আদিম আচার্য'কে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করতে গিয়ে তিনি বলেছেন,

'তব কাব্যে গৌরবের ধরে ইতিহাস।
তুমি জান সমরস বীর ও করুণ।
সে শুধু কাতর যার নয়নে বরুণ।
তোমার নাটকে তাই জলে পরিহাস।'[২৩]

ভাস কেন তাঁর প্রিয় নাট্যকার প্রমথ চৌধুরী তা এই সংক্ষিপ্ত অর্থবহ কাব্যোক্তির মধ্য দিয়ে বলেছেন। মৃচ্ছকটিকের বাস্তব বর্ণন-নৈপুণ্য ও চরিত্র-সৃষ্টি তাঁকে মুগ্ধ ক'রেছে। নায়িকা বসন্তসেনা বাঙালী কবিদের রোম্যান্টিক কল্পনাকে উদ্দীপ্ত ক'রেছে—প্রমথ চৌধুরী ছিলেন যুক্তিবাদী, আবেগের কুয়াসা তাঁর বক্তব্য অস্পষ্ট করে নি। কিন্তু বসন্তসেনাকে তিনি সম্বোধন ক'রে ব'লেছেন,

'তুমি নও রত্নাবলী, কিম্বা মালবিকা,
রাজোদ্যানে বৃন্তচ্যুত শুভ্র শেফালিকা।
অনাঘ্রাত পুষ্প নও, আশ্রমবালিকা,—
বিলাসের পণ্য ছিলে, ফুলের মালিকা॥

*   *   *

কলঙ্কিত দেহে তব, সাবিত্রীর মন
সারানিশি জেগেছিল, করিয়ে প্রতীক্ষা
বিশ্বজয়ী প্রণয়ের, প্রাণ যার পণ।
তারি বলে সহ তুমি অগ্নির পরীক্ষা।'[২৪]

ভাসের নবাবিষ্কৃত নাট্যাবলী ও 'মৃচ্ছকটিক' ছাড়া বাণভট্টের 'কাদম্বরী'ও চৌধুরী মহাশয়ের একটি প্রিয় গ্রন্থ ছিল। প্রবোধেন্দু ঠাকুরের কাদম্বরীর বঙ্গানুবাদ অবলম্বন ক'রে তিনি 'বাংলা কাদম্বরী' নাম দিয়ে একটি পুস্তক-সমালোচনা লেখেন।[২৫] পুস্তক-সমালোচনা হ'য়েও এই রচনাটি নাতি-দীর্ঘ একটি প্রবন্ধের মর্যাদা পেয়েছে। বাণভট্টের ভাষার দীর্ঘ-সমাসবদ্ধতা সম্পর্কে

কিছু কিছু বিরূপ আলোচনা আছে। কিন্তু চৌধুরী মহাশয় এ ভাষার অন্তস্তলে প্রবেশ করে এর স্বরূপ উদ্ঘাটিত ক'রেছেন। তাঁর মতে এ ভাষার যেমন অবিশ্রান্ত গতিময়তা, তেমনি এর উচ্ছ্বসিত ও তরঙ্গিত লাবণ্য, 'বাণভট্ট চেয়েছিলেন কথার মুক্তার মালা গাঁথতে—যার প্রতি দানাটি স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট, অথচ সমগ্র মাল্যের দেহে একটি লাবণ্যের ঢেউ খেলে যায়।...তারপর এ ভাষাকে গতিহীন মনে করাও ভুল।' তাঁর মতে বাংলা অনুবাদে সংস্কৃত ভাষার উচ্ছ্বাস রক্ষা করা যায় না।

দ্বিতীয়ত, তিনি বাণভট্টকে চিত্রশিল্পী ব'লেছেন—অন্য কবিদের তুলনায় বাণভট্টের চিত্রকর্মের ঐশ্বর্য অনেক বেশী। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘকাল পূর্বেই কাদম্বরী রচয়িতার চিত্রাঙ্কণিক বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছিলেন। তিনি ব'লেছেন, 'কাদম্বরী একটি চিত্রশালা।'[২৬] কিন্তু প্রমথ চৌধুরী কাদম্বরী চিত্রকে বর্ণাঢ্য বলেই থেমে থাকেন নি, 'বাণভট্ট কেবল যে landscape এঁকেছেন, তা নয়, তিনি সংস্কৃত কাব্যে অপূর্ব portrait painter. তিনি শবর সেনাপতি, বৃদ্ধ চণ্ডাল, চণ্ডাল বালক, কাদম্বরীর বীণাবাদক ও দ্রাবিড় ধার্মিকের যে ছবি এঁকেছেন, সে সব ছবি স্মৃতিপটে চিরদিন অঙ্কিত থাকে। এ সব ছবিকে realistic art-এর সংস্কৃত নিদর্শন বললে অত্যুক্তি হয় না।' 'বাংলা কাদম্বরী' পুস্তকপরিচয় উপলক্ষে রচিত হ'লেও প্রমথ চৌধুরীর মনোজীবনের একটি অতি মূল্যবান সঙ্কেত এখানে আছে। তিনি বাণভট্টকে প্রধানত আর্টিস্ট বা শিল্পী ব'লেছেন। তাঁর মতে বাণভট্টের কৃতিত্ব হচ্ছে প্রধানত রমণীর রূপ বর্ণনায়। বাণভট্টের নারী-রূপ বর্ণনার মধ্যে একটি বৈশিষ্ট্য ছিল, যা আধুনিক কালের এই বাঙালী রূপদক্ষকেও মুগ্ধ ক'রেছিল। বাণভট্টের রমণী-রূপ বর্ণনার কথা আলোচনা করতে গিয়ে তিনি প্রকৃতপক্ষে রূপতত্ত্ব (Philosophy of Beauty) সম্পর্কে আলোচনা ক'রেছেন। এই সংক্ষিপ্ত আলোচনার মধ্যে তাঁর মননশীলতা ও মৌলিকতা—দু'য়েরই পরিচয় পাওয়া যায়। টেনিসনের একটি প্রসিদ্ধ কবিতার সঙ্গে তুলনা ক'রে তিনি বাণভট্টের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ ক'রেছেন, 'আর্টিস্ট হিসাবে বাণভট্টের চরম কৃতিত্ব হচ্ছে রমণীর রূপ বর্ণনায়। তিনি যে স্বপ্ন দেখেছিলেন ও আমাদের দেখিয়েছেন—সে হচ্ছে Dream of Fair Women। ইংরেজ কবি Tennyson-এর কবিতায় fair woman এর সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না এবং তিনি কোনো সুন্দরীর স্বপ্ন দেখেন নি। তিনি ইতিহাস ও কাব্যের পাতার অন্তর থেকে প্রসিদ্ধ নারীদের উদ্ধার করতে চেষ্টা ক'রেছেন।

সুতরাং এঁদের নাম আছে, কিন্তু রূপ নেই। Helen একটি মর্মর মূর্তি, ও Cleopatra-র চোখ কালো। এর বেশি কিছু নয়। কিন্তু বাণভট্টের সুন্দরীরা রূপলোকের real। তিনি তাঁদের শুধু রূপ দেখেছেন, দেহ নিয়ে টানাটানি করেন নি।'

বাণভট্টের নারীচরিত্রের এই রূপতত্ত্ব-আলোচনায় সমালোচকের মনো-জীবনেরও নিঃসংশয় ছায়াপাত ঘটেছে। প্রমথ চৌধুরী যা বলেছেন তা ক্ল্যাসিক্যাল গ্রীক সৌন্দর্য-চেতনার সবচেয়ে বড় উপলব্ধির কথা। পুরাণ বা ইতিহাসের সত্য সব সময় রূপবিশিষ্ট নয়। কিন্তু বাণভট্ট চেয়েছেন রূপ, নাম নয়। মানসী যদি রূপবিশিষ্টা হ'য়ে ওঠে, তা হলে যে মূর্তিময়ীর সৃষ্টি হয়, বাণভট্ট সেই মূর্তিই গ'ড়েছেন। এই রূপের চেয়ে সত্য রূপ আর নেই,—'এই রূপ হচ্ছে reality-র পরাকাষ্ঠা।' অথচ এ সৌন্দর্য 'সত্যনারীর অতিরিক্ত।' প্রমথ চৌধুরী তাঁর রূপানুভূতির স্বরূপের কথাই প্রকারান্তরে ব'লেছেন। তাঁর গল্পগুলির নারীরূপ বর্ণনার মধ্যে এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় আছে। তিনি যে সমস্ত নারীর ছবি এঁকেছেন, তা তাঁর মানসীমূর্তি—রূপ ধারণ ক'রেছে মাত্র। বাণভট্টের নারীচরিত্রের কথা বলতে গিয়ে তাঁর গ্রীক ভাস্করদের প্রস্তর-মূর্তির কথা মনে পড়ছে। মাতঙ্গ কুমারী, পত্রলেখা, মহাশ্বেতা, তরুণিকা ও কাদম্বরীর কথা তিনি উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ ক'রেছে। বাণভট্টের নারীমূর্তিগুলির মধ্যে অষ্টাদশবর্ষদেশীয়া পত্রলেখাই প্রমথ চৌধুরীর নয়ন-মনকে সবচেয়ে বেশী আকৃষ্ট ক'রেছে। তিনি বহুবার নানাছলে তাম্বূল-করঙ্ক-বাহিকা এই অষ্টাদশবর্ষদেশীয়া কুমারী পত্রলেখার বর্ণনা ক'রেছেন। একদা পত্রলেখাকে সম্বোধন করতে গিয়ে চৌধুরী মহাশয়ের ভাবাবেশ-নির্মুক্ত মনেও মৃদু হৃদয়াবেগ সঞ্চারিত হ'য়েছিল,

'অষ্টাদশ বর্ষদেশে আছে পত্রলেখা !
শুক-মুখে শুনিয়াছি তোমার সন্দেশ।
তাম্বূল-করঙ্ক করে, রক্ত পট্টবেশ,
প্রগল্‌ভ বচন, রাজ অন্তঃপুরে শেখা॥

*　　*　　*

গিরিপুরী লঙ্ঘি, সিন্ধু কান্তার বিজন,
মনোরথে নীলাম্বরে, ভ্রমি যবে একা,—
মম অঙ্কে এসে বস, কবির স্বজন,
তাম্বূল-করঙ্ক করে তুমি পত্রলেখা !'[২৭]

বাণভট্টকে অবলম্বন ক'রে 'বিচিত্রা' পত্রিকায় একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধে তিনি পত্রলেখার একটি সুন্দর ছবি এঁকেছিলেন। তাঁর বহু-অনুশীলিত সুমার্জিত রূপজ্ঞান পত্রলেখা প্রসঙ্গ-বর্ণনায় ফুটে উঠেছে। উচ্ছ্বাস ও কামনার অতিশয্য এই পরিশুদ্ধ ও পরিস্রুত রূপজ্ঞানকে মলিন করতে পারে নি। তাঁর ইন্দ্রিয় সজাগ, কিন্তু ইন্দ্রিয়সর্বস্ব রূপ-লোলুপতা নেই—তাই কাদম্বরী তাঁর কাছে দেহ-সম্পর্ক-বর্জিত একটি মানসলোকের কাহিনী। বাণভট্টের রূপ-চেতনার মধ্যে সমালোচক তাঁর এই মানসলোকের সাক্ষাৎ পেয়েছেন, 'এক কথায় বাণভট্ট এই সব কুমারীদের কামলোক থেকে রূপলোকে তুলেছেন। সেকালের চিত্রকরেরা এই একই সাধনা ক'রেছেন।…কাদম্বরীর সঙ্গে পরিচিত হ'লে আমরা আর্যমনের এই উর্ধ্বলোকের সঙ্গে পরিচিত হব। কারণ বাণভট্টের কাব্যে অনার্য মনোভাবের লেশমাত্র নেই। এ কবির বুদ্ধি পরিষ্কার, হৃদয়বৃত্তি অপূর্ব সুকুমার এবং ইন্দ্রিয় সজাগ।' ক্ল্যাসিক্যাল আর্যমনের সুকর্ষিত রূপ-জ্ঞান ছিল চৌধুরী মহাশয়ের আজীবন সাধনার বস্তু। বৌদ্ধদার্শনিকদের মতো তিনিও জানতেন যে কামলোকের বহু উর্ধ্বে রূপলোক। তিনি অন্যত্র ব'লেছেন, 'সবশেষে আসে রূপজ্ঞান। কেননা, এ জ্ঞান অতিসূক্ষ্ম ও সংসারিক হিসাবে অকেজো। রূপজ্ঞানের প্রসাদে মানুষের মনের পরমায়ু বেড়ে যায়, দেহের নয়। সুনীতি সভ্যসমাজের গোড়ার কথা হলেও সুরুচি তার শেষ কথা। শিব সমাজের ভিত্তি, আর সুন্দর তার অভ্রভেদী চূড়া।'[২৮]

প্রমথ চৌধুরীর সংস্কৃত সাহিত্য সমালোচনা নানা পত্র-পত্রিকার মধ্যে এখনও ছড়িয়ে আছে। তা ছাড়া বহু প্রবন্ধে তিনি সংস্কৃতসাহিত্যের অনেক প্রাসঙ্গিক আলোচনা ক'রেছেন, তার পরিধিও কম নয়। প্রাক্-রবীন্দ্র যুগের সংস্কৃত সাহিত্য সমালোচনায় বস্তু-বিশ্লেষণের মহিমা ছিল, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সংস্কৃত-সাহিত্যের যে ভাষ্য রচনা ক'রেছেন, তা ভাষ্য হ'য়েও কাব্য—নূতন সৃষ্টি। বলেন্দ্রনাথও সংস্কৃতসাহিত্য আলোচনায় প্রধানত রবীন্দ্রনাথের পথকেই অনুসরণ ক'রেছেন। প্রমথ চৌধুরীর পথ স্বতন্ত্র—শুধু সংস্কৃত রস-সাহিত্য নয়, ইতিহাস-দর্শন-স্মৃতি-পুরাণ এমনকি টীকা-ভাষ্যেরও তিনি যত্নশীল পাঠক ছিলেন। সংস্কৃত রস-সাহিত্যের শতবর্ণ-রঞ্জিত মণিকুট্টিমে তিনি ভাব-বিভোর হ'য়ে ঘুমিয়ে পড়েননি। সেই অপূর্ব রূপলোকের সঙ্গে হৃদয়ানুভূতি মিশিয়ে বলতে পারেননি 'My sense, as though of hemlock I had drunk।' 'কে দিয়েছে হেন শাপ, কেন ব্যবধান'—রবীন্দ্রনাথের মতো রোম্যান্টিক দীর্ঘশ্বাসও তাঁর

পড়ে নি। কারণ বুদ্ধির অতন্দ্র-প্রহরীর সতর্ক-শাসন তাঁকে জাগিয়ে রেখেছিল।

সাত

প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্য-সমালোচনামূলক প্রবন্ধের মধ্যে 'ভারতচন্দ্র' (নানা-চর্চা) প্রবন্ধটি নানাকারণে উল্লেখযোগ্য। পূর্ববর্তী বাঙালী লেখকদের মধ্যে প্রমথ চৌধুরীর লেখায় ভারতচন্দ্রের প্রভাব সর্বাধিক লক্ষণীয়। দীর্ঘ দু'শো বছরের ব্যাবধান অতিক্রম ক'রে প্রমথ চৌধুরী ভারতচন্দ্রের মধ্যে তাঁর মানস-মিতা আবিষ্কার ক'রেছেন। ভারতচন্দ্র যে তাঁর কত বড় প্রিয় লেখক ছিলেন, তার প্রমাণ তাঁর বহু লেখায় ছড়িয়ে আছে। দেশ-বিদেশের সাহিত্য-তীর্থে ছিল তাঁর অবাধগতি, কিন্তু মিলিয়ে দেখা যাবে তিনি সবচেয়ে বেশী উদ্ধৃতি দিয়েছেন ভারতচন্দ্রের কাব্য থেকেই। 'ভারতচন্দ্র' প্রবন্ধটিতে প্রকৃতপক্ষে চৌধুরী মহাশয় এই অসাধারণ শব্দ-কুশলী ও ভাষা-চতুর কবিকে নূতন ক'রে আবিষ্কার ক'রেছেন। কিন্তু এইটুকুই প্রবন্ধটির সর্বস্ব নয়, ভারতচন্দ্রের সাহিত্যকে সম্মুখে রেখে তিনি যেন স্বকৌশলে ও বিচিত্র ভঙ্গিতে আত্মবিশ্লেষণ ক'রেছেন। সুতরাং প্রমথ চৌধুরীর মনোজগৎ আবিষ্কার করতে হ'লে প্রবন্ধটি অপরিহার্য।

সমালোচক তাঁর স্বভাব-সিদ্ধ পরিহাসের সুরে প্রবন্ধটি আরম্ভ ক'রেছেন। কালের কষ্টিপাথরে একশো আশি বছর পরেও যে ভারতচন্দ্রের কবিখ্যাতি সমুজ্জ্বল, তার প্রমাণ স্বরূপ বলেছেন যে ইংরেজদের আগমনে ও অন্যান্য বহুবিধ কারণে আমাদের মনোজগতে বিরাট বিপ্লব ঘটেছে, 'অথচ দেশের লোকের জীবনে ও মনে এই খণ্ড প্রলয়ের মধ্যেও ভারতচন্দ্র চিরজীবী হ'য়ে র'য়েছেন। সুতরাং এর থেকে প্রমাণিত হয় যে, নিন্দা-খ্যাতি যতই থাক না কেন, অষ্টাদশ শতাব্দীর এই কবি সাহিত্যিক-অমরতা অর্জন ক'রেছেন। এখানে প্রমথ চৌধুরী সমা-লোচকের একটি কর্তব্য নির্দেশ ক'রেছেন, যাঁরা দীর্ঘকলের নিন্দা-প্রশংসার স্তর অতিক্রম ক'রে সাহিত্যিক অমরতার অধিকারী হ'য়েছেন, তাঁদের ক্ষেত্রে 'সমালোচকের কার্য লৌকিক নিন্দা-প্রশংসা নয়, এই অমরতার কারণ আবিষ্কার করা'—প্রমথ চৌধুরীর এই মতটি প্রণিধান যোগ্য। কারণ যুগোত্তীর্ণ (classic) সাহিত্যের ক্ষেত্রে তো বটেই, এমন কি সমকালীন সাহিত্য বিচারের ক্ষেত্রেও নিন্দা-প্রশংসার দ্বারা অভিভূত হ'লে সমালোচকের বিভ্রান্তি ঘটার

সম্ভাবনা। দ্বিতীয়ত, লৌকিক নিন্দা-প্রশংসার দ্বারা সব-সময় শিল্পীর মনোজীবন নির্ণয় করা সম্ভব নয়। প্রমথ চৌধুরী উদাহরণ দিয়ে তাঁর বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত ক'রেছেন। এইখানে তাঁর কণ্ঠে তীক্ষ্ণ শ্লেষ ফুটে উঠেছে, 'আমার অকরুণ সমালোচক ব'লেছেন যে, ভারতচন্দ্র ও আমি—আমরা উভয়েই—উচ্চ ব্রাহ্মণ-বংশে উপরন্তু ভূসম্পন্ন ব্যক্তির ঘরে জন্মগ্রহণ ক'রেছি।...এখন জিজ্ঞাসা করি, কোনো লেখকের লেখা বিচার করতে বসে তার কুলের পরিচয় নেবার ও দেবার সার্থকতা কি।'

ভারতচন্দ্র যে দীর্ঘকাল ভাগ্য-বিড়ম্বিত জীবন যাপন ক'রছেন সে পরিচয় তিনি দিয়েছেন। মোটকথা ভারতচন্দ্র যে মোটেই বিলাসীর জীবন নির্বাহ করেন নি, সেইটিই তিনি তাঁর জীবন-কাহিনী আলোচনা ক'রে প্রমাণ ক'রে দিয়েছেন। বিরুদ্ধবাদীদের প্রতি যে বক্রোক্তি ও শ্লেষোক্তি ক'রেছেন তার যেমন তীব্রতা, তেমনি দীপ্তি, 'আমরা আরামে আছি বলে আমরা মনে করি যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যাঁরা কবিতা লিখতেন, তাঁরা সব দাঁতে হীরে ঘষতেন আর তাঁদের ঘরে রুইমাছ এবং পালংশাক ভারে ভারে আসত।' ভারতচন্দ্র যে অবস্থায় পড়েছিলেন, সে অবস্থায় মনের স্বাভাবিক ভাব রক্ষা করাই সচরাচর দুরূহ হ'য়ে ওঠে, কাব্য রচনা তো দূরের কথা। ভারতচন্দ্রের নিজের স্বীকারোক্তি উদ্ধার ক'রে তিনি দেখিয়েছেন যে 'রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ হ'য়েও তাঁর দারিদ্র্য ঘোচে নি, এবং দারিদ্র্য তাঁকে নিরানন্দ করতে পারে নি, ক'রেছিল শুধু প্রমোদের প্রভু।' জীবনের এই বাস্তব দুঃখকে অস্বীকার ক'রে—সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত থেকে একমাত্র খাঁটি আর্টিস্টই হাসতে পারেন। ভারতচন্দ্রের মন ছিল যথার্থ শিল্পীর—তাই তাঁর কাব্যে বাস্তব জীবনের কোন দুঃখের ছায়া পড়ে নি, যদিও তাঁর জীবনের অধিকাংশ ঘটনার সঙ্গে ভাগ্য-বিড়ম্বনার দুঃখময় ইতিহাস জড়িয়ে ছিল। প্রমথ চৌধুরী ভারতচন্দ্রকে প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ 'শিল্পী' ব'লে মনে করেন।

সমালোচক মহলে ভারতচন্দ্রের সঙ্গে প্রমথ চৌধুরী যে আত্মিক সংযোগের কথা একটি বহু-আলোচিত বিষয় হ'য়ে উঠেছে, তার জবাব দিয়েছেন চৌধুরী মহাশয় নিজের ভাষায়, 'ভাষামার্গে আমি ভারতচন্দ্রের পদানুসরণ ক'রেছি। এর কারণ আমিও কৃষ্ণচন্দ্রের রাজধানীতে দীর্ঘকাল বাস ক'রেছি।' 'কৃষ্ণ-নাগরিক' প্রমথ চৌধুরী দুশো বছর আগের আর একজন কৃষ্ণনাগরিকের সঙ্গে

সংযোগ অনুভব ক'রেছেন। সরলতা ও সরসতা যেখানকার ভাষায় প্রধান গুণ, সেখানকারই নাগরিক এঁরা দুজন। কৃষ্ণনাগরিক হিসাবে ভারতচন্দ্রকে সর্বপ্রথম আবিষ্কার ক'রেছেন প্রমথ চৌধুরী। প্রসাদগুণ, ভাষার ঘনবদ্ধ-সংহতি, কথা-চতুরতা, নিপুণ শব্দার্থ-প্রয়োগকৌশল ও হাস্যরস—এ যেন অষ্টাদশ শতাব্দীর কৃষ্ণনাগরিক ভারতচন্দ্রের উত্তরাধিকার! চৌধুরী মহাশয় সশ্রদ্ধভাবে সেই গুরুঋণ স্বীকার ক'রেছেন। প্রবন্ধটিতে ভারতচন্দ্রের ভাষার প্রসাদ গুণ সম্পর্কে তিনি নাতিদীর্ঘ আলোচনা ক'রেছেন। ভাষার প্রসাদ গুণ হচ্ছে প্রসন্ন মনের পরিচ্ছন্ন ভাষা—মনের আলো যে ভাষার স্ফটিক-দেহে ঔজ্জ্বল্যের সৃষ্টি করে।

ভারতচন্দ্রের কাব্যের রস-বিচার নিয়ে প্রমথ চৌধুরী চমৎকার আলোচনা ক'রেছেন। পরের মুখে ঝাল খাওয়া যে তাঁর স্বভাব ছিল না তার প্রমাণ এখানে সুপরিস্ফুট। ভারতচন্দ্রের কাব্য সম্পর্কে অশ্লীলতার অভিযোগ করা হ'য়েছে এবং প্রমথ চৌধুরীর পূর্ব পর্যন্ত প্রায় সকলেই একবাক্যে ভারত কাব্যকে অশ্লীল বলেছেন। প্রমথ চৌধুরীর মতে, 'যে দোষে প্রাচীন কবিরা প্রায় সকলেই সমান দোষী, সে দোষের জন্য এক ভারতচন্দ্রকে তিরস্কার করবার কারণ কি ?' উদাহরণ স্বরূপ তিনি বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ও রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দরের কথা ব'লেছেন। দ্বিতীয়ত, ভারতচন্দ্রের অশ্লীলতার মধ্যে একটি আর্ট আছে, যা প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের অশ্লীল অংশের মধ্যে নেই। তার কারণ 'ভারতচন্দ্রের অশ্লীলতা গম্ভীর নয়, সহাস্য।' ভারতচন্দ্র সম্পর্কে অনেক আলোচনাই হ'য়েছে, কিন্তু এমন মৌলিক ও চিন্তাশীল মন্তব্য কদাচিৎ চোখে পড়েছে। ভারতচন্দ্র বিচারে তিনি সম্পূর্ণ নূতন পথ দেখিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'ভারতচন্দ্রের সাহিত্যের প্রধান রস কিন্তু আদিরস নয়, হাস্যরস। এ রস মধুর রস নয়, কারণ এ রসের জন্মস্থান হৃদয় নয় মস্তিষ্ক, জীবন নয়, মন।' হাস্যরসের স্বভাবধর্মের মধ্যেই কোথায় যেন শিষ্টতার সঙ্গে বিরোধ আছে। তার জন্য ভারতচন্দ্রকে শুধু অপরাধী করা যায় না। সামাজিক শিষ্টতাকে হাস্যরস অনেক সময়ই প্রবলবেগে আঘাত করে। হাস্যরসের প্রগল্‌ভতার জন্যই সম্ভবত সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রে 'এই প্রগল্‌ভ বিদূষকটি' অন্যান্য রসের সঙ্গে একাসন পায় নি। হাস্যরসের মধ্যে যে প্রবল অসঙ্গতি থাকে, তা অনেক সময় সংস্কারকে আঘাত করে। ভারতচন্দ্রের হাসিতে আছে 'সামাজিক জড়তার প্রতি প্রাণের বক্রোক্তি, সামাজিক মিথ্যার প্রতি সত্যের বক্রদৃষ্টি।'

চৌধুরী মহাশয়ের মতে ভারতচন্দ্রের হাস্যরস সৃষ্টির মধ্যে সেই প্রাণশক্তি ছিল।

ভারতচন্দ্র প্রসঙ্গে প্রমথ চৌধুরী যা ব'লেছেন, তা প্রধানত তিনভাগে ভাগ করা যায়—প্রথমত জীবনে দুঃখ ভোগ ক'রেও ভারতচন্দ্র তাঁর কাব্যকে এক-খানি দুঃখের পাঁচালী তৈরী করেন নি। দ্বিতীয়ত, তিনি একজন অসাধারণ ভাষাশিল্পী—তাঁর ভাষার প্রসাদগুণ অসাধারণ। তৃতীয়ত, তাঁর কাব্যের মূলরস আদিরস নয়, হাস্যরস। দ্বিতীয় বিষয়টি সম্পর্কে মতদ্বৈধতার অবকাশ নেই। কিন্তু তাঁর প্রথম বক্তব্যটি নিঃসন্দেহে মৌলিক। তিনি ভারতচন্দ্রের জীবনী আলোচনা ক'রে তাঁর বক্তব্যকে প্রমাণ ক'রেছেন। সাহিত্যিকের বাস্তবজীবন এবং তাঁর রচিত সাহিত্যের মধ্যে সংযোগ-সূত্র নির্ণয় করে যে সব সময় সাহিত্যিকের মনোজীবন নির্দেশ করা যায় না, এ কথা তিনি স্পষ্টভাবেই ব'লেছেন। সাহিত্যের একটি মূলতত্ত্বেরও তিনি আলোচনা ক'রেছেন। ব্যক্তি জীবন ও শিল্পীজীবন যে সব সময় সমান্তরালভাবে চলে না, এমন কি সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী হ'তে পারে, সাহিত্যে এর উদাহরণও দুর্লভ নয়। মিল্টনের ব্যর্থ দাম্পত্য জীবনই কি আদম-ঈভের সুখাবেশমণ্ডিত দাম্পত্য জীবনের স্বপ্ন-স্বর্গ রচনা করে নি? সারভান্তেসের দুঃখময় জীবন তাঁর হাস্য-সমুজ্জল রচনার মধ্যে কোন ছায়াপাতই করে নি। ডষ্টয়েভস্কির ব্যক্তিজীবনের ছবির সঙ্গে তাঁর শিল্পী-ব্যক্তিত্বের কোন মিল খুঁজে পাওয়া যাবে না। ব্যক্তিজীবনে তিনি ছিলেন সন্দেহবাতিকগ্রস্ত, কলহ-পরায়ণ, স্বার্থপর, অবিবেচক ও সঙ্কীর্ণচিত্ত অসহিষ্ণু। কিন্তু তাঁর কথাসাহিত্যের মধ্যে যে শিল্পীমানস উদ্ঘাটিত হ'য়েছে তার তুলনা নেই। এইজন্য ব্যক্তি জীবনের খুঁটিনাটি ঘটনা দিয়ে সব সময় শিল্প জীবন বিচার করা সম্ভব নয়।[২৯] প্রমথ চৌধুরীর মতে ভারতচন্দ্র প্রাণবন্ত হাস্যরসের বিদ্যুতের আলোয় দুঃখের অন্ধকারকে দূর ক'রেছেন। এ হাঁসি 'বীরের হাসি।'

তাঁর মতে ভারতচন্দ্রের হাস্যরসের ফলশ্রুতি দু'টি: হাসির সাহায্যে তিনি দুঃখকে অতিক্রম ক'রেছেন, দ্বিতীয়ত, হাস্যরস অনেক সময় অশ্লীলতাকে সহাস্য ক'রে তুলেছে। ভারতচন্দ্রের গোটা কাব্য না হোক, অংশ বিশেষ যে অশ্লীল, এ বিষয়ে তাঁরও কোন দ্বিমত ছিল না। তিনি বলেছেন, 'সাদা কথায় ভারত-চন্দ্রের কাব্য অশ্লীল। তাঁর গোটা কাব্য অশ্লীল না হোক, তার অনেক অংশ যে অশ্লীল সে বিষয় দ্বিমত নেই। তা যে অশ্লীল তা স্বয়ং ভারতচন্দ্রও জানতেন

কারণ তাঁর কাব্যের অশ্লীল অঙ্গ সকল তিনি নানাবিধ উপমা অলংকার ও সাধুভাষায় আবৃত করতে প্রয়াস পেয়েছেন।

'ভারতচন্দ্র' প্রবন্ধটিতে প্রমথ চৌধুরী ভারতচন্দ্রের পূর্ণাঙ্গ সমালোচনা করেন নি—কারণ ভারতচন্দ্র সম্পর্কে আলোচনার নানাদিক আছে। কিন্তু তিনি কয়েকটি এমন প্রসঙ্গের উল্লেখ করেছেন, যা ভারতচন্দ্র-আলোচনার নূতন দিক-নির্ণয় করবে। তাই পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও গবেষণাধর্মী আলোচনাগুলির পাশে এই আলোচনাটি একান্ত মৌলিক ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। ভারতচন্দ্রকে যে তিনি হৃদয়-মন দিয়ে গভীরভাবে বুঝেছিলেন এবং কত অন্তরঙ্গভাবে, তার প্রমাণ এই প্রবন্ধটি। প্রবন্ধটির কোথায়ও অতিরিক্ত উচ্ছ্বাস নেই, কিন্তু তার জন্য শ্রদ্ধা ও প্রীতির তারতম্য ঘটেনি। এখানেও নানাপ্রসঙ্গের অবতারণা করা হয়েছে, কিন্তু মূল কথাটিকে প্রয়োজন মতো ঠিকই ধরেছেন, কথাসূত্র হারায়নি। এ যেন অন্তরঙ্গ মহলে লঘু ভঙ্গিতে নিতান্ত গল্পচ্ছলে নিজের একান্ত আপন একটি মানুষের কথা বলে যাওয়া! অতুলচন্দ্র গুপ্ত যথার্থই বলেছেন, 'ভারতচন্দ্রের এক স্মৃতিসভায় তিনি তাঁর প্রিয় কবির যে জীবনকথা পড়েছিলেন তাতে তাঁর মনের ভাবের দিকটা একটু উন্মুক্ত হ'য়েছে। তাঁর লেখার কোন গুণ আবৃত না ক'রে এ রচনাটি শ্রদ্ধা ও প্রীতির অপূর্ব মৃদু আলোতে উদ্ভাসিত। এক সময় মনে হয়, ভাবের মুখের রাশ তিনি একটু বেশি জোরে টেনে রেখেছিলেন।'[৩০]

আ ট

'নানা-চর্চা'র 'রামমোহন রায়' একটি অত্যন্ত মূল্যবান ও পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধ। আধুনিক যুগের চিন্তা-চেতনার অগ্র-পথিকের বহুমুখী কার্যকলাপের পূর্ণাঙ্গ রূপ উদ্‌ঘাটনের পক্ষে একটি প্রবন্ধ নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। তথাপি প্রমথ চৌধুরী একটি প্রবন্ধের মধ্যেই রামমোহন রায়ের চরিতশ্রী ও অপূর্ব মনীষার যে পরিচয় দিয়েছেন, তার বিচারশক্তি ও গভীরতা প্রশংসনীয়। প্রবন্ধকার প্রমথ চৌধুরী সাধারণত লঘু রীতিতেই কথা বলেন, কিন্তু এই প্রবন্ধটি তার একটি উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। এখানে তিনি তর্কজাল বিস্তার ক'রে, কথার মারপ্যাঁচের সাহায্যে বক্তব্য থেকে দূরে সরে যান নি, শ্রদ্ধা ও প্রীতির স্নিগ্ধ আলোকে তিনি একালের শ্রেষ্ঠ বাঙালী-মনীষাকে আরতি ক'রেছেন। কিন্তু যুক্তিবাদী লেখক অকারণ ভাব বিলাসের কাছে আত্মসমর্পণ করেন নি। বিরুদ্ধবাদীদের মতামত উজ্জ্বল-কঠিন যুক্তির শরাঘাতে খণ্ডিত করে রামমোহন-চরিত ও তাঁর কার্যকলাপের

যথার্থ স্বরূপ কি তা-ই দেখানোর চেষ্টা ক'রেছেন—এ বিষয়ে তাঁর প্রধান অস্ত্র ছিল রামমোহনের রচনাবলী। তিনি রামমোহনের রচনাবলী থেকে একাধিক অংশ উদ্ধার করে তাঁর বক্তব্য প্রতিপাদন ক'রেছেন। প্রবন্ধটি বিচিত্র-পুরুষ ও অদ্ভুতকর্মা রামমোহনের চরিত্র ও কার্যকলাপের একটি সংক্ষিপ্ত estimate।

প্রবন্ধের প্রথমেই তিনি রামমোহন সম্পর্কে লোক-চলিত ধারণাগুলির কথা বলেছেন। রামমোহন যে 'বর্তমান ভারতবর্ষের অদ্বিতীয় মহাপুরুষ' একথা আজ সুবিদিত। লোকসমাজে অনেকেরই ধারণা যে রামমোহনই বাংলা গদ্যের স্রষ্টা। রামমোহন বাংলা গদ্যের সর্ব প্রথম লেখক, এ ধারণাটি ঐতিহাসিক সত্য নয়, কিন্তু তিনি হচ্ছেন বাংলা গদ্যের প্রথম লেখকদের মধ্যে সর্বপ্রধান লেখক।' চৌধুরী মহাশয়ের মতে রামমোহনের লেখার সঙ্গে বর্তমান কালের বাঙালী লেখকদের যথেষ্ট পরিচয় নেই। তাই অনেকে মনে করেন যে, রামমোহন মূলত বাংলা নবধর্ম সম্প্রদায়ের প্রবর্তকদের একজন। কিন্তু রামমোহনকে শুধু নব-ধর্ম সম্প্রদায়ের একজন বললে তাঁর বিশাল ও সর্বঙ্কর প্রতিভার কোন পরিচয়ই দেওয়া হয় না, উপরন্তু তাঁর জীবনের আসল স্বরূপ অনুদ্ঘাটিতই থাকে। এর প্রধান কারণ এই যে রামমোহনের রচনার সঙ্গে খুব কম লোকেরই পরিচয় আছে।

রামমোহনের ধর্মমত সম্পর্কে লেখক ইচ্ছে করেই আলোচনা করেন নি, তিনি মূলত তাঁর সামাজিক মত নিয়েই আলোচনা ক'রেছেন। সচরাচর আমাদের ধারণা এই যে, প্রাচীন ভারতবর্ষ মোটেই ইহ-চেতন ছিল না, অপর পক্ষে আধুনিক ইউরোপ হচ্ছে সমাজ-সচেতন। জ্ঞানমার্গ ও কর্মমার্গের সমন্বয় সাধন করার জন্য এ দেশের অনেক মহাপুরুষ আবির্ভূত হ'য়েছেন। প্রাচীন ভারতবর্ষ এই দু'য়ের সমন্বয় সাধনের মহাব্রত গ্রহণ ক'রেছিল। 'জ্ঞানকর্মের সমন্বয় করবার জন্য ভারতবর্ষে যুগে যুগে বহু মহাপুরুষের আবির্ভাব হ'য়েছে, যাঁদের কাছে এ সত্য প্রত্যক্ষ ছিল যে, কর্মহীন জ্ঞান পঙ্গু এবং জ্ঞানহীন কর্ম অন্ধ। রামমোহন রায় এঁদেরই বংশধর, এঁদেরই পাঁচজনের একজন'—সে যুগে বিরুদ্ধবাদীরা তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিলেন যে 'তিনি গৃহী হয়েও ব্রহ্মজ্ঞানী হবার ভান করতেন।' এই জাতীয় অভিযোগ থেকেই বেশ বোঝা যায় যে তিনি কত বড় সমন্বয়সাধক ছিলেন।

রামমোহন সম্বন্ধে লেখক আর একটি লৌকিক ধারণাকে নিরসন করার চেষ্টা ক'রেছেন। প্রচলিত ধারণা এই যে ইউরোপীয় সংস্কৃতির প্রসাদেই

রামমোহনের মনোজগৎ গড়ে উঠেছিল। কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে ইংরেজী শেখার বহু আগে থেকেই তাঁর মনে বিচার বুদ্ধি ও স্বাধীন-চিন্তার উন্মেষ হয়েছিল—তার আগেই তিনি যুক্তির সাহায্যে ধর্মবিচারে প্রবৃত্ত হ'য়েছিলেন। তা ছাড়া তিনি যেমন পৌত্তলিকতাকে সমর্থন করেন নি, তেমনি খ্রীষ্টানধর্মকেও প্রত্যাখ্যান ক'রেছিলেন। তাঁর মনের এমন প্রবল শক্তি ছিল যা, কোন সাময়িক উন্মাদনায় আন্দোলিত হত না। দৃঢ়নিষ্ঠ বিচার বুদ্ধি দিয়েই তিনি সব কিছু গ্রহণ-বর্জন করেছেন—সাময়িক উত্তেজনার স্রোতে অবাধে গা ভাসিয়ে দেন নি। প্রমথ চৌধুরী চমৎকার ভাবে রামমোহনের মানস প্রকৃতি নির্ণয় করেছেন, 'সত্য কথা বলতে গেলে তিনি এ যুগে বাংলা দেশে প্রাচীন আর্যমন নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।'—অপূর্ব মীমাংসা!

কোন একজন সমালোচক এমন মন্তব্যও ক'রেছেন যে রামমোহন দীর্ঘকাল বেঁচে থাকলে নাকি খ্রীষ্টান হয়ে যেতেন। এখানে লেখক তাঁর স্বভাব-সিদ্ধ বিচারবুদ্ধির সাহায্যে সমস্যাটির ওপরে আলোকপাত ক'রেছেন। রামমোহন ছিলেন উদারচেতা—তাঁর মনের পরিধি ছিল বহু-বিস্তৃত। তাই তিনি খ্রীষ্টধর্মের 'যে অংশ spiritual এবং ethical তার প্রতি অনুকূল ছিলেন' কিন্তু বাইবেলের কোন কোন অংশকে 'বড়াই বুড়ির কথা' বলে বিদ্রূপও করেছেন। প্রবন্ধটির প্রথমাংশে প্রমথ চৌধুরী রামমোহনের দার্শনিক মনোভাবের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়ে শেষার্ধে তাঁর সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক দূরদর্শিতা সম্পর্কে আলোচনা ক'রেছেন।

জাতীয় জীবনের চারদিকেই অজ্ঞানতা ও জড়তার অন্ধকার—মোহনিদ্রা তখনও ভাঙে নি। কিন্তু ইংরেজী শিক্ষা ও সভ্যতার প্রভাবে যে আমাদের জীবনের গভীর পরিবর্তন ঘটবে, এ সত্য রামমোহনের সম্মুখে স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছিল। রামমোহন সমস্যাটিকে দু'দিক থেকে দেখেছিলেন—তিনি বুঝেছিলেন যে জাতির সম্মুখে এসেছে চরম পরীক্ষার লগ্ন—এতে যেমন আমাদের আত্মরক্ষা করতে হবে, তেমনি নব-সভ্যতার সুযোগ নিয়ে, তাকে সদ্ব্যবহার ক'রে আত্মোন্নতির উপায় উদ্ভাবন করতে হবে। সুতরাং এক্ষেত্রে মোহনিদ্রায় আচ্ছন্ন থাকলে চলবে না, সতর্ক পদক্ষেপে বিচার-প্রবণ জাগ্রত বুদ্ধি নিয়ে অগ্রসর হতে হবে। রামমোহনের ঐতিহাসিক দৃষ্টি ও যুক্তিবাদী মন আগামী যুগের সঙ্কেত অনুভব করেছিল, অথচ তিনি ইংরেজী বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন না। ইংরেজী শেখার বহু আগে তিনি সংস্কৃত আরবী ও ফারসী ভাষার সম্বল নিয়েই পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও সভ্যতার দোষগুণ বিচারে প্রবৃত্ত হ'য়েছিলেন।

সাধারণের মধ্যে একটি প্রচলিত বিশ্বাস আছে এই যে 'রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্মধর্মের প্রবর্তন ক'রে দেশের লোককে খ্রীষ্টধর্মের আক্রমণ থেকে রক্ষা ক'রেছেন।' প্রমথ চৌধুরী রামমোহনের রচনা থেকে উদ্ধার করে দেখিয়েছেন যে, রামমোহন খ্রীষ্টধর্মের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন নি, খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের যে সঙ্কীর্ণ ও বিকৃত পদ্ধতি তখন প্রচলিত ছিল, তারই বিরুদ্ধে শস্ত্রপাণি হ'য়েছিলেন। যে যুগে ইংরেজ শুধু প্রভুই নয়, সাধারণের কাছে ভীতির পাত্র ছিল, সেই যুগে রামমোহনের বলিষ্ঠ প্রতিবাদ তাঁর চরিত্রের দৃঢ়তা ও সাহসিকতারই পরিচয় দেয়। সে যুগের ভয়ার্ত ও দুর্বলচিত্ত বাঙালীকে রামমোহন মানুষ ক'রে তুলতে চেয়েছিলেন—কারণ চিত্তমুক্তির সাধনাই ছিল তাঁর চরম ও শ্রেষ্ঠ সাধনা। ইউরোপীয় চিন্তার শ্রেষ্ঠ সম্পদ দিয়ে তিনি জাতীয় জীবনকে গৌরব-মণ্ডিত ক'রে তুলতে চেয়েছিলেন। ইউরোপীয় প্রভাব সম্পর্কে রামমোহনের দৃষ্টিভঙ্গিকে চৌধুরী মহাশয় একটি কথায় সুন্দর ক'রে ফুটিয়ে তুলেছেন, 'তাই তিনি একদিকে যেমন ইউরোপের পৌরাণিক ধর্ম অগ্রাহ্য ক'রেছিলেন, অপর দিকে তিনি তেমনি ইউরোপের সামাজিক ধর্ম সোৎসাহে সানন্দে অঙ্গীকার ক'রেছিলেন।'

রামমোহনের স্বাধীনতা-স্পৃহাটিকেও লেখক খুব সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ ক'রেছেন। দেশের স্বাধীনতা এখানে ব্যক্তিস্বাধীনতার পরিপন্থী নয়—তিনি ব্যক্তিকে সমষ্টির যূপকাষ্ঠে বলি দেওয়ার পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না।[৩১] চৌধুরী মহাশয় তাই সঙ্গতভাবেই ব'লেছেন, 'মানুষকে দাস রেখে মানব সমাজকে স্বাধীন ক'রে তোলার যে কোন অর্থ নেই এ জ্ঞান রামমোহন রায়ের ছিল।' সিভিল ও রিলিজিয়াস লিবার্টি রক্ষার জন্য তিনি তৎকালীন ইংলণ্ডের রাজা চতুর্থ জর্জকে যে খোলা চিঠি লেখেন তা মানুষের মুক্তি-সংগ্রাম ইতিহাসের মূল্যবান দলিল। অবিদ্যার চেয়ে বড় অভিশাপ আর নেই। তাই অবিদ্যার মোহান্ধকার দূর করার জন্য তিনি নব্য ইউরোপের দর্শন ও বিজ্ঞানকে সাদরে আহ্বান ক'রেছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালী যে মানসিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গোটা ভারতবর্ষের নেতৃত্ব গ্রহণ ক'রেছিলেন তার জন্য দায়ী রামমোহনের অতন্দ্র-সাধনা। নব্য বাংলাদেশ প্রকৃতপক্ষে তাঁর মানস-সন্তান।

প্রমথ চৌধুরীর অধিকাংশ প্রবন্ধের সঙ্গে এই প্রবন্ধের একটি পার্থক্য আছে। তাঁর প্রবন্ধের অনেক ক্ষেত্রেই বিষয়ের আপেক্ষিক ক্ষীণতা লক্ষণীয়, কিন্তু মনোজ্ঞ বাচনভঙ্গির গুণে তাদের আস্বাদন হ'য়েছে অভিনব। কিন্তু আলোচ্য প্রবন্ধটির

বিষয়ের গুরুত্বও কম নয়—লেখকের মনটিও বিষয়ের ওপরে নিবদ্ধ। দ্রুত প্রসঙ্গ পরিবর্তন, বিতর্কসঙ্কুল আবহাওয়ার সৃষ্টি প্রভৃতি যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য প্রমথ চৌধুরীর গদ্য রচনায় চোখে পড়ে, তা এখানে নেই বললেই হয়। 'খাঁটি প্রবন্ধ' (Formal Eassy) বলতে যা বোঝায়, এ প্রবন্ধটি তাই। বক্তব্য গভীর অথচ খুব হাল্কা চালে ব'লেছেন, এ কথাও ঠিক বলা চলবে না। তিনি সমগ্রভাবে রামমোহন চরিত্র আলোচনা করলেও, প্রধানত তাঁর সামাজিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টির দিকেই জোর দিয়েছেন। রামমোহনের প্রগতিপন্থী ও অগ্রগামী ভাবনা কেমন ক'রে নবযুগের সূচনা ক'রেছিল সে দিকের ছবিই বড় ক'রে ফুটিয়ে তুলেছেন।

প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধটির প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের রামমোহন সম্পর্কিত বিখ্যাত প্রবন্ধটির[৩২] কথা মনে হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক। তিনি প্রধানত রামমোহনের ধর্মজীবন সম্পর্কেই আলোচনা ক'রেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধের মূল পার্থক্য বক্তব্যের বিভিন্নতার জন্য নয়,—এ পার্থক্য প্রকৃতিগত। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ কবির হাতে লেখা। তাতে চিত্রকল্প ও উপমার প্রাচুর্য। রামমোহনের স্বরূপ ফোটাতে গিয়ে প্রমথ চৌধুরীকে যেখানে নানা যুক্তি তর্কের অবতারণা ক'রে স্বমত প্রতিষ্ঠিত করতে হ'য়েছে, রবীন্দ্রনাথ সেখানে এক একটি চিত্রকল্পের মাধ্যমে রামমোহনের অন্তর্জীবনকে উদ্ভাসিত ক'রে তুলেছেন। প্রমথ চৌধুরীর যুক্তির জাল ইস্পাতের মতো কঠিন, বিচারশক্তি যেমন তীক্ষ্ণ তেমনি বলিষ্ঠ। তাঁর প্রবন্ধের প্রধান হাতিয়ার এই দুটি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ভিন্ন মার্গের পথিক—তিনি মানসলোকে রামমোহনকে সৃষ্টি করেছেন,—আবেগ স্পন্দিত শ্রদ্ধার সঙ্গে রামমোহনের অন্তর্জীবনকে রূপ দিয়েছেন। রামমোহনের আবির্ভাব লগ্নটির যে ভয়াবহ প্রেত-পিঙ্গল ছবি এঁকেছেন, তার কবি-কল্পনা বিশ্ব-ব্যাপক। অন্ধকার নিশীথিনীর অনির্দেশ বিভীষিকার মাঝখানে রামমোহনের আবির্ভাবের চিত্রকল্পটিকে তিনি যে ভাবে ফুটিয়েছেন, তাতে আর কিছুর প্রয়োজন হয় না। ঐ একখানি ছবিতেই রামমোহন ও তাঁর কালের একটি পূর্ণায়ত রূপ ফুটেছে। একই বিষয়ে লেখা রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধ দুটির আস্বাদন কত স্বতন্ত্র !

নয়

সমসাময়িক সাহিত্যিক-বিতর্কের মধ্যে প্রমথ চৌধুরী একটি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ ক'রেছিলেন। তাঁর অনেকগুলি সাহিত্য-বিষয়ক প্রবন্ধ তৎকালীন সাহিত্যিক

বাদ-প্রতিবাদ অবলম্বন ক'রে রচিত হ'য়েছে। কিন্তু সাময়িকতার ছাপ যতই থাকুক না কেন, প্রবন্ধগুলিতে লেখকের নিজস্ব চিন্তা ও জিজ্ঞাসা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এই শ্রেণীর প্রবন্ধের দু'টি দিক আছে, প্রথমত, সমালোচকের মূল্যবান সাহিত্য চিন্তা। এই সাহিত্যচিন্তার মধ্যে প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যিক বিবেকের পরিচয় পাওয়া যায়। দ্বিতীয়ত, প্রবন্ধগুলির একটি ঐতিহাসিক মূল্যও আছে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস-লেখকদের কাছেও এ প্রবন্ধগুলি মূল্যবান দলিলের কাজ করবে। প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্বে বাংলা সাহিত্যের আবহাওয়া কৌতূহলী গবেষকের সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হবে।

'সাহিত্যে চাবুক' (বীরবলের হালখাতা) ও 'চিত্রাঙ্গদা'[৩৩] প্রবন্ধ দু'টি প্রধানত রবীন্দ্র-দ্বিজেন্দ্র বিরোধ পর্বের পটভূমিকায় লেখা। রবীন্দ্রনাথের সুদীর্ঘ সাহিত্যিক জীবনের মধ্যে মুখ্যত তাঁর বিভিন্ন রচনা অবলম্বন ক'রে বহুবার সাহিত্যিক-বিতর্কের সূত্রপাত হ'য়েছিল। কৈশোর ও প্রথম যৌবনেও বঙ্কিমচন্দ্র, চন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতির সঙ্গে বিতর্কে অবতীর্ণ হ'য়েছিলেন। রবীন্দ্র-বিরোধীদলের সক্রিয়তা ও প্রবলতা কম ছিল না। একদা কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ 'মিঠে ও কড়া' নামে 'কড়ি ও কোমল' কাব্যের একটি প্যারডি লিখেছিলেন। 'সাহিত্য' ও 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার সুর ছিল তীব্র রবীন্দ্র-বিরোধী। পরবর্তী কালে (১৩২১-'২২) দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ সম্পাদিত 'নারায়ণ' পত্রিকাও রবীন্দ্র-বিরোধী দলকে পরিপুষ্ট ক'রেছিল। রবীন্দ্রনাথ যখন তাঁর প্রতিভার মধ্যগগনে তখনও রবীন্দ্র-বিরোধী ধারা প্রবল ও সক্রিয়। বিশ শতকের প্রথম দশ-বারো বছর বোধ হয় রবীন্দ্র-বিরোধী দলের সবচেয়ে সক্রিয় অধ্যায়। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ধারার পাশাপাশি আর একটি ধারাও চ'লেছিল। বিশ শতকের প্রথম দশকের রবীন্দ্র-বিরোধী সাহিত্যিক গোষ্ঠীর সারথ্য ক'রেছিলেন কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। তখনকার সাহিত্যিক, এমন কি শিক্ষিত সম্প্রদায় পর্যন্ত যেন দু'টি বিরোধীদলে ভাগ হ'য়ে গিয়েছিলেন—'দ্বিজু রায়ের দল ও রবিঠাকুরের দল।'[৩৪] দৃষ্টিভঙ্গি ও রুচিবোধের আমূল পার্থক্যই এই জাতীয় বিরোধের মূলে। রবীন্দ্র-মানস ও দ্বিজেন্দ্র-মানসের মধ্যে পার্থক্য এত বেশী যে তাকে সম্পূর্ণ বিপরীত বললেও অত্যুক্তি হয় না।

দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রনাথের থেকে দু'বছরের ছোট ছিলেন, কিন্তু তাঁর সাহিত্যিক খ্যাতি ঘটে অনেক পরে। দ্বিজেন্দ্রলালের প্রথম দিকের কবিতায় (আর্যগাথা, দ্বিতীয় খণ্ড) রবীন্দ্রনাথের কিছু কিছু প্রভাব ছিল। রবীন্দ্রনাথ

দ্বিজেন্দ্রলালের তিনখানি কাব্যগ্রন্থ সমালোচনা ক'রে কবি ও গীতিকার দ্বিজেন্দ্রলালের কবি-মানসের বৈশিষ্ট্য ও রচনারীতির স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে মূল্যবান মন্তব্য ক'রেছেন।[৩৫] অন্যদিকে দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর 'বিরহ' নামক প্রহসনটি (১৩০০) রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করেন। তখনও রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলালের সম্পর্ক কেমন ছিল তা প্রহসনটির উৎসর্গ-পত্র দেখলেই বেশ বোঝা যায়।[৩৬] কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশপ্রেমমূলক নাটক যখন দেশব্যাপী একটি আলোড়নের সৃষ্টি ক'রেছিল তখন এর স্বপক্ষে বা বিপক্ষে রবীন্দ্রনাথ কোন মন্তব্য প্রকাশ করেন নি। হয়তো রবীন্দ্রনাথের এই মৌনতা দ্বিজেন্দ্রলালের কাছে ভালো লাগে নি।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের প্রকাশ্য বিরোধ সুরু হ'ল 'বঙ্গভাষার লেখক' গ্রন্থের অন্তর্গত রবীন্দ্রনাথের আত্মকাহিনী অবলম্বন ক'রে। গ্রন্থটিতে জীবিত ও মৃত কবিদের জীবনী সংগৃহীত হয়। রবীন্দ্রনাথকে তাঁর নিজের জীবনী লিখতে অনুরোধ করায় তিনি তাঁর কাব্যানুভূতির ক্রমবিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করেন। এই আলোচনায় 'মানুষ আকারে বদ্ধ যে জন ঘরে' তার কথা মোটেই স্থান পায় নি, কবি রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবনের বিচিত্র অভিব্যক্তি এবং ক্রমবিকাশের কথাই বর্ণিত হ'য়েছে। রবীন্দ্রনাথের এই আত্মপরিচয়টি দ্বিজেন্দ্রলালকে উত্তেজিত ক'রেছিল। এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দ্বিজেন্দ্র-লালের পত্র-বিনিময়ও হ'য়েছিল। দ্বিজেন্দ্রলাল ১৩১৩ সালের আষাঢ় মাসে গয়ায় বদলি হন; গয়ায় অবস্থান কালে তাঁর নিত্যসঙ্গী ছিলেন তৎকালীন জেলা জজ লোকেন্দ্র পালিত। লোকেনবাবুর সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্পর্কে নানাপ্রকার আলোচনা হ'ত—দ্বিজেন্দ্রলালের আলোচনার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের কবিতার বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট অভিযোগ থাকত।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যের অস্পষ্টতার বিরুদ্ধে দ্বিজেন্দ্রলাল যে অভিযান চালিয়ে ছিলেন, তা 'কাব্যের অভিব্যক্তি'[৩৭] নামক প্রবন্ধে সুস্পষ্টভাবে আত্মপ্রকাশ করল। রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' কবিতার প্রসঙ্গে উক্ত প্রবন্ধে তিনি ব'লেছিলেন, 'পরের ভাষায় পরের দেশের প্রায় সর্বাপেক্ষা দুর্বোধ কবির প্রায় সর্বাপেক্ষা দুর্বোধ্য কবিতা (যথা, Wordsworth-এর 'Ode on the immortality of the soul') বুঝিতে পারি; কিন্তু আমার মাতৃভাষায় আমার বাঙ্গালী ভ্রাতার কবিতা বুঝিতে গলদঘর্ম হইতে হয়। এই যদি ইহাদের বৃহৎ ভাবের ফল হয় তো বলিতে হইবে যে সে ভাব বড়ই বৃহৎ!! কারণ এ

কবিতাটি দুর্বোধ্য নয়, অবোধ্যও নয়,—একেবারে অর্থশূন্য, স্ব-বিরোধী।' প্রবন্ধটিকে কেন্দ্র ক'রে সাহিত্যিক মহলে নানা বাদানুবাদের সৃষ্টি হ'য়েছিল। দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' কবিতার প্যারডি ও তার হাস্যকর কষ্টকল্পিত আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা প্রকাশ করলেন।[৩৮] দ্বিজেন্দ্রলালের এই প্যারডি রচনা করার আসল উদ্দেশ্য স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে। তিনি মনে করেন যে রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের সমর্থকেরা 'সোনার তরী' কবিতার ওপরে জোর ক'রে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা আরোপ করেছেন। পরের বছর তিনি 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় 'কাব্যের উপভোগ' নামে আর একটি প্রবন্ধে[৩৯] 'বঙ্গভাষার লেখক' গ্রন্থে সঙ্কলিত রবীন্দ্রনাথের আত্মজীবনীকে তীব্র ভাষায় সমালোচনা করেন, 'রবীন্দ্রবাবু তাঁর আত্মজীবনীতে Inspiration-এর দাবী ক'রে যখন নিজের কবিতাবলী সমালোচনা করতে ব'সেছিলেন তখন তাঁর দম্ভ ও অহমিকায় আমি স্তম্ভিত হ'য়েছিলাম।' 'বঙ্গদর্শন' সম্পাদক শৈলেশচন্দ্র মজুমদার রবীন্দ্রনাথকে সেই প্রবন্ধ দেখতে দিয়েছিলেন, ঐ সংখ্যাতেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করেন, 'আমি যাহা বলিতে চেষ্টা করি, সকল ক্ষেত্রে তাহা যে স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করিতে পারি না, দ্বিজেন্দ্রবাবু তাহা আমার কাব্য-সমালোচনা উপলক্ষে পূর্বেই বলিয়াছেন। আমার বুদ্ধি ও বাণীর জড়িমা আমার গদ্য প্রবন্ধেও নিশ্চয়ই প্রকাশ পাইয়া থাকে, নহিলে দ্বিজেন্দ্রবাবু আমার আত্মজীবনী পড়িয়া এমন ভুল বুঝিবেন কেন। কারণ আমি মনে জানি, অহঙ্কার করিবার অভিপ্রায় আমার ছিল না।'

কাব্যে অস্পষ্টতার অভিযোগের বছর খানিক পরে দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রনাথের কাব্যকে দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত করলেন। তিনি মুখ্যত রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা' নাট্যকাব্য অবলম্বন ক'রে তাঁর তীব্র চিত্ত বিক্ষোভ প্রকাশ করেন— প্রবন্ধটির নাম 'কাব্যে নীতি'।[৪০] এই প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্র-বিরোধ চূড়ান্ত হ'য়ে উঠেছে, 'রবীন্দ্রবাবুর গ্রহ উপগ্রহগণ ভারতচন্দ্রকে নিশ্চয়ই অশ্লীল কবি বলেন। অশ্লীলতা ঘৃণার্হ বটে, কিন্তু অধর্ম ভয়ানক। ঘরে ঘরে বিদ্যা হইলে সংসার 'আস্তাকুড়' হয়, কিন্তু ঘরে ঘরে চিত্রাঙ্গদা হইলে সংসার একেবারে উচ্ছন্নে যায়। সুরুচি বাঞ্ছনীয়, কিন্তু সুনীতি অপরিহার্য।' এর পরে দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ আর মসীযুদ্ধে নামেন নি; তথাপি উভয় পক্ষের সমর্থকদের মধ্যে বেশ কয়েক বছরব্যাপী বাদানুবাদ চ'লেছিল। রবীন্দ্রনাথ যখন বিদেশে তখন দ্বিজেন্দ্রলাল অতুলকৃষ্ণ মিত্রের 'নন্দবিদায়'কে প্যারডি ক'রে অত্যন্ত নগ্নভাবে

রবীন্দ্রনাথকে আক্রমণ করেন। নাটকখানিকে 'ষ্টার' থিয়েটারের অভিনয় করানো হয়।[৪১] কিন্তু সেদিনের বাঙালী দর্শক এই বীভৎস ব্যক্তিগত আক্রমণ সহ্য করিতে পারে নি—এমন কি নাট্যকারও রঙ্গালয় ত্যাগ করতে বাধ্য হন। 'আনন্দ-বিদায়' উৎসর্গ করা হ'য়েছিল রসরাজ অমৃতলাল বসু মহাশয়কে। 'ভূমিকা'য় নাট্যকার কৈফিয়ৎ দিয়েছেন, 'এ নাটিকায় কোন ব্যক্তিগত আক্রমণ নাই। "মি"র প্রতি আক্রমণ আছে। ন্যাকামি, জেঠামি ভণ্ডামি ও বোকামি লইয়া যথেষ্ট ব্যঙ্গ করা হইয়াছে। যদি কাহারও অন্তর্দাহ হয় তো তাহার জন্য তিনি দায়ী, আমি দায়ী নহি।...যদি কোন কবি কোনরূপ কাব্যকে অমঙ্গলকর বিবেচনা করেন, তাহা হইলে সেরূপ কাব্যকে সাহিত্য ক্ষেত্র হইতে চাবকাইয়া দেওয়া তাঁহার কর্তব্য। Browning মহাকবি Wordswoth-কে এইরূপ চাবকাইয়াছিলেন। Wordsworth মহাকবি Shelley ও Byron-কে এইরূপই কশাঘাত করিয়াছিলেন।'

'সাহিত্যে চাবুক' ও 'চিত্রাঙ্গদা' প্রবন্ধ দু'টির মোটামুটি পটভূমিকা এইরূপ। 'আনন্দ-বিদায়' অভিনয়ের পরের মাসেই এই প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়।[৪২] 'আনন্দ-বিদায়'-এর দক্ষযজ্ঞ-পরিণতি নিয়েই প্রবন্ধটির সূত্রপাত। কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে, দ্বিজেন্দ্রলাল 'আনন্দ-বিদায়'-এর যে সংক্ষিপ্ত ভূমিকা লিখেছিলেন, তার প্রতিটি অংশকে প্রমথ চৌধুরী সুতীক্ষ্ণ ও অব্যর্থলক্ষ্য যুক্তির সাহায্যে ব্যর্থ প্রতিপন্ন করেন। একজন 'কৃষ্ণনাগরিক'কে আর একজন 'কৃষ্ণনাগরিক' বাক্‌যুদ্ধে পর্যুদস্ত ক'রেছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল উচ্চকণ্ঠ ও উচ্ছ্বসিত, তাঁর আক্রমণ নগ্ন ও স্পষ্ট; কিন্তু প্রমথ চৌধুরীর শ্লেষ ও বক্রোক্তি যেমন প্রচ্ছন্ন তেমনি সূক্ষ্ম ও সুকৌশলী। প্রমথ চৌধুরীর হাস্যরসের মধ্যে কোনরকম উত্তেজনা ও উন্মাদনা নেই—তাঁর বক্তব্যে উষ্মার চেয়ে Cold logic-ই বেশী। তাই দ্বিজেন্দ্রলালের বিদ্রূপাত্মক আক্রমণ-রীতির তুলনায় প্রমথ চৌধুরীর সুকৌশলী চাপা শ্লেষ-বিদ্রূপ অনেক বেশী মারাত্মক। উত্তেজনার প্রাবল্যে যেখানে দ্বিজেন্দ্রলালের হাস্যরস শালীনতা হারিয়ে ব্যক্তিগত আক্রমণে পরিণত হ'য়েছে সেখানে প্রমথ চৌধুরীর স্মিত ও শ্লেষাত্মক ভাষণ যেমন অভিজাত, তেমনি মর্মভেদী। 'কৃষ্ণনাগরিক' হিসেবে প্রমথ চৌধুরী দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে একটি সংযোগ অনুভব করতেন—বিশেষত হাস্যরস সৃষ্টির ক্ষেত্রে। কিন্তু দুজনের হাস্যরসের মধ্যে প্রকৃতিগত পার্থক্য ছিল অনেকখানি।

অম্ল-মধুর শ্লেষের সঙ্গে প্রমথ চৌধুরী প্রবন্ধটি সুরু ক'রেছেন। তাঁর মতে

'মি'-ভাগান্ত পদার্থের ওপর দ্বিজেন্দ্রলাল খড়্গহস্ত, কিন্তু তিনি অবশেষে এরই হাতের খেলনা হ'য়েছেন—এই বিশেষ ধরণের 'মি'-র নাম হ'ল 'ষণ্ডামি' আমাদের জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে বিশেষত সাহিত্যের ক্ষেত্রেও যে এই মারাত্মক বস্তুটি প্রবেশ করেছে তার জন্য প্রবন্ধকার তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে দুঃখ প্রকাশ ক'রেছেন। রবীন্দ্রনাথকে লাঞ্ছিত করতে গিয়ে নাট্যকার নিজেই লাঞ্ছিত হ'য়েছেন। প্রবন্ধকার হাস্যরস সম্পর্কেও তাঁর স্পষ্ট ও জোরালো অভিমতই দিয়েছেন। হাস্যরস যে নানাশ্রেণীতে বিভক্ত, এ বিষয় তিনি দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে একমত—কিন্তু হাস্যরস যদি সহজ স্বাভাবিক ও স্বতস্ফূর্ত না হয়, তা হ'লে রস পদবাচ্য হ'তে পারে না। তিনি ব্যঙ্গাত্মক লঘু ভঙ্গিতে বলেছেন, '…দ্বিজেন্দ্রবাবু ব'লেছেন যে, কাব্যে বিদ্রূপের হাসিরও ন্যায্য স্থান আছে, সেকথা সম্পূর্ণ সত্য। কিন্তু উপহাস জিনিসটের প্রাণই হচ্ছে হাসি। হাসি বাদ দিলে তার উপ্‌টুকু থাকে, কিন্তু আর রূপটুকু থাকে না। হাসতে হ'লেই আমরা অল্পবিস্তর দন্তবিকাশ করতে বাধ্য হই। কিন্তু দন্তবিকাশ করলেই যে সে ব্যাপারটা হাসি হ'য়ে ওঠে তা নয়; দাঁতখিঁচুনি ব'লেও পৃথিবীতে একটি জিনিস আছে—সে ক্রিয়াটি যে ঠিক হাসি নয়, বরং তার উলটো, জীবজগতে তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ আছে।' অর্থাৎ প্রকারান্তরে তিনি ব'লেছেন যে, দ্বিজেন্দ্রলাল প্যারডির মাধ্যমে হাসাতে তো পারেনই নি, বরং ব্যক্তিগত আক্রমণের স্থূলতা দর্শকদের রস-চেতনাকে পীড়ন ক'রেছে।

প্রমথ চৌধুরীর দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, দ্বিজেন্দ্রলাল প্যারডির মাধ্যমে লোকশিক্ষা দিতে চেয়েছেন। প্যারডির কাজ হ'ল ব্যঙ্গাত্মক অনুকরণের ভেতর দিয়ে হাস্যরস সৃষ্টি করা। সেখানে দর্শন, বিজ্ঞান, সুনীতি, সুরুচি প্রভৃতি গুরু বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে গেলে প্যারডির সাধারণ বৈশিষ্ট্য ও প্রাণশক্তি নষ্ট হয়—কারণ প্যারডিমূলক কৌতুকনাট্যের দর্শকেরা ঠিক এ জাতীয় গুরু ভোজনের জন্য প্রস্তুত থাকেন না। তাই প্রমথ চৌধুরী ব'লেছেন, 'শিক্ষাপ্রদ ভ্যাংচানির সৃষ্টি করতে গিয়ে দ্বিজেন্দ্রবাবু রসজ্ঞানের পরিচয় দেন নি। যদি প্যারডির মধ্যে কোন দর্শন থাকে তো সে দন্তের দর্শন।' প্রবন্ধকারের তৃতীয় আপত্তি এই যে, 'আনন্দ-বিদায়ের' ভূমিকায় দ্বিজেন্দ্রলাল লোকশিক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হ'য়েছেন। সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে লোকশিক্ষকের মনোবৃত্তিকে তিনি কোন দিনই সমর্থন করতে পারেন নি—'সাহিত্যে খেলা' (বীরবলের হালখাতা) প্রবন্ধে তিনি এর বিস্তৃত

আলোচনা ক'রেছেন। সাহিত্যে এই জাতীয় অযাচিত গুরুগিরির ফলে ব্যক্তিগত বিদ্বেষ ও বাদানুবাদই প্রবল হ'য়ে ওঠে, সৎ সাহিত্য সৃষ্টি হয় না।

দ্বিজেন্দ্রলাল স্বমত প্রতিষ্ঠার জন্য পাশ্চাত্য সাহিত্য থেকে নজির তুলেছেন। 'তিনি বল্লেন যে, ওয়ার্ডসওয়ার্থকে ব্রাউনিং চাবকিয়েছিলেন এবং ওয়ার্ডসওয়ার্থ বায়রণ এবং শেলিকে চাবকেছিলেন।' প্রমথ চৌধুরীর মতে এ নজির যথার্থ নয়—কারণ ব্রাউনিং-এর Lost Leader কবিতাকে ঠিক চাবুক বলা যায় না, এর ভেতরে ব্রাউনিং-এর গভীর দুঃখই প্রকাশিত হয়েছে—নেতৃস্থানীয় কবি যে নিজের দল ত্যাগ ক'রে অপর দলে যোগ দিয়েছেন, সেই দুঃখের প্রকাশ ব্রাউনিং-এর কবিতায়। কিন্তু ওয়ার্ডসওয়ার্থ যে বায়রণ শেলিকে দু'ঘা লাগিয়েছিলেন এর কোন প্রমাণ নেই। প্রমথ চৌধুরী সাহিত্যে চাবুকের সার্থকতা অস্বীকার করেন নি। কিন্তু সেই চাবুক ব্যক্তি বিশেষের ওপর যখন পড়ে তখন এর নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘিত হয়—'সমগ্র সমাজের পৃষ্ঠেই ওর প্রয়োগটা সনাতন প্রথা।' তা ছাড়া অপদার্থ লোক, যার কোন পরিবর্তনের সম্ভবনা নেই, তাকে চাব্‌কানো অর্থ চাবুকেরই অপমান করা। আর যদি কোন প্রথম শ্রেণীর লেখকের দোষ ত্রুটি কেউ আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন, তবে তাকে আর যাই বলা হোক না কেন, কোনমতেই 'চাবুক' বলা যায় না।

দ্বিজেন্দ্রলাল 'সাহিত্যের মঙ্গলের জন্য নৈতিক চাবুক মারা'র পক্ষপাতী। সাহিত্যের সঙ্গে নীতির বিরোধ চিরকালের—তাই এই নীতির অত্যাচারকে সাহিত্য চিরকাল সহ্য ক'রে এসেছে। প্রমথ চৌধুরী মনে করেন যে, এই জাতীয় আতিশয্য বোধের মূলে থাকে তথাকথিত নীতিবাদীদের উগ্র অহং বোধ। এতে মঙ্গল তো হয়ই না, বরং চিত্তবিক্ষোভেরই সৃষ্টি হয়। তা ছাড়া পিউরিটান দৃষ্টিতে সাহিত্য-বিচার করলে গোটা সংস্কৃত সাহিত্যকেই অগ্রাহ্য করতে হয়। প্রবন্ধটির শেষদিকে প্রমথীয় ব্যঙ্গোক্তি চূড়ান্ত সীমায় উঠেছে, 'যাঁরা রবীন্দ্রবাবুর সরস্বতীর গাত্রে কোথায় কি তিল আছে তাই খুঁজে বেড়ান, তাঁরা যে ভারতবর্ষের পূর্ব-কবিদের সরস্বতীকে কি ক'রে তুষারগৌরীরূপে দেখেন, তা আমার পক্ষে একবারেই দুর্বোধ্য।'

'সাহিত্যে চাবুক' প্রবন্ধটির বিষয় এমন কিছু গুরুতর নয় এবং একথাও ঠিক যে বিশেষ একটি সাময়িক ঘটনা প্রবন্ধটি রচনার প্রেরণা দিয়েছে। কিন্তু এই

নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধটিতে বলার ভঙ্গি অপরূপ হ'য়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ-দ্বিজেন্দ্রলালের মতানৈক্য সেইদিন বাংলাসাহিত্যে তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি ক'রেছিল। দু'পক্ষের সমর্থকরাও কলম ধ'রেছিলেন। কিন্তু এই আক্রমণাত্মক ও বিদ্রূপমূলক রচনার অনেকগুলিরই কিছু ঐতিহাসিক মূল্য থাকলেও সাহিত্যিক মূল্য আর নেই। সেইদিনের পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত বহু রচনার মধ্যে 'সাহিত্যে চাবুক' রচনাটির দোসর খুঁজে পাওয়া কঠিন। স্মিত-ভাষণ, শ্লেষ বক্রোক্তির সতর্ক ও সুকৌশলী প্রয়োগ, উত্তেজনাহীন দীপ্ত পরিমার্জিত ভঙ্গি—প্রবন্ধটিকে স্বাদনীয় ক'রে তুলেছে। প্রমথীয় স্টাইলের একটি পরিচ্ছন্ন রূপ প্রবন্ধটিতে ফুটে উঠেছে। এখানে যে বিদ্রূপ আছে তার রূপ কোন প্রকার দৈহিক বিকারে ফুটে উঠে নি, ফুটেছে শুধু কণ্ঠের বহু-ভঙ্গিম-বৈচিত্র্যে। মনে হয়, ভল্‌তেয়ারের অব্যর্থ ও মর্মভেদী চাপা বিদ্রূপই যেন এই শ্লেষাত্মাক রচনাটির মডেল। মর্মভেদী অথচ শান্ত সুভদ্র প্রতিবাদ!

দশ

প্রমথ চৌধুরীর 'চিত্রাঙ্গদা' সমালোচনাটি নানাকারণে মূল্যবান। 'কাব্যে নীতি' প্রবন্ধে দ্বিজেন্দ্রলাল 'চিত্রাঙ্গদা'র বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ আনেন। সেই থেকে 'চিত্রাঙ্গদা' সমালোচক মহলে আলোচনা ও বিতর্কের বিষয় হ'য়ে ওঠে। দ্বিজেন্দ্রলালের প্রবন্ধ প্রকাশের পাঁচ মাস পরে[৪৩] প্রিয়নাথ সেন এর যথোচিত জবাব দেন। তুলনামূলক বিচারপদ্ধতিতে ও রস-বিশ্লেষণের নিপুণতায় প্রবন্ধটি রবীন্দ্রসাহিত্য-সমালোচানার ইতিহাসে একটি মূল্যবান সংযোজন। কিন্তু প্রমথ চৌধুরীর এই প্রবন্ধটি ঘটনার আঠারো বছর পরে লেখা।[৪৪] সুতরাং প্রত্যক্ষভাবে দ্বিজেন্দ্রলালের মতের প্রতিবাদ বাদ বলা যায় না, কিন্তু আঠারো বছর আগে এই নাট্যকাব্যকে অবলম্বন ক'রে যে কুরুক্ষেত্রের সৃষ্টি হ'য়েছিল, সম্ভবত সে স্মৃতি এখান থেকে একেবারে মুছে যায় নি। লেখক এই প্রবন্ধ অবতারণা করার কারণ বলেছেন, 'টমসন সাহেবের কৃত চিত্রাঙ্গদা কাব্যের দোষ-গুণ বিচারের বিচার করাই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।' টমসন সাহেবের মতের প্রতিবাদ করা ও আঠারো বছর আগে যাঁরা চিত্রাঙ্গদার প্রতিকূল সমালোচনা ক'রেছিলেন তাঁদের কথার উত্তর দেওয়া, প্রকারান্তরে একই কথা। কারণ টমসন সাহেব 'চিত্রাঙ্গদা' সম্বন্ধে প্রতিকূল সমালোচানার সার সংগ্রহ করেছেন।' টমসন সাহেব চিত্রাঙ্গদা আলোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্র-বিরোধীদের মতবাদের

দ্বারা প্রভাবিত হ'য়েছিলেন। প্রমথ চৌধুরী তার উত্তর দিতে গিয়ে নূতন করে 'চিত্রাঙ্গদা'র রস-বিচার ক'রেছেন।

প্রবন্ধটির আসল বক্তব্য ও প্রারম্ভিক ভূমিকা বা কৈফিয়ৎ অংশটি প্রায় সমান স্থান জুড়ে আছে। বক্তব্য অবতারণার আগে এই সুদীর্ঘ ভণিতাটি প্রবন্ধকারের বৈশিষ্ট্য সূচিত করে। নানাকথার বহু বাঁকা পথ পেরিয়ে, ছোটবড় গলি দিয়ে অনেক ঘোরার পর পাঠককে তিনি আসল কথার কাছে নিয়ে আসেন। ছোটগল্প ও প্রবন্ধ—উভয়ক্ষেত্রেই তিনি একই রীতি অবলম্বন ক'রেছেন। ভূমিকা অংশে লেখকের সঞ্চরমান বক্তব্য থেকে মোটামুটি দুটি বস্তু আহরণ করা যায় : একটি হ'ল সমালোচনার শ্রেণীবিভাগ, অন্যটি কাব্যবিচারের মানদণ্ড। এখানেও বড় বড় সমালোচকদের বচন উদ্ধার করা অনায়াসেই চলত, কিন্তু চৌধুরী মহাশয় বহুকাল আগেই সেই লোভ সম্বরণ করতে অভ্যস্ত হ'য়েছিলেন। তাঁকে আর যাই হোক, গবেষণা করার জন্য যে পৃথিবীতে পাঠানো হয়নি, এজন্য তিনি তাঁর জীবন-বিধাতাকে ধন্যবাদ দিয়েছেন।

টমসন সাহেবের প্রধান অভিযোগ দু'টি : প্রথম অভিযোগ, এই যে চিত্রাঙ্গদা দুর্নীতিপরায়ণ কাব্য, '···the purpose of the play has been represented as being the glorification of sexual abandonment.' টমসনের দ্বিতীয় অভিযোগ এই যে কবির নাকি স্ত্রীলোক সম্বন্ধে ধারণা অত্যন্ত ঘৃণ্য, 'The most serious charge that can be brought against Chitrangada is against its attitude.' প্রমথ চৌধুরী 'চিত্রাঙ্গদা'র রসমূল্য বিচার করতে গিয়ে রোম্যান্টিক সৃজন-প্রক্রিয়ার স্বরূপের কথা বলেছেন। অযথা বাগ্‌বিস্তার না ক'রে সূত্রাকারে কবি-হৃদয়ের অভিপ্রায়টিকে চিহ্নিত ক'রেছেন। তাঁর প্রথম কথাই যে 'চিত্রাঙ্গদা একটি স্বপ্নমাত্র, মানব মনের একটি জাগ্রত স্বপ্ন।' কিন্তু এই স্বপ্নলোক ও কল্প-বিলাস কি বাস্তব জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন? এখানে মনে রাখতে হবে যে সমসাময়িক সমালোচকেরা রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিরুদ্ধে বাস্তবতার অভিযোগও এনেছিলেন। প্রমথ চৌধুরী অত্যন্ত সহজ ভাবেই এর জবাব দিয়েছেন, 'কর্মজগৎ ও কল্পজগৎ এ দুই জগৎই সমান সত্য, কেননা আমাদের মনে যেমন কর্মের প্রতি অসক্তি আছে তেমনি কর্মজগৎ থেকে মুক্তি পাবারও আকাঙ্ক্ষা আছে। এই আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হয় আমাদের স্বকপোলকল্পিত ধর্মে ও আর্টে।' সমালোচকের এই মন্তব্যটি বিচার্য। 'কল্পজগৎ'—রোম্যান্টিক কবিদের কাব্যে নূতন অর্থ নিয়ে

এসেছিল। সমালোচকবর্ণিত শুধু 'কর্মজগৎ থেকে মুক্তি পাবার আকাঙ্ক্ষা'ই নয়, এর চেয়ে গভীর ও রহস্যময় আর একটি উপলব্ধি রোম্যান্টিক কবিদের কল্পস্বপ্নের মূলে নিহিত থাকে। রোম্যান্টিক কবিদের এই কল্প-স্বপ্নের স্বরূপ বিশ্লেষণ করিতে গিয়ে একজন খ্যাতনামা সমালোচক ব'লেছেন, '...for the Romantics imagination is fundamental, because they think that without it poetry is impossible. This belief in imagination was part of the contemporay belief in the individual Self' The poets were conscious of a wonderful capacity to create imaginery worlds, and they could not believe that this was idle or false. On the contrary, they thought that to curb it was to deny some thing vitally necessary to their whole being.[৪৫] রোম্যান্টিক কবিদের কল্পলোক একটি সুলভ পলায়নীবৃত্তি অথবা মিথ্যাচার নয়। 'কল্পনা' শব্দটিকে তাঁরা একটি বিশেষ অর্থেই ব্যবহার ক'রেছেন—তাঁদের মতে মৌলিক কল্পনা (Primary imagination) 'Stands in some essential relation to truth and reality.' প্রমথ চৌধুরী রোম্যান্টিক কল্পবৃত্তির বিস্তৃত আলোচনা না করলেও খানিকটা ইঙ্গিত দিয়েছেন।

সমালোচক এর পর চিত্রাঙ্গদার ভাষার সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্যের বিস্তৃত আলোচনা ক'রেছেন। তার কারণ তিনি সংস্কৃত আলঙ্কারিকের মতো বিশ্বাস করেন যে শ্রেষ্ঠ কাব্যের বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গের মধ্যে সম্পর্ক খুব নিবিড়, যেহেতু এই দু'টি বস্তু একই প্রযত্নে গ'ড়ে উঠেছে—সেই জন্য কবিকে পৃথক যত্ন-নিতে হয় না। প্রমথ চৌধুরী চিত্রাঙ্গদাকে চিত্র, সঙ্গীত ও কাব্যের অপূর্ব সমন্বয় ব'লেছেন। তাঁর মতে চিত্রাঙ্গদা একটি 'সম্পূর্ণ রাগিণী'। তিনি এই নাট্যকাব্যটির ভাষা-শিল্পের আলোচনা-প্রসঙ্গে প্রধানত অনুপ্রাস ও উপমার সৌন্দর্য বিশ্লেষণ ক'রেছেন। 'চিত্রাঙ্গদা' যৌবন-স্বপ্নের কাব্য। উপমাদি অলঙ্কার এখানে বাইরের বৈচিত্র্যবৃদ্ধির জন্য আসেনি, কাব্যের অন্তরাত্মার সার্থক বহিঃপ্রকাশ হিসাবেই এদের গৌরব। 'চিত্রাঙ্গদা' প্রসঙ্গে টমসন সাহেব বলেছেন যে এই নাট্যকাব্যটি নাকি একটি 'Lyric feast'। তীক্ষ্ণধী প্রমথ চৌধুরী সমালোচকের মনোগত অভিপ্রায়টি তাঁর শব্দার্থের ইঙ্গিত থেকে বুঝে নিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'কিন্তু উক্ত feast উপভোগ ক'রে নাকি

মানুষের স্বাস্থ্য নষ্ট হয়। কারণ উক্ত রাগিণীর অস্থায়ী erotic এবং অন্তরা immoral।' ব্যবহারিক জগতের ধর্মাধর্মের সঙ্গে কাব্য-বর্ণিত রসজগতের সম্পর্ক কি, তিনি তা সুন্দর একটি উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন। ব্যবহারিক জগতে যা অধর্ম, রসে পরিণত হ'লে তা-ই আর্ট হ'য়ে ওঠে। মৃচ্ছকটিক নাটকে শর্বিলক চুরিবিদ্যার কথা বলেছেন—কিন্তু কোন সমালোচকই দুর্নীতির অভিযোগে ঐ অংশটিকে বরখাস্ত করার চেষ্টা করেন নি। লেখক এর কারণ নির্দেশ ক'রেছেন, 'এর কারণ সমাজে যা অধর্ম কাব্যে তা রসে পরিণত হ'য়েছে। ফলে মৃছকটিক পড়ে কারও মনে চুরি করবার প্রবৃত্তি জন্মায় নি। মর‍্যালিটি হচ্ছে মানুষের ব্যবহারিক আত্মার জিনিস, আর কাব্য তার অন্তরাত্মা।' প্রমথ চৌধুরী এখানে স্পষ্টতই কাব্যের রূপান্তরবাদের পক্ষপাতী। লৌকিক জগতে যাই হোক না কেন, রসলোকে তার সম্পূর্ণ রূপান্তর ঘটে।

টমসনের দ্বিতীয় বক্তব্য এই যে নারী সম্পর্কে কবির ধারণা নাকি ঘৃণ্য। টমসনের এই অংশের প্রতিবাদ করতে গিয়ে প্রমথীয় বাক্ চাতুর্য শীর্ষে উঠেছে —এখানে তিনি বিচারের সুযোগ নিয়ে কিছু কূট-তর্কেরও অবতারণা করেছেন। বিচারের ঋজুতার চেয়ে এখানে বিতর্কের কৌটিল্যই প্রধান হয়ে উঠেছে। সর্বশেষে তিনি মীমাংসা ক'রেছেন বহুশ্রুত মিতাক্ষর একটি মন্তব্যে; 'আমার আলোচ্য বিষয় হচ্ছে সৌন্দর্য, সত্য নয়; সুতরাং এ ক্ষেত্রে রুচির কথাটা বড় কথা।' যাঁরা প্লেটোনিক লভের দোহাই দিয়ে থাকেন তাঁদের কথাও তিনি আলোচনা ক'রেছেন। প্রেম মনোজগতের বস্তু হ'লেও একে দেহ-সম্পর্কচ্যুত করা সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথ চিত্রাঙ্গদায় নর-নারীর যৌবন-স্বপ্নের অপূর্ব লীলা-বিলাসের ছবি এঁকেছেন। দেহ-নিষ্ঠ কামনার সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রেই এই কাব্য আবদ্ধ নয়—তিনি কামলোক থেকে তাঁর বিষয়বস্তুকে অপূর্ব কলা-কৌশল ও কল্পনা-সম্পদের বলে রূপলোকে নিয়ে গিয়েছেন। লৌকিক ভাবের মধ্যে কামনার বিষয়বস্তু নিঃসন্দেহে ছিল, কিন্তু যে মুহূর্তে ভাবের রসতাপ্রাপ্তি ঘটেছে, সেই মুহূর্তেই তা কামনা-কলুষমুক্ত। 'চিত্রাঙ্গদা' বিচারে সর্বশেষে তিনি বলেছেন, 'Erotic কাব্য ব'লে কোনো বস্তু নেই, কেননা যে মুহূর্তে কবির কল্পনা কাব্য-আকার ধারণ করে সেই মুহূর্তেই তা eroticism অতিক্রম করে।' প্রমথ চৌধুরীর এই মীমাংসা সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ভাব রসে রূপায়িত হ'লে লৌকিক পরিমিতির বন্ধন অপসারিত হয়। লৌকিক ভাবের ক্ষেত্রে সুনীতি, দুর্নীতি যাই থাকুক না কেন, রসে পরিণত হলে সব

কিছুই 'আনন্দ' হ'য়ে ওঠে। সাধারণীকরণের জন্যই 'বিগলিত-পরিমিত-প্রমাতৃ ভাব' সম্ভব হয়। বিশ্বনাথ, জগন্নাথ প্রভৃতি আলঙ্কারিক সাধারণীকৃতি-প্রসূত রসের স্বরূপধর্ম সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। ব্যক্তিগত জীবনে যাই থাকুক না কেন যদি খাঁটি কাব্য হয়, তা হ'লে তার আস্বাদন হবে আনন্দময়। কারণ কবি সেখানে ব্যক্তিত্বের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী অতিক্রম করেন।[৪৬] চৌধুরী মহাশয় পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের একজন সুপণ্ডিত হ'য়েও সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের একজন শ্রদ্ধাবান পাঠক ছিলেন। তাঁর সমুন্নত রসবোধের একটি মূল্যবান উদাহরণ 'চিত্রাঙ্গদা' সমালোচনাটি।

এগার

'কাব্যে অশ্লীলতা—আলংকারিক মত'[৪৭] প্রবন্ধটিকে বিষয়ানুসারে 'চিত্রাঙ্গদা' আলোচনাটির পরিপূরক বলা যায়। 'চিত্রাঙ্গদা' আলোচনায় প্রাচীন আলঙ্কারিকদের মতকে তিনি অনুসরণ ক'রেছেন। আলোচ্য প্রবন্ধটিতে তিনি প্রধানত থিওরি অংশের ওপরেই আলোকপাত ক'রেছেন। প্রাচীন আলঙ্কারিকদের মতে কাব্যে অশ্লীলতা বলতে কি বোঝায় তাই তিনি এখানে বিচার করেছেন। হলসাহেবকৃত স্বপ্নবাসবদত্তার সংস্করণের ভূমিকায় 'ইংরেজী ওরফে খ্রীষ্টানী সাধু মনোভাবের যে স্পষ্ট পরিচয়' আছে, তার উল্লেখ করে প্রবন্ধটি সুরু ক'রেছেন। প্রবন্ধটির পটভূমিকা সম্পর্কে আর একটি প্রসঙ্গ উল্লেখযোগ্য। এই সময় যতীন্দ্রমোহন সিংহ তাঁর 'সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা' গ্রন্থে সাহিত্যের নৈতিকতা নিয়ে গুরুগিরি সুরু করেন। তিনি তাঁর এই বইয়ে নীতির দোহাই দিয়ে খ্যাতনামা সাহিত্যিকদেরও আঘাত করতে ছাড়েন নি।[৪৮] প্রমথ চৌধুরী এ প্রবন্ধে উক্ত বিষয় সম্পর্কেও কটাক্ষ ক'রেছেন।

অশ্লীলতা যে কাব্যের দোষ একথা আলঙ্কারিকরাও স্বীকার ক'রেছেন। দণ্ডীর কাব্যাদর্শ একটি প্রাচীন গ্রন্থ—তিনি অশ্লীল বলতে বুঝতেন গ্রাম্য। গ্রাম্যতা শ্রেষ্ঠরসের প্রতিবন্ধক। শব্দগত ও অর্থগত—এই দু'জাতীয় গ্রাম্যতা আছে। পরবর্তী আলঙ্কারিকেরা গ্রাম্যতা ও অশ্লীলতাকে পৃথক পৃথক দোষ হিসেবে গণ্য ক'রেছেন। বামন ও তাঁর পরবর্তী আলঙ্কারিকেরা গ্রাম্যতা ও অশ্লীলতাকে—দু'টি স্বতন্ত্র দোষ হিসেবে উল্লেখ ক'রেছেন। তাঁদের মতে গ্রাম্যতা হচ্ছে শুধু শব্দের দোষ। সুতরাং একটি বাক্যঅশ্লীল না হয়েও গ্রাম্য হ'তে পারে, অথচ যে শব্দ মোটেই গ্রাম্য নয় তা দিয়েও অশ্লীল বাক্য রচনা

করা সম্ভব। অশ্লীলতার স্বরূপ নির্ণয় করতে গিয়ে বামন ব'লেছেন, 'যে কথা শুনে মনে লজ্জা ঘৃণা অথবা অমঙ্গলের আশঙ্কা উদয় হয়, সেই বাক্যই অশ্লীল।' কিন্তু এখানেও রুচির প্রশ্ন ওঠে—দেশভেদে এবং যুগভেদে সামাজিকদের রুচিরও পরিবর্তন ঘটে। প্রমথ চৌধুরীর মতে 'সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা কথাটি সম্পূর্ণ নিরর্থক।' আসল কথা হচ্ছে, বিচার করতে হবে যে বাক্য রসের প্রতিবন্ধক হ'য়েছে কিনা। তথাকথিত ইংরেজী সুরুচির দ্বারা প্রভাবিত হ'লে কাব্যজিজ্ঞাসা অনেক সময় ধর্মজিজ্ঞাসায় পরিণত হয়। সেইখানেই কাব্যবিচারে গলদ দেখা দেয়।

সাহিত্য বিচারে চৌধুরী মহাশয় যেমন পাশ্চাত্ত্য কাব্যতত্ত্বের মানদণ্ড প্রয়োগ ক'রেছেন, তেমনি প্রাচ্য আলঙ্কারিকদের সূত্রও অনুসরণ ক'রেছেন। আলঙ্কারিকদের সূত্রই শুধু নয়, আধুনিক সাহিত্যের ওপর এই বিধিগুলিকে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে প্রয়োগ ক'রেছেন। টীকাকারদের মতো প্রাচীন আলঙ্কারিকদের সুতীক্ষ্ন বিচার, অভ্রান্তযুক্তি ও গাঢ-সংহত মিতাক্ষর বাক্‌বিধিকে তিনি শ্রদ্ধার চোখে দেখেছেন। আলোচ্য প্রবন্ধটিতে তারই প্রোজ্জ্বল স্বীকৃতি উদ্ভাসিত হ'য়েছে।

সমসাময়িক সাহিত্যিক বিতর্ক নিয়েই 'বস্তুতন্ত্রতা বস্তু কি' প্রবন্ধটি (নানাকথা) রচিত হ'য়েছে। সাহিত্য-বিচারের একটি মূল সমস্যা প্রবন্ধটিতে আলোচিত হ'য়েছে। বাংলাসাহিত্যে বস্তুতন্ত্রতা ও রবীন্দ্র সাহিত্যে বাস্তবতা নিয়ে অবশ্য বহুপূর্বেই বিতর্কের সূত্রপাত হ'য়েছিল। প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধটির পটভূমি জানতে হ'লে সেকালের বাস্তবতা সম্পর্কিত সাহিত্যিক বিতর্কের ইতিহাস জানা প্রয়োজন।

১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যু হয়, কিন্তু রবীন্দ্র-বিরোধিতার ধারা অব্যাহতই ছিল। নূতন নূতন এক একটি সমস্যা নিয়ে রবীন্দ্রনাহিত্যকে বার বার আক্রমণ করা হ'য়েছে। রবীন্দ্র-সাহিত্যের বাস্তবতা সম্পর্কে সংশয়াতুর হ'য়ে এই যুগে বিপিনচন্দ্র পাল ও রাধাকমল মুখোপাধ্যায় লেখনী সঞ্চালন করেন। রবীন্দ্রনাথ জবাব দিতে গিয়ে একাধিক প্রবন্ধে সাহিত্যে বাস্তবতার স্বরূপ সম্পর্কে অলোচনা করেন। প্রমথ চৌধুরীও নব-প্রকাশিত 'সবুজপত্র' পত্রিকায় 'বস্তুতন্ত্রতা বস্তু কি' প্রবন্ধটি লেখেন। তাঁর প্রবন্ধের প্রথমেই তিনি ব'লেছেন, 'শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রবাবুর 'বাস্তব' নামক প্রবন্ধের প্রতিবাদে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন।' কিন্তু ঐতিহাসিক

দিক থেকে বিচার করতে গেলে দেখা যাবে যে, আলোচনার সূত্রপাত রবীন্দ্রনাথ করেন নি। কারণ রবীন্দ্রনাথের 'বাস্তব' প্রবন্ধটি অনেক পরের লেখা। তার বহু আগেই আলোচনাটির সূত্রপাত করেন বিপিনচন্দ্র পাল তাঁর 'চরিত্র চিত্র' প্রবন্ধে।[৪৯]

বিপিনচন্দ্র ও তাঁর সমর্থকদের আলোচনার উত্তাপ রবীন্দ্রনাথকেও স্পর্শ ক'রেছিল। প্রমথ চৌধুরীর কাছে লেখা একখানি চিঠিতে তিনি তাঁর মনের এই তিক্ততাকে প্রকাশ ক'রেছেন।[৫০] এদিকে সামাজিক ও রাজনৈতিক মতবাদ নিয়েও এই সময় নানাপ্রকার আলাপ আলোচনা চলেছিল। প্রগতি-বাদীদের সঙ্গে সনাতনপন্থীদের এই বিরোধের কথা কবি সবুজপত্র-পর্বের কয়েকটি প্রবন্ধের মধ্যে আলোচনা করেন। এই আলোচনা সকলের মনঃপুত হয় নি; হওয়াও সম্ভব ছিল না। এই সময় বিপিনচন্দ্রের মতকে সমর্থন ক'রে অধ্যাপক রাধাকমল মুখোপাধ্যায় সুস্পষ্টভাবেই ঘোষণা করেন 'রবীন্দ্রসাহিত্য সার্বজনীন নহে।'[৫১] কৃত্তিবাস-মুকুন্দরাম-কাশীরাম দাসের সাহিত্য, এমন কি কবিওয়ালাদের সাহিত্যও 'রাজধানী হইতে বহু দূরে থাকিয়া নিভৃত পল্লীগ্রামে জনসাধারণের হৃদয়ের কথা গাহিয়া এই বিকৃতরুচির দিনেও সাহিত্যের প্রাণকে সজীব রাখিয়াছিল।' সেক্ষেত্রে রবীন্দ্রসাহিত্য কি 'বাঙালীর অন্তরতম প্রাণকে স্পর্শ করিয়াছে?'—এই ছিল সংক্ষেপে রাধাকমল বাবুর অভিমত। প্রবন্ধটিতে তিনি রবীন্দ্রসাহিত্যের অবাস্তবতার প্রতি ইঙ্গিত ক'রে লোক-শিক্ষকতা ও জননায়কত্বের ওপর অতিরিক্ত জোর দিয়েছেন। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে জননায়কের এই আদর্শটি তিনি রবীন্দ্রনাথের একটি বিখ্যাত কবিতার থেকেই[৫২] পেয়েছিলেন। প্রবন্ধটির শেষাংশের সঙ্গে কবিতাটি মিলিয়ে দেখলেই মন্তব্যটির যাথার্থ্য উপলব্ধি করা যাবে।

এরপরেই রবীন্দ্রনাথ 'বাস্তব' নামক একটি প্রবন্ধ লেখেন।[৫৩] এই প্রবন্ধে কবি অনেকগুলি সুপ্রযুক্ত উদাহরণের সাহায্যে তাঁর বক্তব্যকে পরিস্ফুট ক'রছেন, 'কালিদাস যদি কবি না হইয়া লোকহিতৈষী হইতেন তবে সেই পঞ্চম শতাব্দীর উজ্জয়িনীর কৃষাণদের জন্য হয়তো প্রাথমিক শিক্ষার উপযোগী কয়েকখানা বই লিখিতেন,—তাহা হইলে তারপর হইতে এতগুলা শতাব্দীর কী দশা হইত। তুমি কি মনে করো লোকহিতৈষী তখন কেহ ছিল না। লোকসাধারণের নৈতিক ও জাঠরিক উন্নতি কী করিয়া হইতে পারে সে কথা ভাবিয়া কেহ কি তখন কোনো বই লেখে নাই। কিন্তু সে কি সাহিত্য।'—'বাস্তব' প্রবন্ধের পরে

'লোকহিত'[৫৪] ও 'আমার জগৎ'[৫৫] প্রবন্ধদ্বয়ে কবি তাঁর বক্তব্যকে আরও বিশদভাবে প্রকাশ করেন। রাধাকমলবাবু কবির বক্তব্যের উত্তর দিলেন 'সাহিত্যে বাস্তবতা' প্রবন্ধে।[৫৬] তাঁর ব্যক্তব্যের কয়েকটি মূলসূত্র হচ্ছে এই

ক. 'সাহিত্যের চরম সাধনা হইতেছে যুগধর্ম প্রকাশ করা, নবযুগ আনয়ন করা।'

খ. সাহিত্য বাস্তবকে অবলম্বন করিয়াই রস সৃষ্টি করে। রস জিনিষটার একটা আধার থাকা চাই—সেই আধারটাই হইতেছে বাস্তব। বাস্তবের পরিবর্তন হইতেছে—যুগে যুগে বাস্তব বিভিন্ন হইতেছে; সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যরসও বিভিন্ন হইতেছে। তবু বাস্তবের মধ্যে একটি নিত্যতা আছে, আর সেই নিত্যতা আছে বলিয়া আমরা দেশ-কাল-পাত্র অতিক্রম করিয়া বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন প্রকার সাহিত্য-রসের আস্বাদন করিতে পারি।

গ. 'সরস্বতী চরণতলাশ্রিত সাহিত্য যুগে যুগে দেশকালপাত্র ভেদে বিভিন্ন রসের সৃষ্টি করিয়াছে। নীলপদ্ম, শ্বেতপদ্ম, রক্তপদ্ম, সবই নিত্যরসের অভিব্যক্তি; আবার প্রত্যেক মৃণাল, প্রত্যেক লতিকা,—নিত্যবস্তুর বিকাশ।'

ঘ. 'সাহিত্য যে ইস্কুল মাস্টারীর ভার লইবে, সমাজেরও দীক্ষাগুরু হইবে ইহা ঠাট্টা বা বিদ্রূপের বিষয় নহে। সাহিত্যের পরম সৌভাগ্য, সাহিত্যের চরম সার্থকতা যদি সে সমাজের গুরুর স্থান অধিকার করিতে পারে।'

বার্ণার্ড শ'র নাটককে তিনি এই সাহিত্যিক গুরুগিরির আদর্শ হিসাবে দাঁড় করিয়েছেন।

রাধাকমলবাবু বক্তব্যের নির্গলিতার্থ থেকেই স্পষ্টই ধারণা করা যায় যে এই মতবাদ প্রমথ চৌধুরীর কাছে গ্রাহ্য হবে না। প্রমথ চৌধুরী এই প্রবন্ধে স্পষ্টত রবীন্দ্রসাহিত্যের বাস্তবতা সম্পর্কে আলোচনা করেন নি, কিন্তু এখান থেকে রবীন্দ্রসাহিত্যের বাস্তবতা সম্পর্কে তাঁর মতবাদ অনুমান করা অসঙ্গত নয়। প্রবন্ধের প্রথমে 'বস্তুতন্ত্রতা' শব্দের প্রয়োগগত ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করা হ'য়েছে। লেখক শব্দটির গোত্র নির্ণয় করতে গিয়ে দেখেছেন যে এ শব্দটি সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রে ও দর্শনশাস্ত্রে নেই। তাঁর মতে ইংরেজী রিয়লিজম্ নাম ভাঁড়িয়ে বাংলাসাহিত্যে বস্তুতন্ত্রতা নামে দেখা দিয়েছে। ইউরোপীয় দর্শনের ক্ষেত্রে শব্দটি প্রথম আইডিয়ালিজমের প্রতিক্রিয়া হিসাবে ব্যবহৃত হয়। দর্শনের ক্ষেত্র থেকে

এই শব্দটি ক্রমশ সাহিত্যের ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ে। বস্তুতন্ত্রতার 'অর্থ যদি প্রত্যক্ষ বস্তুর স্বরূপজ্ঞান হয়,' তা হ'লে এ কথা অবশ্য স্বীকার্য যে এই জ্ঞানের অভাবে কোনদিন বড় কাব্য হ'তে পারে না। লেখক এখানে রাধাকমলবাবুর প্রতি যে তির্যক কটাক্ষ ক'রেছেন, তাও এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয়, 'রাধাকমলবাবু অবশ্য যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতং অর্থেও বাক্য ব্যবহার করেন না, কেননা যে কবির হাতে বাংলার মাটি এবং বাংলার জল পরিচ্ছন্ন মূর্তি লাভ করেছে তাঁর কাব্যে যে পূর্বোক্ত হিসাবে বস্তুতন্ত্রতা নেই, এ কথা কোনো সমালোচক সজ্ঞানে বলতে পারবেন না।' দ্বিতীয়ত, 'বর্ণাদর্শ'-র যে বাণী রাধাকমলবাবু উদ্ধার ক'রে দেখিয়েছেন, ঠিক তার বিপরীত মন্তব্য উদ্ধার ক'রে চৌধুরী মহাশয় উল্টো কথাই ব'লেছেন।

তিনি 'বস্তুতন্ত্রতা'কে ইংরেজী রিয়ালিজম্ শব্দটির তর্জমা হিসাবেই ব্যবহার ক'রেছেন। সাহিত্যের ইতিহাসে রিয়ালিজম্ শব্দটি ঠিক আইডিয়ালিজম্ শব্দের বিপরীত নয়। রোম্যান্টিক সাহিত্যের প্রতিক্রিয়া হিসেবেই বস্তুতান্ত্রিক সাহিত্যের উদ্ভব হয়। ফরাসী সাহিত্যে সুপণ্ডিত প্রমথ চৌধুরী উক্ত সাহিত্য থেকেই উদাহরণ নিয়ে তাঁর বক্তব্যকে পূর্ণতা দিয়েছেন, 'এক কথায় রিয়্যালিষ্টিক সাহিত্য রোম্যান্টিক সাহিত্যের অপর পৃষ্ঠা এবং ভিক্টর হুগো প্রমুখ লেখকদের রচিত সাহিত্যের প্রতিবাদ স্বরূপেই ফ্লবেয়ার প্রমুখ লেখকেরা এই বস্তুতান্ত্রিক সাহিত্যের সৃষ্টি করেন।' সমালোচক ফরাসী সাহিত্যের দু'টি ধারারই সম্যক বিচার ক'রেছেন। রোম্যান্টিক সাহিত্যের মধ্যেও আতিশয্য ছিল। বাস্তব-বিস্মৃত এই কল্প-চারণা যখন চূড়ান্ত হয়ে উঠল, তখনই দেখা দিল রিয়্যালিজমের আধিব্যাধিদুষ্ট জীবনের রুগ্ন-চিত্রণ। অর্থাৎ এক আতিশয্যকে দূর করতে গিয়ে আর এক আতিশয্যের সৃষ্টি হ'লে। অথচ ইউরোপীয় সাহিত্যের এই রিয়ালিজ্‌ম্ রাধাকমলবাবু আমদানী করতে চান না। রাধাকমলবাবু মনে করেন যে কবি জাতীয় মনের ক্ষেত্র থেকেই রস আহরণ করবেন। এখানে প্রমথ চৌধুরীর মত সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি মনে করেন, 'কবির মনের সঙ্গে জাতীয় মনের যোগাযোগ থাকলেও কবিপ্রতিভা সামাজিক মনের সম্পূর্ণ অধীন নয়।' কবির মনকে তিনি একটি 'স্বতন্ত্র রসের উৎস' বলে মনে করেন। সমাজের সঙ্গে তাঁর আদান-প্রদানের সম্পর্ক থাকলেও তা প্রাকৃতজনসুলভ নয়। সমাজ থেকে তিনি রস-সংগ্রহ করেন বটে, কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশী ফিরিয়ে দেন।

চৌধুরী মহাশয় রাধাকমলবাবু বর্ণিত 'যুগধর্ম' সম্পর্কে নানা প্রশ্নের অবতারণা করেছেন। রাধাকমলবাবুর মতে সাহিত্য হবে স্বদেশ ও স্বকালের কুক্ষিগত—তিনি রামায়ণ-মহাভারতকে এর শ্রেষ্ঠ উদাহরণ হিসাবে ধরেছেন। কিন্তু রামায়ণ-মহাভারতকে একালে অনুসরণ করাও তো যুগধর্মের অনুগত নয়। যুগধর্ম সম্পর্কে প্রবন্ধকার তাঁর সুস্পষ্ট অভিমতই জানিয়েছেন, '...প্রথমতঃ যুগধর্ম ব'লে কোনো যুগের একটিমাত্র বিশেষ ধর্ম নাই। একই যুগে নানা পরস্পরবিরোধী মতামতের পরিচয় পাওয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ মন পদার্থটি কোনো বিশেষ কাল সম্পূর্ণ গ্রাস করতে পারে না'। প্রবন্ধটির মূলকথা এই যে যারা রিয়্যালিজমের ধুয়ো তুলেছেন, তাঁর ইউরোপীয় রিয়্যালিজমেরই চর্বিতচর্বণ করেছেন মাত্র। প্রবন্ধের উপসংহারে লেখক একটি সমন্বয় করার চেষ্টা করেছেন। সাহিত্য থেকে রিয়্যালিজম বা আইডিয়ালিজ্‌ম্ স্বতন্ত্র ক'রে ছেঁকে দেখানো সম্ভব নয়—কারণ এ দু'য়ের সম্পর্ক অবিচ্ছেদগু, 'রিয়্যালিজমের পুতুল-নাচ এবং আইডিয়ালিজমের ছায়াবাজি উভয়ই কাব্যে অগ্রাহ্য। কাব্য হচ্ছে জীবনের প্রকাশ এবং যেহেতু জীবে চিৎ এবং জড় মিলিত হয়েছে, সে-কারণ যা হয় বস্তুহীন নয় ভাবহীন, তা কাব্য নয়। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবি মাত্রেই একধারে রিয়্যালিস্ট এবং আইডিয়ালিস্ট।'

'বস্তুতন্ত্রতা বস্তু কি' প্রবন্ধটি দু'দিক থেকে বিচার্য। প্রথমত, দেখতে হবে প্রতিবাদ-প্রবন্ধ হিসেবে প্রবন্ধটি কতদূর পরমত খণ্ডন ক'রে স্বমত প্রতিষ্ঠা করেছে। দ্বিতীয়ত, সাহিত্য-সমালোচনা হিসেবে এর মূল্য নির্ণয় করতে হবে। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে, রাধাকমলবাবুর বক্তব্য থাকলেও তা যেন খুব স্পষ্ট হ'য়ে উঠতে পারে নি। 'আধার' সম্পর্কে তিনি যে প্রশ্নটি উত্থাপন করেছেন, তা একেবারেই অস্পষ্ট—তিনি কি বলতে চেয়েছেন, তাই ভালো ক'রে বোঝা যায় না। তর্কের ভাষা সব সময়ই স্পষ্ট ও শরবৎ ঋজু হওয়া প্রয়োজন। আর একটি কথা তিনি বলেছেন, যার নাম 'নিত্যবস্তু'। এখানেও তিনি তাঁর বক্তব্যকে স্পষ্ট ক'রে তুলতে পারেন নি। কিন্তু 'যুগধর্ম' ব'লে তিনি যে কথাটি উল্লেখ করেছেন, তা বিশেষভাবে বিবেচ্য। যুগধর্ম সাহিত্যক্ষেত্রে সঞ্চারিত হওয়া সাহিত্যের চরম সাধনা না হতে পারে, কিন্তু 'যুগধর্ম' বলে যে একটি বিশিষ্ট কাল-লক্ষণ আছে, তাকে বোধ হয় অস্বীকার করা যায় না। এর স্বপক্ষে চৌধুরী মহাশয়ের একটি যুক্তি আছে। যেহেতু 'একই যুগে পরস্পর-বিরোধী মতামতের পরিচয় পাওয়া যায়' সেইজন্য উক্ত ধর্মটিকে অস্বীকার

করেছেন। পরস্পরবিরোধী মতামত যে কোন চলমান কালেরই ধর্ম, এই বিরোধ না থাকলে বোধ হয় কালের অগ্রগতি সম্ভব হ'ত না। বিশেষত, আধুনিক কালের জটিল সমস্যায় ও ধর্মে যেখানে নানামুখী বৈচিত্র্য, সেখানে পরস্পরবিরোধী মতামত থাকা খুবই স্বাভাবিক। তথাপি কালের একটি মৌলিক অভিপ্রায় ও অভিব্যক্তিকে অস্বীকার করা যায় না। তা না হ'লে দেশকাল যে পরিবর্তিত ও রূপান্তরিত হচ্ছে তা নির্ণয়ের মানদণ্ড কি? সুতরাং পরস্পর-বিরোধী মতামত সত্ত্বেও কালের নিজস্ব একটি স্বরূপধর্মকে অস্বীকার করা যায় না।

প্রবন্ধটির মধ্যে রিয়্যালিজমের স্বরূপ-নির্ণয়ের অংশটি সবচেয়ে মূল্যবান। আইডিয়ালিজম্ যে রিয়্যালিজমের বিরোধী নয়, বরং পরিপূরক—এ সত্যটি প্রবন্ধকার অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন। রিয়্যালিজমের উল্টোপিঠ হচ্ছে রোম্যান্টিসিজম্। এসব সত্য অ্যাবারক্রম্বে প্রমুখ সমালোচকেরা প্রমাণ ক'রে দিয়েছেন। ফরাসী সাহিত্যের যুগসন্ধি-লগ্নের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে রোম্যান্টিক ধারা ও বস্তুতান্ত্রিক ধারার যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় তিনি দিয়েছেন, তার চেয়ে ভালো উদাহরণ এক্ষেত্রে আর হতে পারে না। তিনি মূলত ফরাসী কথা-সাহিত্যের কথাই বলেছেন। হুগোর কথা বলা হয়েছে, কারণ তিনিই ছিলেন ফরাসী রোম্যান্টিকতার যূথপতি, কিন্তু ১৮৫০-এর পর থেকে ক্রমশ তাঁর প্রভাব অপসারিত হয়েছে। আরও ত্রিশ বছর বেঁচে থেকে শুধু নিজের পতন-কেই তাঁকে বেদনার সঙ্গে দেখতে হয়েছে। বালজাকের মৃত্যুর পর সাহিত্যের বস্তুতান্ত্রিক ধারা প্রবল হয়ে উঠল—এই ধারার সারথ্য গ্রহণ করলেন 'ম্যাডাম বোভারী'র সুবিখ্যাত লেখক গুস্তেভ ফ্লবেয়র। তার আগে থেকেই অবশ্য এর কিছু কিছু সূচনা দেখা গিয়েছিল।[৫৭] এমিল জোলার হাতে বস্তুতান্ত্রিক সাহিত্য 'খোলা নর্দমা' হয়ে দাঁড়ালো। প্রমথ চৌধুরী দু'ধারার কোন ধারারই আতিশয্য সমর্থন করেন নি। সাহিত্যকে জীবন-বিচ্ছিন্ন 'আকাশ গঙ্গা' ক'রে যেমন লাভ নেই, তেমনি নর্দমার পঙ্কিল-প্রবাহের মধ্যে জোর ক'রে টেনে এনেও কোন লাভ নেই। যে-কোনদিকেই অতিগুরুত্ব দিলে এর ভারসাম্যই খর্ব হয়। শ্রেষ্ঠ সাহিত্য একই সঙ্গে রিয়্যাল ও আইডিয়াল—এখানে 'ক্ষীরমম্বুমধ্যাৎ' নীতিটি অচল। সুতরাং বস্তুতন্ত্রতার স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে তাঁর মতবাদ সাধারণভাবে সমর্থনযোগ্য। কারণ বস্তুতন্ত্রতার নামে বিকৃতি কোন দেশে বা সুস্থ সমাজের পক্ষে সমর্থনযোগ্য নয়।[৫৮] প্রমথ চৌধুরীর প্রতিবাদের

ভাষা তীব্র ও মর্মভেদী কিন্তু বিরুদ্ধবাদীদের কথার জবাব দিতে গিয়ে কোথায়ও তিনি ভদ্রতা ও সৌজন্য হারান নি। বিভিন্ন মসীযুদ্ধে তাঁর যে বৈশিষ্ট্য দেখা গিয়েছে তা আলোচ্য প্রবন্ধেও অনুপস্থিত নয়। তাঁর আঘাত অব্যর্থ হ'য়েও অলক্ষিত—একটি অপ্রত্যাশিত দিক থেকে এমনভাবে আঘাতটি আসে যার জন্য হয়তো কেউ প্রস্তুত ছিল না। প্রবন্ধটিতে তাঁর সাহিত্যিক মতামতের পরিচয়ও পাওয়া যায়।

বার

'ফরাসী সাহিত্যের বর্ণপরিচয়' (নানাকথা) প্রবন্ধটি প্রমথ চৌধুরীর মনোজীবনের নির্দেশক। ফরাসী সাহিত্যের প্রতি তাঁর অসাধারণ প্রীতির কথা সুবিদিত। তাঁর বহু রচনায় ফরাসী সাহিত্যের প্রসঙ্গ আছে, কিন্তু সমগ্রভাবে ফরাসী সাহিত্যের আলোচনা করেছেন আলোচ্য প্রবন্ধটিতে। প্রবন্ধটির দু'টি দিক আছে। একদিকে যেমন স্বল্প-পরিসরের মধ্যে সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও মেজাজ-মর্জির পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনি ফরাসী সাহিত্য-রসিক প্রমথ চৌধুরীর রচনারীতি ও মানসপ্রকৃতির একটি সুন্দর ছবিও এখানে ফুটেছে। বাংলাভাষায় লেখা ফরাসী সাহিত্য-সম্পর্কিত এমন মূল্যবান ও সুখপাঠ্য প্রবন্ধ আর নেই। কথক ও কথাবস্তুর অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক প্রবন্ধটিকে অসাধারণ ক'রে তুলেছে।

চৌধুরী মহাশয় যে ফরাসী সাহিত্যের বিশেষজ্ঞ—এ দাবী তিনি কোথায়ও করেন নি। কিন্তু সম্পূর্ণ বিদেশী একটি সাহিত্য ও সভ্যতার সঙ্গে তিনি অদ্ভুত একটি ঐক্য অনুভব করেছেন। দেশে-বিদেশের জ্ঞানের ভাণ্ডার ছিল তাঁর সম্মুখে অবারিত—বিশ্ব-সংস্কৃতি-তীর্থের মুক্ত আকাশ ও আলো-হাওয়া তাঁর মনকে সমৃদ্ধ করেছিল, রুচিকে করেছিল উদার ও অভিজাত। তাই প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালীন ফরাসী দেশের মর্মবেদনা তিনি নিজের মর্ম দিয়ে বুঝেছিলেন, 'যিনি ফরাসি সাহিত্য ভালবাসেন তিনি ফরাসি জাতির সুখের সুখী ব্যথার ব্যথী হ'য়ে ওঠেন। আজকের দিনে ফ্রান্স তার জাতীয় জীবনের অণুপরমাণুতে যে অত্যাচারের বেদনা অনুভব করছে আমরাও তার অংশীদার।' —বাংলা দেশের রাজধানীতে ব'সে ফরাসী দেশের মর্মবেদনা অনুভব করার মধ্যে উক্ত দেশ, জাতি ও ভাষার সঙ্গে লেখকের সংযোগ কি নিগূঢ় তা সহজেই অনুমেয়।

প্রবন্ধটিতে তিনি মূলত ফরাসী সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য ও সংক্ষেপে ফরাসী সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করেছেন। প্রমথ চৌধুরীর বক্তব্যকে সূত্রাকারে গ্রথিত করলে মোটামুটি নিম্নলিখিত রূপ দাঁড়ায়:

ক. 'ফরাসি জাতি চিন্তারাজ্যে ইন্দ্রিয়জ্ঞানকে মিথ্যা ব'লে উড়িয়ে দেয় নি, অকিঞ্চৎকর ব'লেও উপেক্ষা করে নি; সুতরাং ফরাসী সাহিত্যের ভিতর সায়েন্স ও আর্টের একত্র সাক্ষাৎলাভ করা যায়।'

খ. ফরাসি লেখকেরা বাক্‌যুদ্ধেও সভ্যতার আইনকানুন মেনে চলেন। সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁরা ধর্মযুদ্ধের পক্ষপাতী। ফরাসী জাতি হাসতে জানে, তাই তারা কথায় কথায় ক্রোধান্ধ হ'য়ে ওঠে না। তীক্ষ্ণহাসির যে কি মর্মভেদী শক্তি আছে, এ সন্ধান যারা জানে, তাদের পক্ষে কটুবাক্য প্রয়োগ করা অনাবশ্যক।'

গ. 'ফরাসী সাহিত্য এই অর্থেই স্পষ্টভাষী যে, সে সাহিত্যের ভাষায় জড়তা বা অস্পষ্টতার লেশমাত্র নেই। ···জার্মান পণ্ডিতেরা অসাধারণ পরিশ্রম ক'রে যা প্রস্তুত করেন তা অধিকাংশ সময় বিদ্যার গ্যাস বই আর কিছুই নয়। অপর পক্ষে ফরাসী পণ্ডিতেরা মানব জাতির সুমুখে যা ধরে দেন, সে হচ্ছে গ্যাসের আলো।'

এই হ'ল ফরাসী জাতির বৈশিষ্ট্য। রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের দিকে হীনবল হ'য়ে পড়লেও বিশ্বমানব-মনীষার ইতিহাসে ফরাসী জাতির কীর্তি অবিস্মরণীয় হ'য়ে থাকবে—প্রবন্ধকারের সে বিশ্বাস আছে। এই বিশ্বাসের মূলে আছে পূর্ববর্তী শতাব্দীর নজির। উনবিংশ শতাব্দীর ফরাসী দেশ যে একটানা শান্তিভোগ করে নি, একথা সুবিদিত। অন্তর্বিপ্লব ও বহিঃশত্রুর আক্রমণে সে বারবার বিধ্বস্ত হয়েছে। তথাপি তার সৃষ্টি প্রবাহে কখনও ভাটা পড়েনি—জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানাক্ষেত্রে তার বিচিত্র সঞ্চরণ লক্ষণীয়। এই শতাব্দীর প্রথমার্ধে ফরাসী সাহিত্যের রোমান্টিসিজম্ ও দ্বিতীয়ার্ধে রিয়্যালিজম্, যুগ্মবেণী রচনা করেছিল। হিউগো, মুস্‌সে, গোতিয়ে, বাল্‌জাক, ফ্লবেয়র, মোপাসাঁ প্রভৃতি বিশ্রুতকীর্তি সাহিত্যিকেরা এই শতাব্দীতেই আবির্ভূত হয়েছিলেন। সুতরাং চৌধুরী মহাশয়ের ধারণা যে কত অভ্রান্ত তা স্পষ্টই অনুভব করা যায়।

ইংরেজী সাহিত্যের সঙ্গে তুলনা ক'রে যেখানে তিনি ফরাসী সাহিত্যের বিশেষ ধর্মটি বিচার করেছেন, যেখানে তাঁর তুলনামূলক সাহিত্য-বিচারে নৈপুণ্য চূড়ান্ত শীর্ষে আরোহণ করেছে। তিনি একটি বাক্যে তাঁর সমস্ত

বক্তব্যকে ঘনীভূত ক'রেছেন, 'এক কথায় বলতে ইংরেজি সাহিত্য রোমান্টিক এবং ফরাসী সাহিত্য রিয়্যালিষ্টিক্।' আত্মভাবমুগ্ধ রোমান্টিক ভাবাবেশ ও আধ্যাত্মিকতার স্বল্পতা ফরাসী সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। ফরাসী প্রতিভা অনেক বেশী বিশ্লেষণী।[৫৯] ফরাসী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ লেখক মোলিয়েরের সঙ্গে ইংরেজী ভাষার শ্রেষ্ঠ লেখক শেক্সপীয়রের তুলনামূলক আলোচনা ক'রে তিনি ফরাসী প্রতিভার বিশেষত্বের কথা বলেছেন। শেক্সপীয়র ও মোলিয়েরের তুলনামূলক বিচার করতে গিয়ে চৌধুরী মহাশয় অদ্ভুত রসগ্রাহিতার পরিচয় দিয়েছেন, 'শেক্সপীয়রের রিচার্ড দি-থার্ড, ইয়াগো প্রভৃতির পরিচয়ে দর্শকের মনে আতঙ্ক উপস্থিত হয়। শাইলক আমাদের মনে যুগপৎ করুণা ও ঘৃণার উদ্রেক করে, কিং লিয়রের পাগলামি আমাদের মনকে বেদনা দেয়, এয়ারিয়েল (Aeriel) আমাদের স্বপ্নরাজ্যে নিয়ে যায়। ফরাসি কবিরা শুধু হাস্য ও করুণ, বীর ও মধুর রসের চর্চা করেন। ইংরেজ কবিদের ন্যায় তাঁরা ভয়ঙ্কর ও অদ্ভুত রসের রসিক নন। ফরাসী জাতির ভিতর কোনো সেক্সপীয়র জন্মায় নি ও জন্মাতে পারে না।' একজন খ্যাতনামা ইংরেজ জীবনীকার ও সমালোচকের মন্তব্য উদ্ধার করলেই প্রমথ চৌধুরীর এই মূল্যবান বিশ্লেষণটির তাৎপর্য উপলব্ধি করা যাবে। মোলিয়ের ও শেক্সপীয়রের প্রতিভার তুলনামূলক আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 'The English dramatist shows his persons to us in the round ; innumerable facets flash out quality after quality ; the subtlest and most elusive shades of temperament are indicated ; until at last the whole being takes shape before us, endowed with what seems to be the very complexity and mystery of life itself. Entirely different is the Frenchman's way. Instead of expanding he deliberately narrows his view ; he seizes upon two or three salient qualities in a character and then uses all his art to impress them indelibly upon our minds.'[৬০]

ফরাসী সাহিত্যিকের এই বিশেষ মেজাজ তাদের সাহিত্যের গতিপথকেও নির্ণীত করেছে। ইংরেজী কবিতার তুলনায় ফরাসী কবিতা একেবারে ম্লান—কারণ সেখানে উচ্ছ্বসিত আবেগও নেই, কল্পনায় সপ্তবর্ণের ইন্দ্রধনু-বিলাসও নেই। কিন্তু সে অভাব পূরণ করেছে তার অননুকরণীয় গদ্যসাহিত্য।

গদ্যসাহিত্যের মধ্যেও প্রমথ চৌধুরী তিনটি বিভাগকে বিশেষভাবে নির্বাচন করেছেন—ইতিহাস, জীবনচরিত ও সামাজিক উপন্যাস। ফরাসী উপন্যাস—রিয়্যালিষ্টিক। এখানে রিয়্যালিজম্ মানে কদর্যতার পঙ্ক-কালিমা নয়। এইজন্য ফরাসী 'প্রকৃতিবাদীরা' যখন জোলার নেতৃত্বে বস্তুতন্ত্রতার নামে কদর্যতার নগ্নরূপ উদঘাটিত ক'রে দেখালেন, তখনকার সাহিত্যকে অন্য আর একটি প্রবন্ধে তিনি 'নর্দমা' আখ্যা দিয়েছেন। জোলার বিকৃত ও অবক্ষয়িত জীবন-চিত্রণ চৌধুরী মহাশয়ের কখনও সমর্থন পায় নি। প্রমথ চৌধুরীর মতে জোলা ছিলেন 'বিশেষরূপে ফরাসীধর্মে বঞ্চিত; জোলার রচনায় ফরাসি সুলভ লিপিচাতুর্য নেই; জোলার মন সূর্যকরোজ্জ্বল নয় সে মন নিশাচর।'

প্রবন্ধটির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অংশ হল এর শেষার্ধ। কারণ এই অংশে প্রবন্ধকার ফরাসী ভাষার ক্ল্যাসিক্যাল রীতি ও অন্যান্য শিল্পগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। ফরাসী ভাষার গঠনের মূলেই এমন এক বৈশিষ্ট্য ছিল, যা এর গতিপথকে সুনিয়ন্ত্রিত ক'রে দিয়েছে। ফরাসী ভাষা ল্যাটিন ভাষার প্রাকৃত—ইংরেজী ভাষার মতো মিশ্র উপাদানে এ ভাষা গড়ে ওঠে নি। ফরাসী শিল্পীরা, বিশেষত গদ্যশিল্পীরা ভাষার ঐক্যকে ক্রমাগত কেন্দ্রবদ্ধ ক'রে একটি বিশেষ রীতিকে জয়যুক্ত করে তোলার চেষ্টা ক'রেছেন। প্রবন্ধকার সংক্ষেপে একাদশ থেকে উনিশ শতক পর্যন্ত ফরাসী সাহিত্যের ধারাবাহিক কাহিনী বলেছেন। কিন্তু একে শুষ্ক তথ্যবিবৃতি বা ইতিহাস বলা সঙ্গত হবে না। ফরাসী জাতির বিশিষ্টতা অনুযায়ী এ সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি নির্ণয় করেছেন। সাহিত্যের ইতিহাসের মতো জটিল ও তথ্যাশ্রয়ী বিষয়কে লেখক কত সহজে ও সংক্ষেপে রমণীয় ক'রে বলতে পারেন, তারই পরিচয় এখানে পাওয়া যায়। মালের্ব ও বোয়ালোর ভাষাসংস্কার ভাষাকে ভাবাবেগ-নির্মুক্ত যুক্তিনিষ্ঠ ক্ল্যাসিক্যাল সংস্কারে যে অভ্রান্ত শিক্ষা দিয়েছিল, তারই চূড়ান্ত সিদ্ধি ভল্‌তেয়ারের গদ্যে। ভাষার অতি সূক্ষ্মতার ফলে যখন দুর্বলতা এলো, তখন শতোব্রিয়াঁ, হুগোর রোম্যান্টিক সাহিত্যের অভ্যুদয়, তারপর রোম্যান্টি-সিজমের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ এলো রিয়্যালিজমের ধারা। এত বড় সাহিত্যের মর্মবাণীকে কত স্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন ক'রে তুলতে পারেন—ফরাসী সাহিত্যের কথা বলতে গিয়ে যেন ফরাসী রীতিতেই সবটা বলেছেন। মাঝে মাঝে দু'একটি মৌলিক চিন্তার গভীরতা রীতিমতো ভাবিয়ে তোলে। ফরাসী রোম্যান্টি-সিজমের স্বরূপধর্ম আলোচনা করতে গিয়ে লেখক একটি জাতির সমগ্র সাহিত্যিক

বিবেককেই রূপায়িত করেছেন। ইংরেজী সাহিত্যের রোম্যান্টিসিজমের সংস্কার আমাদের মনে এত বেশী বদ্ধমূল যে, এই ধারায় যে বহু-বিচিত্র মনোবিকাশ থাকতে পারে, তা আমরা ভুলে যাই। সুকৌশলী লেখক ফরাসী রোম্যান্টিকতার বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলেছেন মিতবাক্ মন্তব্যের মৃদু আলোতে, 'ফরাসি রোম্যান্টিক সাহিত্যের ভাষার প্রলেপ তুলে ফেললে দেখা যায় যে, তার ভিতরে রোম্যান্টিসিজমের খাঁটি মাল নেই।' অথচ ভাষাপুষ্টির জন্য এর প্রয়োজন ছিল ৬১

প্রবন্ধটির উপসংহারে লেখক আমাদের দেশের শিক্ষিত সমাজে ফরাসী সাহিত্য-চর্চার প্রসারতা প্রত্যাশা করেছেন। বাংলাসাহিত্যে সাবজেকটিভ ও অবজেকটিভ—দুটি ধারাই পাশাপাশি চলেছিল—বৈষ্ণব গীতিকবিতা যেমন ছিল, তেমনি তার পাশে ছিল মঙ্গলকাব্য। প্রমথ চৌধুরীর মতে ইংরেজী সাহিত্য শিক্ষার ফলে যেমন আমাদের সাহিত্যে সুফল ফলেছে, তেমনি কুফলও কম হয় নি। ভাষাগত সংযম অভ্যাসের জন্য ফরাসী সাহিত্যের অনুশীলন দরকার। রোম্যান্টিক ইংরেজী সাহিত্য-চর্চার ফলে মনের একটি দিক অনেক বড় হয়ে উঠেছে সন্দেহ নেই, কিন্তু অন্যদিক তেমন পুষ্ট হতে পারে নি—এই কারণে ফরাসী সাহিত্য-চর্চার আরও বেশী প্রয়োজন। প্রমথ চৌধুরীর মতে ইংরেজী ভাষার অতি-চর্চার ফলে, তাদের স্থুল অনুকরণ ক'রেই আমাদের এই দুর্দশা। ভারতচন্দ্রের বাগ্বিধি ও ভাষাচর্যাকে আমরা হারিয়ে ফেলেছি। প্রবন্ধকার তাঁর এই প্রিয় কবি সম্পর্কে মনে করেন, 'আমার বিশ্বাস ভারতচন্দ্র যদি ফ্রান্সে জন্মগ্রহণ করতেন তাহলে তাঁর প্রতিভা অনুকূল অবস্থার ভিতর আরও পরিস্ফুট হয়ে উঠত এবং তাঁর রচনা ফরাসী সাহিত্যের একটি মাস্টারপিস বলে গণ্য হত।'

প্রবন্ধটিতে ফরাসী জাতি ও ফরাসী সাহিত্যের আলোচনার পরে লেখক যেখানে দাঁড়িয়েছেন, সেটি হল তাঁর স্বক্ষেত্র। আঙ্গিক-সচেতনতা, ক্ল্যাসিক্যাল মেজাজ ও মিতাক্ষর ভাষার যত্নকৃত-বিন্যাস—ফরাসী ভাষার এই ত্রিবিধ বৈশিষ্ট্য তাঁর আলোচনার প্রধান বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাংলা গদ্যরীতির আদল যে ক্ল্যাসিক্যাল নয়, এ অভিযোগ অযথার্থ নয়। এর একটি কারণ বোধ হয় এই যে বাংলাসাহিত্যের ক্ল্যাসিক্যাল বনেদ দুর্বল—তার ওপরে প্রবল রোম্যান্টিক প্রবাহ এসে পড়েছে—তাতে ভাষার কতকগুলি দুর্বলতা থেকেই গেল। কিন্তু এতে ইংরেজী ভাষার দায়িত্ব কতখানি আছে তাও বিবেচ্য। রোম্যান্টিক

উচ্ছ্বাসই তো ইংরেজী ভাষার একমাত্র পরিচয় নয়। বুদ্ধিধর্মী ইংরেজী গদ্য-সাহিত্যের অনুশীলনই বা বাংলায় কতটকু হয়েছে? ইংরেজী ভাষার সঙ্গে সুদীর্ঘ পরিচয়ের ফলে আমাদের মনোজীবনে রোম্যান্টিক ও ভিক্টোরীয় যুগের কবিতা, শেকস্‌পীয়রের নাটক, বড় জোর সাম্প্রতিককালে এলিয়ট ও পরবর্তীদের কবিতার কিছু কিছু প্রভাবের স্বাক্ষর আছে। ফরাসী সাহিত্যের মতো না হতে পারে, কিন্তু ইংরেজী গদ্যের ধারও তো কম নয়? বাংলা সাহিত্যে তার অনুশীলনই বা কতটা হয়েছে। বিষয়টিকে আর একটি দিক থেকেও বিচার করা চলতে পারে। উনিশ শতকে কোন কোন বাঙালী লেখক তো মূল ফরাসী জানতেন, তা ছাড়া অনেকেই ফরাসী সাহিত্যের ইংরেজী অনুবাদ (যার ভেতর মূলের রস অনেকখানি পাওয়া যায়) প'ড়েছেন, কিন্তু ফরাসী মনের সহাস্য আলোক, অথবা ফরাসী গদ্যের স্ফটিকদ্যুতি ক'জনের লেখার মধ্যে পাওয়া গিয়েছে? আসল কথা ইংরেজী সাহিত্য-চর্চার ফলেই যে বাঙালী মনের এই শ্রেণীর পরিণতি দাঁড়িয়েছে, এ কথা বলা যায় না। বাঙালী মানসিকতার সঙ্গে ফরাসী গদ্যের মেজাজের ব্যবধান আকাশ পাতাল! ফরাসী সাহিত্য-চর্চার ফলে বাঙালী মানসিকতার মৌলিক রূপের মূলোচ্ছেদ সম্ভব নয়, তবে কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত হতে পারে, একথা বলাই বাহুল্য। চৌধুরী মহাশয় ফরাসী সাহিত্যের দিকে যতটা দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন, ইংরাজী ভাষার সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের সুদীর্ঘ সম্পর্কের কথা তেমনভাবে বিচার করেন নি।

তের

'সনেট কেন চতুর্দশপদী' (নানা-কথা) কবিতার আঙ্গিক সম্পর্কিত প্রবন্ধ। প্রমথ চৌধুরীর 'সনেট-পঞ্চাশৎ' সম্বন্ধে প্রিয়নাথ সেন যে আলোচনা করেন, সেই প্রসঙ্গেই প্রবন্ধটি লেখা। প্রবন্ধটি সনেটের 'চতুর্দশী-তত্ত্ব' সম্পর্কিত—এখানে তিনি সনেটের কোন তত্ত্বগত আলোচনা করেন নি। সাধারণ বুদ্ধি ও সনেট-রচয়িতার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেই যে তিনি প্রবন্ধটি লিখেছেন, একথা তিনি প্রবন্ধটির প্রারম্ভেই স্বীকার করেছেন। দ্বিপদী, ত্রিপদী ও চতুষ্পদীই যে কবিতার মূল উপাদান, এ বিষয় কোন সন্দেহ নেই। ইতালীয় 'তেরজা রিমার' প্রসঙ্গ তুলে তিনি বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন। লেখকের বক্তব্য হল—'ত্রিপদীর সঙ্গে চতুষ্পদীর যোগ করলে সপ্তপদ পাওয়া যায় এবং সেই সপ্তপদকে দ্বিগুণিত ক'রে নেওয়াতেই সনেট চতুর্দশপদ লাভ করেছে।'—একেবারে সোজা হিসেব!

'সনেট কেন চতুর্দশপদী'-কে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধ বলা সঙ্গত নয়, প্রিয়নাথ সেনের প্রবন্ধটির পরিপূরক হিসেবে মাত্র একটি দিকের আলোচনাই তিনি করেছেন। কিন্তু পেত্রার্কারও প্রায় দুশো বছর আগে থেকে যে শিল্পরীতি চতুর্দশ-চরণ-নির্ভর হয়েই চলে আসছে, তার পেছনে কী গূঢ় কারণ ছিল, তা আলোচনা ক'রে দেখালে বিষয়ের দিক থেকে প্রবন্ধটি পূর্ণাঙ্গ হতে পারত। একাদশ থেকে চতুর্দশ শতাব্দীর প্রভেন্সের 'ক্রবাদুর' কবিদের প্রেমসঙ্গীতের মধ্যে, বিশেষত 'কান্‌সো' (canso) নামক প্রেমগীতিকায় সম্ভবত সনেটের চতুর্দশপদতত্ত্ব লুকিয়ে আছে। সে যাই হোক, প্রবন্ধটি পড়ে জিজ্ঞাসুর মনে অতৃপ্তিই বেড়ে উঠে।

'নোবেল প্রাইজ', 'সাহিত্যে খেলা', 'শিশু সাহিত্য' (বীরবলের হালখাতা)—তিনটি রচনাই তেমন বিষয়নিষ্ঠ নয়, বিষয়ের সামান্য একটু প্রসঙ্গ তুলে খেয়ালী মনের লীলা-বিলাসকেই এখানে যেন প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বীরবলী রচনারীতির স্বাদ ও গন্ধ তিনটি লেখায়ই পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। লঘুমেজাজ, তির্যক্‌ভাষণ, বৈঠকী আমেজ, তিনটি লেখায়ই পাওয়া যায়। বিশেষ মতবাদ বা বক্তব্যের পূর্ণাঙ্গ বিন্যাস এখানে অনুসন্ধান করা সঙ্গত নয়, কথাবলাকে কেমন ক'রে কথাকলায় পরিণত করেছেন, তারই জাদু আছে এখানে।

রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাইজ পাওয়ার ব্যাপার নিয়ে বাংলাদেশের সাহিত্যিক মহলে যে তুমুল আন্দোলন ও প্রবল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল, তাকেই উদ্দেশ্য ক'রে বীরবল অম্ল-মধুর টিপ্পনী কেটেছেন। সুইডিস অ্যাকাডেমির সম্মুখে যাতে উপস্থিত করা যায়, এই ভেবে কেউ কেউ নিজেদের লেখা তর্জমা করানোর দিকেও সচেতন হয়ে উঠলেন। একদিকে বাঙালী লেখকদের প্রাণান্ত অবস্থা, ও অন্যদিকে নোবেল প্রাইজ যিনি পেলেন, তাঁরও খ্যাতির বিড়ম্বনার কৌতুকছবি তিনি এঁকেছেন। এক কথায় তিনি বহুশ্রুত হিন্দী প্রবাদটিকে আর একবার রসিয়ে রসিয়ে শুনিয়েছেন, 'তাই বলি আমাদের বাঙালি লেখকদের পক্ষে নোবেল প্রাইজ হচ্ছে দিল্লির লাড্ডু—যো খায়া ওভি পস্তায়া, যো না খায়া ওভি পস্তায়া।' নোবেল প্রাইজ লাভ করার মূলধন সংগ্রহের জন্য কৌতুকপ্রদ অবস্থার হাস্যকর অসঙ্গতি, এবং পাওয়ার পরে আকস্মিক সৌভাগ্য লাভের বিসদৃশ পরিস্থিতি—এই দুটি দিককেই তিনি নিপুণতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন। রচনাটিতে প্রমথ চৌধুরীর কলাসিদ্ধির আশ্চর্য রূপ ফুটেছে। হাল্কা চাল ও লঘু ভঙ্গি! বিষয়টি আপাত-দৃষ্টিতে লঘু হলেও এর গুরুত্ব আছে। হবু নোবেল

লরিয়েটদের বেশ রসিয়ে রসিয়ে শুনিয়েছেন—সহজ কৌতুকের আড়ালে আছে বিদ্রূপাত্মক ভ্রূ-ভঙ্গির রেখা। সেকালের যাঁরা নোবেল প্রাইজ পাওয়ার দুরাকাঙ্খায় ইংরেজী তর্জমার দিকে নজর রেখে বাংলা সাহিত্য গড়তে চেয়েছিলেন, তাঁদের তিনি শুনিয়েছেন, 'একটি বাঙালি আর একটি বিলেতি—এই দুটি স্ত্রী নিয়ে ঘর-সংসার পাতা যে আরামের নয়, তা যাঁরা ভুক্তভোগী নন, তাঁরাও জানেন। ...সর্বভূতে সমদৃষ্টি, চাই কি, মানুষের হ'তেও পারে; কিন্তু দুটি পত্নীতে সমান অনুরাগ হওয়া অসম্ভব, কেন না মানুষের চোখ দু'টি হলেও হৃদয় একটি। স্ত্রৈণ হ'তে হ'লে একটি মাত্র স্ত্রী চাই। এমন কি দুই দেবীকে পূজা করতে হ'লেও পালা ক'রে ছাড়া উপায়ান্তর নেই। অতএব দাঁড়াল এই যে, বছরের অর্ধেক সময় আমাদের বাংলা লিখতে হবে, আর অর্ধেক সময় ইংরেজিতে তার তরজমা করতে হবে। ফিরেফিরতি সেই সুইডেনের কথাই এলো; অর্থাৎ আমাদের চিদাকাশে ছ'মাস রাত আর ছ'মাস দিনের সৃষ্টি করতে হবে, অথচ দৈবশক্তি আমাদের নেই।'

'সাহিত্যে খেলা' বীরবলী গদ্যরচনার আর একটী সার্থক উদাহরণ। এই সংক্ষিপ্ত গদ্যরচনাটি যদিও সাহিত্য সম্পর্কেই লেখা, তবু এর লঘুছন্দ ও বাক্‌ভঙ্গি বীরবলী ঢঙের সবগুলি বৈশিষ্ট্যই ফুটিয়ে তুলেছে। রচনাটি ঠিক 'রীতিমত প্রবন্ধ' নয়, 'বেল্-লেত্যর'-এর সুন্দর একটি নিদর্শন। তাঁর আসল বক্তব্য হ'ল সূত্রবদ্ধ অথচ অর্থগূঢ় একটি ছোট মন্তব্য, 'সাহিত্য ছেলের হাতের খেলনাও নয়, গুরুর হাতের বেতও নয়।' এর মধ্যে সাহিত্য সম্পর্কে মূল্যবান কথাও আছে, কিন্তু বলেছেন রসের ছলে এবং মজলিশী মেজাজে। তিনি সাহিত্যের দ্বারা মনোরঞ্জন করতে বসে যেমন নট-বিটের দলভুক্ত হ'তে রাজি নন, তেমনি গুরুগিরি করাও তাঁর অভিপ্রেত নয়, আবার 'খেলাচ্ছলে শিক্ষা' দেওয়ারও তিনি পক্ষপাতী নন, কারণ 'সরস্বতীকে তা হ'লে কিণ্ডারগার্টেনের শিক্ষয়িত্রীতে' পরিণত করা হবে,—এতে তাঁর প্রবল আপত্তি। যদি কেউ এই লেখায় লেখকের সাহিত্য-সম্বন্ধীয় মতামত জানতে চান, তা হ'লও যে একেবারে ব্যর্থ হবেন, তা নয়, কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা এর আস্বাদন। রচনাটি নিরন্ধ্র, বক্তব্যের সুদক্ষ বুনোনির মধ্যে কোথাও ফাঁক নেই। কিন্তু প্যারাডক্স, শ্লেষ, বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য ও প্যাঁচালো ভঙ্গি রচনাটিকে অভিনবত্ব দিয়েছে। প্রতি ছত্রেই এই প্রোজ্জ্বলবুদ্ধি অসাধারণ কথকের মনের দীপ্তি ছড়িয়ে পড়েছে। বীরবলী গদ্য কথ্যভাষাশ্রয়ী, কিন্তু অনলঙ্কৃত নয়—শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কার

তাঁর চলতি গদ্যকেও লাবণ্যমণ্ডিত করেছে। এই অনবদ্য গদ্যরচনাটিতে কোথায়ও কষ্ট-কল্পনা নেই—অনেক বিষয়ের কথা ব'লেও তিনি ভারমুক্ত—মনের বিচিত্র লীলাস্পন্দন ছাড়া আর কি? বিয়রবোম সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'One of the charms of Max Beerbohm is that he never pretends to be what he is not.'[৬২] প্রমথ চৌধুরী সহজেই বলতে পেরেছেন, 'আমরা যদি একবার সাহস ক'রে কেবল মাত্র খেলা কববার জন্য সাহিত্য-জগতে প্রবেশ করি, তা হ'লে নির্বিবাদে সে জগতের রাজা-রাজড়ার দলে মিশে যাব। কোনোরূপ উচ্চ আশা নিয়ে সে ক্ষেত্রে উপস্থিত হ'লেই নিম্নশ্রেণীতে যেতে হবে।' নিজের অধিকারের সীমা সম্পর্কে তাঁর ছিল সুনির্দিষ্ট ধারণা, কিন্তু খেলা করার অধিকার কি সকলেরই থাকে? বেশীর ভাগই তো খেলতে এসে অ-খেলোয়াড়ী মনোভাব দেখান। কিন্তু চৌধুরী মহাশয় পেয়েছিলেন সাহিত্যে খোশ-মেজাজে খেলা করার সেই দুর্লভ অধিকার।

'শিশু-সাহিত্য' রচনাটিতে রচয়িতা শিশু-সাহিত্য সম্পর্কে অনেক মূল্যবান কথা বলেছেন। রচনাটির আর একটি বৈশিষ্ট্য দৃষ্টি আকর্ষণ করে। জীবন-সমালোচনা থেকে সুরু ক'রে লেখক শিশু-সাহিত্যের সমীপবর্তী হয়েছেন। রচনাটির প্রথমার্ধে আমাদের দেশে অকাল-বার্ধক্য সম্পর্কে লেখক কৌতুককর আলোচনা করেছেন। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে এই কৌতুকের নেপথ্যে আছে বিদ্রূপাত্মক জীবন-সমালোচনা। প্রমথ চৌধুরী ছিলেন অকাল-বার্ধক্য ও জড়তার বিরোধী—কারণ এ দু'টি বস্তু হ'ল জীবন-যৌবন-বিধ্বংসী। তাই তিনি শুষ্কপত্রের দেশকে সবুজপত্র-মণ্ডিত করতে চেয়েছিলেন। সমাজদেহে ও জীবনাচরণে তিনি তারুণ্য সঞ্চারিত করতে চেয়েছিলেন। আলোচ্য রচনায় তিনি আমাদের এই অকালপক্কতার একটি কারণ নির্দেশ করেছেন—সেটি হল আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা—এখানে শিশুদের 'জ্ঞানের ভোগ ভোগানো' হয়। লেখকের মতে 'শিশু-পছন্দ সাহিত্য শিশু ব্যতীত অপর কেউ রচনা করতে পারে না, আর শিশুরা সমাজের উপর আর যে অত্যাচারই করুক-না কেন, সাহিত্যরচনা করে না।'

তবে শিশু-সাহিত্যের অস্তিত্ব অস্বীকার করলেও তিনি বালপাঠ্য সাহিত্যের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করেন নি—কারণ শিক্ষার মধ্যে যে আনন্দাংশ বাদ পড়ে তা এই জাতীয় সাহিত্য দিতে পারে। শিশু-সাহিত্য ব'লে কোন বস্তু গোড়ায় ছিল না—যা শিশু-সাহিত্য বলে চলে, তা লেখা হয়েছিল

বড়দের জন্যই। কালক্রমে উচ্চাঙ্গের সাহিত্যের কিয়দংশ শিশু-সাহিত্যের এলাকাভুক্ত হ'য়ে পড়েছে—যেমন রূপকথা, রামায়ণ, মহাভারত, ডন-কুইক্‌সোট, গালিভারস্‌-ট্র্যাভেলস্‌। কিন্তু বর্তমানকালে রূপকথা লেখা সম্ভব নয়, কারণ রূপকথা রচনার দেশ-কাল-সমাজ পরিবর্তিত হয়েছে। একালে 'আমরা রূপকথা লিখতে বসলে, হয় তা কিছুই হবে না, নয় রূপক হবে।' অসামান্য প্রতিভা ছাড়া রূপকথা লেখা সম্ভব নয়। বয়সে বৃদ্ধ হ'য়েও যাঁরা মনে বালক, তাঁরাও এ জাতীয় সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারবেন না। প্রবন্ধটির শেষ দিকে লেখক একটু খোঁচা দিতেও ছাড়েন নি, 'সুতরাং আমার মতে, বিশেষ ক'রে শিশু-সাহিত্য রচনা হ'তে আমাদের নিরস্ত থাকাই শ্রেয়। আমরা যদি ঠিক আমাদের উপযোগী বই লিখি, খুব সম্ভবত তা শিশু-সাহিত্যই হবে।' লেখকের এই অম্ল-মধুর মন্তব্যটি উপভোগ্য হ'য়ে উঠেছে। শিশু-সাহিত্য সম্পর্কে তিনি খুব সামান্যই বলেছেন, কিন্তু সেটুকুর মধ্যেই তাঁর অসামান্যতা ও মৌলিকতা ঝলমল ক'রে উঠেছে। প্রমথ চৌধুরীর এ শ্রেণীর লেখায় কোন তথ্য নেই এ কথা বলা সঙ্গত নয়, কিন্তু যে কোন রকম তথ্যকেই যে তিনি রসে পরিণত করতে পারতেন, এ কথা তাঁর বহু লেখায় প্রমাণিত হয়েছে। তাঁর দৃষ্টি ছিল অন্তর্ভেদী, তাই যে কোন বিষয়কেই তাঁর মনের তীক্ষ্ণ সন্ধানী আলো নূতন ক'রে আবিষ্কার করেছে।

চৌদ্দ

সমকালীন বাংলা সাহিত্যের স্বরূপ ও গতি-প্রকৃতি নিয়ে প্রমথ চৌধুরী নানারকমের মন্তব্য করেছেন। এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধও যেমন আছে তেমনি প্রাসঙ্গিক আলোচনাও কম নেই। সমকালীন সাহিত্য-সম্পর্কিত মন্তব্যগুলি একত্রিত করলে দেখা যাবে যে, সমকালীন সাহিত্যের ভাষ্যকার হিসাবে তিনি একটি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। 'মলাট-সমালোচনা', 'বঙ্গ সাহিত্যের নবযুগ' [বীরবলের হালখাতা] ও 'বর্তমান বাংলা সাহিত্য' [নানা-কথা]—এই তিনটি প্রবন্ধে সম-সাময়িক বাংলা সাহিত্যের কথা অপেক্ষাকৃত বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। সমকালের সাহিত্য বিচার করা দুরূহ—কিন্তু প্রমথ চৌধুরী চলতি কালের সাহিত্যের যে ছবি এঁকেছেন, তার মধ্যেও তাঁর অন্তর্ভেদী দৃষ্টি ও দীপ্ত বুদ্ধির ছাপ পরিস্ফুট।

'মলাট সমালোচনা'য় পুস্তকের প্রসাধন-বৈচিত্র্য, সমালোচনার নামে

অতিনিন্দা ও অতিপ্রশংসার মাত্রাতিরিক্ত আলোচনা, অচল সাহিত্যকে প্রাণপণে সচল করার জন্য অতি-বিজ্ঞাপিত করার প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা, সংস্কৃত শব্দ-ব্যবহারে নিরঙ্কুশতা, পুস্তকের নামকরণ সম্পর্কে অপ্রচলিত ও দুরূহ শব্দের ব্যবহার প্রভৃতি সাহিত্য প্রসঙ্গে পাঁচমিশেলী আলোচনা এখানে আছে। একটু বিচার করলেই দেখা যাবে যে, তাঁর কোন মন্তব্যই অযথার্থ নয়। বিজ্ঞাপনের ঢাক-পেটানো থেকেই বইয়ের প্রকৃত গুণাগুণ জানা মোটেই সম্ভব নয়। সমকালীন সাহিত্য-সমালোচনা সম্পর্কে তিনি যা বলেছেন তাও প্রাণিধানাযাগ্য। প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে প্রবন্ধটি লেখা হয়েছে, কিন্তু সমকালীন সাহিত্য-সমালোচক আজও অতিনিন্দা ও অতিপ্রশংসার গোলোকধাঁধা থেকে মুক্ত হ'তে পারেন নি।

বীরবলের রচনরীতির ঔজ্জ্বল্য ও ঋজুতা রচনাটির সর্বত্র পরিস্ফুট। ঢিলেঢালা মেজাজে নানা প্রসঙ্গের অবতারণা, প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে ছুটে চলার বিলাস, কথাকে ঘুরিয়ে শ্লেষের মসৃণতা সৃষ্টি করা, তীক্ষ্ণাগ্র ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্য—রচনাটিকে বীরবলী মেজাজের দোসর ক'রে তুলেছে। আমাদের সাহিত্যের বহুবিধ দুর্লক্ষণের উল্লেখ করলেও ভাষাসমস্যার ওপরেই যেন তিনি তাঁর বক্তব্যকে বেশী নিবদ্ধ রেখেছেন। স্বল্প-পরিচিত সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার প্রসঙ্গে তিনি অক্ষয়কুমার বড়ালের 'এষা' কাব্যের নামকরণ নিয়ে যে আলোচনার আবর্ত সৃষ্টি করেছেন, তা যেমন কৌতুককর, তেমনি শব্দার্থ-বিলাসী বীরবলী ঢঙের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। একটু আতিশয্য যে না আছে এমন নয়, কিন্তু তাতে এর আস্বাদন বেড়েছে বই কমে নি, কিন্তু যতই রসিয়ে বলুন না কেন, রচনাটিতে বক্তব্যের গুরুত্ব আছে। বাংলাভাষার মেরুদণ্ডহীনতা ও ললিত-গলিত ভাব, যাকে তিনি ব্যঙ্গ ক'রে বলেছেন 'ন্যাকামি'—তার মূলোচ্ছেদ করার জন্য তিনি এর বিরুদ্ধে আজীবন লেখনী সঞ্চালন করেছেন। রচনাটির শেষদিকে তাঁর বক্তব্য ইস্পাতের মতো কঠিন হ'য়ে উঠেছে—তেমনি হয়েছে ঋজু ও ধারালো, 'ন্যাকামির উদ্দেশ্য হ'চ্ছে সহজে লোকপ্রিয় হওয়া, এবং তার লক্ষণ হচ্ছে ভাবে ও ভাষায় মাধুর্যের ভান এবং ভঙ্গি। বঙ্গসাহিত্যে ক্রমে যে তাই প্রশ্রয় পাচ্ছে, সেইটে দেখিয়ে দেবার জন্যে আমার এত কথা বলা।··· লেখকেরা যদি ভাষাকে সুকুমার করবার চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে তাকে সুস্থ এবং সবল করবার চেষ্টা করেন, তাহলে বঙ্গসাহিত্যে আবার প্রাণ দেখা দেবে।' ভাষার স্থিতিস্থাপকতা ও বলিষ্ঠতার কথা তিনি নানা প্রসঙ্গেই শুনিয়েছেন।

'বঙ্গসাহিত্যের নবযুগ'-এ লেখক নবযুগের বঙ্গসাহিত্যের বিভিন্ন লক্ষণ

আলোচনা করে নূতন লেখকদের পথ-নির্দেশ দিয়েছেন।' প্রবন্ধটির শেষাংশে, লেখকের চিত্র-সমালোচনার মধ্যেও মনস্বিতার ছাপ আছে। তাঁর মতে নবযুগের বঙ্গসাহিত্যের প্রথম লক্ষণ হল এই যে, এ সাহিত্য 'রাজধর্ম ত্যাগ করে গণধর্ম অবলম্বন করছে।' লেখকের বক্তব্যের মূল অভিপ্রায় হ'ল এই যে বর্তমানকালে সংখ্যালঘিষ্ঠ দিক্‌পালরা নেই বটে, কিন্তু সাহিত্যিকদের সংখ্যা বেড়েছে। লেখক এখানে অতীতের সঙ্গে বর্তমানের তুলনা দিয়ে নবযুগের সাহিত্যকে হেয় প্রতিপন্ন করেন নি—বরং তিনি এ যুগের সাহিত্য-প্রচেষ্টাকে উৎসাহিতই করেছেন। সেকালের সাহিত্যের আসর ছিল স্বল্পসংখ্যক দিক্‌পালদের দখলে—বহুলোকের ভেতর থেকে দু'চারজন যেন মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিলেন। এ যুগের সাহিত্যিকেরা মাথায় হয়তো ছোট, কিন্তু সংখ্যায় অনেক বেশী। 'এক কথায়, বহু শক্তিশালী স্বল্পসংখ্যক লেখকের দিন চলে গিয়ে স্বল্পশক্তিশালী বহু সংখ্যক লেখকের দিন আসছে।' লেখক এই যুগধর্মকে অস্বীকার করেন নি, কিন্তু তার সঙ্গে একটি বিষয়ে সতর্কও ক'রে দিয়েছেন। প্রাচীন যুগের তুলনায় এ যুগের সাহিত্যের কৃশতা লেখককে মোটেই বিচলিত করে নি, কিন্তু তিনি শঙ্কিত হয়েছেন অন্য একটি কারণে। তাঁর ভাষায়-ই বলা যাক, 'একে স্বল্পায়তন, তার উপর লেখাটি যদি ফাঁপা হয় তাহলে সে জিনিসের আদর করা শক্ত। বালা গালা-ভরা হলেও চলে, কিন্তু আংটি নিরেট হওয়া চাই।' তিনি লঘু ধরণের রচনার পক্ষপাতী হলেও ফাঁপা লেখার পক্ষপাতী ছিলেন না।

কিন্তু গণধর্মের একটি প্রধান দোষ এই যে, বৈশ্যধর্মের দিকে তার প্রধান আকর্ষণ, কারণ 'সাহিত্যের বাজার-দর সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান যত বাড়বে সেই সঙ্গে তার মূল্য সম্বন্ধে জ্ঞান আমাদের লোপ পেয়ে বসবে।' প্রমথ চৌধুরী সাহিত্যের গণধর্মকে স্বীকার করলেও, বৈশ্যধর্মের প্রতি চিরদিনই খড়গহস্ত ছিলেন।

দ্বিতীয়ত, প্রবন্ধের শেষ দিকে নবযুগের সচিত্র মাসিক পত্রের চিত্রসম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেছেন। ছবির লোভ দেখিয়ে অনেক ক্ষেত্রে খারাপ জিনিষকে বাজারে চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে। যদিও লেখক বলেছেন যে চিত্রসমালোচনা তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য নয়, তথাপি প্রবন্ধের শেষদিকে চিত্র সম্পর্কে তিনি যে সমস্ত মন্তব্য করেছেন, তার মূল্য অনস্বীকার্য। তাঁর মতে আমাদের চিত্রবিদ্যার প্রথম দোষ ইউরোপের ব্যর্থ অনুকরণ। দ্বিতীয়ত জ্যামিতি বা গণিতের শাসনের ওপরে এ বিদ্যা গড়ে তুললে আর্টের মূলগত ব্যাপারটিকেই অস্বীকার করা হয়, কারণ

বিজ্ঞানের সত্য ও রসের সত্যের মধ্যে প্রচুর পার্থক্য আছে। তৃতীয়ত, লেখক শিল্প সম্পর্কে দীর্ঘকালের একটি প্রশ্নকেই নূতন ক'রে তুলে ধরেছেন। তিনি মনে করেন যে, 'যে-ঘোড়া দৌড়বে না, তার অ্যানাটমি ঠিক চড়বার কিংবা হাঁকাবার ঘোড়ার অনুরূপ করাতেই বস্তুজ্ঞানের অভাবের পরিচয় দেওয়া হয়!' প্রবন্ধটিতে তিনি আমাদের শিল্প ও সাহিত্যের মধ্যে যে কৌতুককর অসঙ্গতি আছে, তা স্পষ্টভাষায় বলেছেন। চিত্রকলা ও সাহিত্যের মধ্যে একটি প্রবল বিরোধ আছে। চিত্রকলায় অবিকল বাস্তবের অনুকৃতি চলেছে, অথচ সাহিত্যে এই ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানকে বর্জন করা হচ্ছে—এই জাতীয় আবিষ্কার লেখকের মৌলিক চিন্তাশক্তির পরিচায়ক। তিনি শ্লেষের সঙ্গে বলেছেন, 'সম্ভবতঃ এ যুগের লেখকদের বিশ্বাস যে, ছবির বিষয় হচ্ছে দৃশ্যবস্তু আর লেখার বিষয় হচ্ছে অদৃশ্য মন। সুতরাং বাস্তবিকতা চিত্রকলায় অর্জনীয় এবং কাব্যকলায় বর্জনীয়।'

প্রবন্ধের উপসংহারে তিনি নব্যতন্ত্রী লেখকদের পথ-নির্দেশ করেছেন। বস্তু-জ্ঞানের ভিত্তির ওপরে সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা করতে হবে। দ্বিতীয়ত, ভাবাবেগে আত্মহারা না হয়ে কলাসৃষ্টির ক্ষেত্রে আত্মসংযম-অভ্যাসের প্রয়োজনীয়তা আছে। তৃতীয়ত, কলাসৃষ্টির পক্ষে অধ্যবসায় ও প্রযত্ন চাই, কারণ 'অবলীলাক্রমে রচনা করা আর অবহেলাক্রমে রচনা করা' এক ব্যাপার নয়। এখানে মনে রাখতে হবে যে শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রমথ চৌধুরী 'স্বভাব-কবিত্ব'-কে আমল দেন নি, কারণ তিনি প্রেরণাবাদী ছিলেন না। আর্টচর্চাও যে যত্ন ও পরিমার্জনার ওপর নির্ভরশীল একথা তিনি বহুবার বলেছেন। ফরাসী শিল্পীরা তাঁকে এ মন্ত্রের দীক্ষাও দিয়েছিলেন। সর্বশেষে, বলেছেন যে, বাহ্যজগৎ এবং অন্তর্জগৎ —এই দুইকেই সমানভাবে মূল্য দিতে হবে!

'বঙ্গ সাহিত্যের নবযুগ' মনন-প্রধান রচনা—লঘুচালের লেখা নয়। দুরূহ বস্তুর অন্তঃপ্রকৃতিকে বিশ্লেষণ করার মধ্যে চৌধুরী মহাশয় চিরকালই আনন্দ পেয়েছেন। লঘুভঙ্গিতেই তিনি সুরু করেছিলেন, কিন্তু শেষের দিকে দুরূহ চিন্তার গাম্ভীর্য সঞ্চারিত হয়েছে। প্রবন্ধ বা ব্যক্তিগত লঘু আলোচনা—কোন পর্যায়েই রচনাটিকে অন্তর্ভূ'ত করা সম্ভব নয়। প্রসঙ্গগুলির মধ্যেও অনেকখানি করে ফাঁক আছে। যে নিটোল ও নিরন্ধ্র রূপ প্রমথ চৌধুরীর অধিকাংশ রচনার বৈশিষ্ট্য, এখানে তার ব্যতিক্রম ঘটেছে। এখানে লেখকের বক্তব্যের গভীরতা ও মৌলিক চিন্তাশীলতার যথেষ্ট পরিচয় আছে। কিন্তু অন্যান্য রচনায় যেমন বিষয়ান্তরের আলোচনা মূল বক্তব্যকেই আলোকিত করেছে, এখানে

তেমন নয়—এখানে বিষয়ান্তর বক্তব্যকে মাঝে মাঝে অস্পষ্ট ক'রে তুলেছে। বীরবলী কথা-রসিকতার দীপ্তিও এখানে কম, কখনও কখনও বৈচিত্র্যহীন ব'লে মনে হয়। সুতরাং বক্তব্যের গভীরতা থাকলেও রচনাটির মধ্যে শিল্পগত দুর্বলতা আছে। যে প্রসঙ্গান্তরের অবতারণা অন্যত্র বীরবলী রচনার ভূষণ, এখানে তা-ই ত্রুটি—'গুণ সব দোষ হৈল বিষ্টার বিষ্টায়।'

'বর্তমান বঙ্গসাহিত্য'-কে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধ বলা যায়—বিষয়বস্তু ও রচনা-পদ্ধতি দুদিক থেকেই। বর্তমান বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন দিক সম্পর্কেই তিনি কিছু কিছু আলোচনা করেছেন। সমকালীন সাহিত্য-বিচারের মধ্যে যে সমস্ত বিচার-বিভ্রান্তি দেখা যায়, তার কথা তিনি সর্বপ্রথম উল্লেখ করেছেন। আধুনিক সাহিত্যের ওপর যাবতীয় দোষারোপ ক'রে কোন কোন সমালোচক উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্য-সৃষ্টির গুণকীর্তন করতে পঞ্চমুখ হন। তাঁদের মতে সাহিত্যের সত্যযুগ অন্তর্ধান করেছে উনিশ শতক শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই। কিন্তু এ ধরণের সরাসরি মন্তব্য চৌধুরী মহাশয়ের মোটেই মনঃপুত নয়—কারণ তিনি 'ইভলিউশন-বিশ্বাসী'—আগামী দিনের নূতন সম্ভাবনার দিকে তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ। লেখক পরিহাসের সুরে এই জাতীয় সমালোচকদের মতামত আলোচনা করেছেন। গত শতাব্দীর লেখকেরা দীর্ঘকালের পঠন-পাঠন ও আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে মোটামুটি একটি স্থান করে নিয়েছেন। আর যাঁরা খ্যাতনামা তাঁদের তো কোন কথাই নেই, তাঁদের অচল-প্রতিষ্ঠ আসন থেকে নামানো সম্ভব নয়। সুতরাং একালে যাঁদের খ্যাতি এখনও সুপ্রতিষ্ঠিত নয়, সুবিধাবাদী সমালোচকদের জজিয়তি তাঁদের ওপরেই। জন্মাবধি যাঁদের সুখ্যাতি শুনে মনের ভেতর একটি বদ্ধমূল সংস্কার গ'ড়ে উঠেছে, নূতন ক'রে ভেবে দেখার প্রবৃত্তি সেখানে কমই হয়। তা ছাড়া পুরানো সাহিত্যের পুনর্বিচারের দায়িত্বই বা কজন নিতে পারেন? সুতরাং সমালোচনা যখন করতে হবে তখন নব-সাহিত্যেরই দোষ কীর্তন করাই বিধেয়—চৌধুরী মহাশয়ের মতে বর্তমান-কালের সমালোচকদের এইখানেই প্রধানতম ত্রুটি।

নব-সাহিত্যের বিরুদ্ধে যে সমস্ত অভিযোগ করা হয়, সেগুলি তিনি বিচার করে দেখেছেন—অভিযোগগুলি এই যে, সে সাহিত্য 'অপর্যাপ্ত ও সস্তা, বিশেষত্বহীন, ও প্রতিভাহীন চুটকি ও নকল।' এ যুগে সাহিত্যের ক্ষেত্র লোকে লোকারণ্য এবং এ জনতার মধ্যে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই আছেন। স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের ফলে মহিলা-সাহিত্যিকের সংখ্যাও

বেড়ে চলেছে। সাহিত্যক্ষেত্রে যোগদানকারীদের সংখ্যাধিক্য নিঃসন্দেহে আশার কথা। এর থেকে আর একটি বিষয়ও প্রমাণিত হয় যে একালের বাঙালীদের আত্মপ্রকাশের ব্যাকুলতা তীব্রতর হয়েছে। তবে সব লেখাই যে সমানভাবে বেঁচে থাকবে এ কথা বলা যায় না। নব-সাহিত্য বৈচিত্র্যহীন—এই অভিযোগের উত্তর দিতে গিয়ে লেখক একটি চমৎকার কথা বলেছেন। তাঁর মতে আমাদের সাহিত্যের বৈচিত্র্যহীনতার মূল কারণ এই যে আমাদের জীবনেই বৈচিত্র্য নেই। তা ছাড়া, সাহিত্য-চর্চার এই বিস্তৃতির আর একটি সুফল ফলেছে এই যে, একদল পাঠকও তৈরী হয়ে উঠেছেন।

এ যুগের সাহিত্যের বিরুদ্ধে চুটকিত্বের অপবাদকে লেখক একটু বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন। একালের সাহিত্যে যে অতিকায় কিছু রচিত না হয়ে 'ছোটগল্প, খণ্ড কবিতা, সংক্ষিপ্ত সমালোচনা ও প্রক্ষিপ্ত দর্শন' লেখা হচ্ছে, এইটিই হলো সমালোচকদের প্রধান অভিযোগ। বীররসাশ্রিত মহাকাব্য না লিখলে যে তা সাহিত্য হবে না, এমন কোন কথা নেই। প্যারাডাইস লস্টের পর ইংরেজী সাহিত্যে মহাকাব্য লেখা হয় নি, ফরাসী ভাষায় আদৌ মহাকাব্য লেখা হয় নি—কিন্তু তার জন্য সাহিত্যের গৌরব বিন্দুমাত্র কমে নি। সমালোচকেরা ব'লে থাকেন যে এ যুগে অসাধারণ প্রতিভাবান সাহিত্যিক জন্মান নি। এর জন্য চৌধুরী মহাশয় লেখকদের দায়ী না করে দায়ী করেছেন বর্তমান যুগের পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে। গত শতাব্দীতে একটি অনুকূল পরিবেশ ছিল—এক অপূর্ব সৌন্দর্যশালী ভাবার সঙ্গে উনিশ শতকের বাঙালীর পরিচয় ঘটে। নূতন ভাবের জোয়ার বাঙালীর রস-চেতনাকে প্রকৃতপক্ষে নূতন করে সৃষ্টি করেছিল—সেখানে 'প্রাক্-বৃটিশ যুগের বঙ্গসাহিত্যের কোনরূপ প্রভাব ছিল না।' কিন্তু বর্তমান কালে গত শতাব্দীর জোয়ার থেমে গিয়েছে, এখন সুরু হয়েছে ভাটা—'তার কারণ বাঙালি জাতির মনের কলে স্কট, মিলটন ও কঁৎ-এর চাবির দম ফুরিয়ে এসেছে।' রবীন্দ্রসাহিত্য একালের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য ব'লে নবযুগের সাহিত্যের আদর্শ হয়েছে —সমালোচকদের মতে এ যুগের সাহিত্যের এটিও নাকি একটি মস্ত অপরাধ।

সংস্কৃত, ফরাসী ও জার্মাণ সাহিত্য থেকে উদাহরণ দিয়ে প্রবন্ধকার দেখিয়েছেন যে পরের লেখার অনুকরণ ও অনুসরণ করা সর্বত্র যে বিফল, এ কথা বলা যায় না। রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ বা অনুসরণ করেছে ব'লে নব যুগের সাহিত্যকে উপেক্ষা করা সঙ্গত নয়। নবযুগের কাব্য আঙ্গিকের দিক থেকে গত

শতাব্দীর কাব্যের চেয়ে অনেক বেশী পরিণত। ভাষা, ছন্দ, শব্দ-গ্রন্থন প্রভৃতি দিক থেকে এ যুগের কবিরা অনেক বেশী শিল্পকৃতিত্ব দেখিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের কল্যাণে আর যাই হোক না কেন, আমাদের শিল্পসৃষ্টি অনেকখানি পূর্ণতা লাভ করেছে।

যুগধর্মের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মহাকাব্যের দিন চলে গিয়েছে। এ যুগে মহাকাব্য রচনা সম্ভব নয়। মহাকাব্যের যুগ শুধু আমাদের দেশেই যে অন্তর্হিত হয়েছে এমন নয়, ইউরোপীয় সাহিত্যের দিকে লক্ষ্য করলেও আমরা একই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হব। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে যেমন একদিকে ছিল রামায়ণ-মহাভারতের মতো অতিকায় মহাকাব্য, তেমনি অন্যদিকে ছিলেন অমরু-ভর্তৃহরির মতো দু'চার ছত্রের কবিতার লেখক। অবশ্য এ যুগের সাহিত্যচর্চার মাধ্যম হচ্ছে গদ্য। অজস্র ছোটগল্প এ যুগে রচিত হচ্ছে। কিন্তু এ যুগেও ইউরোপে গদ্যে মহাকাব্য রচিত হচ্ছে—বিপুলায়তন উপন্যাসগুলিই এ যুগের মহাকাব্য। বর্তমান বাংলাসাহিত্যে ছোটগল্পের অজস্রতা লক্ষণীয়। কিন্তু ইউরোপর তুলনায় উপন্যাস-সাহিত্যে আমাদের দুর্বলতা সুপ্রকট। লেখকের মতে এ দৈন্য ইউরোপীয় সাহিত্যের তুলনায়, কিন্তু গত শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের তুলনায় নয়। তা ছাড়া তিনি আর একটি মূল্যবান কথা শুনিয়েছেন, 'আমাদের সঙ্কীর্ণ-পরিসর বৈচিত্র্যহীন জীবন ছোটগল্প রচনারই অধিকতর অনুকূল, উপন্যাস রচনার পক্ষে এ জীবনের পরিসর অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ।' লেখক উপসংহারে বাইবেল থেকে একটি সুভাষিত উদ্ধার ক'রে বর্তমান বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশার বাণী শুনিয়েছেন, 'এ যুগে কোন অসাধারণ প্রতিভাশালী উপন্যাসকার না থাকলেও এমন অনেক গল্প লেখা হ'য়ে থাকে যা গত শতাব্দীর দ্বিতীয় শ্রেণীর লেখকের কলম হতে বেরত না। সুতরাং নবসাহিত্যে যদি chosen few থাকেন, তাহলে আমাদের ভগ্নোদ্যম হবার কারণ নেই।'

'বর্তমান বঙ্গসাহিত্য' প্রবন্ধটির মধ্যে পূর্ণাঙ্গ অথচ অনেক গভীর বক্তব্য আছে। প্রবন্ধকার বর্তমান সাহিত্যের অনেক দোষ-ত্রুটি ধরিয়ে দিয়েছেন, তথাপি একালের বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর প্রত্যাশার অভাব নেই। অন্যদিকে সমসাময়িক সাহিত্য সম্পর্কে সমালোচকদের মতামতগুলিও খুব ভালভাবেই বিচার করেছেন। সমসাময়িক সাহিত্য সম্পর্কে শুধু এ দেশেই নয়, অন্যান্য দেশেও এই জাতীয় উন্নাসিকবৃত্তি লক্ষ্য করা যায়।

জয়েসের 'ইউলিসিস্' বেরবার পর একদল লোক যেমন একে যুগান্তকারী সৃষ্টি হিসাবে অভিনন্দনিত করেছিলেন, তেমনি আর একদল বলেছিলেন যে এ বই ওয়েস্ট-পেপার বাস্কেটে ফেলে দেওয়া উচিত। সমসাময়িক সমালোচকদের হাতে যুগান্তকারী সাহিত্যিকদেরও কম নিগ্রহ ভোগ করতে হয় নি।[৬৩]

উনবিংশ শতাব্দীর সঙ্গে নবযুগের সাহিত্যের পারিপার্শ্বিকের তুলনাটিও অসঙ্গত নয়। জাতীয় জীবনের জোয়ার-ভাটা ও ইংরেজী সাহিত্যের যে সম্পর্ক-বৈচিত্র্যের কথা এখানে আলোচিত হয়েছে, তার যাথার্থ্যও অস্বীকার করা যায় না। উনবিংশ শতাব্দীতে পশ্চিমী সাহিত্য ও সংস্কৃতি বাঙালীর মানস-জীবনে যে জোয়ারের সৃষ্টি করেছিল, পরবর্তী কালে সে জোয়ারের প্রাবল্য অন্তর্হিত হয়েছে। এলিজাবেথীয় ইংল্যাণ্ডের উচ্ছ্বসিত জীবন-চেতনা যে প্রবল সৃষ্টি-সাফল্যের উন্মাদনা সৃষ্টি করেছিল, পরবর্তী শতাব্দীতে তার ঢেউ বহু দূরে গিয়েছে দেখা যায়—যেখানে উচ্ছ্বসিত জোয়ার ছিল, সেখানে দেখা দিয়েছে রিক্ত বালুচরের বিলুপ্ত-বৈভব মূর্তি। সুতরাং প্রবন্ধকার উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর যে কালগত ও পারিপার্শ্বিকগত ব্যবধানের কথা বলেছেন তাও অস্বীকার করা যায় না। উনবিংশ শতাব্দীর সেই প্রাথমিক উচ্ছ্বাসের সঙ্গে পরবর্তী যুগের তুলনা ক'রে বহুকাল আগেই রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'আমরা কিশোরকালে বঙ্গসাহিত্যের মধ্যে ভাবের সেই নবসমাগমের মহোৎসব দেখিয়াছিলাম, সমস্ত দেশ ব্যাপ্ত করিয়া যে একটি আশার আনন্দ নূতন হিল্লোলিত হইয়াছিল তাহা অনুভব করিয়াছিলাম—সেইজন্য আজ মধ্যে মধ্যে নৈরাশ্য উপস্থিত হয়। মনে হয় সেদিন হৃদয়ে যে অপরিমেয় আশার সঞ্চার হইয়াছিল তদনুরূপ ফললাভ করতে পারি নাই। সে জীবনের বেগ আর নাই।'[৬৪]

নব-কবিদের কাব্যের রচনা-পারিপাট্য ও আঙ্গিক-পরিচ্ছন্নতার কথা প্রবন্ধকার উল্লেখ করেছেন। হেমচন্দ্রের 'কবিতাবলী' বা নবীনচন্দ্রের 'অবকাশ-রঞ্জিনী'-র তুলনায় রবীন্দ্র-যুগের কবিদের শিল্পজ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্বের কথা তিনি বলেছেন। প্রমথ চৌধুরীর এই মন্তব্যের মধ্যে যথেষ্ট সাহসিকতার পরিচয় আছে। শিল্পাংশ ও কল্পনাশক্তি—দুদিকেই হেমচন্দ্রের কবিতার দুর্বলতা ছিল। মহাকাব্যের কৃত্রিম অনুকরণ ছাড়া মধুসূদনের কোন মহৎ উত্তরাধিকার সেখানে ছিল না। অধিকন্তু তাঁর কাব্যরীতি অনেক ক্ষেত্রেই গদ্যাত্মক ব'লে মনে হয়। খণ্ডকবিতায় প্রকৃতি ও দেশপ্রেমিকতার সুর বিদ্যমান, কিন্তু সেখানেও শিল্পগত দুর্বলতা পরিস্ফুট। নবীনচন্দ্রের কবিশক্তি ছিল, কল্পনা-

প্রসারতা ও আবেগ-প্রবণতাও ছিল, কিন্তু সে তুলনায় আবেগকে সংহত করার শক্তি তাঁর ছিল না। অসংযত আবেগ, একটি বেদনা-বিহ্বল অবসাদ, বিফল-স্বপ্নের হাহাকার 'অবকাশ-রঞ্জিনীর' দিগন্তে অস্পষ্ট কুয়াসার মত ছড়িয়ে পড়েছে, রূপবান হ'তে পারে নি।[৬৫] বাংলাকাব্যের রূপকরণের ইতিহাস তখনও পূর্ণাঙ্গ হ'য়ে উঠতে পারে নি। মাত্রাবৃত্ত ছন্দের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ যেমন নূতনত্ব এনেছেন, তেমনি স্বরাঘাত-প্রধান ছন্দকেও দিয়েছেন অনন্যসাধারণ লাবণ্য ও কৌলীন্য।

রবীন্দ্র-প্রভাবিত বাংলাকাব্য শব্দ-গ্রন্থন, ভাষা-চর্যা, ছন্দ-সুষমা, স্তবক-বিন্যাস প্রভৃতি বিষয়ে বিস্ময়কর অগ্রগতি লাভ করেছে। করুণানিধান, সত্যেন্দ্রনাথ, যতীন্দ্রমোহন, কুমুদরঞ্জন, মোহিতলাল, যতীন্দ্রনাথ, কালিদাস রায়—এঁদের প্রত্যেকেরই কাব্যে কলাবিধির সযত্ন ও সুকর্ষিত বিন্যাস লক্ষণীয়। কাব্য-ক্ষেত্রে এঁরা সকলেই সমান দক্ষতা দেখিয়েছেন, এ কথা বলা যায় না, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অজস্র দাক্ষিণ্যে বাংলাকাব্যে যে শিল্প-সাফল্যের অপরূপ জ্যোতি ছড়িয়ে পড়েছে, তারই আলোয় এই পর্বের কাব্যের ইতিহাস অনুরঞ্জিত হ'য়ে উঠেছে। এখানে মনে রাখতে হবে যে প্রমথ চৌধুরী হেম-নবীনের কবিতার সঙ্গে নবযুগের কবিদের শিল্প-বোধেরই তুলনা করেছেন, অন্য কিছুর নয়।

সর্বশেষে, চৌধুরী মহাশয় বর্তমান যুগে মহাকাব্যের বিলুপ্তি, কথা-সাহিত্যের প্রাদুর্ভাব, ইউরোপীয় সাহিত্যের তুলনায় বাংলা সাহিত্যের গল্প-উপন্যাসের সাফল্যের তারতম্য ও তার কারণ সম্পর্কে যে সমস্ত মন্তব্য করেছেন, তাও বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তাঁর আলোচনায় তিনি একটি মৌলিক প্রশ্ন তুলেছেন—মহাকাব্য যুগপ্রভাবে লুপ্ত হ'লেও তার স্থান অধিকার করেছে উপন্যাস—একালের গদ্যরচিত মহাকাব্য।[৬৬] প্রাচীনকালের মহাকাব্য একাধারে গীতিকাব্য, উপন্যাস, নাটক, খণ্ডচিত্র প্রভৃতির বিচিত্র-সংমিশ্রণ। শুধু তাই নয় মহাকাব্যে সামাজিক, রাজনৈতিক, নৈতিক—এমনি ধরণের তত্ত্ব ও তথ্য পরিবেশন করা হ'ত। মহাকাব্যের মৃত্যু হয়েছে বটে, কিন্তু তার স্থান অধিকার করেছে উপন্যাস—এপিকের মতো উপন্যাসও এই বহু-বিচিত্রের সমন্বয়ে গ'ড়ে উঠেছে।

কথাসাহিত্য সম্বন্ধে তিনি যে মন্তব্য করেছেন, তাও বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। ইউরোপের তুলনায় আমাদের কথাসাহিত্যের দীনতার কথা তিনি স্বীকার

করেছেন। এ দৈন্য প্রধানত উপন্যাসের দিক থেকে। ছোটগল্পের ক্ষেত্রে বাংলাসাহিত্যের বৈশিষ্ট্যকে তিনিঅস্বীকার করেন নি। কিন্তু নভেলের ক্ষেত্রে বাংলাসাহিত্যে দৈন্যের কথাও তিনি স্পষ্টভাবেই বলেছেন। প্রমথ চৌধুরীর প্রশ্ন-চঞ্চল জিজ্ঞাসা ও অনুসন্ধিৎসা এর কারণকেও অনুসন্ধান করেছে। ইউরোপীয় জীবনের নানামুখী বৈচিত্র্য, বিপুলায়তন প্রসারতা, তরঙ্গ-মুখর আবেগ ও নভোস্পর্শী উদাত্ততা তাদের উপন্যাসকে এক অপূর্ব প্রাণৈশ্বর্যে দীক্ষিত করেছে। আমাদের সঙ্কীর্ণ বৈচিত্র্যহীন জীবনের মধ্যে সেই অপরিসীম প্রসারতা কোথায়? এই কারণেই সম্ভবত উপন্যাসের চেয়ে ছোটগল্পের ক্ষেত্রই এখানে প্রশস্ততর।[৬৭] প্রমথ চৌধুরী টলস্টয়ের প্রসঙ্গ তুলেছেন। টলস্টয়ের 'ওয়ার অ্যাণ্ড পীস' কিম্বা 'অ্যানা ক্যারেনিনা' জাতীয় উপন্যাস বাংলায় রচিত হয় নি সত্য, কিন্তু তার জন্য বাংলা ছোটগল্প মোটেই পশ্চাৎপদ নয়—এর প্রমাণ অতি আধুনিক বাংলা সাহিত্যেও পাওয়া যায়। তবে বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের কথাসাহিত্য ছাড়া, উনিশ শতকের বাংলা কথাসাহিত্যের তুলনায় বিংশ শতাব্দীর কথা সাহিত্য যে সমৃদ্ধ হয়েছে এ বিষয় কোন সন্দেহ নেই। প্রবন্ধটি বিষয়গৌরবে সমৃদ্ধ ও প্রসাদগুণান্বিত। প্রমথ চৌধুরী এই গুণেরই চর্চা করেছেন, কিন্তু সর্বত্র সমান সার্থক হয়েছেন, একথা বলা যায় না। যে কয়েকটি জায়গায় এই গুণ চরমসিদ্ধি লাভ করেছে, আলোচ্য প্রবন্ধটি তার মধ্যে অন্যতম।

প নে র

প্রমথ চৌধুরীর পরিমার্জিত রুচিজ্ঞান সবচেয়ে বেশী পরিস্ফুট হয়েছে তাঁর রসতত্ত্ব সম্পর্কিত আলোচনায়। সম্ভবত, রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে Aesthetics বা রসতত্ত্বকে জীবনচর্যার সঙ্গে আর কোন লেখক এমনভাবে মিলিয়ে দিতে পারেন নি। রূপ-রস-চর্চাকে তিনি জীবনের মূলে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন যে, তাঁর গল্পগুলির মধ্যে এর ছাপ পড়েছে। প্রমথ চৌধুরী ব্যাপকতর অর্থে 'জীবন-শিল্পী' নন, কিন্তু রূপজ্ঞানের প্রথম শ্রেণীর শিল্পী। যে জগৎ স্বচ্ছন্দে তাঁর এই রূপজ্ঞানের আলোকচক্রে স্পন্দিত হ'তে পারে, সেইটুকুই তিনি অবলম্বন করেছেন। তাঁর ছোটগল্পের ক্ষেত্রে এই সত্যটি বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাঁর মনের পদ্মরাগ-দ্যুতি সবচেয়ে বেশী পরিস্ফুট হ'য়েছে তাঁর 'রূপের কথা' [বীরবলের হালখাতা] রচনাটিতে।

রচনাটি আরম্ভ করেছেন নিতান্ত হাল্‌কা ভাবে, আমাদের যে রূপজ্ঞানের অভাব—এই আক্ষেপ নিয়ে। কিন্তু রূপ-বিমুখদের বিদ্রূপ করতেও ছাড়েন নি। পোষাকে-পরিচ্ছদে, গৃহসজ্জায় কোথায়ও আমাদের রূপজ্ঞান পরিস্ফুট নয়। প্রমথ চৌধুরীর মতে আমাদের এই রূপান্ধতার কারণ আধ্যাত্মিকতার আতিশয্য। রূপজ্ঞানের মূলে আছে ইহ-চেতনা, আর, একদল রূপ-বিরোধী আছেন, যাঁরা রূপচর্চাকে পাপ ব'লে মনে করেন—যেন এক জাতীয় নৈতিক অপরাধ। রূপ জিনিষটিই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য—যাঁরা অতীন্দ্রিয় জগতকে একমাত্র সত্য ব'লে ধরে নিয়েছেন, তাঁদের দ্বারা রূপ-সাধনা অসম্ভব—'কেন না, অতীন্দ্রিয় জগতে রূপ নিশ্চয়ই অরূপ হ'য়ে যায়।'

লেখক অন্যান্য দেশের উদাহরণ নিয়েছেন। প্রথমেই বলেছেন বর্তমান ইউরোপের কথা, 'বর্তমান ইউরোপ সুন্দরকে সত্যের চাইতে নীচে আসন দেয় না, সে দেশে জ্ঞানীর চাইতে আর্টিস্টের মান্য কম নয়। তারা সভ্য সমাজের দেহটাকে—অর্থাৎ দেশের রাস্তাঘাট বাড়ীঘরদোর মন্দির-প্রাসাদ, মানুষের আসনবসন, সাজসরঞ্জাম ইত্যাদি—নিত্য নূতন ক'রে গ'ড়ে তোলবার চেষ্টা করছে।' ইউরোপীয় সভ্যতার যে কুৎসিত দিক আছে, সে সম্পর্কেও লেখক সচেতন—তিনি এই জাতীয় বিকৃতিকে বলেন লোভসর্বস্ব 'কমার্শিয়ালিজম্'। চীন-জাপানের অসাধারণ রূপজ্ঞানের কথা তিনি উল্লেখ ক'রে স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে বলেছেন, 'মোঙ্গলজাতিকে ভগবান রূপ দেন নি, সম্ভবত সেই কারণে সুন্দরকে তাদের নিজের হাতে গ'ড়ে নিতে হয়েছে'। গ্রীকো-ইতালীয় সভ্যতা ও প্রাচীন ভারতবর্ষ—দু'য়েরই রূপচর্চার ইতিহাস জগদ্বিখ্যাত। লেখক সংস্কৃত সাহিত্য অবলম্বন ক'রে প্রাচীন ভারতবর্ষের রূপচর্চার পরিচয় দিয়েছেন। সংস্কৃত সাহিত্যে রমণীর রূপবর্ণনা সর্বত্র পরিব্যাপ্ত—প্রকৃতিকেও তাঁরা রমণী-দেহের সৌন্দর্যের মাধ্যমেই দেখেছেন। 'প্রকৃতিকে তাঁরা সুন্দরী রমণী-হিসেবেই দেখেছিলেন। তার যে অংশ নারী-অঙ্গের উপমেয় কি উপমান নয়, তার স্বরূপ হয় তাঁদের চোখে পড়ে নি, নয় তা তাঁরা রূপ ব'লে গ্রাহ্য করেন নি।' আর্যরা ছিলেন রূপদেবতার পূজারী—তাই তাঁদের দেবতারা ছিলেন অসাধারণ সৌন্দর্যের অধিকারী।

সভ্যতার সঙ্গেও সৌন্দর্যের একটি ঘনিষ্ঠ সংযোগ আছে। সমাজের রূপটি যেখানে সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন, সেখানে সভ্যতারও পূর্ণ পরিণতি। সমাজদেহে যখনই নবশক্তি সঞ্চারিত হয়েছে, তখনই শিল্প-সৌন্দর্যে ও নানা রূপকরণে

তার বহিরঙ্গও অলঙ্কৃত হ'য়ে উঠেছে। প্রমাণ স্বরূপ লেখক বৌদ্ধযুগ ও বৈষ্ণব-যুগের কথা বলেছেন। এর পরেই লেখক বর্তমান সাহিত্যের প্রসঙ্গ তুলেছেন। বাস্তববাদীরা বলেছেন যে, যে সাহিত্যে ফুলের কথা, জ্যোৎস্নার কথা থাকে তা জীবন-বিচ্ছিন্ন একটি স্বপ্ন-বিলাস মাত্র। তাঁরা 'অপ্রয়োজনের আনন্দ'কে সাহিত্যের উপাদান ব'লে স্বীকার করতে প্রস্তুত নন—কারণ তা উদরান্নের সমস্যা মেটায় না। বিরুদ্ধবাদীদের এই সমস্ত যুক্তির জবাব দিতে গিয়ে তিনি শ্লেষাত্মক ভঙ্গিতে বলেছেন, 'কিন্তু এই জ্যোৎস্নাবিদ্বেষ থেকেই এঁদের প্রকৃত মনোভাব বোঝা যায়। এ রাগটা আসলে আলোর উপর রাগ। জ্ঞানের আলোক যখন আমাদের চোখে পুরোপুরি সয় না, তখন রূপের আলোক যে মোটেই সইবে না তাতে আর বিচিত্র কি'। চৌধুরী মহাশয় জ্ঞানের বহু-বিচিত্র পথ পরিক্রমা করেছেন, তবু তিনি জ্ঞানের আলোর চেয়ে রূপের আলোর পক্ষপাতী, কারণ 'জ্ঞানের আলো শাদা ও একঘেয়ে' অথচ 'রূপের আলো রঙিন ও বিচিত্র।'

জৈব প্রয়োজনের মধ্যেই মানবজীবন সীমাবদ্ধ নয়। জৈবচেতনার উর্ধ্বে উঠতে গেলেই মানুষের পক্ষে রূপচর্চার প্রয়োজন, কারণ 'রূপজ্ঞানেই মানুষের জীবন্মুক্তি।' রূপজ্ঞানের কথা আলোচনা করতে গিয়ে তিনি যা বলেছেন, তাতে মনে হয় তিনি 'অপ্রয়োজনের আনন্দ'কে সমর্থন করেন। সত্য, শিব ও সুন্দরের মধ্যে শিবজ্ঞান আসে সবচেয়ে আগে, তারপর সত্যজ্ঞান এবং সর্বশেষে রূপজ্ঞান—কারণ রূপজ্ঞানটি হ'ল সবচেয়ে সূক্ষ্ম, অথচ এই জ্ঞানের সাধনা ক'রেই মানুষ তার মনোজীবনের পরমায়ু বাড়িয়ে তুলতে পারে। রূপজ্ঞানের সাধনা আমাদের মনোজগতকে উর্ধ্বলোকেই নিয়ে যায়। মানসিক দারিদ্র্যই আমাদের রূপান্ধ ক'রে রেখেছে।

প্রথম চৌধুরী 'রূপের কথা' রচনাটির মোটামুটি বক্তব্য নানাভাবে নানা প্রসঙ্গে বলেছেন। এ বিষয়ে তাঁর ধারণাগুলিকে একত্রিত ক'রে এখানে প্রকাশ করেছেন। প্রমথ চৌধুরীকে মনন-প্রধান সাহিত্যিক বলা হয়। এই জাতীয় বিশেষণ প্রয়োগ করা তাঁর পক্ষে মোটেই অসঙ্গত হয় নি, কারণ জীবন-ব্যাপী তিনি বিচিত্র জ্ঞান আহরণ করেছেন। তবু জ্ঞান-মার্গের পথিক বললে, তাঁর সম্বন্ধে সবটুকু বলা হয় না। জ্ঞান যেখানে রূপময় হ'য়ে ওঠে, নানাবর্ণে বিচিত্রিত হ'য়ে ওঠে—সেই জগতকেই তিনি সাধ্য ও কাম্য ব'লে মনে করেছেন। এই জন্যই তিনি জ্ঞানী হ'য়েও রসিক হ'তে পেরেছেন, অর্থাৎ

তাঁর পক্ষে এ দু'য়ের মধ্যে কোন বিরোধ ছিল না। তাঁর মতে জ্ঞান হচ্ছে আলোর মূল এবং রূপ হচ্ছে আলোর ফুল। মূল থেকে ফুলে তিনি অবলীলাক্রমে যাতায়াত করেছেন। 'রূপের কথা' রচনাটিতে তিনি 'রূপ'কে নিয়েছেন একটি বৃহত্তর ও প্রশস্ততর অর্থে। সচরাচর রূপজ্ঞানকে আমরা শিল্পসাহিত্যের প্রসঙ্গেই আলোচনা ক'রে থাকি, কিন্তু দৈনন্দিন জীবনচর্যার সঙ্গেও যে এই জ্ঞানটি কত গভীরভাবে সংযুক্ত তাও তিনি দেখিয়েছেন। রচনাটিতে বাক্-চাতুর্যের আতিশয্য নেই, শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কারের খেয়ালী খেলায় লেখক মেতে ওঠেন নি। এখানে লেখককে খুব বেশী পাওয়া যায়, কারণ এখানে তিনি যা বলেছেন, সবই তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের আচরণ —তাঁর বিদগ্ধ জীবনের রূপচর্চার স্বরূপ।

সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যে সঙ্গীত-সমালোচনার প্রসারতা লক্ষণীয়। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে সঙ্গীত-সমালোচনাও একটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ বিভাগ হিসেবে স্বীকৃত হচ্ছে। প্রমথ চৌধুরী যখন সঙ্গীত সম্পর্কে প্রবন্ধ লেখেন তখনও বাংলা সাহিত্যে এই জাতীয় আলোচনার শৈশব-লগ্ন বলা যায়। চৌধুরী বংশে কোনদিন সঙ্গীতচর্চা ছিল না, মাতুল পরিবারের কাছ থেকে সঙ্গীতপ্রিয়তা তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেন। 'আত্মকথা'য় তিনি সেকালের সঙ্গীতচর্চার একটি চমৎকার ছবি এঁকেছেন। সেকালের কৃষ্ণনগরের সাঙ্গীতিক পরিবেশের কথাও তিনি ব'লেছেন। ফলে বাল্যকাল থেকেই তাঁর গানের কান তৈরী হয়েছিল। তিনি বলেছেন, 'এ সব গানই গাওয়া হ'ত ওস্তাদী ঢংয়ে, ওস্তাদদের তালকর্তব বাদ দিয়ে। সেকালের বাংলা গানকে হিন্দীগানের অপভ্রংশ বলা যেতে পারে। একেবারে তান বাদ দিয়ে ঝিঁঝিট-খাম্বাজ গাওয়া যায় না; তাই ও-জাতীয় গান গাইতে হ'লে গলাকে একটু খেলাতে হয়, যা বেহাগ-বাগেশ্রীতে করতে হয় না। ফলে বাল্যকালে আমার কান তৈরী হয়েছিল বাঙ্গলায় যাকে বলে ওস্তাদী ঢংয়ের গানে। আজ পর্য্যন্ত আমার কানের সে অভ্যাস যায় নি। আমার কান সহজেই মার্গসঙ্গীতের অনুকূল।'[৬৮] জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীর সাঙ্গীতিক পরিবেশ বর্ণনা করতে গিয়েও তিনি তৎকালীন গানের আবহাওয়ার একটি সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন।

সবুজপত্রের অন্তত দুটি সংখ্যাকে সঙ্গীতের বিশেষ সংখ্যা বলা যায়।[৬৯] তারও আগে প্রমথ চৌধুরী দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গীত সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে দু'টি প্রবন্ধ লেখেন।[৭০] এই প্রবন্ধ থেকেই লেখকের সঙ্গীতশাস্ত্র সম্পর্কে

কতদূর অধিকার তা বেশ বোঝা যায়। দ্বিজেন্দ্রলাল সম্পর্কিত আলোচনায় একদিকে যেমন দ্বিজেন্দ্র-প্রতিভা সম্পর্কে তিনি অনেক মূল্যবান কথা বলেছেন, তেমনি সঙ্গীত-সমালোচক হিসাবেও তাঁর পরিচয় পাওয়া যায়। অক্ষয়চন্দ্র সরকার দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গীত সম্পর্কে বিরুদ্ধ সমালোচনা করেন। চৌধুরী মহাশয় সেই সমালোচনার উত্তর হিসাবে দ্বিজেন্দ্র-সঙ্গীতের বিস্তৃত আলোচনা ক'রে স্বমত প্রতিষ্ঠিত করেন। হাসির গানের সুরের কথা বলতে গিয়ে এর তিনি একটি মূলতত্ত্বের কথা বলেছেন, 'অনুরূপ কি বিরূপ, সকল রূপ সুরেই গুণী ব্যক্তির হাতে হাস্যরস সমান ফুটে উঠে। ৺দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর হাসির গানে সুর সম্বন্ধে যে উভয় পদ্ধতিই অবলম্বন করেছেন, তা' দু' চারটি উদাহরণের সাহায্যে সহজেই প্রমাণ করা যেতে পারে।'

অক্ষয়চন্দ্র সরকার দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গীতের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিলেন যে, তিনি সুরকে বিকৃত করেছেন। চৌধুরী মহাশয়ের সঙ্গীত-সমালোচনার মধ্যেও কতখানি ঔদার্য ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় প্রবন্ধটির শেষাংশে—যেখানে তিনি অক্ষয়চন্দ্রের মতকে সম্পূর্ণভাবে খণ্ডন করেছেন। 'হিন্দুসঙ্গীত' বলতে যে সঙ্কীর্ণ ধারণা ছিল, তিনি তা যুক্তির সাহায্যে খণ্ডন করেন। পরবর্তী কালে 'হিন্দু সংগীত' প্রবন্ধে তিনি এ বিষয় বিস্তৃত আলোচনা ক'রে বলছেন, '…দ্বিজেন্দ্রলাল আমাদের রাগরাগিণীর উপর হস্তক্ষেপ করায় তাঁর অহিন্দুত্বের পরিচয় দেন নি—পরিচয় দিয়েছেন শুধু তাঁর বাঙ্গালীত্বের।' দ্বিজেন্দ্রলালের সুরের বিলিতি ভঙ্গি সম্পর্কে তিনি যে আলোচনা করেছেন, তা-ও প্রণিধান-যোগ্য, '৺দ্বিজেন্দ্রলালের সুরের বিশেষত্ব এবং নূতনত্ব এই যে, সে সুরের ভিতর অতি সহজেই একটি বিলেতি চাল এসে পড়েছে। আমার মতে সঙ্গীত সম্বন্ধে ৺দ্বিজেন্দ্রলালের একটি বিশেষ কৃতিত্ব এই যে তাঁর প্রতিভার বলে আমাদের রাগরাগিণী বিলেতি চাল এত সহজে অঙ্গীকার করেছে যে তাঁর সুরের এই বিলেতি ভঙ্গি আমাদের কানে মোটেই বেখাপ্পা লাগে না। আমাদের দেশে ইতিপূর্বে দেশী গান-বাজনাকে বিলেতি ছাঁচে ঢালাবার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। বিলেতি concert-এর অনুকরণে আমাদের দেশে যে সব 'ঐক্যতান-গীত-বাদ্যের' রচনা করা হয়েছে তা শুনে যুগপৎ হাসি ও কান্না পায়। কারণ, এ সকল তানে আর যাই করা হ'য়ে থাক, দেশী ও বিলাতি সঙ্গীতের ঐক্যসাধন করা হয় নি।…৺দ্বিজেন্দ্রলাল যে নূতন ঢঙের নবসুরের সৃষ্টি করেছেন, সে সুর তাঁর মগ্ন-চৈতন্যে, দেশী ও বিলাতি সুরের নিগূঢ় মিলনে সৃষ্টি হয়েছে।'

সবুজপত্রের ঐ সংখ্যাতেই রবীন্দ্রনাথ 'সোনার কাঠি' নামক প্রবন্ধে সঙ্গীত সম্পর্কে অনেক কথা আলোচনা করেছেন—দ্বিজেন্দ্র-সঙ্গীত প্রসঙ্গ সেখানেও ছিল। ১৩২৩-এর আষাঢ় মাসের সবুজপত্রে প্রমথ চৌধুরী দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান সম্পর্কে আলোচনা করেন, অবশ্য সে প্রবন্ধটিকে সঙ্গীত-সমালোচনা না ব'লে সাহিত্য-সমালোচনা বলাই সঙ্গত। ঐ বছরের আশ্বিন ও কার্ত্তিক সংখ্যা একই সঙ্গে প্রকাশিত হয়। অধ্যাপক বিশ্বপতি চৌধুরী হিন্দু-সঙ্গীত সম্পর্কে তাঁর মতামত জানিয়ে যে পত্র লেখেন এবং প্রমথ চৌধুরী হিন্দু সঙ্গীত নাম দিয়ে তার যে উত্তর দিয়েছেন, তা ঐ সংখ্যাতে একত্র ছাপা হয়। তা ছাড়া ঐ সংখ্যাতেই অমরবন্ধু গুহের 'বাংলার গান' ও সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রাগ ও মেলোডি' প্রবন্ধ দুইটিও প্রকাশিত হয়। মোটকথা ঐ মূল্যবান সংখ্যাটিকে সবুজপত্রের 'সঙ্গীত-সংখ্যা'ও বলা যায়। ঐ বছরের পৌষ-সংখ্যায় বীরবলের 'সুরের কথা' ও ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর 'সঙ্গীত-পরিচয়' প্রকাশিত হয়। সুতরাং সঙ্গীত-সম্পর্কিত নানা আলোচনার ও বিচার-বিতর্কের দিক থেকেও সবুজপত্রের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে।

'হিন্দুসংগীত' প্রবন্ধে প্রমথ চৌধুরী হিন্দুসঙ্গীতের স্বরূপ নির্ণয় করার চেষ্টা করেছেন। একদল বলেন হিন্দুস্থানী সঙ্গীতই হিন্দুসঙ্গীত কিন্তু এর প্রবল প্রতিবাদ করেন দাক্ষিণাত্যের সঙ্গীতচার্যেরা – তাঁরা বলেন যে উত্তর ভারতের সঙ্গীতের বিশুদ্ধি নেই, কারণ এ সঙ্গীত 'যবনদোষে দুষ্ট' হয়েছে। অন্যদিকে মুসলমান ওস্তাদজীরাও রাগরাগিণীকে তাঁদের 'ঘরানা চিজ' বলে থাকেন। সুতরাং এ বিষয় মতানৈক্যের অবকাশ আছে। রাগরাগিণীর শুদ্ধাশুদ্ধি নিয়ে ওস্তাদ মহলে যে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে, তাতে ধারণা হওয়া স্বাভাবিক যে 'মিশ্র হ'লেই বুঝি সুরের সর্বনাশ হয়।' চৌধুরী মহাশয় মনে করেন যে এ জাতীয় দুশ্চিন্তা সম্পূর্ণ অমূলক, কারণ 'এই মিশ্র সুরের উপরেই আমাদের সংগীতের বৈচিত্র্য ও ঐশ্বর্য প্রতিষ্ঠিত।'

মার্গ-সঙ্গীতের মতো কীর্তন, বাউল, সারি, জারি প্রভৃতিকেও তিনি হিন্দুসঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তিনি আশা করেন যে 'কালক্রমে আমাদের এই দেশী-সংগীত হয়ত এক অপূর্ব মার্গসংগীতে পরিণত হবে।' অবশ্য আলোচ্য প্রবন্ধে তিনি প্রধানত মার্গসঙ্গীত সম্বন্ধেই আলোচনা করেছেন। আজকাল মার্গসঙ্গীতের আদর ক্রমাগত ক'মে আসছে। লেখকের মতে শ্রোতা ও গায়ক—দু'দলই এর জন্য দায়ী। গায়কদের 'তালের ডন-

বৈঠকে'র আতিশয্য ধ্রুপদের গাম্ভীর্য নষ্ট ক'রে ফেলে। খেয়ালীরাও তালের অপপ্রয়োগ ও দুষ্টপ্রয়োগ ক'রে থাকেন। তিনি পরিহাস-তরলকণ্ঠে খেয়ালীদের ম্যানারিজমের পরিচয় দিয়েছেন, 'এমন খেয়ালীও দুষ্প্রাপ্য নয়, যাঁদের একটি তান বের করতে কণ্ঠের প্রসব বেদনা উপস্থিত হয়। কেউ কেউ বা তান গাঁজার ধোঁয়ার মত নাক দিয়ে ছাড়তে বাধ্য হন।' এর ফলে সঙ্গীতজ্ঞরা বিরক্ত হন, আর যাঁরা গান জানেন না, তাঁরা পরিহাস করেন।

দ্বিতীয়ত, আমাদের দেশের অধিকাংশ গুণী অল্পবিস্তর pedant; তাঁরা সঙ্গীতের বিশুদ্ধির দোহাই দিয়ে তার অস্থি-কঙ্কাল নিয়ে নাড়াচাড়া করেন। তৃতীয়ত, আমাদের দেশে স্বরলিপি না থাকার জন্যও ওস্তাদে ওস্তাদে এত মারামারি। স্বরলিপি থাকার জন্য ইউরোপীয় গীতিকারদের এ বিপদে পড়তে হয় নি। তা ছাড়া আমাদের মার্গসঙ্গীতে দীর্ঘকালব্যাপী নূতন রাগরাগিণীর সৃষ্টি হয় নি—পুরাতনের পুনরাবৃত্তি ছাড়া নূতন কিছুই হচ্ছে না। চৌধুরী মহাশয়ের মতে গায়ককে পণ্ডিত না হ'য়ে আর্টিস্ট হতে হবে।

মার্গসঙ্গীতের এই অনাদরের জন্য শ্রোতারাও কম দায়ী নন—সঙ্গীত-রসাস্বাদনের জন্য এক জাতীয় 'মিউজিক্যাল ফিলিং' দরকার। রবীন্দ্রনাথ তার 'গান-ভঙ্গ' কবিতায় সত্যিকথাই বলেছেন—'একাকী গায়কের নহে তো গান, গাহিতে হবে দুইজনে'। মার্গসঙ্গীতের চেয়ে দেশী-সঙ্গীত অনেক বেশী জনপ্রিয়। সচরাচর ধারণা এই যে মার্গসঙ্গীত দেশী-সঙ্গীতের চেয়ে কঠিন, এইজন্যই দেশী-সঙ্গীতের জনপ্রিয়তা এতবেশী। কিন্তু চৌধুরী মহাশয়ের মতে এর কারণ হ'ল দেশী-সঙ্গীত কথা-প্রধান এবং 'জন-সাধারণের মতে গান কাব্যেরই একটি অঙ্গ'। শুধু মার্গসঙ্গীতকে কঠিন বললে হবে না, অন্য সকল আর্টের চেয়ে গানে টেকনিকের প্রাধান্য অনেক বেশী এ কথাও মনে রাখতে হবে। এই টেকনিক যাঁর আয়ত্ত নেই তাঁর পক্ষে সঙ্গীতের রসোপলব্ধি হওয়াই দুরূহ—সমস্ত উপাদানের জড়তাকে অতিক্রম করার নামই টেক্‌নিক্।

যাঁরা সঙ্গীতকে আর্ট হিসেবে না দেখে সায়ান্স হিসেবে দেখতে চান, তাঁদের পক্ষেও সঙ্গীতের পূর্ণ রসোপলব্ধি ঘটা সম্ভব নয়। প্রবন্ধের শেষদিকে তিনি মার্গসঙ্গীত সম্পর্কে অনাদরের কারণগুলির একটি সংক্ষিপ্ত-সার তৈরী করেছেন, 'শ্রোতাদের আলস্য ও গায়ক-বাদকদের ব্যায়াম, এই দুয়ের প্রসাদে মার্গসংগীত ঘুমিয়ে না থাক—ঝিমিয়ে পড়েছে।' সর্বশেষে, মার্গসঙ্গীতের ভবিষ্যতের কথা তিনি বলেছেন। নানাকারণে মার্গসঙ্গীত ঝিমিয়ে পড়েছে। কেউ কেউ মনে

করেন বিলিতি সঙ্গীতের কঠিন স্পর্শে আবার সে সঙ্গীত জেগে উঠবে। প্রমথ চৌধুরী এ বিষয় সন্দেহ প্রকাশ করেছেন, 'আমি পূর্বেই বলেছি মার্গসঙ্গীত ঝিমুচ্ছে। কিন্তু তাই বলে ওস্তাদীর আফিং ছাড়াবার উদ্দেশ্যে কেউ যে তাকে বিলাতী সংগীতের মদ ধরাতে প্রস্তুত, এর প্রমাণ তো অদ্যাবধি পাই নি।'

'হিন্দু-সঙ্গীত' প্রবন্ধে প্রমথ চৌধুরী মার্গসঙ্গীত প্রসঙ্গে যে কটি সমস্যার কথা তুলেছেন, তা অত্যন্ত প্রণিধানযোগ্য। বর্তমানকালে মার্গসঙ্গীতের প্রতি অনাদরের যে কারণ তিনি নির্দেশ করেছেন, তার মধ্যে দেশ-কাল ও সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের কথাটি বলেন নি। মনে হয় সেই প্রসঙ্গ থাকলে তাঁর বক্তব্য পূর্ণতর হতে পারত। মার্গসঙ্গীত প্রধানত রাজা-বাদশা ও দেশীয় রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে উঠেছিল। দেশ-কালের সঙ্গে সঙ্গে অবস্থারও পরিবর্তন হয়েছে। মার্গসঙ্গীতের সেই কলাবতী পরিবেশ ক্রমাগত অতীতের স্মৃতিতে পর্যবসিত হচ্ছে। দেশ-কালের এই অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রুচিরও পরিবর্তন ঘটেছে। 'সাহিত্যে খেলা' রচনাটিতে তিনি প্রকারান্তরে এই সমস্যার ওপর আলোকপাত করেছেন, 'বিদ্যা-সুন্দর খেলনা হলেও রাজার বিলাসভবনের পাঞ্চালিকা—সুবর্ণে গঠিত, সুগঠিত এবং মণিমুক্তায় অলংকৃত; তাই আজও তার যথেষ্ট মূল্য আছে, অন্তত জহুরীর কাছে। অপর পক্ষে, এ যুগের পাঠক হচ্ছে জনসাধারণ, সুতরাং তাঁদের মনোরঞ্জন করতে হলে সস্তা খেলনা গড়তে হবে, নইলে তা বাজারে কাটবে না।'

'সুরের কথা' প্রবন্ধে সুরের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করা হয়েছে, শেষের দিকে দেশী ও বিলিতি সঙ্গীতের ভেদাভেদ নির্ণয় করা হয়েছে। সঙ্গীতের মূল হচ্ছে শ্রুতি। প্রবন্ধকার শ্রুতির স্বরূপ ও তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন। শব্দ থেকে সুরের, কি, সুর থেকে শব্দের উৎপত্তি হয়েছে, এ সম্পর্কে শাস্ত্র, বিজ্ঞান ও দর্শনের মতামত কি তিনি দেখিয়েছেন। সঙ্গীতের তত্ত্বগত আলোচনার মধ্যে প্রবন্ধকারের বহু-শাখান্বিত অধ্যয়নশীল মনের পরিচয় পাওয়া যায়। দেশী ও বিলিতি সঙ্গীতের পার্থক্যও খুব সুস্পষ্টভাবে নির্ণীত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ একাধিকবার দেশী ও বিলিতি সঙ্গীতের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করেছেন।

যেকালে বাংলা সাহিত্যে সঙ্গীত-সমালোচনা বলে কোন বিভাগ গড়ে ওঠে নি, সেইযুগে প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গীত-সম্পর্কিত প্রবন্ধগুলি নিঃসন্দেহে এই জাতীয় আলোচনার পথ দেখিয়েছে। প্রাচীন সঙ্গীত-শাস্ত্র থেকে আরম্ভ ক'রে বিলিতি

সঙ্গীত-শাস্ত্র পর্যন্ত তাঁর কত গভীর ও বিস্তৃত অধিকার ছিল, তার প্রমাণ এই প্রবন্ধগুলির মধ্যে পাওয়া যায়। সরস ও প্রসাদগুণযুক্ত বাচনভঙ্গির জন্য গভীর তত্ত্বকথাও রসমণ্ডিত হয়ে উঠেছে। গভীর কথাও যে বলার ঢংয়ে কত সহজ ও সহাস্য হতে পারে তার একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। দেশী ও বিলিতি সঙ্গীত সম্পর্কে 'সুরের কথা' প্রবন্ধের উপসংহারে বলেছেন, 'সেদিন একজন ইংরেজ বলছিলেন যে, যে সংগীতে ছয়টি রাগ এবং প্রতি রাগের ছয়টি ক'রে স্ত্রী আছে, সেখানে হারমনি কি করে থাকতে পারে ? আমি বলি, 'ও ত ঠিকই কথা, বিশেষত স্বামী যখন মূর্তিমান রাগ, তার স্ত্রীরা প্রত্যেকেই এক-একটি মূর্তিমতী রাগিণী। অবশ্য এরূপ হবার কারণ আমাদের সংগীতের কৌলীন্য।' কোথায়ও পাণ্ডিত্যের পরুষতা নেই, বিদ্যাকে জাহির করার প্রাণান্তকর অপ-প্রচেষ্টা নেই—অথচ পরিহাসের সুরে হালকাভাবে সবই বলেছেন। তাঁর কোন কোন ছোটগল্পের মধ্যেও মার্গসঙ্গীতের যে কলাবতী পরিবেশের বর্ণনা আছে, তার থেকে বোঝা যায়—এ বিষয় তিনি শুধু পড়াশুনাই করেন নি, অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির সঙ্গে মিলিয়ে তাঁর বিদগ্ধ জীবনচর্যার অঙ্গীভূত ক'রে তুলেছেন।

১. ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বলেছিলেন, 'দেওয়ানজী জলের স্থায় সহজ ভাষা লিখিতেন, তাহাতে কোন বিচিত্র ও বিবাদ ঘটিত বিষয় লেখায় মনের অভিপ্রায় ও ভাবসকল অতি সহজে স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইত, এ জন্য পাঠকেরা অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করিতেন, কিন্তু সে লেখায় শব্দের বিশেষ পারিপাট্য ও তাদৃশ মিষ্টতা ছিল না।' —(ডঃ সুকুমার সেনের 'বাংলা সাহিত্যে গদ্য' থেকে উদ্ধৃত।)

২. বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ক বক্তৃতা।

৩. বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ক বক্তৃতা, ১৮৭৮।

৪. 'Passing from form to substance, we have specially to note that whatever its theme and the range of its subject matter is, of course, practically unlimited—the true essay is essentially personal. Like its verse analogue, tbe lyric, it belongs therefore to the liturature of self-expression.' —Introduction to the study of literature : Hudson.

৫. পঞ্চভূত।

৬. বাজে কথা : বিচিত্র প্রবন্ধ।

৭. 'The essay is the most popular mode of writing, because it suits the writer who has neither talent nor inclination to pursue his inquiries farther, and…the generality of readers who are amused with variety and superficiality.'—Crabbe.

৮. প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধসংগ্রহের [প্রমথ খণ্ড] ভূমিকা : অতুলচন্দ্র গুপ্ত।

৯. খেয়ালখাতা : বীরবলের হালখাতা।

১০. ফরাসী সাহিত্যের বর্ণপরিচয় : নানাকথা।

১১. আত্ম-কথা : ৯৩ পৃঃ।

১২. বিদ্যাপতি ও জয়দেব : বিবিধ প্রবন্ধ (প্রথম খণ্ড)।

১৩. জয়দেব : সাধনা, ফাল্গুন, ১৩০০।

১৪. জয়দেব : সনেট-পঞ্চাশৎ।

১৫. ফাল্গুন : বীরবলের হালখাতা।

১৬. 'উত্তরচরিত' ১২৮৭ সালের ৩০শে জ্যৈষ্ঠ থেকে ৩০শে শ্রাবণের মধ্যে প্রকাশিত হয়। 'রত্নাবলী' ঐ সালের ৯ই আশ্বিন থেকে ৫ই অগ্রহায়ণ-এর মধ্যে এবং ১২৯০সালের ১২ই জ্যৈষ্ঠ থেকে ১৬ই অষাঢ়ের মধ্যে প্রকাশিত হয়। 'মৃচ্ছকটিক' প্রকাশিত হয় ১২৯৪ সালের ৭ই মাঘ থেকে ১১ই চৈত্রের মধ্যে। তিনটি প্রবন্ধই 'এডুকেশন গেজেটে' প্রকাশিত, হয়। তিনটি প্রবন্ধ 'বিবিধ প্রবন্ধ' প্রথম ভাগ, নাম দিয়ে প্রকাশিত হয় [১৩০২]।

১৭. আত্ম-কথা : ৯৭ পৃঃ।

১৮. প্রমথ চৌধুরী : শ্রীঅতুল গুপ্ত : বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৫৫।

১৯. কৃষ্ণচরিত্র : নবম পরিচ্ছেদ।

২০. 'যাহা হউক, মহাভারতে যে নানাকালের নানালোকের রচনা আছে তাহা স্বীকার্য; কিন্তু তাহাদিগকে পৃথক করিয়া তাহদের রচনাকাল ও তাহাদের আপেক্ষিক সত্যাসত্য নির্ণয় যে কেমন করিয়া সাধিত হইতে পারে তাহা এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই।' —কৃষ্ণচরিত্র : আধুনিক সাহিত্য।

২১. 'তাঁর কবিতার উপর কার কার প্রভাব পড়েছে? আমার উত্তর—ইতালীয় কবি পেত্রার্কার, পারসিক কবি ওমর খৈয়ামের, ভারতীয় কবি ভাসের, বঙ্গীয় কবি ভারতচন্দ্রের।' —প্রমথ চৌধুরীর কবিতা, অন্নদাশঙ্কর রায়, বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৫৪

২২. মৃচ্ছকটিক, বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৫৪।

২৩. ভাস : সনেট-পঞ্চাশৎ।

২৪. বসন্তসেনা : সনেট-পঞ্চাশৎ।

২৫. পুস্তক-পরিচয় : পরিচয়, মাঘ ১৩৪৪।

২৬. কাদম্বরী-চিত্র : প্রাচীন সাহিত্য।

২৭. পত্রলেখা : সনেট-পঞ্চাশৎ।

২৮. রূপের কথা : বীরবলের হালখাতা।

২৯. 'There is a dichotomy between the man and the writer, and I can think of no one in which it has been greater than it was in Dostoevsky. This dichotomy probably exists in all creative artists, but it is more conspicuous in authors than in others because their medium is words, and the contradiction between their behaviour and their communication is more shocking.'—Great Novelists and their novels : W. Somerset Maugham.

৩০. প্রমথ চৌধুরী, শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত, বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ আষাঢ়, ১৩৫৪।

৩১. পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথও বলেছেন, 'সকল মানুষে মিলে মৌমাছির মতো একটি নমুনায় চাক বাঁধবে, বিধাতা এমন ইচ্ছে করেন নি। কিন্তু সমাজ-বিধাতারা কখনো কখনো সেই রকম ইচ্ছে করেন। তাঁরা কাজকে সহজ করবার লোভে মানুষকে মাটি করতে কুণ্ঠিত হন না। তাঁরা ছাঁটাই-কলের মধ্যে মানুষ-বনস্পতিকে চালিয়ে দিয়ে ঠিক সমান মাপের হাজার হাজার সরু-সরু দেশলাই-কাঠি বের ক'রে আনেন।' —চরকা ঃ কালান্তর।

৩২. রামমোহন রায় (১২৯১) ঃ চারিত্রপূজা।

৩৩. বিচিত্রা', চৈত্র, ১৩৩৪

৩৪. 'কয়েক বৎসরের মধ্যে বাংলাদেশের সাহিত্যিক মহলে পত্রিকার অফিস হইতে কলেজের হোষ্টেল পর্যন্ত সর্বত্র, লেখা-পড়া-জানা ভদ্রসমাজ যেন দুই দলে বিভক্ত হইয়া গিয়াছিল, দ্বিজুরায়ের দল ও রবিঠাকুরের দল।' রবীন্দ্রজীবনী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৭৭, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

৩৫. আর্যগাথা (দ্বিতীয় ভাগ) ঃ ১৩০১ ; আষাঢ়ে, ঃ ১৩০৫ ও মন্দ্র ঃ ১৩০৯। পরবর্তী কালে এই তিনটি সমালোচনা 'আধুনিক সাহিত্য' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

৩৬. 'বন্ধুবর! আপনি আমাব রহস্যগীতির পক্ষপাতী। তাই রহস্যগীতিপূর্ণ এই নাটিকাখনি আপনার করে অর্পিত হইল। —সব বিষয়ে দু'টি দিক আছে—একটি গম্ভীর, অপরটি লঘু। বিরহেরও তাহা আছে। আপনি ও অপনার পূর্ববর্তী কবিগণ বিষাদ-বেদনাপ্লুত বিরহের করুণগাথা গাহিয়াছেন। আমি—'মন্দঃ কবিযশঃপ্রার্থী' হইয়া বিরহের রহস্যের দিকটা জাগাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছি মাত্র। আপনাদেব বিরহ-বেদনার ব্যঙ্গ বা উপহাস করা আমার উদ্দেশ্য নহে।'—

৩৭. প্রবাসী, ১৩১২, কার্তিক।

৩৮. সাহিত্য, ১৩১৩, আশ্বিন।

৩৯. বঙ্গদর্শন ঃ ১৩১৪, মাঘ।

৪০. সাহিত্য ১৩১৩ জ্যৈষ্ঠ।

৪১. ১৩১৯ সালের ১লা পৌষে 'আনন্দ-বিদায়' ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত হয়।

৪২. সাহিত্য ঃ ১৩১৯, মাঘ।

৪৩. সাহিত্য. ১৩১৬, কার্ত্তিক।

৪৪. বিচিত্রা, ১৩৩৪, চৈত্র।

৪৫. The Romantic Imagination : C. M. Bowra, (Page 1-2)

৪৬. 'He forgets his own petty sufferings. He quits the narrow sphere of the individual.'—Aristotle's theory of poetry and fine art—page 266

৪৭. বসুমতী, ১৩৩৬ বৈশাখ।

৪৮. যতীন্দ্রমোহন সিংহ তাঁর 'সাহিত্যে স্বাস্থ্যরক্ষা'য় পল্লীসমাজের রমা প্রসঙ্গে কঠোর মন্তব্য করেছিলেন। তিনি বিদ্রূপ ক'রে বলেছেন, 'তুমি ঠাকুরাণী বুদ্ধিমতী না? বুদ্ধির বলে তোমার পিতার জমিদারি শাসন করিতে পারিলে আর তুমিই কিনা তোমার বাল্যসখা রমেশকে ভালবাসিয়া

ফেলিলে ?' এই তোমার বুদ্ধি ? ছিঃ।' বলা বাহুল্য, এ আক্রমণটি যে কি পর্যায়ের তা সহজেই অনুমেয়।

৪৯. চরিত্র-চিত্র, বঙ্গদর্শন, ১৩১৮ চৈত্র।

৫০. চিঠিপত্র, পঞ্চম খণ্ড, ২৯ নং।

৫১. লোকশিক্ষক বা জননায়ক, প্রবাসী, ১৩২১ আষাঢ়।

৫২. গুরুগোবিন্দ, মানসী।

৫৩. সবুজপত্র : ১৩২১, শ্রাবণ।

৫৪. ঐ : ঐ, ভাদ্র

৫৫. ঐ : ঐ, আশ্বিন।

৫৬. ঐ : ঐ, মাঘ

৫৭. 'By 1850 Romanticism in the academic sense was well and truely dead, although its spirit lingered on under the new names and flared up in unexpected ways and places. Between 1840 and 1850 the new theories of Realism made their appearance and directed literary activity into new channels. —A short history of French literature; Laurence Bisson, page 117.

৫৮. 'যাহা কিছু সমস্তই পরিপূর্ণ আনন্দের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে, ধুঁকিতে ধুঁকিতে রাস্তার ধুলোর উপরে মুখ থুবড়াইয়া মরিবার দিকে নহে।'

—কবির কৈফিয়ৎ, রবীন্দ্রনাথ, সবুজপত্র. ১৩২২ জ্যৈষ্ঠ।

৫৯. 'The Frenchman sees life from an essentially realist and adult point of view, without illusion and without sentiment; this vision of life is the stuff of his literature, expressed in language neat, precise, lucid, economical.' —A short history of French literature: Laurence Bission, page-I

৬০. Landmarks in French Literature: Lytton Strachey, Page-59.

৬১. 'The most startling and the most complete of the Romantic innovations related to the poetic vocabulary. The number of words considered permissible in French poetry had been steadily diminishing since the days of Racine.'—Landmarks in French liturature: Lytton Strachey, pages 149-150.

৬২. Max Beerbohm, 1922: Essays on life and literature: Robert Lynd. page 152.

৬৩. In the first place a contemporary can scarcely fail to be struck by the fact that two critics at the same table at the same moment will pronounce completely different opinions about the same book...yet both critics are in

agreement about Milton and about Keats ......It is only when they discuss the work of contemporary writers that they inevitably come to blows.'—How it strikes a contemporary : The common Reader (first series) : Virginia Woolf. Page 292.

৬৪. বঙ্কিমচন্দ্র : আধুনিক সাহিত্য।

৬৫. 'তুচ্ছ ক্ষুদ্র বস্তুকে অবলম্বন করিয়া মুহূর্তে তাহাকে কল্পনার বিদ্যুৎ-ছটায় উদ্ভাসিত করিতে নবীনচন্দ্র অদ্বিতীয় ছিলেন, কিন্তু একটু ধৈর্য ধরিয়া তাহাকে একটি বিশেষ পরিণতি দানের ধাতটিই যেন কবির ছিলনা।' —বাংলা সাহিত্যের নবযুগ (২য় সং): শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত, পৃ. ২৩৮।

৬৬. 'The comparison has often been made between the epic and the novel. The novel is the epic artform of our modern, bourgeois society ; it reached its full stature in the youth of that society.'—The novel and the people. Ralph Fox, Page 25.

৬৭. 'আমাদের সাধারণ জীবনযাত্রা যেরূপ সঙ্কীর্ণপরিসর ও বৈচিত্র্যহীন, ইহার স্রোতোবেগ যেরূপ মন্দীভূত, তাহাতে ছোটগল্পের সহিতই ইহার একটি স্বাভাবিক সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য আছে। উপন্যাসের বৃহত্তর ক্ষেত্রে ইহাকে একটি বালুকাপ্রোথিত, শীর্ণ কলেবর জলধারার মতই দেখায়। আমাদের জীবন যে সমস্ত ক্ষুদ্র বিক্ষোভের দ্বারা আন্দোলিত হয়, তাহা ছোটগল্পের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সহজেই সীমাবদ্ধ হইতে পারে,'

—বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা [দ্বিতীয় সং] পৃ. ১৮০ : শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

৬৮. আত্ম-কথা : পৃ. ৩০।

৬৯. ১৩২৩ সালের আশ্বিন-কার্তিক এবং পৌষ সংখ্যা।

৭০. দ্বিজেন্দ্রলালের স্মৃতি-সভায় কথিত : সবুজপত্র, ১৩২২, জ্যৈষ্ঠ এবং দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের হাসির গান : সবুজপত্র, ১৩২৩, আষাঢ়।

প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধগ্রন্থের সংখ্যা খুব বেশী নয়—ছোট বড় বই মিলিয়ে প্রায় দশখানা হবে। অবশ্য মাসিক পত্রিকার পাতায় এমন কিছু প্রবন্ধ আছে, যা তাঁর কোন প্রবন্ধসংগ্রহে সঙ্কলিত হয় নি। প্রবন্ধের সংখ্যা বা প্রবন্ধগ্রন্থের কলেবর এখানে বড় কথা নয়। চৌধুরী মহাশয়ের প্রবন্ধাবলীর বিষয়-বৈচিত্র্য অনন্যসাধারণ। অতি তুচ্ছ সাধারণ বিষয় থেকে উচ্চতর দর্শন পর্যন্ত যে কোন ক্ষেত্রেই তিনি স্বচ্ছন্দ-বিচরণ করেছেন। বিষয় যাই হোক না কেন, মোটামুটিভাবে তাঁর অধিকাংশ প্রবন্ধেই সাহিত্যিক ধর্ম পরিস্ফুট। কিন্তু সবগুলি প্রবন্ধ যে একজাতীয় একথা বলা যায় না। ব্যক্তিগত প্রবন্ধের আস্বাদন তাঁর অধিকাংশ প্রবন্ধেই স্বল্পাধিক পরিমাণে বিদ্যমান। তবে ব্যক্তিগত প্রবন্ধের দিক থেকে 'বীরবলের হালখাতা'কেই শ্রেষ্ঠ সঙ্কলন বলা যায়। এই সঙ্কলনটির নাতিদীর্ঘ রচনাগুলি বীরবলী রচনারীতিতে ও প্রমথীয় মানস-প্রকর্ষে অপূর্ব হ'য়ে উঠেছে। সামান্য একটি বিষয় বা প্রসঙ্গ নিয়ে তিনি যে অতি সূক্ষ্ম ও স্বল্প-পরিসর কথার জাল বুনেছেন, তা বাংলা সাহিত্যে একটি নূতন সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিয়েছে।

'বীরবলের হালখাতা' সঙ্কলনটি বিচিত্র-বিষয়াশ্রয়ী। 'সবুজপত্র', 'যৌবনে দাও রাজটিকা,' 'ফাল্গুন'—এই তিনটি রচনায় প্রমথ চৌধুরীর জীবনচর্যার একটি দিক উদ্ঘাটিত হয়েছে। শুধু তাই নয় জীবন-সমালোচনার ফাঁকে ফাঁকে 'সবুজপত্র' পত্রিকার আদর্শের পরিচয়ও পাওয়া যায়। প্রমথ চৌধুরী যে প্রাণধর্মের পূজারী ছিলেন, তারই স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে এই তিনটি রচনায়। প্রাণশক্তিহীন অকালবার্ধক্যের দেশে তিনি সবুজকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, কারণ সবুজ হচ্ছে প্রাণের প্রতীক। 'সবুজপত্র' রচনাটি সবুজপত্র পত্রিকার প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যায় (১৩২১, বৈশাখ) প্রকাশিত হয়। রচনাটির দু'টি দিক আছে—লেখকের জীবন-দর্শন, দ্বিতীয়ত, পত্রিকাটির স্বরূপধর্ম। প্রাণধর্মের মৃত্যুহীন অভিব্যক্তির কথা তিনি বহু জায়গায় নানা প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন। তাই জড়তা ও স্থবিরতাকে তিনি কোনকালেই স্বীকার করেন নি। বের্গসঁপন্থী প্রমথ চৌধুরী তাঁর তর্জমা প্রবন্ধে এই সৃষ্টিশীল বিবর্তনবাদের (creative evolution) কথাই সুস্পষ্টভাবে বলেছেন, 'ইভলিউশন জড়জগতের নিয়ম নয়, জীবজগতের ধর্ম। ইভলিউশনের মধ্যে শুধু ইচ্ছাশক্তিরই বিকাশ পরিস্ফুট।

ইভলিউশন অর্থে দৈব নয়, পুরুষকার। তাই ইভলিউশনের জ্ঞান মানুষকে অলস হ'তে শিক্ষা দেয় না, সচেষ্ট হতে শিক্ষা দেয়।'

'সবুজপত্র' প্রবন্ধটিতে তিনি নিত্যবহমান সেই প্রাণলীলার কথাই বলেছেন। নিছক বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক সত্যকেও তিনি সরস ক'রে তুলেছেন। এখানে একটু লক্ষ্য করলেই লেখকের বিবর্তনপন্থী মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু এই বিজ্ঞান-সত্যকে আমাদের জীবন-সম্পর্কিত মনোভাবের ওপর কত সহজে প্রয়োগ করেছেন! কতকগুলি সহজ ও প্রাত্যহিক উপমা তাঁর বক্তব্যকে পরিস্ফুট করেছে। প্রবন্ধটির আসল উদ্দেশ্য হ'লো আমাদের 'অর্ধেক অকালপক্ক' এবং অর্ধেক 'অযথা-কচি' জীবনের অম্ল-মধুর সমালোচনা। কিন্তু গোটা আলোচনা বিচিত্র বর্ণ-সমালোচনার ওপর ভিত্তি ক'রে গড়ে উঠেছে। প্রমথ চৌধুরীর রূপজ্ঞান ও ইন্দ্রিয়-সচেতনতা এই জাতীয় বিচারের সহচর হয়েছে। লেখক অপূর্ব-কৌশলে বর্ণতত্ত্ব বিশ্লেষণ ক'রে তাঁর বক্তব্যকে সুস্পষ্ট ক'রে তুলেছেন—বাগ্-বৈদগ্ধ্যেও রৌদ্র-রঞ্জিত অসিফলকের খরদীপ্তি, 'সবুজ হচ্ছে এই বর্ণমালার মধ্যমণি। এবং নিজগুণেই সে বর্ণরাজ্যের কেন্দ্রস্থল অধিকার ক'রে থাকে; বেগুনি কিশলয়ের রং, জীবনের পূর্বরাগের রং, লাল রক্তের রং, জীবনের পূর্ণরাগের রং, নীল আকাশের রং, অনন্তের রং, পীত শুষ্ক পত্রের রং, মৃত্যুর রং। কিন্তু সবুজ হচ্ছে নবীন পত্রের রং, রসের ও প্রাণের যুগপৎ লক্ষণ ও ব্যক্তি। তার দক্ষিণে নীল আর বামে পীত, তার পূর্বসীমায় বেগুনি আর পশ্চিমসীমায় লাল। অন্ত ও অনন্তের মধ্যে, পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে, স্মৃতি ও আশার মধ্যে মধ্যস্থতা করাই হচ্ছে সবুজের অর্থাৎ সরস প্রাণের স্বধর্ম।' বর্ণবিশ্লেষণের মাধ্যমে লেখক চিরন্তনযৌবন ও অফুরন্ত প্রাণধর্মের বন্দনা করেছেন।

'যৌবনে দাও রাজটিকা' প্রবন্ধটিতেও চিরন্তন যৌবনের জয়ধ্বনি উচ্চারিত হয়েছে। পূর্বোক্ত প্রবন্ধটিতে যে কথা তিনি রূপক ছলে বলেছেন, আভাস-ইঙ্গিত দিয়েছেন, আলোচ্য প্রবন্ধে তা-ই আরও সুস্পষ্ট ক'রে তুলেছেন। প্রবন্ধটির নামকরণ করা হয়েছে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের একটি কবিতার চরণাংশ নিয়ে।[১] আমাদের এই অকাল-বার্ধক্যের দেশের অকারণ যৌবন-ভীতির একটি শ্লেষাত্মক পরিচয় দিয়েছেন। আমাদের যৌবন সম্পর্কে ধরণা এই যে, 'আমাদের বিশ্বাস মানব-জীবনের যৌবন একটা মস্ত ফাঁড়া।' আমাদের শিক্ষানীতি ও সমাজনীতি—দু'য়েরই এতে পূর্ণদায়িত্ব আছে। প্রবন্ধকার

স্পষ্ট ও তীক্ষ্ণভাষায় এর কারণ নির্দেশ করেছেন, 'এ অবস্থায় কি জ্ঞানী, কি অজ্ঞানী সকলেই চান যে, এক লম্ফে বাল্য হতে বার্ধক্যে উত্তীর্ণ হন।' লেখকের ধারণা যে এছাড়াও যৌবন সম্পর্কে আমাদের এই মনোভাবের জন্য দায়ী 'আমাদের প্রাচীন সাহিত্য'।

প্রবন্ধটির এই অংশে চৌধুরী মহাশয় সংস্কৃত সাহিত্যে বর্ণিত যৌবন-সম্পর্কিত মনোভাবের একটি বিস্তৃত পরিচয় দিয়েছেন। এই অংশই প্রবন্ধটির প্রাণ। সংস্কৃত সাহিত্যে যুবক-যুবতীই মুখ্য চরিত্র—যৌবনের রূপগুণ বর্ণনাতেই সংস্কৃত সাহিত্য মুখর। 'এই মাল্যচন্দনবনিতা'র জগতে 'প্রকৃতির কাজ হচ্ছে শুধু রমণীদেহের উপমা যোগানো'। তাই সংস্কৃত সাহিত্যে বুদ্ধদেবের জীবনী তেমন জনপ্রিয় হয় নি, যেমন হয়েছিল তাঁরই সমসাময়িক কৌশাম্বীর যুবরাজ উদয়নের অজস্র প্রেমকাহিনী। সুতরাং যৌবনের ধর্মটিকে সংস্কৃত কবিরা মোটেই অস্বীকার করেন নি। প্রমথ চৌধুরী সংস্কৃত সাহিত্যের যৌবনচর্চার আতিশয্যকেও অস্বীকার করেন নি। যৌবনের স্থূল দেহটি ক্রম-বর্ধিত হ'য়ে এক সময় এমন হয়ে দাঁড়ালো যে, প্রাণ-স্পন্দনটুকুও স্তব্ধ হ'ল। তাই যৌবন-চর্চার আতিশয্যের বিরুদ্ধেও প্রবল প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। প্রমথীয় বাক্-চাতুর্য্য ও সুকঠিন শ্লেষ অত্যন্ত সহজভাবেই এর কারণ নির্দেশ করেছে, 'প্রথম বয়সে মধুর রস অতিমাত্রায় চর্চা করলে শেষ বয়সে জীবন তিতো হ'য়ে ওঠে। এ শ্রেণীর লোকের হাতে শৃঙ্গার-শতকের পরেই বৈরাগ্য-শতক রচিত হয়।'

কিন্তু ব্যক্তি-বিশেষের যৌবন ক্ষণস্থায়ী—তাই তার স্থায়িত্ব বাড়ানোর চেষ্টা যেমন হয়েছে, তেমনি এই স্বল্পায়ু কালটির জন্য নানা আক্ষেপ শিল্পে ও সঙ্গীতে ছড়িয়ে আছে। কিন্তু ব্যক্তিগত যৌবন ক্ষণস্থায়ী হ'লেও মানব-সমাজের সুবিস্তৃত পটভূমিকায় যৌবনের একটি নিত্যকালের রূপ আছে। প্রবন্ধটির শেষদিকে চৌধুরী মহাশয় মানব-সমাজের সেই চিরন্তন মানসিক যৌবনের কথা আলোচনা করেছেন। মানসিক যৌবনই সমাজে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। মানসিক যৌবন প্রসঙ্গেই তিনি প্রাণের সৃজন-তৎপর ধর্মের কথা বলেছেন। এখানেও তিনি বের্গ্‌সঁর মতবাদে বিশ্বাসী। তিনি বলেছেন, 'প্রাণের ধর্ম যে, জীবনপ্রবাহ রক্ষা করা—এটি সর্বলোকবিদিত। কিন্তু প্রাণের আর একটি বিশেষ ধর্ম আছে, যা সকলের কাছে সমান প্রত্যক্ষ নয়। সেটি হচ্ছে এই যে প্রাণ প্রতিমুহূর্তে রূপান্তরিত হয়।' এই প্রসঙ্গে বের্গ্‌সঁর উক্তি স্মর্তব্য, 'We change without ceasing, and the state itself is nothing

but change.'[২] সৃষ্টিশীল পরিবর্তনশীলতার সম্পর্কে অন্যত্র বলেছেন, 'We find that, for a conscious being, to exist is to change to change is to mature and to mature is to go on creating oneself endlessly.'[৩]

লেখক এই চিরন্তন প্রাণ-প্রবাহকেই মানসিক যৌবনের ভিত্তিভূমি হিসেবে স্বীকার করেছেন, 'ব্যক্তিগত জীবনে ফাল্গুন একবার চলে গেলে আবার ফিরে আসে না; কিন্তু সমগ্র সমাজে ফাল্গুন চিরদিন বিরাজ করছে। সমাজে নূতন প্রাণ, নূতন মন, নিত্য জন্মলাভ করেছে। অর্থাৎ নূতন ভালোবাসা, নূতন কর্তব্য ও নূতন চিন্তা নিত্য উদয় হচ্ছে। সমগ্র সমাজের এই জীবন-প্রবাহ যিনি নিজের অন্তরে টেনে নিতে পারবেন, তাঁর মনের যৌবনের আর ক্ষয়ের আশঙ্কা নেই। এবং তিনি আবার কথায় ও কাজে সেই যৌবন সমাজকে ফিরিয়ে দিতে পারবেন।' 'সবুজপত্র' প্রতিষ্ঠার মূল-মন্ত্রটি ছিলও এই। আধ্যাত্মিকতাবিলাসী জড়িমা-জড়িত জীবনের মধ্যে তিনি সঞ্চারিত করতে চেয়েছিলেন অনন্ত প্রাণ-চেতনার প্রসন্ন দীপ্তি, মুক্ত মনের সহাস্য আলোক। অনন্ত প্রাণ-চৈতন্যের এক সৃষ্টিশীল ক্রমাভিব্যক্তি সবুজপত্রের যুগে বাংলা সাহিত্যে একটি স্থায়ী সুরের সৃষ্টি করেছিল। রবীন্দ্রনাথের 'বালাকা' কাব্যের ও 'ফাল্গুনী' নাটকের মধ্যে চিরন্তন প্রাণ-প্রবাহের এই সত্যটি এক মহত্তর শিল্প-সার্থকতায় মণ্ডিত হয়েছে।

দুই

'ফাল্গুন' রচনাটিও লঘুচালে ও হাল্কা মেজাজে লেখা। মূল বক্তব্য খুব বেশী নয়; কিন্তু তাকে সাজিয়ে তুলেছেন নানা প্রাসঙ্গিক আলোচনায় ও বিচিত্র বাক্‌রীতির অগ্নি-দীপ্ত আল্‌পনায়। ইউরোপের ঋতুবৈচিত্র্যের সঙ্গে আমাদের দেশের ঋতু-রূপের পার্থক্য নির্দেশ করেছেন প্রবন্ধের প্রথমেই। চতুর্বর্ণ ইউরোপীয় ঋতুর বর্ণময় আত্মপ্রকাশ যেমন স্পষ্ট, তেমনি উজ্জ্বল, 'ইউরোপের প্রকৃতির যেমন ক্রমবিকাশ নেই, তেমনি ক্রমবিলয়ও নেই।' কিন্তু আমাদের দেশের ঋতুর গমনাগমনটি অলক্ষিত। এ দেশে 'বসন্ত' একটি মুখের কথামাত্র, তার কোন স্পষ্ট ও বৈশিষ্ট্যদ্যোতক মূর্তি নেই। লেখকের মতে, বসন্তের কোনো রূপ যে আমাদের সামনে ধরা দেয় না, তার আর একটি কারণও আছে। আমাদের কর্মবিব্রত মন প্রকৃতিকে দেখার সেই সহজ মুগ্ধদৃষ্টি হারিয়ে ফেলেছে।

চৌধুরী মহাশয় একটি অপূর্ব সুন্দর ছবি এঁকে এই বিষয়টি পরিস্ফুট করেছেন, 'বসন্তে প্রকৃতিসুন্দরী নেপথ্যবিধান করেন, সে সাজগোজ দেখবার যদি কোন চোখ না থাকে, তাহলে কার জন্যই বা নবীন পাতার রঙিন শাড়ি পরা, কার জন্যই বা ফুলের অলংকার ধারণ, আর কার জন্যই বা তরুণ আলোর অরুণ হাসি হাসা ?' আমাদের দেখার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছি, তাই 'হয় সবই জানি, নয় সবই শুনি।' উদাহরণ স্বরূপ তিনি জয়দেবের বসন্তবর্ণনার কথা উল্লেখ করেছেন। লেখকের মতে জয়দেব বসন্তের যে রূপ বর্ণনা করেছেন, তা নিতান্তই মন-গড়া—কারণ এর অস্তিত্ব কোনকালেই ছিল না। সুতরাং জয়দেব যে বসন্তের বর্ণনা করেছেন, তাতে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কোন পরিচয় নেই, তিনি পূর্ববর্তী কবিদের বসন্ত-বর্ণনা থেকে তাঁর বসন্ত-চিত্রের উপাদান সংগ্রহ করেছেন। জয়দেব ও অন্যান্য সংস্কৃত কবিদের কাব্য থেকে নানা নজির তুলে চৌধুরী মহাশয় যে সিদ্ধান্তে এসেছেন, তা তাঁর ভাষাতেই বলা যাক, 'অতএব দাঁড়াল এই যে, বসন্ত প্রকৃতির রাজ্যে একটি আরোপিত ঋতু।' এখানেও লেখক মানসিক বসন্তের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, 'আমার শেষ কথা এই যে, এ পৃথিবীতে বসন্তের যখন কোনোকালে অস্তিত্ব ছিল না, তখন সে অস্তিত্বের কোনোকালে লোপ হতে পারে না। আমরা ও-বস্তু যদি হারাই তবে সে আমাদের অমনোযোগের দরুণ। যে জিনিস মানুষের মন-গড়া তা মানুষের মন দিয়েই খাড়া রাখতে হয়।' সুতরাং এই প্রবন্ধেও তিনি বসন্তের স্থূল রূপের চেয়ে মানসিক বসন্তকেই বড় করেছেন।

'ফাল্গুন' রচনাটির প্রসঙ্গে 'বর্ষার কথা' রচনাটির কথা অনিবার্যভাবেই মনে পড়ে। কারণ রচনা দু'টিতে প্রধান দু'টি ঋতু-সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। 'বর্ষার কথা'য় প্রমথ চৌধুরীর রোম্যাণ্টিকতা-বিরোধী মনোভাবের সুস্পষ্ট পরিচয় আছে। বর্ষা-সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি প্রচলিত রোম্যাণ্টিক ভাবাতিরেককে ব্যঙ্গ করেছেন। মাসিক পত্রিকার চাহিদানুযায়ী যে ধরণের ঋতুরূপের কবিতা লেখা হয়, লেখকের মতে তা নিতান্তই যান্ত্রিক, 'যে কবিতা আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে প্রকাশিত হবে, তা অন্তত জ্যৈষ্ঠমাসের মাঝামাঝি রচনা করতে হবে, আমার মনের কল্পনার এত বাষ্প নেই যা নিদাঘের মধ্যাহ্নকে মেঘাচ্ছন্ন ক'রে তুলতে পারে। তা ছাড়া যখন বাইরে অহরহ আগুন জ্বলছে তখন মনে বিরহের আগুন জ্বালিয়ে রাখতে কালিদাসের যক্ষও সক্ষম হতেন কি না, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে।' দ্বিতীয়ত,

লেখকের মতে বর্ষা সম্পর্কে কবিতা লেখার আর এক অসুবিধে আছে। বর্ষা সম্পর্কে যা কিছু বক্তব্য ছিল, তা কালিদাসই প্রায় সব ব'লে দিয়েছেন, আর যেটুকু বাকি ছিল, তাও রবীন্দ্রনাথ বলে রেখেছেন। সুতরাং বর্ষা সম্পর্কে নূতন কিছু ভাবার বা লেখার কিছুই নেই। বর্ষাকে নিয়ে দীর্ঘকালব্যাপী যে সংস্কার চলে আসছে, চৌধুরী মহাশয় তারই মূলে কুঠারাঘাত করেছেন। বর্ষাকে নিয়ে ভাবোচ্ছ্বাস ও আবেগের আতিশয্য তিনি বরদাস্ত করতে পারেন নি। তাই বর্ষা-সম্পর্কিত রোম্যান্টিক কবিতাকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করতে ছাড়েন নি।

প্রমথ চৌধুরী প্রবন্ধটিতে যে বর্ষার কথা বলেছেন, তা কালিদাস বা রবীন্দ্রনাথের শিল্পমণ্ডিত রূপ-রসময় বর্ষা নয়। চৌধুরী মহাশয় আমাদের বাস্তবজগতের প্রাকৃত বর্ষার কথা বলেছেন। এই বর্ষায় সেই রাজকীয় ঐশ্বর্য-বিলাস নেই—পঞ্চেন্দ্রিয়ের পঞ্চপ্রদীপের শিখা তাকে বর্ণাঢ্য ক'রে তোলে নি। বর্ষা-কবিতার দীর্ঘকালের রোম্যান্টিক সংস্কারকে সম্পূর্ণভাবে অপসারিত ক'রে এর নগ্নরূপ ও প্রাকৃতমূর্তিকে ফুটিয়ে তুলেছেন, '···বর্ষার রূপ কালো, রস জোলো, গন্ধ পঙ্কজের নয়—পঙ্কের, স্পর্শ ভিজে, এবং শব্দ বেজায়।' বর্ষার পক্ষী-জগৎ ও পুষ্প-জগতকে নিয়েও তিনি পরিহাস করতে ছাড়েন নি।

বর্ষা ও বসন্তের তুলনামূলক আলোচনা ক'রে তিনি বসন্তেরই শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করেছেন। লেখকের আলোচনা লক্ষ্য করলে দু'টি জিনিস চোখে পড়ে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে যে রোম্যান্টিক বর্ষাকে ব্যঙ্গ করার জন্যই বুঝি তিনি বসন্তকে জিতিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু লেখকের এই দৃষ্টিভঙ্গির মূলে আছে তাঁর বিশেষ ধরনের মানস-প্রকৃতি। তিনি এই তুলনামূলক আলোচনাটিকে এই তাৎপর্যমূলক উক্তিতে পরিস্ফুট করেছেন। অপর পাঁচটি ঋতুর সঙ্গে বর্ষার কোন মিল নেই, তাই 'এ ঋতু বিজাতীয় এবং বিদেশী, অতএব অস্পৃশ্য। এই প্রক্ষিপ্ত ঋতু আকাশ থেকে পড়ে, দেশের মাটির ভিতর থেকে আর্বিভূত হয় না। বসন্তের নবীনতা সজীবতা ও সরসতার মূলে হচ্ছে ধরণী।' যা ইন্দ্রিয়জ নয় অথবা যা কোন প্রকার ইন্দ্রিয়ের দ্বারা পাওয়া যায় না, চৌধুরী মহাশয়কে কোন দিনই তা আকৃষ্ট করতে পারে নি। বাস্তবের বর্ষার মূর্তির মধ্যে তিনি কোনো অসাধারণত্ব দেখতে পান নি—তাঁর মতে বর্ষায় যা রূপ, তা মূলত মেঘলোকের অদৃশ্য কারসাজী। অপর পক্ষে বসন্ত মৃত্তিকাশ্রয়ী ও মৃত্তিকা-ঘনিষ্ঠ—পত্র-পুষ্পে তার বর্ণময় স্বাক্ষর। প্রবন্ধকার বর্ষাকে 'অব্যবস্থিতচিত্ত ঋতু' বলেছেন—এর আসা-যাওয়া যেমন আকস্মিক তেমনি প্রচণ্ড।

প্রবন্ধটির শেষদিকে প্রমথ চৌধুরী একটি প্রশ্ন তুলেছেন, প্রশ্নটি মোটেই অপ্রাসঙ্গিক নয়। এই অসঙ্গত ও অভদ্র ঋতুকে কালিদাস প্রভৃতি মহাকবিরা কেন একটি অসাধারণ স্থান দিয়েছেন, এই হ'লো তাঁর প্রশ্ন। এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে, সেকালের বর্ষা এবং একালের বর্ষা ঠিক এক নয়—মেঘদূতকাব্যে বর্ণিত সন্তপ্ত-শরণ বন্ধু-বৎসল মেঘ আর আজ নেই, 'সে মেঘ তো মেঘ নয়, পুষ্পকরথে আরূঢ় স্বয়ং বরুণদেব; সে রথ অলকার প্রাসাদের মত ইন্দ্রচাপে সচিত্র, ললিতবনিতাসনাথ মুরজধ্বনিতে মুখরিত; সে মেঘ কখনো শিলাবৃষ্টি করে না, মধ্যে মধ্যে পুষ্পবৃষ্টি করে। এ হেন মেঘ যদি কবিতার বিষয় না হয়, তা হলে সে বিষয় আর কি হ'তে পারে?' 'বর্ষার কথা' রচনাটির প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত লেখকের একটি তির্যকদৃষ্টিই আত্মপ্রকাশ করেছে। বর্ষা সম্পর্কিত রোম্যান্টিক সাহিত্যিকে ব্যঙ্গ করাই যেন এই শ্লেষাত্মক প্রবন্ধটির আসল উদ্দেশ্য। এই গদ্যরচনাটির সঙ্গে তাঁর 'পদ-চারণ' কাব্যগ্রন্থের 'বর্ষা' নামক লঘুরসের ছড়াটি মিলিয়ে পড়লেই লেখকের মনোগত অভিপ্রায় পরিস্ফুট হবে। কবিতাটির কোথায়ও কোন ভাবোচ্ছ্বাস নেই, বর্ষার বহিরাকাশকে হৃদয়ের গাঢ় আকাঙ্ক্ষায় অভিসিঞ্চিত ক'রে কোনও বর্ণময় রূপ ফুটিয়ে তোলেন নি, এমন কি হৃদয়ের এতটুকু উত্তাপ কবিতাটির মধ্যে সঞ্চারিত হয় নি—আমাদের বাস্তব-জগতের একটি নগ্ন ও গদ্যাত্মক রূপই আত্ম-প্রকাশ করেছে,

'কালো কালো মেঘগুলো
জল খেয়ে পেট ফুলো,
পুঁটুলি পাকিয়ে শুলো
          জুড়িয়া আকাশ।
হাতীর মতন ধড়
নাহি তাহে নড়চড়,
নাক ডাকে ঘড়ঘড়
          চারিদিক চেয়ে।'

কবিতাটিতে বর্ষার যে রূপ এঁকেছেন, তা মনোহর তো নয়ই উপরন্তু সে ছবি দেখে আমাদের রসচেতনা ব্যাহতই হয়। কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ যে তরুণী-পথিক-ললনা'-দের বর্ণনা করেছেন, চৌধুরী মহাশয়ের হাতে প'ড়ে তাঁদের আর

দুর্দশার অন্ত নেই। আমাদের আধিব্যাধিগ্রস্ত বাস্তব পৃথিবী তাদের শীর্ণ ও বিদীর্ণ রূপ নিয়ে আত্ম-প্রকাশ করেছে,

'পা ছড়িয়ে নারীকুল
উনুনে শুকোয় চুল,
দু' নয়ন বাষ্পাকুল
ধোঁয়া ঢুকে ঢুকে।'

আসল কথা বর্ষা কোনকালে চৌধুরী মহাশয়ের প্রিয় ঋতু হ'য়ে উঠতে পারে নি—তিনি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের উদ্দেশ্য নিয়েই যেন বর্ষা সম্পর্কে প্রবন্ধ লিখতে বসেছেন। তাই 'ফাল্গুন' সম্পর্কে তিনি যে মীমাংসায় এসেছেন, এখানে সে মীমাংসার পথ যেন ইচ্ছে ক'রেই বর্জন করেছেন। 'ফাল্গুন' সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন যে, যাকে মন দিয়ে গ'ড়ে তোলা হয়েছে, তাকে একমাত্র মন দিয়েই রক্ষা করা সম্ভব। ঠিক এ ধরণের কথা তো বর্ষা সম্পর্কে বলাও চলত। বর্ষার রোম্যান্টিক রূপও তো কবিরা দীর্ঘকালের প্রচেষ্টায় গ'ড়ে তুলেছেন, সুতরাং এই মন-গড়া ঋতুটিকে কি মনের দ্বারাই মানুষ বাঁচিয়ে রাখে নি? অর্থাৎ বিরুদ্ধ-বাদীরা বলতে পারেন যে, এই ধরণের বর্ষা-চিত্র যিনি এঁকে থাকেন, বর্ষার রোম্যান্টিক রূপ দেখার চোখ তাঁর নেই। 'পদ-চারণ'-এর 'বর্ষা' কবিতায় তিনি ব্যঙ্গের ছলে যে কথা বলেছেন, বিরুদ্ধবাদীরা তাকেই যথার্থ ব'লে স্বীকার করবেন,

'তোমার ঐ রঙ্ কালো,
তোমার ঐ রাঙা আলো,
তার বড় লাগে ভালো
যার আছে চোখ।'

'বর্ষার কথা'য় যা নিয়ে ব্যঙ্গ করেছেন, 'ফাল্গুন' প্রবন্ধে তার ভেতর থেকেই একটি মীমাংসায় উপস্থিত হয়েছেন। দু'টি প্রবন্ধে তাঁর পরস্পর-বিরোধী সিদ্ধান্তেরই পরিচয় পাওয়া যায়। আসলে এ বিরোধ দৃষ্টিভঙ্গির—এখানে বিষয়বস্তু দু'টি মোটেই বড় নয়।

তিন

পার্থক্যটি যে মূলত দৃষ্টিভঙ্গির তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ প্রমথ চৌধুরীর বর্ষা-সম্পর্কিত অন্যান্য গল্পরচনা। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে 'বর্ষা'[৪] ও 'বর্ষার দিন'[৫]

রচনা দু'টি। 'বর্ষা' একটি অতি-সংক্ষিপ্ত গল্পরচনা, কিন্তু রচনাটির এমন একটি বৈশিষ্ট্য আছে, যা প্রমথ চৌধুরীর অন্যান্য রচনার মধ্যে সচরাচর দেখা যায় না। আত্মতন্ময় ভাবসাধনা ও হৃদয়াবেগের স্পন্দন তাঁর রচনায় দুর্লভ বললেই হয়, কিন্তু উক্ত প্রবন্ধে তিনি হৃদয়াবেগের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন। বর্ষার অবিশ্রান্ত ধারা, বাতাসের দীর্ঘশ্বাস ও আকাশের অপূর্ব স্নিগ্ধ প্রলেপ চৌধুরী মহাশয়ের যুক্তিবাদী ও বুদ্ধিধর্মী মনের ওপরে এক অপূর্ব আবেশ ছড়িয়ে দিয়েছে। রচনাটি সামান্য কয়েকটি রেখার স্ফটিক-স্বচ্ছ আলোকপাতে অপূর্ব হ'য়ে উঠেছে। রচনাটির প্রথমেই লেখক-মনের স্নিগ্ধ-সুকুমার প্রসন্নতা ফুটে উঠেছে। চৌধুরী মহাশয়ের মতো সতর্ক ও অতন্দ্রবুদ্ধির সাধকও যেন অনেকখানি আবিষ্ট হ'য়ে পড়েছেন। বর্ষার একটি মেঘমন্থর অলসপ্রহর তাঁর মনেও এক স্নিগ্ধ রসাবেশের সৃষ্টি করেছে। তাই তিনি বলেছেন, 'আজকের আকাশ দেখে মনে হয়, ছায়ার রঙের কোন পাখির পালক দিয়ে বর্ষা তাকে আগাগোড়া মুড়িয়ে দিয়েছে, তাই তার স্পর্শ আমাদের চোখের কাছে এত নরম, এত মোলায়েম।' এখানে বর্ষার বহিঃপ্রকৃতির কোনো অসঙ্গতি নিয়ে তিনি পরিহাস করেন নি—হৃদয়ের একটি নামহারা অনির্দেশ অনুভূতি তাঁকে ব্যাকুল ক'রে তুলেছে, 'মনের ভিতর আমার এখন আর কোন ভাবনাচিন্তা নেই, আছে শুধু এমন একটা অনুভূতি যার কোন স্পষ্ট রূপ নেই, কোন নির্দিষ্ট নাম নেই।'

আলোচ্য গল্পরচনাটিকে একটি ভাবঘন আত্মনিষ্ঠ রচনা বলা যেতে পারে। সামান্য উপাদান ঘিরে লেখকের নিটোল অনুভূতি একটি সূক্ষ্মরেখ ধূপের ধোঁয়ার মতো রচনাটির চারিদিকে একটি অপূর্বসুন্দর পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেছে। বর্ষার দিনের এই 'আনন্দে-বিষাদে মেশানো' অনুভূতিটি একমাত্র সঙ্গীতের মাধ্যমেই ফোটানো সম্ভব—সঙ্গীত ছাড়া এমন কোন মাধ্যম নেই যার সাহায্যে এই সূক্ষ্ম রসানুভূতি ফুটিয়ে তোলা যায়। হৃদয়ের অব্যক্ত অনুভূতির কথা প্রকাশ করতে গিয়ে তাঁর মনে পড়েছে বিভিন্ন বর্ষা-কবিতার নানা টুক্‌রো অংশ। এমন কি যে জয়দেবকে নিয়ে তিনি একাধিকবার ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেছিলেন, তাঁর কবিতাও হৃদয়ের গোপনপ্রান্তে অপূর্ব ধ্বনিতরঙ্গের সৃষ্টি করেছে। বর্ষা হৃদয়ে যে ব্যাকুলতা ও বেদনা জাগায়, তার অতি সামান্য অংশই প্রকাশ করা যায়, বেশীর ভাগই থাকে অব্যক্ত ও অপ্রকাশিত। লেখক এই অংশে কাব্যতত্ত্বের একটি মূলকথা বলেছেন। 'কাব্যে অস্পষ্টতা' নিয়ে এক সময় রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলালের মধ্যে যে

মতানৈক্যের সৃষ্টি হয়েছিল, তার ওপরেও এই অংশটি অপূর্ব আলোকপাত করেছে।

'আমি ভাবছি মানুষ ভাষায় তার মনের কথা কত অল্প ব্যক্ত করে, আর কত বেশি অব্যক্ত রয়ে যায়। ভাষায় মনোভাব ব্যক্ত করবার জন্যই যাঁরা এ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছেন তাঁরাও, অর্থাৎ কবির দলও, আমার বিশ্বাস, তাঁদের মনকে অর্ধেক প্রকাশ করেছেন, অর্ধেক গোপন রেখেছেন। আজকের দিনে রবীন্দ্রনাথের একটি পুরনো গানের প্রথম ছত্রটি ঘুরে ফিরে ক্রমান্বয়ে আমার কানে আসছে—"এমন দিনে তারে বলা যায়।" এমন দিনে যা বলা যায় তা হয়তো রবীন্দ্রনাথও আজ পর্যন্ত বলেন নি, শেক্সপীয়রও বলেন নি। বলেন যে নি, সে ভালোই করেছেন। কবি যা ব্যক্ত করেন তার ভিতর যদি এই অব্যক্তের ইঙ্গিত না থাকে তাহলে তাঁর কবিতার ভিতরে কোনো mystery থাকে না, আর যে কথার ভিতর mystery নেই, তা কবিতা নয়—পদ্য হতে পারে।'

বর্ষার গোপন-মাধুর্য চৌধুরী মহাশয়ের মুগ্ধ মনে যে শুধু অশরীরী বাসনা জাগিয়ে তুলেছে তাই নয়, রবীন্দ্রনাথের বর্ষা-সঙ্গীতের অন্তরালে যে অজস্র চিত্র-জগৎ আছে, তাও তাঁর ভাবদৃষ্টির সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়েছে। চণ্ডীদাসের কবিতায় তিনি বর্ষার রূপ দেখতে পান নি। বৈষ্ণবকাব্য সম্পর্কে তিনি যে মন্তব্য করেছেন, তা এই প্রসঙ্গে বিচার্য। তিনি বলেছেন, 'নবাবি আমলের বাঙালি কবিরা এ ঋতুকে হয় উপেক্ষা করেছেন, নয় তাকে তেমন আমল দেন নি। চণ্ডীদাসের কবিতায় কি বর্ষার স্থান আছে? আমার তো তা মনে হয় না। হয়তো বীরভূমে সেকালে বৃষ্টি হত না, তাই তিনি ও-ঋতুর বর্ণনা করেন নি। বাকি বৈষ্ণব কবিরাও এ বিষয়ে একরূপ নীরব। অবশ্য ঝড়বৃষ্টি না হ'লে অভিসার করা চলে না, সুতরাং অভিসারের খাতিরে তাঁদের কাব্যেও মেঘ-বজ্রবিদ্যুতের একটু-আধটু চেহারা দেখাতে হয়েছে; অর্থাৎ ও-ক্ষেত্রে বর্ষা এসেছে নিতান্ত আনুষঙ্গিকভাবে।' চৌধুরী মহাশয় জ্ঞানদাসের রচিত স্বপ্নে-মিলনের পদটি ছাড়া বৈষ্ণব-কাব্যে তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য বর্ষা-কবিতা খুঁজে পান নি। মনে হয় এ ক্ষেত্রে বৈষ্ণব কবিতার ওপর তিনি অবিচারই করেছেন। বৈষ্ণব সাহিত্যে বর্ষার একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। বর্ষার বহিরাকাশ ও রাধার মনের আকাশকে একই সূত্রে গাঁথা হয়েছে—বিশেষত বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাসের বর্ষা-কবিতাগুলি কাব্যাংশে তুলনাহীন। সুতরাং বৈষ্ণব কবিদের বর্ষাকাব্য সম্পর্কে চৌধুরী মহাশয়ের মন্তব্য মেনে নেওয়া যায় না।

কিন্তু রচনাটির বৈশিষ্ট্য অন্য কারণে। বর্ষার প্রভাবের মধ্যে যে নিবিড় আবেশ ও তন্ময়তা আছে, লেখক যেন তার জাদু স্পর্শে আচ্ছন্ন হ'য়ে পড়েছেন। তাঁর এই রচনাটি যে পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধ নয়, এ কথা তিনিও স্বীকার করেছেন। কারণ বর্ষা তাঁর অন্তর্লোকে যে মোহাবেশের সৃষ্টি করেছে, তাতে যুক্তি-শৃঙ্খল-সমন্বিত প্রবন্ধ-রচনা সম্ভব নয়। লেখক এখানে সম্পূর্ণভাবে তাঁর হৃদয়ের কাছে ধরা দিয়েছেন। ভালোলাগা-মন্দলাগা, স্মৃতি-বিস্মৃতির পর্যালোচনা ও মর্মগহনের অনাবিষ্কৃত ভাবসত্যকে আবিষ্কার করা—রচনাটিকে নূতন আস্বাদনে ভ'রে তুলেছে। বুদ্ধিবিলাসী লেখক ক্ষণেকের জন্য তাঁর নিজস্ব জগৎ ভুলে গিয়ে হৃদয়ানুভূতির কাছে ধরা দিয়েছেন—বাইরের মেঘমূর্ছিত পৃথিবী তাঁর বাসনা-লোককে আন্দোলিত করেছে—একটি নিবিড় মোহময় সুখালস্য বাণীবিলাসী মুখর লেখককে নীরব ক'রে দিয়েছে। এই কারণেই এই স্বল্পভাষী রচনাটি প্রমথ-সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী।

'বর্ষার দিন' রচনাটিতে লেখকের স্বতন্ত্র মনের ছাপ পড়েছে। এখানে তিনি প্রধানত ভারতবর্ষের বহু-বিচিত্র বর্ষা-সাহিত্যের আলোচনা করেছেন। প্রাচীন সংস্কৃতসাহিত্যে বর্ষা-বর্ণনার প্রাচুর্যের কারণ হ'লো এই যে 'বর্ষা দেখা দিত গ্রীষ্মের পিঠ পিঠ।' হর্ষচরিত থেকে অগ্নিরূপী গ্রীষ্মের বর্ণনা উদ্ধার ক'রে লেখক বলেছেন, 'যে ঋতুতে বাতাস আসে আগুনের হলকার মত, যে ঋতুতে আলোক অগ্নির রূপ ধারণ করে, যে ঋতুতে পত্র পুষ্প সব জ্বলে পুড়ে ছাই হ'য়ে যায়, আর বৃক্ষলতা সব কঙ্কালসার হ'য়ে ওঠে, সে ঋতুর অন্তে বর্ষার আগমন, প্রকৃতির ঘরে নবজীবনের আগমন।' গ্রীষ্মের বহিঃপ্রকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতির সঙ্গে বর্ষার বৈপরীত্য এত বেশী যে এই ঋতু সহজেই 'প্রাণিনাং প্রাণভূতো' হ'য়ে উঠেছে।

বর্ষা আমাদের দেশে একটি আকস্মিক বিপর্যয়ের মতো উপস্থিত হয়—পূর্ববর্তী ঋতুর সঙ্গে এর কোন মিলই নেই। ইউরোপীয় সাহিত্যে বর্ষার এই অনিন্দ্যসুন্দর মূর্তির কোন ছবিই নেই। ইউরোপীয় সাহিত্যের বর্ষা-বর্ণনা করতে গিয়ে কথাকুশলী লেখক অপূর্ব বাক্-চাতুর্যের পরিচয় দিয়েছেন। বর্ণনাটিতে যেমন হাসি পায়, তেমনি মনের মধ্যে ইউরোপীয় বর্ষার একটি স্পষ্ট ছবি ফুটে ওঠে। শ্লেষাত্মক বর্ণনা ও গদ্যাত্মক প্রাত্যহিক উপমা-বিন্যাসে প্রমথ চৌধুরী অদ্বিতীয় শিল্পী। ইউরোপীয় বর্ষা-বর্ণনা এই জাতীয় শিল্পের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ,—

'—ইংলণ্ডে দেখেছি, সেখানে বৃষ্টি আছে কিন্তু বর্ষা নেই। বিলিতি প্রকৃতি সদাসর্বদা মুখ ভার ক'রে থাকেন এবং যখন তখন কাঁদতে শুরু করেন, আর সে কান্না হচ্ছে নাকে-কান্না, তা দেখে প্রকৃতির উপর মায়া হয় না, রাগ ধরে। সে দেশে বিদ্যুৎ রণ-পতাকা নয়—পিদিমের সল্‌তে, তার মুখের আলো প্রকৃতির অট্টহাসি নয়—রোগীর মুখের কষ্টহাসি। আর সে দেশের মেঘের ডাক অশনিশব্দমর্দল নয়, গাব-চটা বাঁয়ার বুকচাপা গ্যাঁঙরানি। এক কথায় বিলেতের বর্ষা থিয়েটারের বর্ষা। ও গোলাপপাশের বৃষ্টিতে কারও গা ভেজে না, ও টিনের বজ্রধ্বনিতে কারও কান কালা হয় না, ও মেকি বিদ্যুতের আলোতে কারও চোখ কানা হয় না। বিলেতের বর্ষার ভিতর চমকও নেই, চটকও নেই। ও রকম ঘ্যানঘেনে প্যানপেনে জিনিস কবির মনকে স্পর্শ করে না, তাই বিলেতি সাহিত্যে বর্ষার কোন রূপবর্ণনা নেই।'

অপর পক্ষে তিনি ভারতীয় সাহিত্য থেকে উদাহরণ নিয়ে দেখিয়েছেন যে—'বর্ষার রূপ এ দেশে সনাতন, তাই তার বর্ণনাও সনাতন।' বর্ষাকে ভারতীয় সাহিত্যে দিগ্‌বিজয়ী রাজা রূপে আঁকা হয়েছে। বর্ষার এই রাজবেশ শুধু কালিদাসের কাব্যেই নয়, হিন্দী সাহিত্যে ও বাংলা সাহিত্যেও তার রাজকীয় বৈভবের ছবি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। কালিদাসের পূর্ববর্তী কালেও যে বর্ষার রাজবেশ, বিদ্যুৎপতাকা ও পটহনিনাদের বর্ণনা সংস্কৃত সাহিত্যে লক্ষণীয়, প্রবন্ধকার তার কথাও বলেছেন।

এইখানেই প্রবন্ধটির প্রথমার্ধ শেষ হয়েছে। প্রবন্ধটির শেষার্ধে লেখক বর্ষা অবলম্বন ক'রে নানাপ্রকার আলোচনার অবতারণা করেছেন। বহুকাল থেকে একটি বিশ্বাস চলে আসছে যে 'পয়লা আষাঢ়ে বৃষ্টি নামতে বাধ্য'। সম্ভবত, কালিদাসের মেঘদূত কাব্য থেকেই এই জাতীয় সংস্কার গড়ে উঠেছে। 'মেঘদূত' পড়ে যাঁরা কালিদাসকে জিয়োগ্রাফার, অর্নিথলজিষ্ট বা মেটিয়রলজিষ্ট বলে মনে করেন, তাঁদের সঙ্গে প্রবন্ধকারের মতের কোন মিল নেই। মেঘদূতের সংস্কারে বাঙালীর মনও যে কেন পয়লা আষাঢ়ে নৃত্য করতে থাকে, তা লেখক উপলব্ধি করতে পারেন নি, কারণ ভারতবর্ষের যে উত্তরখণ্ড মেঘদূতের জগৎ তা বাংলাদেশ থেকে দেড়হাজার মাইল দূরবর্তী। দ্বিতীয়ত কালিদাসের বর্ণনা থেকেও পয়লা আষাঢ়েই যে বৃষ্টি নামে তার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। লেখক এখানে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ বুদ্ধি-কৌশলে প্রমাণ করেছেন যে বাংলাদেশে বাস করে পয়লা আষাঢ়ে 'উৎফুল্ল হ'য়ে ওঠা'র পেছনে কোন যুক্তি নেই।

এর পরে প্রবন্ধকার 'আষাঢ়ে গল্প' কথাটির সম্ভাব্যতা বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর মতে গল্পের প্রশস্ত সময় শীতের রাত্রি। কারণ শীতকালে রাত বড়, দিন ছোট। তা ছাড়া রাত্রির অবকাশই গল্প বলার ও শোনার শ্রেষ্ঠকাল। এই কারণেই সম্ভবত আরব্য উপন্যাসের গল্পগুলি রাত্রিতেই বলা হয়েছিল। আষাঢ়ে দিন বড়, রাত ছোট এবং সেইজন্য 'দিনের আলোতে আলাদীনের প্রদীপ জ্বালানো যায় না।' এই বিষয়টি আলোচনা করতে গিয়ে দার্শনিক বিচারের নানা কূট-তর্ক অবতারণা করেছেন। কোয়ান্‌টিটি ও কোয়ালিটি তত্ত্বের মধ্যে তিনি প্রবেশ করেছিলেন, আবার পূর্ব-প্রসঙ্গে ফিরে এসেছেন। এই জাতীয় প্রসঙ্গের আকস্মিক পরিবর্তন প্রমথ চৌধুরীর গদ্যরচনার বৈশিষ্ট্য। প্রবন্ধের প্রকৃষ্ট বন্ধনকে স্বীকার না ক'রে তিনি আলাপচারী মানুষের কথকতার রীতিকেই গ্রহণ করেছেন।

লেখক আবার 'আষাঢ়ে গল্পে'র প্রসঙ্গেই ফিরে এসেছেন। তিনি একটি প্রশ্ন তুলেছেন যে 'আষাঢ়ে' শব্দটির সঙ্গে 'আজাড়ে' শব্দটির কোন সম্পর্ক আছে কিনা। লেখকের বিচিত্রধর্মী কৌতূহল যে শব্দতত্ত্ব পর্যন্ত প্রসারিত, আষাঢ়ে শব্দের বুৎপত্তি নির্ণয়ে তিনি তার পরিচয় দিয়েছেন। 'আজাড়' শব্দ কোন সংস্কৃত কোষে পাওয়া যায় না। ভাষাবিজ্ঞানে যাকে Analogy বলে, তার থেকেই লেখক এই শব্দটির বুৎপত্তি নির্ণয় করেছেন। মূল বক্তব্যকে একটু আড়ালে রেখে লেখক শব্দতত্ত্ব নিয়ে মেতে উঠেছেন। 'উজাড়' শব্দের Analogy থেকে লেখক অনুমান করেছেন যে 'অজাড়ে' কথার অর্থ অমূলক গল্প। তিনি আরও অনুমান করেন যে 'আষাড়ে'-র শুদ্ধ সংস্করণ 'আষাঢ়ে'।

প্রমথ চৌধুরীর মতে বর্ষা গল্পের ঋতু নয় গানের ঋতু। আর গল্পের ঋতু যদি আদৌ কিছু থেকে থাকে, তবে সে হ'লো শীত। বাংলা সাহিত্যে মেঘরাগের অজস্র সঙ্গীতই তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ। জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' কাব্যের প্রথম চরণ উদ্ধার করে তিনি তার চিত্রধর্মের কথা আলোচনা করেছেন। জয়দেবের কাব্যের চিত্রসৌন্দর্য থেকে তিনি উপস্থিত হয়েছেন কাব্যতত্ত্বের গভীরে। যুগযুগান্তরব্যাপী 'কাব্য কি বস্তু'—নিয়ে আলোচনা চলে আসছে। 'ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' সম্পর্কে যেমন দার্শনিকেরা নেতি নেতি করে অগ্রসর হয়েছেন, কাব্যজিজ্ঞাসা সম্বন্ধেও তাই। রীতি, নীতি, ভাষা ও ভাবকে অতিক্রম ক'রে কাব্যের প্রাণকে উপলব্ধি করার চেষ্টা হয়েছে। কাব্যের মূলে রয়েছে এক জাতীয় রহস্য—এ রহস্যের কথা বুঝেও দেহের মধ্যেই প্রাণের সন্ধান চলেছে। কাব্যে বহিরঙ্গের সঙ্গে প্রাণের সম্পর্ক থাকার জন্য বহিরঙ্গ আলোচনা করলেও

প্রাণের-পরিচয় পাওয়া যায়। জয়দেবের কাব্যের গীতি-মূর্ছনা, অনুপ্রাস প্রভৃতি অনেক সময় আমাদের মুগ্ধ করেছে। অথচ উক্ত কবির কাব্যের এমন অনেক অংশ আছে যাতে অলঙ্কারাদি আছে, কিন্তু যথার্থ রসধ্বনি নেই।

শ্রেষ্ঠকাব্য শব্দালঙ্কার বা অর্থালঙ্কারের অতিরিক্ত। কিন্তু তাই বলে অলঙ্কারের কোনো মূল্য নেই, একথা বলা যায় না। অলঙ্কার অনেক সময় কবিতার রূপটিকে আমাদের হৃদয়ে সঞ্চারিত করে। লেখক বৈষ্ণব কাব্য থেকে দুটি বিখ্যাত বর্ষার পদ উদ্ধার করে দেখিয়েছেন যে বাংলা সাহিত্যের বর্ষা-বর্ণনা চিত্র-প্রধান নয় সঙ্গীত-প্রধান। এইজন্যই বর্ষার কবিতায় উপমার চেয়ে অনুপ্রাস বেশী। রবীন্দ্রনাথের বর্ষা-কবিতার মধ্যে চিত্র ও সঙ্গীতের সমন্বয় ঘটেছে, 'সংস্কৃত কবির চোখ বাঙালি কবির কান এ দুই-ই তাদের পূর্ণ অভিব্যক্তি লাভ করেছে রবীন্দ্রনাথের কাব্যে।' রবীন্দ্রনাথের 'এমন দিনে তারে বলা যায়'—গানটিকে চৌধুরী মহাশয় একটি perfect সৃষ্টি হিসেবে উল্লেখ করেছেন —কারণ এখানে ভাব ও ভাষা 'পার্বতী-পরমেশ্বর' একাত্মতায় বিধৃত। প্রবন্ধটিতে বিষয়ান্তরের বৈচিত্র্য আছে—বর্ষার কথা থেকে কবি সর্বশেষে কাব্য-জিজ্ঞাসায় এসে পৌছেছেন। কিন্তু কোনো প্রসঙ্গই শুষ্ক ও বৈচিত্র্যহীন হয় নি। নানা আলোচনার মধ্যে কথা-বিস্তারের রসটুকু সহজে উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। তাই এখানকার প্রসঙ্গচ্যুতি রসাস্বাদনের বিঘ্ন ঘটায় না, বরং একটি বিদগ্ধ-জীবনের রূপ-রস-পিপাসা 'উপরি-পাওনা' হিসেবে লাভ করা যায়।

চা র

ইতিহাসকে কেন্দ্র ক'রে প্রমথ চৌধুরী অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। এ ক্ষেত্রেও তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। ইতিহাসকে নিয়ে তিনি যে সমস্ত প্রবন্ধ লিখেছিলেন তাদের মোটেই গবেষণামূলক প্রবন্ধ বলা যায় না। ইতিহাসকে তিনি অনেক সময় যুক্তি ও বুদ্ধির সাহায্যে ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করেছেন। ইতিহাস যে শুধু অতীতের জীর্ণ কঙ্কাল অথবা শুষ্ক তথ্য-বিবৃতি মাত্র নয়, এই শ্রেণীর লেখাগুলির মধ্যে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। পুরাবস্তু ও পুরাকথার মধ্যেও তিনি তাঁর বিদগ্ধ জীবনের সন্ধানী আলো ছড়িয়ে দিয়েছেন। কিন্তু ইতিহাসকে সুলভ রোম্যান্সে পরিণত করে দেখতেও তিনি অভ্যস্ত ছিলেন না। তাঁর ভ্রাম্যমান কৌতূহলী মন যেমন তুচ্ছ বিষয়কে ঘিরে বিচিত্র পথ পরিক্রমা করেছে, এখানেও তার ব্যতিক্রম ঘটে নি।

'নানাচর্চা'র বেশীর ভাগ প্রবন্ধই ইতিহাস অবলম্বন করে লেখা। এই সংকলনটির মধ্যে 'বীরবল' রচনাটি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। কারণ চৌধুরী মহাশয় 'বীরবল' নামটিকে ছদ্মনাম হিসেবে ব্যবহার করেছেন। শুধু তাই নয় 'বীরবল' নামটি 'প্রমথ চৌধুরী'র চেয়ে বাঙালী পাঠকদের কাছে অনেক বেশী পরিচিত। 'বীরবল' প্রবন্ধের প্রাথমাংশটি লেখকের আত্মকাহিনীর মতো মনে হয়। কেন যে তিনি বীরবল ছদ্মনাম গ্রহণ করেছিলেন তার কথাও এই প্রবন্ধে বলেছেন। তারপরে প্রবন্ধের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ জুড়ে আছে ঐতিহাসিক বীরবলের জীবনী। জীবনীটি অবশ্য তিনি ভিনসেণ্ট স্মিথের Akbar, the Great Mogul, নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ থেকে সংগ্রহ করেছেন, তবু এইটুকুই এর সম্বন্ধে সম্পূর্ণ কথা নয়। স্মিথ সাহেবের বই থেকে উপাদান সংগ্রহ করলেও, লেখক নিজেও প্রয়োজন মতো টিকা-টিপ্পনী করেছেন। তার ফলে প্রবন্ধটি উপভোগ্য হ'য়ে উঠেছে।

প্রবন্ধটির প্রথমে তিনি বীরবল নামটির সঙ্গে তাঁর পরিচয়ের যে সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দিয়েছেন, তাতে সাহিত্যিক বীরবলের ছদ্মনাম গ্রহণের ইতিহাসটুকুও উদ্ভাসিত হয়েছে। এগার বছর বয়সে মজঃফরপুরে বীরবলের সঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর পরিচয় ঘটে। তাঁর বাবা উর্দু বই থেকে তাঁদের বীরবলী কেচ্ছা পড়ে শোনাতেন। 'এর অধিকাংশ কেচ্ছাই এই বলে শুরু হত "আক্‌বর বীরবল নে পুছা," আর শেষ হত বীরবলের উত্তরে।' বালক প্রমথ চৌধুরীর তখনকার সম্বল ছিল তারিণীচরণের ভারতবর্ষের ইতিহাস, কিন্তু সেই বালপাঠ্য ইতিহাস-টিতে আকবরের নাম থাকলেও বীরবলের নাম ছিল না। তথাপি তিনি বীরবলের মহাভক্ত হ'য়ে উঠলেন। এর কারণ হ'লো এই যে বীরবলের উপস্থিত বুদ্ধি ছিল অসাধারণ। উপস্থিত বুদ্ধি ও বাক্‌চাতুর্য না থাকলে তিনি আকবরের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারতেন না। চৌধুরী মহাশয়ের মুখেই তাঁর এই বীরবল-অনুরাগের ইতিহাস শোনা যাক, 'আকবরের প্রশ্নের উত্তরে বীররলের চেথাচোখা জবাব শুনে আমি মনে মনে তাঁর মহাভক্ত হয়ে উঠলুম। প্রশ্ন করতে পারে সবাই, কিন্তু উত্তর দিতে পারে ক'জন? আর যে-পারে আমার বালক-বুদ্ধি তাকেই প্রশ্নকর্তার চাইতে উঁচু আসনে বসিয়ে দিলে।...তখন মনে ভাবতুম, হায়, আমার মুখে যদি বীরবলের রসনা থাকত তাহলে এইসব ঘরো আকবর শাহদের বোকা বানিয়ে দিতুম।'

বীরবল-সম্পর্কিত কৌতুহলের দ্বিতীয়বার যবনিকা উত্তোলিত হয়েছে চৌধুরী

মহাশয়ের বিলাত-প্রবাসকালে। তিনি তাঁর মুসলমান বন্ধুদের কাছে বীরবলের রসিকতা সম্পর্কে অনেক গল্প শুনেছিলেন। এই গল্পের মধ্যে মৌলবী দো-পিয়াঁজা নামে একজন রসিকের নাম পাওয়া যায়—তিনি নাকি বীরবলকে তাঁর রসিকতার দ্বারা পরাজিত করতেন। চৌধুরী মহাশয় মনে করেন যে মৌলবী দো-পিয়াঁজ নামটি সম্পূর্ণ কাল্পনিক—বীরবলের দেশব্যাপী খ্যাতির জন্য 'তার পাল্টা জবাব দিতে পারে এমন একজন মুসলমান রসিক কল্পিত হয়েছে।' তা ছাড়া, তাঁর নামে যে সমস্ত রসিকতা চলে আসছে, তা মোটেই সাহিত্য-পদবাচ্য নয়, স্থূলরুচিতে পরিপূর্ণ। 'বীরবল' ছদ্মনাম গ্রহণের পিছনে চৌধুরী মহাশয়ের দুটি অভিপ্রায় প্রবল ছিল, 'প্রথমত নামটি ছোট, দ্বিতীয়তঃ শ্রুতিমধুর।'—এ ছাড়া আর একটি কারণও বোধ হয় সক্রিয় ছিল। বীরবলের বাক্-চাতুর্য, তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও রসিকতা এই তীক্ষ্ণধী বাঙালী লেখককে মুগ্ধ করেছিল।

স্মিথ সাহেবের ইতিহাস থেকে তিনি বীরবলের জীবনী সংগ্রহ করেছেন। জীবিতকালে বীরবল যে নিন্দা-প্রশংসার সমভাগী ছিলেন এর বিস্তৃত পরিচয় তিনি দিয়েছিলেন। স্মিথ সাহেব ফতেপুরসিক্রিতে বীরবলের সুদৃশ্য বাসভবনের বর্ণনা করেছেন, সেটি ছিল আস্তাবলের কাছাকাছি। এর থেকে ঐতিহাসিক মহাশয় অনুমান করেছেন যে 'he may have been master of Horse.' প্রবন্ধকার এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করতে পারেন নি, 'আলীপুরে লাটসাহেবের বাড়ীর পাশেই আছে পশুশালা, এর থেকে লাটসাহেবকে পশুশালার অধ্যক্ষ বলে ধরে নেওয়াটা ঐতিহাসিক বুদ্ধির কাজ হতে পারে 'কিন্তু সহজ বুদ্ধির কাজ নয়।' কাবুলের যুদ্ধে বীরবলের পলায়ন ও তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে স্মিথ সাহেব তারিখ-ই-বদাউনি গ্রন্থ থেকে উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন। বদাউনি কোন কালেই বীরবলের ওপর প্রসন্ন ছিলেন না। প্রমথ চৌধুরীর মতে বিদূষক বীরবলের পক্ষে অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী না হওয়া এমন কিছু অগৌরবের নয়। আকবরের ধর্মবিষয়ক ঔদার্যকে বদাউনি কোনদিন সুনজরে দেখতে পারেন নি। ধর্ম সম্পর্কে আকবরের র‍্যাশান্যালিজম্-এর জন্য তিনি তিনজনকে দায়ী করেছেন—ফৈজী, আবুল ফজল ও বীরবল—'এই তিনি গ্রহ একত্র মিলে আকবরের কুবুদ্ধি ঘটায়, আর এ তিনজনের মধ্যে শনি ছিলেন বীরবল।' আবার অন্যদিকে সেকালের হিন্দুরা বীরবল সম্পর্কে সপ্রশংস উক্তি করেছেন। কবি কেশবদাসের 'রসিক-প্রিয়া' কাব্যের ভণিতাংশ উদ্ধার ক'রে প্রবন্ধকার দেখিয়েছেন যে বীরবল glorious death বরণ করেছেন।

স্মিথ সাহেবের বীরবল-জীবনীর সমালোচনা করতে গিয়ে লেখক কোনো নূতন ঐতিহাসিক তথ্য পরিবেশন করেন নি। সাধারণ বুদ্ধির ওপরে নির্ভর ক'রেই তিনি স্মিথ সাহেবের মতামত আলোচনা করেছেন। এতে খাঁটি ঐতিহাসিক প্রবন্ধের পদ্ধতি অনুসারণ করা হয় নি, কিন্তু এই ইতিহাস-বিখ্যাত বিদূষকটিকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে তিনি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ কথাকৌশল হারান' নি। প্রবন্ধের উপসংহারে তিনি 'বীরবল' ছদ্মনাম গ্রহণ সম্পর্কে রসিকতা ক'রে বলেছেন, 'আমি কবিও নই গায়কও নই, গল্প-রচয়িতাও নই। তারপর রাজদরবার আমি কখনও দূর থেকেও দেখি নি। কাবুলের যুদ্ধ করতে যাবার আমার কোনরূপ অভিপ্রায়ও নেই, সম্ভাবনাও নেই। তারপর আমি কাউকেও নূতন ধর্মপ্রচার করতে কখনো প্ররোচিত করি নি। আমি বাঙালি বিদূষক মাত্র। তবে রসিকতাচ্ছলে সত্যকথা বলতে গিয়ে ভুল করেছি। কারণ, নিত্য দেখতে পাই যে, অনেকে আমার সত্যকথাকে রসিকতা বলে, আর আমার রসিকতাকে সত্য বলে ভুল করেন।' কিন্তু বীরবলের সঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর সম্পর্ক এইটুকুর মধ্যেই শেষ হয়েছে ব'লে মনে হয় না। ঐতিহাসিক বীরবল শুধু রসিকতাই করতেন না, আকবরকে গুরুতর বিষয়ে পরামর্শও দিতেন। সাহিত্যিক বীরবলও লঘুচালে ও হাল্‌কাভঙ্গিতে অনেক গভীর কথা বলেছেন—তবে দুঃখের বিষয় তাঁর 'সত্য কথাকে রসিকতা' এবং 'রসিকতাকে সত্য কথা' বলে অনেক সময় ভুল করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, বীরবল ছিলেন রাজসভার বিদূষক। সুতরাং দরবারী পরিবেশের বৈদগ্ধ্য তাঁর অধিগত ছিল। প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যিক মেজাজের সঙ্গে বীরবলের এ দিক থেকেও একটি মিল খুঁজে পাওয়া যায়। ভারতচন্দ্রের ওপর তাঁর অসাধারণ অনুরাগের মূলে অন্য অনেকগুলি কারণের সঙ্গে এও একটি কারণ ছিল। দরবারী পরিবেশের আমেজ তাঁর নানা রচনায় ছড়িয়ে আছে। তাই মধ্যযুগের আর একজন কথাকুশলী সভাসদ্‌কে তিনি অনায়াসে চিনে নিয়েছেন।

পাঁচ

'পাঠান-বৈষ্ণব রাজকুমার বিজুলি খাঁ (নানা-চর্চা) প্রবন্ধটিতে একটি অপ্রধান ঐতিহাসিক চরিত্র ও ঘটনা থেকে প্রবন্ধকার নূতন তাৎপর্য আবিষ্কার করেছেন। নাবাবি আমলের বাংলাসাহিত্য সম্পর্কে তাঁর একটি বিশেষ রকমের কৌতূহল ছিল, যার পরিচয় তাঁর কয়েকটি প্রবন্ধে ছড়িয়ে আছে। এই

যুগের বাংলাসাহিত্য থেকে অনেক 'ঐতিহাসিক তত্ত্ব' উদ্ধার করা যায়। সেকালের বাঙালিরা যদিও ইতিহাস লেখেন নি, তথাপি তাঁদের লেখায় 'এমন অনেক ঘটনার উল্লেখ' আছে, 'যার গায়ে সত্যের স্পষ্ট ছাপ আছে'। চৈতন্য-চরিতামৃতের অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে কবিরাজ গোস্বামী মহাপ্রভুর বৃন্দাবন-প্রত্যাবর্তনের পথের এক অদ্ভুত কাহিনীর কথা বলেছেন। ঐ ঘটনা অবলম্বন ক'রে প্রবাসী পত্রিকায় অমৃতলাল শীল একটি ঐতিহাসিক প্রবন্ধ লেখেন। শীল মহাশয়ের মতে 'চরিতামৃতে যাঁকে বিজুলি খাঁ বলা হয়েছে, তাঁর প্রকৃত নাম আহম্মদ খাঁ।' কিন্তু প্রবন্ধকার মনে করেন যে 'চৈতন্যের যুগে বিজুলি খাঁ নামে একটি স্বতন্ত্র ও স্বনামখ্যাত রাজকুমার' ছিলেন। চৈতন্যচরিতামৃত থেকে প্রবন্ধকার উক্ত ঘটনাংশের কিছু কিছু উদ্ধৃতি দিয়ে গল্পটা বলেছেন: কেমন ক'রে মহাপ্রভুর প্রেমাবেশের অবকাশে দশজন পাঠান-সৈন্য তাঁর পাঁচজন অনুচরকে বেঁধে নিল এবং কেমন ক'রেই বা তাদের পীর ও রাজকুমার বিজুলি খাঁন মহাপ্রভুর অনুরক্ত হ'য়ে পড়লেন তার কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনী বিবৃত হয়েছে।

প্রবন্ধকার এই ঘটনার তাৎপর্য নির্ণয়ের আগে সেকালের ঐতিহাসিক পটভূমির আলোচনা করেছেন। সিকন্দার লোদির আমলে হিন্দুবিদ্বেষ ও হিন্দু দেবমন্দিরাদি ধ্বংস যে কতদূর চূড়ান্ত সীমায় উঠেছিল প্রামাণ্য ইতিহাস থেকে তার বর্ণনা করেছেন। এই সময়ে হিন্দুধর্ম নবরূপ ধারণ করে, ভক্তিমার্গ অবলম্বন ক'রে এর বিকাশ ঘটে। মুসলমান ধর্মশাস্ত্রীরাও এই নবধর্মকে সুনজরে দেখলেন না, কারণ তাঁদের ধারণা হ'ল যে প্রবলভক্তির স্রোতে বোধ হয় মুসলমানরাও ভেসে যাবে। বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের ফলে যে কোন কোন ব্রাহ্মণের প্রাণদণ্ড হয়, তার প্রমাণ ইতিহাসে পাওয়া যায়। চৌধুরী মহাশয় অনুমান করেন যে, সে যুগের বাংলা ও আগ্রার মৌলভীরা 'ভয় পেয়েছিলেন যে উক্ত ধর্মের প্রশ্রয় দিলে কোনো পাঠানও এই নববৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষিত হবে, যেমন বিজুলি খাঁ পরে হয়েছিলেন।'

মুসলমান পীরের সঙ্গে মহাপ্রভুর শাস্ত্র-বিচারের যে আখ্যায়িকাটি চরিতামৃতে বর্ণিত হয়েছে, তার থেকে প্রবন্ধকার সে যুগের ধর্মীয় চেতনার স্বরূপটিকে আবিষ্কার করেছেন। মুসলমান পীরের কথা শুনলে মনে হবে যে একজন শঙ্করপন্থী অদ্বৈতবাদী কথা বলেছেন। মহাপ্রভুও মুসলমান শাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন। এ সব ঘটনা থেকে চৌধুরী মহাশয় যে সিদ্ধান্তে এসেছেন তার

মৌলিকত্ব বিস্মিত করে। তিনি বলেছেন, 'আমার বিশ্বাস, সে-যুগে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের পণ্ডিতমহলে শাস্ত্রবিচার চলত, এবং হিন্দু-মুসলমান শাস্ত্রীরা উভয় সম্প্রদায়ের ধর্মমতের আসল কথা সব জানতেন।' চৌধুরী মহাশয় মনে করেন 'ও যুগটা ছিল এ দেশের ধর্মের ইণ্টারন্যাশালিজমের যুগ'। বিশেষ ধর্ম-সম্প্রদায় ও নির্বিশেষ ভক্তিভাব—একই সঙ্গে এই দুয়েরই প্রতি আনুগত্য অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছে। তাই পাঠানরাও স্বধর্ম রক্ষা ক'রে পরম বৈষ্ণব হ'তে পারতেন। মুসলমানরাও যে স্বধর্ম ত্যাগ ক'রে হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেছিল, একথা আজ অবিশ্বাস্য ব'লে মনে হ'লেও এককালে যে সত্য ছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই, কারণ 'হিন্দুসমাজের দরজা আজ বন্ধ হ'লেও অতীতে খোলা ছিল।' তা ছাড়া বৈষ্ণবধর্ম ও মুসলমান ধর্ম এত পাশাপাশি এসে দাঁড়িয়েছিল যে, এই নব-হিন্দুধর্মের মধ্যে মুসলমানরাও অনায়াসে প্রবেশাধিকার পেয়েছিল। বিজুলি খাঁ কালিঞ্জরের নবাব হ'য়েও পরমভাগবত ব'লে পরিচিত হয়েছিলেন। লেখক সে যুগের ধর্মীয় চেতনার স্বরূপ বিচার ক'রে চরিতামৃতের বর্ণনাটি যে ঐতিহাসিক ভিত্তির ওপরে প্রতিষ্ঠিত, তাই প্রমাণ করেছেন।

প্রবন্ধের উপসংহারে লেখক ঐতিহাসিক সত্য ও বৈজ্ঞানিক সত্য সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন, তা প্রণিধানযোগ্য—কারণ এই বিশ্লেষণের আলোকে প্রমথ চৌধুরীর এই জাতীয় প্রবন্ধের মূল প্রকৃতি উপলব্ধি করা যায়। তিনি বলেছেন, '...আমরা যাকে ঐতিহাসিক সত্য বলি, তার ভিতর থেকে অনেকখানি খাদ বাদ না দিলে তা বৈজ্ঞানিক সত্য হয় না। ঐতিহাসিক সত্য হচ্ছে অসত্য ও বৈজ্ঞানিক সত্যের মাঝামাঝি একরকম সত্যাসত্য মাত্র।' আপাতদৃষ্টিতে এই উক্তিটি প্যারাডক্স ব'লে মনে হবে, কিন্তু একটু অনুধাবন করলে দেখা যাবে যে এর মধ্যে অনেকখানি সত্য আছে। ঐতিহাসিক তথ্যের ওপর নির্ভর ক'রে একটি সত্যের সমীপবর্তী হওয়া যায়, এই জাতীয় বিচারকে এক জাতীয় বৈজ্ঞানিক বিচার বলা চলে। কিন্তু ইতিহাসের আর এক শ্রেণীর বিচার আছে, যাকে বিচার না ব'লে এক শ্রেণীর ব্যাখ্যা বলাই বোধ হয় অধিকতর সঙ্গত। একে চৌধুরী মহাশয় অবশ্য 'একরকম সত্যাসত্য' বলেছেন, কিন্তু দেখা যাবে এই শ্রেণীর ব্যাখ্যায় ইতিহাসের একটি জীবন্তরূপ ধরা পড়ে। সেখানে সমসাময়িক দেশ-কালের সমগ্র রূপ থেকে ব্যাখ্যাতা একটি বিশেষ সিদ্ধান্তে আসেন। পূর্বাপর বিচারের মধ্যে কিছু কিছু অনুমানও করতে হয়। সেখানে সত্যাসত্য নিয়ে ইতিহাসের যে রূপ জেগে ওঠে, তার

মূল্যও কম নয়। প্রবন্ধকার পাঠান-বৈষ্ণব বিজুলি খাঁর স্বরূপ নির্ণয় করতে গিয়ে দ্বিতীয় পদ্ধতিটিই অবলম্বন করেছেন। কিছু ইতিহাসের সত্য এবং কিছু অনুমান—এখানে দুই-ই আছে। তবে অনুমান নিছক কল্পনা-প্রসূত নয়, দেশ-কালের গতি-প্রকৃতির ওপরে নির্ভরশীল।

'প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে হিন্দু-মুসলমান'[৬] প্রবন্ধটিতে উপাদান ও তথ্যসঙ্কলনও কম নেই। বিষয়গৌরব ও তথ্যের যাথার্থ্য থাকা সত্ত্বেও প্রবন্ধটির রসধর্ম ব্যাহত হয় নি—তথ্য ও উপাদানের অজস্রতাকে অতিক্রম ক'রে সহজ ও অন্তরঙ্গ রীতিই আত্মপ্রকাশ করেছে। প্রাচীন বাংলাসাহিত্যের মধ্যে সেই যুগের সামাজিক ছবি পাওয়া যায়। সেই সামাজিক ছবি থেকে লেখক এই যুগের হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের ওপর আলোকপাত করেছেন। মুসলমান আমলের প্রায় ছ'শো বছরের বাংলাসাহিত্যের গতি-প্রকৃতির আলোচনা ক'রে লেখক তাঁর সিদ্ধান্তে এসে পৌছেছেন। তাঁর সিদ্ধান্ত হ'ল, '…যে কালে বাংলাসাহিত্য জন্মলাভ করে অন্তত সে সময় এদেশে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই মোটের উপর মিলে-মিশে বাস করতে শিখেছিল, এবং তাদের পরস্পরের ভিতর যে সব বিরোধের কারণ ছিল তার একটা আপস-মীমাংসা তারা করে নিয়েছিল।'

শূন্যপুরাণকে কেউ কেউ চণ্ডীদাসের পূর্ববর্তী কাব্য ব'লে মনে করেন। সেখানে হিন্দু-মসলমানের যে সম্পর্ক বর্ণিত আছে, তাকে সত্য বলে মনে করলে বলতে হয় যে নিম্নবর্ণের হিন্দুরা ছিল ঘোরতর ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষী—মুসলমান কর্তৃক 'ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিনাশ'কে তারা আনন্দের বিষয়ই মনে কর'ত 'এক কথায় তারা মুসলমানদের ব্রাহ্মণ-অত্যাচারের হাত থেকে দেশের লোকের উদ্ধারকর্তা মনে করত।' চণ্ডীদাসের পদাবলীর মধ্যেও কোথাও হিন্দু-মুসলমান বিরোধের ছবি পাওয়া যায় না। তবে চৈতন্যদেবের প্রবর্তিত নব-বৈষ্ণবধর্মের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু-মুসলমান বিরোধের কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। মুসলমান রাজপুরুষদের সঙ্গে বৈষ্ণব সমাজের বিরোধ ঘটেছিল। জয়ানন্দ ও লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গলের মধ্যে নবদ্বীপে রাজভয়ের বর্ণনা আছে। কিন্তু প্রবন্ধকার আলোচনা ক'রে দেখিয়েছেন যে হুসেন শা যে নবদ্বীপের ব্রাহ্মণদের ওপর অত্যাচার করেছিলেন তার মূল কারণ political, religious নয়। কিন্তু জয়ানন্দ এ কথাও বলেছিলেন যে হুসেন শাই আবার হিন্দুদের স্বধর্ম পালন করার অধিকার দেন,

'দেউল দেহরা ভাঙ্গে অশ্বত্থ যে কাটে।
ত্রিশূলে চড়াই তাকে নবদ্বীপের হাটে'।

যবন হরিদাসকে যখন বাদশার কাছে ধ'রে এনে কেন তিনি হিন্দুর আচার-আচরণ অনুষ্ঠান করলেন, জিজ্ঞাসা করা হ'লো, তখন হরিদাস বললেন, 'পরমার্থে এক কহেঁ কোরাণে-পুরাণে।' হরিদাসের এই কথা শুনে 'সন্তোষ হৈল সকল যবন ॥' হিন্দু-মুসলমানের ধর্ম-বিরোধ বর্তমান রাজনীতির ক্ষেত্রে একটি প্রধান বিষয় হ'লেও, লেখকের মতে 'সে বিরোধ বাঙালি উত্তরাধিকারী-স্বত্বে লাভ করে নি।' তাই যদি হত তা হ'লে চৈতন্যদেব বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করতে পারতেন না।

চৈতন্যভাগবতে উল্লিখিত আছে যে ব্রাহ্মণেরা যে হরিদাসকে রাজদণ্ডে দণ্ডিত করেছিলেন তার মূলে রাজপুরুষদের দোষের চেয়েও অনেক বেশী দোষ ছিল 'পাষণ্ডী'দের—এইভাবে তাঁরা বৈষ্ণবদের প্রতি তাঁদের ক্রোধ চরিতার্থ করেন। চৌধুরী মহাশয় এই সমস্ত প্রাচীনকাব্য থেকে অংশবিশেষ উদ্ধার ক'রে সিদ্ধান্ত করেছেন, '······মুসলমান আমলে রিলিজিয়াস কারণে হিন্দুদের উপর তাদৃশ পীড়ন হত না, হত শুধু পোলিটিক্যাল কারণে।' পাঠান রাজত্বকালে হিন্দুদের ওপর অত্যাচার হয়েছে। বিজয় গুপ্ত 'হাসান-হোসেন' আখ্যায়িকার মধ্যে মুসলমান কর্তৃক হিন্দুর অত্যাচারের কথা বলেছেন। কাজী সাহেবের মোল্লাকে কয়েকজন ছেলে মিলে প্রহার করে এবং তারেই ফলে কাজী সাহেব এঁদের সমুচিত দণ্ডবিধানের ব্যবস্থা করেন—অবশ্য শেষে তাঁর মত পরিবর্তন হয়। এ ধরণের ব্যাপারকেও ঠিক fanaticism বলা যায় না। সেকালের হিন্দুরাও যে হিন্দুদের ওপর অত্যাচার করত, তার প্রমাণও ইতিহাসে আছে। কবিকঙ্কণের কাব্যের বিদ্রূপাত্মক বর্ণনার মধ্যেও অনেকে মুসলমান-বিদ্বেষের পরিচয় পান, কিন্তু তিনি হিন্দুদের নানাশ্রেণীকেও বিদ্রূপ করতেও ছাড়েন নি।

ভারতচন্দ্রের কাব্যে আলীবর্দী খাঁর উড়িষ্যার ছারখার করার বৃত্তান্ত আছে। কিন্তু প্রবন্ধকার ভারতচন্দ্রের কাব্যের ঐ অংশটি উদ্ধার ক'রে দেখিয়েছেন যে, এর কারণ ধর্ম-বিদ্বেষ নয়—সম্পূর্ণ রাজনৈতিক ব্যাপার। তাছাড়া বিজিত প্রতিপক্ষের সঙ্গে ব্যবহারে কোন জাতিই কম নির্মমতার পরিচয় দেন নি —তা সে সেকালের রোমানরাই হোন, অথবা একালের জার্মানরাই হোন। শূন্যপুরাণ থেকে অন্নদামঙ্গল পর্যন্ত দীর্ঘ পাঁচ ছ'শো বছরের বাংলাসাহিত্যের

সামাজিক ও রাজনৈতিক পটভূমি আলোচনা ক'রে প্রবন্ধকার উপসংহারে বলেছেন, 'আমার মনে হয় যে, বহুকাল পাশাপশি বাস করবার ফলে হিন্দু-মুসলমানের মনোভাব পরস্পরের মতামত সম্পর্কে যথেষ্ট উদারতা লাভ করেছিল। ...প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের প্রসাদে আমরা এ-সত্যের পরিচয় পাই যে, বর্তমানে হিন্দু-মুসলমানের ধর্ম-বিরোধ যদি একটি জাতীয় মহাসমস্যা হ'য়ে উঠে থাকে তো সে সমস্যা আমরা উত্তরাধিকারী-স্বত্বে লাভ করি নি। সমগ্র প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে Cow killing riot-এর নামগন্ধ পর্যন্ত নেই, যদিচ মারপিট দাঙ্গা-হাঙ্গামা সেকালে নিত্যকর্মের মধ্যে ছিল।' প্রবন্ধটি দীর্ঘ ও তথ্যবহুল; প্রাচীন বাংলাসাহিত্যের একটি বিশেষ দিক সম্পর্কে আলোচনা হ'লেও, একে মুসলমান যুগের বাংলা দেশের সামাজিক ইতিহাস বলা যায়। ব্যক্তিগত প্রবন্ধ, রম্যরচনা শ্রেণীর লেখাই যে প্রমথ চৌধুরী গদ্যরচনার একমাত্র সম্বল, একথা মনে করলে তাঁর ওপর অবিচার করা হবে। তথ্য-সঙ্কলনে ও বিষয়-নিষ্ঠায় তাঁর রচনা কতখানি সমৃদ্ধ তার অন্যতম প্রমাণ আলোচ্য প্রবন্ধটি। তবে, ইতিহাসের ঘটনাকে শুধু ঘটনা হিসাবে না দেখে তিনি তাঁর ঋজু-দীপ্ত মননশীল দৃষ্টির সাহায্যে এর মধ্যে একটি তাৎপর্য আবিষ্কারের চেষ্টা করেছেন। বিষয়ের ঘনবদ্ধ-বিস্তার তাঁর মনের আলো ঢেকে ফেলতে পারে নি—তাই মনের প্রসন্ন দীপ্তি পুরাকথাকেও স্বচ্ছ ক'রে তুলেছে। সেখানে ইতিহাস আর ঘটনার জাদুঘর নয়, সজীব ও প্রাণৈশ্বর্যে সমৃদ্ধ।

ছ য়

'ভারতবর্ষের ঐক্য' (নানা-কথা), 'ভারতবর্ষ সভ্য কিনা', 'ভারতবর্ষের জিয়োগ্রাফি' ও 'অনু-হিন্দুস্থান' (নানা-চর্চা) প্রবন্ধ প্রাচীন ভারতবর্ষ সম্পর্কিত আলোচনা। রাধামুকুদ মুখোপাধ্যায়ের একটি ইংরেজী প্রবন্ধের আলোচনা 'ভারতবর্ষের ঐক্য' প্রবন্ধটির মূলে। প্রবন্ধটিতে মূল বিষয়ের ওপর লেখক তেমন দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন নি। তর্ক-বিতর্ক বিচিত্রধর্মী আলোচনা ও নানা-প্রসঙ্গের অবতারণা প্রবন্ধটির কেন্দ্রীয় ঐক্য ব্যাহত করেছে। মূল বিষয় থেকে লেখক এতটা দূরে সরে গিয়েছেন যে প্রবন্ধের শেষে বিষয়ানুযায়ী বক্তব্যকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। রাধাকুমুদবাবু প্রাচীন যুগের সামাজিক জীবনের মধ্যে জাতীয় জীবনের ঐক্যের মূল অনুসন্ধান করেছেন। ঐতিহাসিক সত্যকে বাদ দিয়ে যাঁরা দার্শনিক তথ্যকে এই ঐক্যের মাধ্যম হিসেবে বিচার করেন, তাঁদের

বক্তব্যকে লেখক পরিহাস-তরল কণ্ঠে আলোচনা করেছেন। হিন্দু দর্শন-সম্পর্কিত নানাজাতীয় বিচারে প্রবৃত্ত হয়েছেন। রাধাকুমুদবাবু 'ভারতের আত্মজ্ঞানের ভিত্তি অতীতের জীবনক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা করতে প্রয়াসী হয়েছেন।' কিন্তু এ বিষয়ে তিনি কতটা কৃতকার্য হয়েছেন প্রবন্ধকার প্রধানত তাই আলোচনা করেছেন।

রাধাকুমুদবাবু অনেক রকমের প্রমাণ-প্রয়োগের বলে প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করেছেন যে অতি প্রাচীনকালেই ভারতবাসীর মনে দেশাত্মবোধ জন্মলাভ করেছিল। তিনি প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন যে, বৈদিক যুগেই ভারতবাসীরা এই ভারতভূমিকে পুণ্যভূমি করে তুলেছিল এবং ঋষিদের মনে এই একদেশীয়তার ভাব সর্বপ্রথম উদয় হয়েছিল। রাধাকুমুদবাবুর এই মত চৌধুরী মহাশয় স্বীকার করেন নি। তাঁর মতে এর জন্য দায়ী বৈদিক ধর্ম নয়, লৌকিক ধর্ম। বৈদিক যুগের পর এল পৌরাণিক যুগ—দেশভক্তি এই সময়ের সাহিত্যে পরিস্ফুট হ'লো। পরবর্তী কালে বৌদ্ধযুগে স্বদেশজ্ঞান ও স্বদেশপ্রীতি সর্বভারতে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। আর্যেরা ভারতবর্ষকে এক দেশ বলে স্বীকার করেন নি। প্রমথ চৌধুরী রাধামুকুদবাবুর মত অস্বীকার ক'রে বলেছেন, 'প্রাচীন আর্যজাতির মনে দেশপ্রীতির চাইতে আত্মপ্রীতি ঢের বেশি প্রবল ছিল। দেশের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা নয়, নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষাই ছিল তাদের স্বধর্ম।'

রাধাকুমুদবাবু প্রাচীন ভারতের একরাষ্ট্রীয়তার মূল অনুসন্ধান করেছেন বৈদিক সাহিত্যে। কিন্তু ভারত ইতিহাসের প্রাচীন সাম্রাজ্যগুলি থেকে এই মতের সমর্থন পাওয়া যায় না—কারণ নন্দবংশ ও মৌর্যবংশ দুই-ই শূদ্রবংশ। রাজনীতি শব্দটির দ্বারা চাণক্য বা আমরা যা বুঝতে পারি, 'ব্রাহ্মণ গ্রন্থে তার নামগন্ধও নেই।' এতকাল আমাদের ধারণা ছিল এই যে, প্রাচীন ভারতবর্ষ বুঝি সর্বদা ধ্যানধারণা নিয়েই থাকত, কিন্তু কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের আবিষ্কারের পর থেকে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিও রাতারাতি পরিবর্তন লাভ করেছে। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির এই পরিবর্তনটিকে একটু কটাক্ষ ক'রে লেখক বলেছেন, 'এই সত্যের সাক্ষাৎ লাভ ক'রে আমাদের চোখ এতই ঝলসে গেছে যে, আমরা সকল তন্ত্রে সকল মন্ত্রে ঐ সাম্রাজ্যেরই প্রতিরূপ দেখছি।' অর্থাৎ লেখক বলতে চান যে কৌটিল্য-ব্যাখ্যাত প্রাচীন ইম্পিরিয়্যালিজমকে নিয়ে আমরা বাড়াবাড়ি সুরু করেছি, কিন্তু যেদিন আমাদের প্রাথমিক মোহের ঘোর কাটবে, সেইদিনই আমরা একে বুদ্ধির সাহায্যে বিচার ক'রে দেখতে পারব। উপসংহারে লেখক

বলেছেন, 'এ কথা বোধ হয় নির্ভয়ে বলা যেতে পারে যে, ভারতবাসী আর্যদের কৃতিত্ব সাম্রাজ্যগঠনে নয়, সমাজগঠনে, এবং তাঁদের শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় শিল্পে-বাণিজ্যে নয়, চিন্তার রাজ্যে।' প্রবন্ধটিতে লেখকের চিন্তার মৌলিকতা ও বিশ্লেষণী বুদ্ধির প্রখরতা আত্মপ্রকাশ করেছে।

উইলিয়ম আর্চার ভারতবর্ষকে অসভ্যদের মধ্যে সবচেয়ে সভ্য এবং সভ্যদের মধ্যে সবচেয়ে অসভ্য আখ্যা দিয়েছিলেন। তাঁর এই মন্তব্য নিয়ে তৎকালে নানাজাতীয় আলোচনা হয়েছে। চৌধুরী মহাশয় আর্চার সাহেবের এই মত নিয়ে নানা শ্লেষাত্মক কথা বলেছেন, তাঁর 'ভারতবর্ষ সভ্য কিনা' প্রবন্ধে। তাঁর মতে সভ্য বা অসভ্য, কোন অবস্থাতেই মানুষের শস্তি নেই, 'পুরাকালে ভারতবর্ষ যখন অতি সভ্য হল, তখন সভ্যতার শিকলি কেটে বনে যাবার জন্য ব্যাকুল হ'য়ে উঠল ; এবং একই অবস্থায় একই কারণে গ্রীকরা হল ফিলজফর আর রোমানরা খ্রীষ্টান।' প্রবন্ধকারের এই উক্তির মধ্যে প্রচ্ছন্ন শ্লেষ বিদ্যমান। সভ্য ও অসভ্য কোন অবস্থার মধ্যেই যখন মানসিক শান্তি নেই, তখন নিশ্চয় একাধারে সভ্য ও অসভ্য হওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ! ভারতবর্ষ সম্পর্কে দু'টি চরমপন্থী মতামত সম্বন্ধে প্রবন্ধকার এই কটাক্ষ করেছেন। একদল বলছেন ভারতবর্ষ অতি সভ্য, আর একদল বলছেন যে ভারতবর্ষ অতি অসভ্য। কিন্তু এ নিয়ে বৃথা বাগ্‌বাহুল্য ক'রে কোন লাভ নেই। অপরের নিন্দার ফলে যেমন আমরা অসভ্য প্রমাণিত হব না, তেমনি নিজেদের গুণাবলী নিয়ে ঢাক পিটলেও সভ্য ব'লে প্রমাণিত হব না।

আর একদল বলে থাকেন যে, ইউরোপের খাতিরে না হ'লেও সত্যের খাতিরেও অন্তত ভারতবর্ষ যে সভ্য, তা প্রমাণ করা কর্তব্য। প্রবন্ধকার মনে করেন এতে হিতে বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনা। কারণ নিজেরা যে ভদ্র এ কথা জোর গলায় বলতে গিয়ে শুধু নিজেদের অসভ্যতাই প্রমাণিত হবে। কিপ্‌লিঙের বাণীটিকে তিনি ব্যঙ্গ করতে ছাড়েন নি। দেশভেদে ও কালভেদে সভ্যতার নানা রূপান্তরের কথাও তিনি বলেছেন। এক সভ্যতার সঙ্গে আর এক সভ্যতার পার্থক্য ঘটে শুধু বাহ্যবস্তুর আনুকূল্যে ও প্রতিকূলতায়। প্রাচীন-কালের তুলনায় বর্তমানে এই পার্থক্য ক্রমাগত কমে আসছে। লেখক মনে করেন ভবিষ্যতের মানব সভ্যতার প্রধান বৈশিষ্ট্য হবে এর বৈচিত্র্য। ভারতবর্ষের সেদিক থেকে কোন ভাবনা নেই, কারণ ভারতীয় সভ্যতায় বৈচিত্র্যের অভাব নেই। আবার অন্যদিকে বিভিন্ন সভ্যতার মধ্যে মিলও

আছে—গ্রীক, রোমান ও হিন্দুসভ্যতার মধ্যে যেমন মিল আছে, তেমনি মিল আছে এদের ভাষার মধ্যে। সভ্যতার চেয়ে বড় শিল্প আর নেই—অন্যান্য আর্ট এই মহাশিল্প থেকেই উদ্ভূত হয়েছে। প্রবন্ধের শেষে লেখক নূতন-পুরাতন সভ্যতার মধ্যে ভারতবর্ষ কিভাবে সমন্বয় ঘটাবে, তাই নিয়ে আলোচনা করেছেন।

'ভারতবর্ষের জিয়োগ্রাফি' ও 'অনু-হিন্দুস্থান'—রচনা-দুটির মধ্যে একটি আত্মিক সংযোগ আছে। বিষয় হিসেবে দু'টি প্রবন্ধেরই গুরুত্ব কম নয়, কিন্তু লেখক যেন নিতান্ত গল্প ক'রে বলেছেন। জটিল-বিষয়কে সাধারণের জন্য ও বালকদের জন্য সহজবোধ্য ক'রে লেখা মোটেই সহজ নয়। লেখা-দু'টি বিশেষজ্ঞদের জন্য নয়—Popular way-তে লেখা। 'ভারতবর্ষের জিয়োগ্রাফী' প্রবন্ধটিতে লেখক শুধু ভারতবর্ষের ভৌগোলিক বৃত্তান্তই বলতে বসেন নি—সংক্ষেপে গোটা পৃথিবীরই ভৌগোলিক বৃত্তান্তকে গল্প ক'রে বলেছেন। কিন্তু ভৌগোলিক বৃত্তান্তের একটি বিশেষত্ব আছে। প্রাচীন পুরাণ ও সংস্কৃত সাহিত্যে বর্ণিত আমাদের ভৌগোলিক ধারণার সঙ্গে বর্তমান কালের ভৌগোলিক প্রত্যয়কে মিলিয়ে তিনি চমৎকার ভাবে 'পপুলার জিয়োগ্রাফি' লিখেছেন। পৃথিবীর বিভিন্ন বিভাগের কথা থেকে ভারতবর্যের ঐক্য পর্যন্ত নানা বিষয়ের আলোচনার রচনাটি পড়লে মনে হয় আলোচনার গুণে ভৌগোলিক তথ্যকেও সরস ক'রে তোলা যায়। রচনাটি ভৌগোলিক প্রবন্ধ নয়, ভূগোলের গল্প। বালকবালিকাকে সহজভাবে শুনিয়েছেন—'ভারতবর্ষের নৃতত্ত্ব অথবা জাতি-তত্ত্ব নিয়ে' তাদের সুস্থ মনকে ব্যস্ত ক'রে তোলেন নি, অথচ ছবির মতো বিশ্ব-ভৌগোলিক রূপ আমাদের সামনে ফুটে ওঠে। তিনি নিজেই এ জাতীয় রচনার প্রকৃতি নির্দেশ করেছেন, 'সেকালের ভারতের পরিচয় দিতে আমাকে কষ্ট করতে হবে, কিন্তু শুনতে তোমাদের কোন কষ্ট হবে না।' এইখানেই প্রবন্ধটির বৈশিষ্ট্য!

'অনু-হিন্দুস্থান' প্রবন্ধটিও একই সুরে লেখা। ভারতবর্ষ ও চীনের মাঝখানে যে সব ভূভাগ আছে তাদের তিনি বলেছেন 'উপ-হিন্দুস্থান! সেকালের এই উপ-হিন্দুস্থানের দক্ষিণে যে কয়েকটি ক্ষুদ্র দ্বীপ দেখা যায়, তারই একটি দ্বীপ লেখকের মতে 'অনু-হিন্দুস্থান'। তিনি পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত বলিদ্বীপকেই বলেছেন অনু-হিন্দুস্থান। এর অধিবাসীরা আজও হিন্দু। বলিদ্বীপের বলিষ্ঠ ও কর্মঠ অধিবাসীর উপজীবিকা, জীবনাচরণ ও সেখানকার উৎপন্নজাত দ্রব্যের পরিচয়ও দেওয়া হয়েছে। জাভা ও বলিদ্বীপের সম্পর্কের

কথাটিকে লেখক সুস্পষ্ট ক'রে ফুটিয়ে তুলেছেন। সচরাচর জাভা ও বলিদ্বীপ নাম দু'টি আমরা একই সঙ্গে উচ্চারণ করি। কিন্তু এই প্রবন্ধে দু'টি দ্বীপের ভাষা-সংস্কৃতিগত স্বাতন্ত্র্যকেও স্পষ্ট ক'রে দেখানো হয়েছে। বলিদ্বীপের ভৌগোলিক বৃত্তান্ত থেকে সাংস্কৃতিক ইতিহাস, বিশেষ ক'রে ভারতবর্ষের সঙ্গে তার সংযোগের কাহিনীকে সুন্দর ক'রে গুছিয়ে বলেছেন। কথাপ্রসঙ্গে ভূগোল, ইতিহাস, পুরাণ, অ্যানথ্‌পলজি—সব কিছুই শুনিয়েছেন—'পপুলার' করে শুনিয়েছেন। বালক-বালিকাদের জন্য লেখা হ'লেও ঝর্‌ঝরে ও স্বচ্ছ রচনারীতির গুণে বয়স্কদের কাছেও চিত্তাকর্ষক হ'য়ে উঠেছে।

শুধু অতীত ইতিহাস ও পুরাতত্ত্বই নয়, নিজের দেশ ও কালের সামাজিক রূপও তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। প্রমথ চৌধুরী তাঁর কালের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের ওপর যে সমস্ত মন্তব্য করেছেন তার মধ্যে মত-দ্বৈধতার অবকাশ থাকতে পারে, কিন্তু বিশ্লেষণী চিন্তা ও মৌলিকত্বের কোন অভাব নেই। 'তেল নুন লকড়ি'—'সবুজপত্র' পত্রিকা প্রকাশের প্রায় আট ন' বছর আগে 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।[৭] পরবর্তী কালে এই দীর্ঘ প্রবন্ধটি 'নানা-কথা' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়। প্রবন্ধটির মূল বক্তব্য মুখ্যত সামাজিক। স্বদেশী ও বিদেশী ভাব-সংঘাতের ফলে বাঙালির মানস-প্রতিক্রিয়ার বিচিত্র স্বরূপ লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন।

ইউরোপীয় সভ্যতার প্রবল জোয়ারের মধ্যে আমরাও গা ভাসিয়ে দিয়েছিলাম। অতীত হিন্দুসমাজের শৃঙ্খলা তাই আজ সম্পূর্ণভাবে বিশৃঙ্খল হ'য়ে গিয়েছে। কিন্তু স্বদেশীয় আচার-ব্যবহারের মধ্যে ফিরে যাবার জন্য আজ একটা তাগিদ এসেছে। এতকাল গম্যস্থান ব'লে কিছু ছিল না, এখন গম্য স্থানের সন্ধান পেয়ে আবেগের আতিশয্যে বিশৃঙ্খল হ'য়ে উঠলে চলবে না, শৃঙ্খলার সঙ্গেই মাথা ঠাণ্ডা রেখে অগ্রসর হ'তে হবে। ইউরোপীয় সভ্যতার সংস্পর্শে সুফল কুফল দুই-ই হয়েছে—মনের দিক থেকে সুফল ফলেছে, কিন্তু বাহ্য আচার-আচরণে কুফলই দেখা দিয়েছে। বাঙালি বিলেতি সভ্যতার উপকরণে তাদের দৈনন্দিন জীবন অনাবশ্যকরূপে ভারাক্রান্ত ক'রে তুলেছে, কিন্তু কিছুই আত্মসাৎ করতে পারে নি।

এই অনুকরণকারীরা ছাড়া আর একদল আছেন। হিন্দু-সমাজের ওপর তাঁদের আকর্ষণ আছে, তাঁদের 'ধারণা যে ইউরোপের শিষ্য হওয়া এবং দাস হওয়ার ভিতর আকাশ-পাতাল প্রভেদ'—তাঁরা দুদিকই সমানভাবে রক্ষা করার

চেষ্টা করেন, তাঁরাই 'আহেল বিলেতি ইঙ্গবঙ্গদের মতে কেন্দ্রভ্রষ্ট।'. আমাদের উৎকট সাহেবিয়ানাকে লেখক বিদ্রূপ করতে ছাড়েন নি, 'বিলেতফেরত-পাড়ায় প্রতি গৃহ একটি সৌরজগৎ; হয় কর্তা নয় গৃহিণী সেই জগতের কেন্দ্র; পরিবারের আর-সকলে গ্রহ-উপগ্রহের মত তারই চারিপাশে পাক খায়, এখানে-সেখানে দু-একটি ধূমকেতুও দেখা দেয়। আমাদের কারও গৃহ, হিন্দুগৃহের একটি পরিবর্তিত যুগপৎপরিবর্ধিত ও সংক্ষিপ্তসংস্করণ মাত্র; কারও বা গৃহ বিলেতি গৃহের একটি নিকৃষ্ট ফোটোগ্রাফ মাত্র। আমরা কেউ-বা বিদেশীয়তার দু-চার সিঁড়ি ভেঙেছি, কেউ-বা একলম্ফে বিলেতি সভ্যতার মন্দিরের চূড়ায় উপরিস্থিত ত্রিশূলের উপর গিয়ে চ'ড়ে বসেছি।' আমরা কিছুদিনের জন্য বিভ্রান্ত হ'য়ে বৃহৎ হিন্দু-সমাজের মধ্যে আর একটি সমাজ গড়তে চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু বলাবাহুল্য সার্থক হ'তে পারি নি। নূতন যুগের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ধারণা বদলে যাচ্ছে—একটি জাতীয় ভাব জন্মলাভ করছে। এ বিষয়ে আমাদের কর্তব্য সম্পর্কে লেখক সচেতন করার চেষ্টা করেছেন। 'এ অবস্থায় আমাদের স্বদেশীয়তায় ফেরার অর্থ, আমরা যে বরাবর স্বদেশ ও স্বজাতির অন্তর্ভূ্ত হ'য়েই আছি, সেই বিষয়ে স্পষ্টজ্ঞান করানো।'

ইংরেজের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কটিকে লেখক সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ ক'রে দেখিয়েছেন, কারণ তিনি বলেছেন সরসভাবে। শিক্ষিত ভারতবাসীরা ইংরেজ প্রভুর চিত্ত জয় করার জন্য নানা হাবভাব লীলাখেলার অভ্যাস করেছিল। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও যখন বিদেশী প্রভুর মন পাওয়া গেল না, তখন মান-অভিমানের পালা শুরু হল। এই দাম্পত্য কলহের ফলে বাস্তব জীবনের তেল নুন লকড়ির বিষয়ই প্রাধান্য লাভ করল। অবশ্য অন্নচিন্তা মানবজীবনের আদিম চিন্তা এবং এই চিন্তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হ'তে না পারলে অন্যান্য বিষয়েও চিন্তা করা সম্ভব নয়। কিন্তু বস্তুগত সমৃদ্ধিই মানুষের চরম সমৃদ্ধি নয়। প্রবন্ধকার এখানে রাস্কিনের মতের প্রতিধ্বনি ক'রে বলেছেন, 'ঘর যদি অগোছাল রাখ, তা হলে হাটে-বাজারে যতই কেনা-বেচা কর-না কেন, তাতে নিজে কিংবা জাতি যথার্থ শ্রী এবং সুখলাভে সমর্থ হবে না।'

সমস্যাটিকে লেখক আমাদের নাগরিক জীবন ও গৃহসজ্জার দিক থেকেও বিচার করেছেন। রোম-প্যারিস প্রভৃতি শহরে বনেদি প্রাসাদের নানা কারুকার্য এবং শিল্পচাতুর্যের মধ্যে এমন একটি দিক আছে, যা অতীতের কথা ভাবায়। এই সব আর্কিটেকচারই অতীতের সঙ্গে বর্তমানের সংযোগকে বাঁচিয়ে রাখে।

কিন্তু কলকাতা শহরে বাস করে অতীতের সঙ্গে বর্তমানের যোগসূত্র রক্ষা করা কঠিন। সাহেবিয়ানার আতিশয্যে আমাদের গৃহসজ্জাও জটিল হ'য়ে উঠেছে। অনেক সময় সংশয় জাগে যে এ আমাদের বাসঘর না সাজঘর—বহুপ্রকার বিদেশী উপকরণ দিয়ে আমাদের গৃহসজ্জা অসম্ভব জটিল ক'রে তোলা হয়েছে। কিন্তু এই শ্রেণীর বিদেশী উপকরণ দিয়ে গৃহসজ্জা করার মধ্যে একটি বিপদ আছে। যাঁর অর্থ আছে, তিনি কোন রকম ক'রে অবস্থাটা সামলে নিতে পারেন। কিন্তু যাঁর লক্ষ্মীর কৃপা নেই, তাঁর পক্ষে এ ব্যাপারটি শ্রীহীনতা ও কদর্যতারই প্রতীক হ'য়ে ওঠে। তবু এই সব দূর ক'রে সোজাসুজি দেশী কায়দায় ফরাশ বিছিয়ে বসতেও তাঁরা অসম্মান বোধ করেন। প্রবন্ধকার চমৎকারভাবে এই শ্রেণীর বাঙালীর উৎকট মানসিকতার বর্ণনা করেছেন,

'যিনি ধনী, তাঁর গৃহ হঠাৎ দেখতে দোকান বলে ভুল হয়। আর যিনি লক্ষ্মীর কৃপায় বঞ্চিত, তাঁর গৃহ হঠাৎ দেখতে যুদ্ধক্ষেত্রের হাঁসপাতাল বলে ভ্রম হয়; আসবাবপত্র সব যেন লড়াই থেকে ফিরে এসে, হয় মেরামত, নয় দেহত্যাগের জন্য অপেক্ষা করছে। কোনো চৌকির হাত নেই, কোন টিপয়ের পা নেই কোনো টেবিলের পক্ষাঘাত হয়েছে; পরদার বক্ষ বিদীর্ণ হ'য়ে গেছে, কৌচের নাড়িভুঁড়ি নির্গত হ'য়ে পড়েছে, চীনের পুতুলের ধড় আছে কিন্তু মুণ্ড নেই, প্যারিস পালেস্তারার ভিনাসের নাসিকা লুপ্ত, ওলিয়োগ্রাফ-সুন্দরীর মুখে মেচেতা পড়েছে, আয়নার গা দিয়ে পারা ফুটে বেরিয়েছে, পিয়ানো দন্তহীন এবং হারমোনিয়াম শ্বাসরোগগ্রস্ত। এ অবস্থাতেও আমরা এই সকল অব্যবহার্য কদর্য আবর্জনা দূর ক'রে তার পরিবর্তে ফরাশ বিছিয়ে বসি না কেন?—কারণ ইংরেজের কাছে আমরা শিখেছি যে দৈন্য পাপ নয়, কিন্তু স্বদেশীয়তা অসভ্যতা।'

বিলিতি জিনিসের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে লেখক তার সৌন্দর্য সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছেন। লেখকের মতে ইংরেজের নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যজাতগুলি 'নয়নের তৃপ্তিকর নয়'। কারণ এ বিষয়ে ইংরেজরা এস্‌থেটিক ফ্যাকালটি অর্থাৎ রূপজ্ঞান থেকে বঞ্চিত। এই জ্ঞানটির অভাবে ইংরেজের হাতে-গড়া জিনিস প্রায়ই নয়ন-সুখকর হয় না। লেখকের মতে এর আর একটি কারণ বিদ্যমান, বর্তমান কালে ইউরোপীয় আর্টের পতনের অবস্থাই প্রকট হ'য়ে উঠেছে এবং বিজ্ঞানের প্রভাব ক্রমবর্ধিত হচ্ছে।

পরিচ্ছদের ঐক্যের মধ্যে সামাজিক ঐক্যের কারণ ও লক্ষণ, দুই-ই

বিগুমান। বিদেশী পোশাক পরে গলদঘর্ম হলেও তাতেই আমরা জীবনের চরম সার্থকতা ব'লে মনে করি। ইংরেজী পোশাকের স্বপক্ষে আমাদের প্রধান যুক্তি হ'ল এই যে, এ বেশ পুরুষোচিত। ইউরোপীয় মোহ কাটাতে হলে, ইউরোপীয় পোশাক বর্জন করতে হবে, লেখক স্পষ্টভাবেই এ কথা বলেছেন। প্রবন্ধকার পোশাক থেকে আহার-প্রসঙ্গে এসেছেন। পোশাকের সাহেবিয়ানা থেকেই আহারের সাহেবিয়ানা এসেছে, 'ঐ পোশাকের টানেই চেয়ার আসে, সেই সঙ্গে টেবিল আসে, এবং সেইসঙ্গে চীনের কিংবা টিনের বাসন নিয়ে আসে। এরপর আর হাতে খাওয়া চলে না; কারণ হাতে খেলে হাত মুখ দুই-ই প্রক্ষালন করতে হয়, কিন্তু ছুরিকাঁটা ব্যবহার করলে শুধু আঙুলের ডগা ধুলেও চলে, না ধুলেও চলে।' ইউরোপীয় হালচালের অনেক অনাবশ্যক ও অবাঞ্ছনীয় জিনিস আমাদের সমাজে প্রবেশ করেছে—লেখকের প্রধান আপত্তি সেইখানে।

'তেল নুন লকড়ি' প্রবন্ধটিকে এক হিসাবে সমাজ-সমালোচনাও বলা চলে। আমাদের দেশের ওপর ইউরোপীয় প্রভাবের কথা আলোচনা করতে হ'লে প্রধানত সাহিত্য-সংস্কৃতির দিক থেকেই আলোচনা করা হয়। কিন্তু প্রবন্ধকার এখানে প্রধানত আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ইউরোপীয় প্রভাবের কথা আলোচনা করেছেন। আমাদের চাল-চলন, গৃহসজ্জা, পোশাক-পরিচ্ছদ, আহার প্রভৃতির ওপরেই প্রধানত তাঁর বক্তব্য নিবদ্ধ রেখেছেন। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের মধ্যে যে নানা অসঙ্গতি আছে, তাই তিনি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। আমরা অনেক সময় অনেক বড় বড় জিনিস নিয়ে মাথা ঘামাই, কিন্তু দৈনন্দিন জীবনকে সুন্দর ক'রে তোলার দিকে মোটেই নজর দিই না। প্রবন্ধটির মধ্যে সে দিকটিকেও ভাল ক'রে ফোটানো হয়েছে। 'রূপের কথা' প্রবন্ধের সঙ্গে মিলিয়ে পড়লে লেখকের আসল উদ্দেশ্য পরিস্ফুট হবে।

সাত

সমকালীন সমাজ-সমালোচনামূলক প্রবন্ধের মধ্যে 'তরজমা' (বীরবলের হালখাতা) প্রবন্ধটির একটি বিশেষ স্থান আছে। প্রাচীন ভারত ও নবীন ইউরোপের মধ্যে পড়ে আমাদের মনোবৃত্তির মধ্যে কি কি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে, সেই সম্পর্কে তিনি মূল্যবান আলোচনা করেছেন। বর্তমান কালে আমরা নিজেদের ওপর আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছি—তা না হ'লে একদিকে

প্রাচীন ভারত এবং আর একদিকে নবীন ইউরোপ, এ দুয়ের মধ্যে আমরা দোটানায় পড়তাম না। এই আত্মপ্রত্যয়ের অভাবে আমাদের দু-কূল রক্ষা ক'রে চলার প্রাণান্তকর চেষ্টা চলেছে। লেখক আমাদের এই মনোধর্মটিকে শ্লেষের সঙ্গে বর্ণনা করেছেন, 'আমাদের এ যুগ সত্যযুগও নয় কলিযুগও নয়—শুধু তরজমার যুগ। আমরা শুধু কথায় নয়, কাজেও একেলে বিদেশি এবং সেকেলে স্বদেশি সভ্যতার অনুবাদ করেই দিন কাটাই। আমাদের মুখের প্রতিবাদও ঐ একই লক্ষণাক্রান্ত। আমরা সংস্কৃতের অনুবাদ ক'রে নূতনের প্রতিবাদ করি, এবং ইংরেজির অনুবাদ ক'রে পুরাতেনের প্রতিবাদ করি। আসলে রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম, শিক্ষা, সাহিত্য – সকল ক্ষেত্রেই তরজমা করা ছাড়া আমাদের উপায়ান্তর নেই।'

তরজমা কার্যটির মধ্যে কোনো অন্যায় নেই—কারণ পরের জিনিসটিকে সে ক্ষেত্রে আপন ক'রে নেওয়া হয়। ভালো জিনিস তরজমা করার মধ্যেই মানুষের মনুষ্যত্ব নিহিত থাকে। সুতরাং ভালো তরজমার মধ্য দিয়ে নিজেদের শক্তি বৃদ্ধিই হয়। কিন্তু আমাদের তরজমা ব্যর্থই হচ্ছে, কারণ হয় ইউরোপীয়, নয় আর্যসভ্যতার, তরজমা না ক'রে নকল করেছি। ভালো জিনিসের তরজমা করার মধ্যে গৌরব আছে, কিন্তু ব্যর্থ অনুকরণ করার মধ্যে কোনো আত্মপ্রসাদ বা গৌরব নেই। অনুকরণবৃত্তি বর্জন ক'রে যদি আমরা নবসভ্যতার অনুবাদ করতে পারি, তবেই সে সভ্যতাকে আমরা নিজের করে তুলতে পারব। আমরা সকল ক্ষেত্রেই ইউরোপীয় সভ্যতার বহিরঙ্গ নিয়েই মত্ত, তার ফলে ইউরোপীয় সভ্যতার সৃষ্টিশীল বিচিত্র প্রাণ-প্রবাহের সন্ধান আমরা পাই নি। ইংরেজী-শিক্ষিত লোকের সঙ্গে দেশের জনসাধারণের মনের কোন মিল নেই। ছোট্ট একটু মন্তব্যের সাহায্যে তিনি তার কারণ বলেছেন, 'আমরা যে ইউরোপীয় সভ্যতা কথাতেও তরজমা-করতে পারি নি, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই যে, আমাদের নূতন শিক্ষালব্ধ মনোভাবসকল শিক্ষিত লোকদেরই রসনা আশ্রয় ক'রে রয়েছে, সমগ্র জাতির মনে স্থান পায় নি। আমরা ইংরেজি ভাব ভাষায় তরজমা করতে পারি নে বলেই আমাদের কথা দেশের লোকে বোঝে না, বোঝে শুধু ইংরেজি-শিক্ষিত লোকে।'

আমাদের 'শিক্ষালব্ধ ভাবগুলি' তরজমা করতে গিয়ে কি পরিমাণে ব্যর্থ হয়েছি, লেখক তার কতকগুলি সুনির্দিষ্ট উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন। সাহিত্য, রাজনীতি, ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি সর্ববিষয়েই আমাদের তরজমার

অকৃতার্থকতার কথা তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন। ইউরোপীয় সভ্যতার তরজমার অকৃতকার্যতার জন্য অথবা ভুল তরজমা করার জন্য আমাদের শক্তির অপচয়ই হচ্ছে। প্রবন্ধটির শেষ দিকে লেখক শিক্ষা বিষয়ে যে মন্তব্য করেছেন তা প্রণিধানযোগ্য। কোনক্রমে লিখতে ও পড়তে শেখাকেই আমরা শিক্ষা বলে মনে করি। আমরা সরকারকে অনুরোধ করি যে, যেন গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। লেখকের মতে এই শ্রেণীর বিদ্যালয়-বাহুল্যের ফলে প্রকৃত শিক্ষার কোনো উনিশ-বিশ হবে না। কথাটা শ্রুতিকটু হলেও মূল্যহীন নয়, 'যতদিন পর্যন্ত আমরা আমদের নব শিক্ষা মজ্জাগত করতে না পারব ততদিন জনসাধারণকে পড়তে শিখিয়ে তাদের যে কি বিশেষ উপকার হবে তা ঠিক বোঝা যায় না।' যতদিন পর্যন্ত 'ইংরেজির নীচে আমরা স্বাক্ষর দিয়েই ক্ষান্ত থাকব' ততদিন নিজেকে বা অপরকে কাউকেও শিক্ষিত করতে পারব না। আমাদের সমাজ-সমালোচনা করতে গিয়ে চৌধুরী মহাশয় যে-সব কথা বলেছেন, তা আজও অনেক ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

'নূতন ও পুরাতন' (নানা-কথা) প্রবন্ধেও চৌধুরী মহাশয়ের সমাজচিন্তার স্বাক্ষর বিদ্যমান। কিন্তু এটি প্রধানত প্রতিবাদমূলক প্রবন্ধ—বিপিনচন্দ্র পালের একটি প্রবন্ধের[৮] প্রতিবাদস্বরূপ প্রবন্ধটি লেখেন। রচনাটির মধ্যে দু'টি দিক আছে: ঐতিহাসিক ও দার্শনিক। আমাদের সমাজে নূতন ও পুরাতনের যে বিরোধ দেখা যাচ্ছে, বিপিনচন্দ্র পাল তাঁর প্রবন্ধে এর সমাধান করার চেষ্টা করেছেন। তিনি এই দুই পরস্পর-বিরোধী মতের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা করেছেন। প্রবন্ধকারের মতে সমাজ-সংস্কার প্রচেষ্টার মধ্যেই নূতন পুরাতনের দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছে—পুরাতনকে যেই নূতন ক'রে গড়ে তোলার চেষ্টা করা হল, ওমনি নূতন-পুরাতনের মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি হ'ল। কিন্তু এই জাতীয় পরস্পর-বিরোধী পক্ষের মধ্যে বিবাদ-মীমাংসার ভার যিনি নেবেন, তাঁর পক্ষে নিরপেক্ষ হওয়া উচিত। কিন্তু বিপিনবাবুর লেখার ভেতর নিরপেক্ষতার প্রমাণ নেই। চৌধুরী মহাশয়ের কথাতেই বলা যাক, 'বিপিনবাবু তাই সংস্কারকের উপর গায়ের ঝাল ঝেড়ে নিজেকে ধরা দিয়েছেন। এর থেকে বোঝা যায় যে, পালমহাশয়, যারা সমাজকে বদল করতে চায় তাদের বিরুদ্ধে, আর যারা সমাজকে অটল করতে চায় তাদের পক্ষে।'

বিপিনবাবুর মতে নূতনের সঙ্গে পুরাতনের মিলনের প্রধান বাধা হচ্ছে নূতন। তিনি তাঁর বক্তব্য প্রতিষ্ঠার জন্য বিজ্ঞান-দর্শন-উদ্ভিদবিদ্যা-সমাজবিজ্ঞান-

প্রভৃতি নানা বিষয়ের অবতারণা করেছেন। চৌধুরী মহাশয় একটি সাধারণ কথাকে এতখানি ঘোরালো করতে দেখে একটু শ্লেষাত্মক কটাক্ষ করতেও ছাড়েন নি। বিপিনবাবু হেগেলের থিসিস, অ্যান্টিথিসিস ও সিনথেসিসের মাধ্যমে নূতন-পুরাতনের সমন্বয় ঘটানোর পক্ষপাতী। দর্শনের ছাত্র ও উক্ত বিষয়ে সুপণ্ডিত প্রমথ চৌধুরী বিপিনচন্দ্রের এই মতবাদের বিরুদ্ধে নানাপ্রকার যুক্তির অবতারণা করেছেন। বিপিনচন্দ্রের সমন্বয়ের মূলকথা হ'ল থিসিস ও অ্যান্টিথিসিস উভয়কেই কিছু কিছু ছাড়তে হবে, তা না হ'লে সিনথেসিস সম্ভব হবে না। কিন্তু হেগেলের 'সিনথেসিস্ কোনরূপ রফাছাড়ের ফল নয়।' এ বিষয়ে প্রমথ চৌধুরীর আর একটি আপত্তি আছে। বিপিনবাবু বলেছিলেন যে হেগেলীয় ত্রিতত্ত্বের নামই তমঃ রজঃ ও সত্ত্ব। প্রমথ চৌধুরী এ দুয়ের আকাশ-পাতাল পার্থক্যের কথা আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে বিপিনবাবু তাঁর প্রবন্ধের মধ্যে সমাজদেবতাকে খিচুড়ি ভোগ নিবেদন করেছেন। আমাদের চোখ এমন ঝাপসা হ'য়ে উঠেছে যে, কোন্‌টি স্বদেশী এবং কোন্‌টি বিদেশী নির্বাচন করাও আমাদের পক্ষে কঠিন হ'য়ে পড়েছে। প্রবন্ধটির শেষে লেখক আমাদের কর্তব্য নির্দেশ ক'রে দিয়েছেন, 'এ অবস্থায় বাঙালীর প্রথম দরকার সমাজে নূতন পুরাতনের সমন্বয় নয়, মনে নূতন-পুরাতনের বিচ্ছেদ ঘটানো। আমাদের শিক্ষা যাকে একসঙ্গে ঘুলিয়ে দিচ্ছে, আমাদের সাহিত্যের কাজ হওয়া উচিত তাই বিশ্লেষণ ক'রে পরিষ্কার করা।'

'বর্তমান সভ্যতা বনাম বর্তমান যুদ্ধ' (নানা-কথা) গত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে লেখা। প্রবন্ধটিতে ইউরোপীয় সভ্যতার স্বরূপ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই সভ্যতার পটভূমিকায় বর্তমান বিশ্বযুদ্ধের কারণগুলিকেও লেখক সুস্পষ্ট ক'রে তুলেছেন। বিশ্লেষণদক্ষতায় ও মননশীলতায় প্রবন্ধটি উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে। লেখক এই যুদ্ধের জন্য দায়ী করেছেন বর্তমান ইউরোপীয় সভ্যতার স্বরূপ-প্রকৃতিকে। কারণ যে মনোভাবের ওপর এই সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত, যুদ্ধ তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। কিন্তু লেখকের মতে বর্তমানের ইউরোপীয় সভ্যতাকেই এর জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ী করা চলে না—এর জন্য এই সভ্যতার অপেক্ষাকৃত প্রাচীন-রূপটিও অনেকাংশে দায়ী। তার কারণ 'যেমন আমাদের বর্তমান সভ্যতা কিংবা অসভ্যতা এক অংশে প্রাচীন হিন্দু এবং আর এক অংশে নব্য ইউরোপীয়, তেমনি ইউরোপের বর্তমান সভ্যতা আট আনা নতুন হলেও আট আনা পুরানো।'

যুদ্ধ-বিগ্রহ শুধু এ যুগের সভ্যতার ধর্মই নয় মধ্যযুগের ইউরোপেও রক্তপাত

কম হয় নি। তফাৎ হচ্ছে এইখানে যে মধ্যযুগ ছিল ধর্মপ্রাণ, কিন্তু এ যুগে ঐ বস্তুটি ক্রমাগত কমে আসছে। ইউরোপে মধ্যযুগের পাষাণ-প্রাচীর বিদীর্ণ করার জন্যে দায়ী তিনটি ঘটনা : ইতালীর রেনেসাঁ, জর্মানীর রিফর্মেশন ও ফ্রান্সের বিপ্লব। রেনেসাঁর ফলে মানুষের কর্মবুদ্ধি, রিফর্মেশনের ফলে মানুষের ধর্মবুদ্ধি মুক্তিলাভ করেছিল। ফরাসী বিপ্লবের ফলে ইউরোপের মানুষ মধ্যযুগীয় রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা থেকে মুক্তিলাভ করল। আজ এক একটি জাতি যেন এক একটি ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছে—মধ্যযুগের মানুষ এ কথা ভাবতেও পারত না। তবে একথা ঠিক যে আধুনিক যুগের যে-সমস্ত মনোভাব পুষ্পিত হ'য়ে উঠেছে, তার অনেকগুলিরই বীজ মধ্যযুগের মধ্যে পাওয়া যাবে—তবে তার পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য আধুনিক যুগের আলো হাওয়া প্রয়োজন ছিল। অতীত ও বর্তমানের সংঘাতের ফলে যে বিষামৃত ফেনিল হ'য়ে উঠেছে, ইউরোপের প্রায় সকল জাতির দেহে ও মনে তার অল্প-বিস্তর প্রভাব পড়েছে। এই বিষমুক্ত করাটাই হচ্ছে এ কালের প্রধানতম সমস্যা।

লেখক সমস্যাটিকে দু'দিক থেকে আলোচনা করেছেন : ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের বৈশ্যসভ্যতার দিক থেকে ও যুদ্ধপ্রাণ জর্মান জাতির তরফ থেকে। যুদ্ধ ব্যাপারটি শিল্প-বাণিজ্য-সমৃদ্ধির পরিপন্থী। অথচ শিল্প ও বাণিজ্যই হচ্ছে বর্তমান ইউরোপীয় সভ্যতার প্রধান আশ্রয়ভূমি। ইউরোপীয় বৈশ্যসভ্যতা যুদ্ধের অনুকূল নয়। সুতরাং ইংলণ্ড ও ফ্রান্স আত্মরক্ষার জন্যই যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে—কারণ লেখকের মতে তাঁরা 'ক্ষত্রিয় যুগ উত্তীর্ণ হ'য়ে বৈশ্যযুগে এসে উপস্থিত হয়েছেন।' অপর পক্ষে 'জর্মানি হচ্ছে যুদ্ধপ্রাণ; মিলিটারিজম্ জর্মানির যুগপৎ ধর্ম ও কর্ম।' প্রবন্ধকার জর্মানির পূর্ব-ইতিহাস বিশ্লেষণ ক'রে তাঁর ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করেছেন। দীর্ঘকালব্যাপী জর্মানি খণ্ড খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত ছিল—তার ফলে একটি জর্মান-রাষ্ট্র বা জর্মানজাতি গড়ে উঠতে পারে নি। অথচ মধ্যযুগে যেমন পোপ হ'য়ে উঠেছিলেন ধর্মরাজ্যের অধীশ্বর, তেমনি জর্মানরাজ ইহলোকের অধিপতি হ'য়ে উঠেছিলেন—কিন্তু কোন কালেই তিনি স্বরাজ্য বা স্বজাতি গ'ড়ে তোলার চেষ্টামাত্র করেন নি। জর্মান মনীষীরা লৌকিক রাজ্যের আশা ছেড়ে দিয়ে চিন্তাজগতের উৎকর্ষ-সাধনে তৎপর হলেন। ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে জেনার যুদ্ধে পরাজিত ও লাঞ্ছিত হ'য়ে জর্মানদের চৈতন্য হ'ল—তাঁরা খণ্ড-বিচ্ছিন্ন রাজ্যগুলিকে এক ক'রে একটি যুক্তরাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য উদ্‌গ্রীব হ'য়ে উঠলেন।

বিসমার্কের বজ্রকঠিন লৌহনীতিতে এই ঐক্য সম্ভব হ'য়ে উঠল। এর থেকেই লেখক নব-জর্মানির পররাষ্ট্রনীতির একটি সরল ভাষ্য ক'রে নিয়েছেন, 'সুতরাং যুদ্ধের দ্বারা যে রাজ্যের সৃষ্টি হয়েছে, যুদ্ধের দ্বারাই তার রক্ষা এবং যুদ্ধের দ্বারাই তার উন্নতি সাধন করতে হবে—এই হচ্ছে নবজর্মানির দৃঢ়ধারণা।' জর্মান রাষ্ট্রনায়কেরা নীট্‌শের দর্শনের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছেন। জোর যার মুলুক তার—এই নীতিই হচ্ছে নবজর্মানজাতির গোড়ার কথা। দয়া, ক্ষমা, সমবেদনা নীট্‌শের মতে দুর্বলতা—সবলতা হচ্ছে একমাত্র সত্য। খ্রীষ্টধর্ম নামক রোগে জর্জরিত হ'য়ে ইউরোপ এই সহজ সত্য ভুলে গিয়েছিল। যেহেতু দাসজাতির আবাসভূমি এশিয়ায় এই ধর্মটি জন্মলাভ করেছে, সেইজন্য দাসসুলভ মনোবৃত্তি উক্ত ধর্মের স্বরূপ হ'য়ে উঠেছে। সাম্য মৈত্রী প্রভৃতি ব্যাপারও ঐ ধর্মেরই কতকগুলি উপসর্গ মাত্র। যে সমস্ত জাতির দেহে ঐ বিষ সংক্রামিত হয়েছে, তার উচ্ছেদ করা জর্মান ক্ষত্রিয়দের অবশ্য কর্তব্য। নীট্‌শের এই সমস্ত মতবাদ জর্মানজাতির অস্থি-মজ্জার সঙ্গে মিশে গিয়েছে। জর্মানজাতির পরশ্রী-কাতরতা ও মিলিটারিজম্‌ই বর্তমান যুদ্ধের মূল কারণ—দীর্ঘকাল ধ'রে এই জাতির মনে যে বিষ সঞ্চিত হ'য়ে আসছিল, তারই প্রলয়ঙ্কর উদ্‌গীরণ। অথচ এই জর্মানিই কাণ্ট্‌ হেগেল গ্যেটে শিলার বীঠোভেন মোজার্টের জন্ম দিয়েছে। 'এই মিলিটারিজমের মোহমুক্ত হ'লে সে জাতি আবার মানবসভ্যতার প্রবল সহায় হবে।' বৈশ্যসভ্যতারও স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত হবার সম্ভাবনা আছে। লেখক বিশ্বাস করেন যে ইউরোপের প্রবল প্রাণশক্তি সমস্ত দুর্ভাগ্য কাটিয়ে উঠতে পারবে।

প্রবন্ধটিতে লেখকের স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন চিন্তাশক্তি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিষয় যত দুরূহই হোক না কেন তাঁর অন্তর্ভেদী দৃষ্টি বস্তুকে অতিক্রম ক'রে তার স্বরূপের ওপর আলোকপাত করতে পারে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মূল কারণ যে কয়েকটি আসন্ন ঘটনার ওপরেই নির্ভরশীল নয়, এইটিই লেখকের মূল বক্তব্য। ইতিহাসের ঘটনাপঞ্জীর মধ্যে জাতীয় জীবনের যে সমস্ত দর্শন থাকে, সেদিকে সচরাচর আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় না—ইতিহাসকে জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করার ফলেই এই জাতীয় দুর্ঘটনার সৃষ্টি হয়। চৌধুরী মহাশয়ের চিন্তার প্রৌঢ়ত্ব, মননশীলতা ও অপূর্ব বিশ্লেষণদক্ষতা ঘটনার ঘনঘটার আড়ালে জাতীয় জীবনের দীর্ঘকাল-বিস্তৃত জীবন্ত-অভীপ্সার কাহিনীকে আবিষ্কার করেছে।

আট

'পূর্ব ও পশ্চিম' (নানা-চর্চা) প্রবন্ধে লেখক প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য—এই দু'য়ের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। সচরাচর বলা হ'য়ে থাকে যে প্রাচ্য স্পিরিচুয়াল এবং পশ্চিম মেটিরিয়্যালিস্টিক। কিন্তু দু'টি শব্দের তরজমা আমরা ঠিকমতো করতে পারি নি। লেখক তাঁর আসল বক্তব্যকে প্রবন্ধের গোড়ার দিকে স্পষ্ট ক'রেই বলেছেন, 'এই ইউরোপীয় মেটিরিয়্যালিজ্‌মের প্রভাব আমাদের মনের উপর কি সূত্রে কতদূর হয়েছে, এবং আমাদের স্পিরিচুয়ালিটির প্রভাব ইউরোপীয় মনের উপর কি ভাবে কতটা হয়েছে, আর সে প্রভাবের ফল বিশ্বমানবের পক্ষে আশঙ্কার কথা কিংবা আশার কথা—তাও বিবেচ্য।' এশিয়া ধর্মক্ষেত্র—এই জাতীয় ধারণা দীর্ঘকাল ধরে চ'লে আসছে। তাই এতকাল এশিয়া সম্পর্কে ইউরোপের কোন ভাবনা ছিল না। কিন্তু যুদ্ধ-বিধ্বস্ত ইউরোপের মনে একটি গভীর সংশয়ের সৃষ্টি হয়েছে। এর ফলে তাঁদের কেউ কেউ এশিয়ার সভ্যতাকে তাঁদের সভ্যতার সহায়ক মনে করেন, কেউ বা মনে করেন পরিপন্থী।

প্রবন্ধকার বিখ্যাত ফরাসী লেখক মাসির (Masis) 'ইউরোপের আত্মরক্ষা' নামক পুস্তকের আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য সম্প্রসারিত করেছেন। মাসির মতে গ্রীকসাহিত্য ও খ্রীষ্টধর্ম ইউরোপের মন গ'ড়ে তুলেছে কিন্তু বর্তমান ইউরোপ তার অতীত আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়েছে—তার ফলেই তাদের এই দুর্গতি! দীর্ঘকাল আচরিত ইউরোপীয় আদর্শের ভিত্তি কাঁপিয়ে দিয়েছে দু'টি বড় ব্যাপার—ইতালীয় রেনেসাঁ ও জর্মানির রিফর্মেশন। এর পর এশিয়ার মনোভাবও ইউরোপীয় স্পিরিচুয়ালিটিকে আক্রমণ করেছে। মাসি মনে করেন বুদ্ধদেব-প্রচারিত ধর্মমত যার মনে স্থায়ী হ'য়ে বসবে, সে সবকর্ম ত্যাগ করতে বাধ্য। অথচ ইউরোপ সর্বান্তঃকরণে কর্মযোগী হ'তে চায়। মাসির মতে এশিয়াটিক মনোভাব আমদানীর জন্য দায়ী প্রধানত জর্মানি ও রাশিয়া।

মাসির উক্ত গ্রন্থের সমালোচনা করেছেন এদ্‌মঁ ঝালু নামে একজন সাহিত্যিক। চৌধুরী মহাশয় ঝালুর মতামতটিও আলোচনা করেছেন। ঝালুর মনে প্রথমেই প্রশ্ন জেগেছে যে এশিয়া-সম্পর্কিত মাসির ভীতি পোলিটিক্যাল না দার্শনিক? মাসি তাঁর গ্রন্থে সংস্কৃতসাহিত্য ও সংস্কৃতশাস্ত্রের যে পরিচয় দিয়েছেন, 'তা হিন্দুধর্ম ও হিন্দুদর্শনের সংক্ষিপ্তসার তো নয়ই, এমন-কি

ক্যারিকেচার পর্যন্ত নয়।' ঝালু মনে করেন যে হিন্দুসভ্যতা ও হিন্দুসাহিত্যের প্রতি ঔদাসীন্যের জন্য দায়ী হচ্ছেন ইউরোপের ওরিয়েণ্টালিস্টরা। কারণ 'তাঁরা দার্শনিকও নন, আর্টিস্টও নন, ফিললজিস্ট মাত্র।' সিলভ্যাঁ লেভির মতে হিন্দুদর্শন ও হিন্দুসাহিত্য একান্তভাবে ভারতবর্ষেরই—গ্রীকসাহিত্যের মতো এ সাহিত্য সর্বদেশের ও সর্বকালের নয়। অথচ মাসি লেভির কথাতেই আস্থা স্থাপন ক'রে ভারতবর্ষের প্রতি অবিচার করেছেন। বর্তমান ইউরোপ মেটিরিয়্যালিজমের বশবর্তী হ'য়ে উঠেছে, এ ক্ষেত্রে এশিয়ার স্পিরিচ্যুয়ালিজমের দ্বারা প্রভাবিত হবে এমন কোন সম্ভাবনা নেই।

আসল কথা বুদ্ধদেবের বাণী ইউরোপের কয়েকজন সাহিত্যিক ও আর্টিস্টের ওপরই প্রভাব বিস্তার করেছে। কিন্তু তাঁরা ইউরোপের ভাগ্যনিয়ন্তা নন,—ভাগ্যনিয়ন্তা হচ্ছেন 'বুদ্ধিপৌরুষহীন পলিটিশিয়ান ও কারখানার মালিক।' ইউরোপ যে নীচাশয়তার পঙ্কে নিমগ্ন হয়েছে, তার থেকে বাঁচতে গেলে কি করা উচিত? এ সম্বন্ধে মাসি মনে করেন যে একমাত্র রোমান ক্যাথলিক চার্চ ত্যাগের মন্ত্র দিয়ে তাদের মন শোধন করতে পারে। কিন্তু ঝালু মনে করেন যে, রোমান ক্যাথলিক চার্চের মধ্যেও বিষয়বুদ্ধির ভেজাল মিশ্রিত আছে—কিন্তু 'ইউরোপের মনকে যদি বৌদ্ধধর্মের বরফজলে নাইয়ে তোলা যায় তা হলে সে মন আবার সুস্থ সবল ও সুন্দর হবে।' প্রবন্ধটিতে চৌধুরী মহাশয় দু'জন লেখকের বক্তব্যকে সংক্ষেপে নিবেদন করেছেন মাত্র। তিনি এই দু'টি মত সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে আলোচনাও করেন নি। তবে প্রবন্ধের শেষে ছোট্ট একটু মন্তব্য করেছেন। তাঁর মতে ইউরোপের মনে প্রাচীন হিন্দুধর্মের 'ছোপ' লাগার কোন সম্ভাবনা নেই, বরং দেখা যাচ্ছে একালের এশিয়া নবীন ইউরোপের মেটারিয়্যালিজমের মোহে পড়েছে। বক্তব্যের আড়ালে শ্লেষের আভাস থাকলেও বক্তব্যটি অযথার্থ নয়।

'ইউরোপীয় সভ্যতা বস্তু কি' (নানা-চর্চা) প্রবন্ধটিতে প্রমথ চৌধুরী জর্মান অধ্যাপক ডক্টর হাসের 'What is European civilization' গ্রন্থটির সমালোচনা ক'রে স্বমত প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছেন। প্রবন্ধটির প্রথমাংশে ডক্টর হাসের গ্রন্থ থেকে বিভিন্ন অংশ উদ্ধার ক'রে তিনি তাঁর মতামত বিশ্লেষণ করেছেন, এবং দ্বিতীয়ার্ধে তিনি নিজের বক্তব্য বলেছেন। গত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে ইউরোপীয় সভ্যতার স্বরূপ সম্পর্কে ইউরোপীয়দের মনেই নানাজাতীয় প্রশ্নের উদয় হয়েছে। ডক্টর হাস্ ইউরোপীয় জাতিদের এক

হ'তে বলেছেন—একত্র সম্মিলিত হ'য়ে বহিঃশত্রুকে পরাভূত করাই তাদের উদ্দেশ্য। বহিঃশত্রু অর্থ যে এশিয়া, তা স্পষ্টই বোঝা যায়। এশিয়া যে ইউরোপের প্রধান শত্রু—ভূতপূর্ব জর্মান কাইজার এই সত্যটি আবিষ্কার করেছিলেন। প্রকারান্তরে অধ্যাপক হাস্‌ও এই কথাই বলেছেন। এককালে বার্কলের 'সভ্যতার ইতিহাস' বইটি সভ্যতার আধিভৌতিক ব্যাখ্যার চরম রূপ হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে এই ব্যাখ্যাকে অচল ক'রে 'এথ্‌নলজি অ্যান্‌থ্রপলজি প্রভৃতি নাম ধারণ করে নববিজ্ঞানরূপে পরিচিত হল।' এই সব নববৈজ্ঞানিকেরা প্রমাণ করলেন যে 'আর্যজাতি নামে এক দেবজাতি' 'মাটি ফুঁড়ে উঠেছিল উত্তরজর্মানিতে।' অধ্যাপক মহাশয় প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে ইউরোপীয়রা অন্‌-ইউরোপীয়দের থেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক।

লেখক ইউরোপীয় আত্মার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন যে ইউরোপীয় সভ্যতার ভিত্তি হচ্ছে টেক্‌নিক্যাল সায়েন্সকে আয়ত্ত ক'রে তাঁরা 'প্রকৃতিকে মানুষের সেবাদাসীতে পরিণত' করেছেন। প্রকৃতি-জিজ্ঞাসাই ইউরোপীয় সভ্যতার মূল মন্ত্র। বিজ্ঞানাচার্যেরা জ্ঞানকেই মূলমন্ত্র ক'রে তুলেছেন। গ্রীকদের জ্ঞান, রোমানদের ধর্ম ও মধ্যযুগের ভক্তি, এই তিনটি মিলেই ইউরোপীয় সভ্যতার ভিত্তিভূমি রচনা করেছে। জর্মান অধ্যাপকের মতটিকে লেখক ল্যুসিআঁ রোমিয়ে নামক একজন ফরাসী প্রবন্ধকারের মতামতের সঙ্গে মিলিয়ে যাচাই করে নিয়েছেন। তাঁর মতে জিয়োগ্রাফি ও ইকনমিক অবস্থার জ্ঞানই ইউরোপীয় সভ্যতাকে উপলব্ধি করার একমাত্র মাপকাঠি নয়, ইউরোপীয় সভ্যতার মৌলিক উপাদানগুলিও বিচার ক'রে দেখতে হবে। যে মেটিরিয়্যাল সিভিলিজেশনের কথা ইউরোপীয় সভ্যতার প্রসঙ্গে প্রায়ই উচ্চারিত হয়, তা-ই ইউরোপীয় সভ্যতার যথার্থ স্বরূপ নয়। অতীতের যে যে কারণে ইউরোপীয় সভ্যতা সমৃদ্ধ হ'য়ে উঠেছে, ভবিষ্যতে সে কারণগুলি থাকতে পারে না, কারণ অন্যান্য জাতিও ক্রমশ সেই কারণগুলি আয়ত্ত করতে তৎপর হ'য়ে উঠেছে। যাঁরা ইউরোপীয় সভ্যতাকে মেটিরিয়্যাল সিভিলিজেশন বলে ভুল করেন, তাঁরা এ সভ্যতাকে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে দিচ্ছেন।

গ্রীক সভ্যতা, রোমান সভ্যতা ও খ্রীষ্টধর্ম—এই তিনটি বস্তু মিলে বর্তমান ইউরোপীয় সভ্যতাকে গ'ড়ে তুলেছে। রেনেসাঁর যুগ থেকেই এই তিনের মধ্যে

পার্থক্য দেখা দিল। তার ফলে ইউরোপীয় সভ্যতার মধ্যে যে বিরোধের সর্বনাশা লক্ষণ দেখা দিয়েছে, তার মন্ত্রে যারা আজ দীক্ষিত হচ্ছে তারাই একদিন ইউরোপের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হবে। জর্মান বৈজ্ঞানিক ও ফরাসী সাহিত্যিক—দু'জনেই ইউরোপীয় সভ্যতার ভয়াবহ ভবিষ্যতের ইঙ্গিত করেছেন। কিন্তু একটি বিষয়ে দু'জনের মধ্যে প্রবল মতানৈক্য আছে। জর্মান অধ্যাপকের মতে টেক্‌নিক্যাল সিভিলিজেশন হচ্ছে ইউরোপীয় সভ্যতার চরমতম পরিণতি, ফরাসী সাহিত্যিকের মত ঠিক তার বিপরীত। ফরাসী সাহিত্যিকের মতে একমাত্র ধর্মজ্ঞানই ইউরোপকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারে। জর্মান পণ্ডিত মনে করেন যে, ইউরোপীয় সভ্যতার উন্নতির এখনো অবকাশ আছে। প্রবন্ধটির শেষাংশে যেখানে লেখক নিজের কথা বলেছেন, সেই অংশটিই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। ইউরোপীয় সভ্যতার সাময়িক বিকৃতি এলেও এ সভ্যতা যে ভেঙে পড়বে একথা তিনি কোন মতেই স্বীকার করেন নি—কারণ মানব-মনীষার ইতিহাসে ইউরোপীয় সংস্কৃতি মৃত্যুহীন। গ্রীক-রোমানদের মৃত্যু হয়েছে, কিন্তু তাদের দর্শন-বিজ্ঞান-সাহিত্যের মৃত্যু নেই—বিশ্বমানব তার উত্তরাধিকারী হয়েছে। আসল কথা, সভ্যতা বলতে লোকে বোঝে অর্থ ও স্বার্থ—কিন্তু দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্প হচ্ছে সভ্যতার চরমতম ফল। সেদিক থেকে বিচার করতে গেলে ইউরোপীয় সভ্যতার ভয় পাবার কিছু নেই, কারণ ইউরোপ যে ভাবের ফসল ফলিয়ে রেখেছে, তার মৃত্যু নেই—বিশ্বমানবের মনোজীবনকে এ মহাসম্পদ চিরকালই সমৃদ্ধ ক'রে রাখবে। ইউরোপের যন্ত্র-জীবিত বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতাকে চৌধুরী মহাশয় সমর্থন করতে পারেন নি, কিন্তু ইউরোপীয় দর্শন-বিজ্ঞান-সাহিত্য-শিল্প তাঁকে চিরদিনই অনুপ্রাণিত করেছে।

নয়

সমসাময়িক রাজনৈতিক চিন্তা নিয়ে প্রমথ চৌধুরী কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছেন। রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ না থাকার জন্য তাঁর পক্ষে এই জাতীয় আলোচনার সুবিধে ছিল—তাই তিনি সমসাময়িক রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে নানাদিক থেকে বিশ্লেষণ করতে সমর্থ হয়েছেন। 'বাঙালি-পেট্রিয়টিজম্' (নানা-কথা) প্রবন্ধে তিনি শুধু বাঙালীর স্বদেশপ্রেমিকতা সম্বন্ধেই আলোচনা করেন নি, বাঙালীর বৈশিষ্ট্যকেও নির্দেশ করেছেন। প্রবন্ধটি পত্রাকারে রচিত হয়েছে,—

চিঠির সহজ রস এখানে আছে। বিজয়ার পর জনৈক বন্ধুকে চিঠি লিখতে ব'সে তিনি দুর্গোৎসবের মধ্যে বাঙালীর সৌন্দর্যজ্ঞানের যে বিকাশ ঘটেছে, তার কথা আলোচনা করেছেন, 'ষোড়শোপচারে ওই মূর্তিপূজার প্রসাদেই বাঙালিজাতির মনের poetic এবং aesthetic অংশ গ'ড়ে উঠেছে।' বাঙালী-পেট্রিয়টিজম্ বা প্রাদেশিক পেট্রিয়টিজম্ সম্বন্ধেই তিনি এই প্রবন্ধে আলোচনা করেছেন। বাঙালী জাতির স্বাতন্ত্র্যজ্ঞানই বাঙালী-পেট্রিয়টিজমের মূলে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে যে প্রভেদ আছে, ফ্রান্সের সঙ্গে জর্মানির সে প্রভেদ নেই। এই-জাতীয় প্রাদেশিক পেট্রিয়টিজম্‌কে একদল রাজনীতিজ্ঞ সঙ্কীর্ণ ও স্বার্থপর জাতীয় বুদ্ধি ব'লে মনে করেন। কিন্তু চৌধুরী মহাশয় যে তাঁদের এই অভিযোগ স্বীকার করেন নি তাই নয়, তিনি সর্ব-ভারতীয় পেট্রিয়টিজম সম্পর্কে অম্ল-মধুর শ্লেষাত্মক মন্তব্য করেছেন 'নিজের সন্তানকে স্তন দিলে কোন মায়ের উপর যদি এই অভিযোগ আনা হয় যে, সে মাতা অতি স্বার্থপর, যেহেতু তিনি পাড়াপড়শির ছেলেদের নিজের স্তন্যক্ষীরে বঞ্চিত করছেন, তা হলে সে অভিযোগের কি কোনো প্রতিবাদ করা আবশ্যক? মানুষের পক্ষে যা অস্বাভাবিক তাই করার ভিতর যে আসল মনুষ্যত্ব নিহিত, এ কথা বলে অতিমানুষে আর শোনে অমানুষে। ধরো, যদি কোনো জননী নিজেকে জগজ্জননী-জ্ঞানে পাড়াসুদ্ধ ছেলেমেয়েদের নিজের স্তনের দুধ জোগাতে ব্রতী হন, তা হলে কাউকে বঞ্চিত না ক'রে সবাইকে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দিতে হলেও সে দুধে এত জল মেশাতে হবে যে তা পান ক'রে কারও পেট ভরবে না, সকলের পেট ভরবে শুধু যকৃতে। আমার বিশ্বাস আমাদের পলিটিশিয়ান্‌রা অদ্যাবধি পেট্রিয়টিজমের উক্তরূপ জলো-দুধের কারবার করছেন, এবং আর সকলকেও তাই করতে পরামর্শ দিচ্ছেন।'

প্রাদেশিক পেট্রিয়টিজমের রূপ আমাদের চোখে তেমন ফুটে ওঠে না। তার কারণও নির্দেশ করেছেন লেখক। বিদেশী শাসন-পাশের দ্বারা, আমরা এমনভাবেই আবদ্ধ যে, প্রদেশবিশেষ নিজ চেষ্টায় সে বন্ধন থেকে মুক্ত হ'তে পারে না। তৎকালীন 'কংগ্রেসী ঐক্যে'র ত্রুটির কথাও লেখক উল্লেখ করেছেন। সে ঐক্য যেন জোর ক'রে পরস্পরের মধ্যে মিলন-প্রচেষ্টা, কিন্তু প্রীতির আকর্ষণে যে মিলন, তাই স্বাভাবিক। লেখকের মতে কংগ্রেসী পেট্রিয়টিজ্‌মের মূলে আছে 'বিলেতি পুঁথিপড়া মন।' কিন্তু তার অন্তরালে একটি গভীরাশ্রয়ী মন আছে—'সে মন প্রতি জাতির নিজস্ব।' প্রাদেশিক

পেট্রিয়টিজমের মূল সেইখানেই নিহিত। লেখক আলোচ্য প্রবন্ধে সেই মনটিকেই জাগাতে বলেছেন।

বর্তমান পৃথিবীতে রাজনৈতিক মতবাদের দু'টি শিবির বিদ্যমান—ক্যাপিট্যালিজ্‌ম্ ও বলশেভিজ্‌ম্। লেখক এই দু'টি মতবাদের স্বরূপ ও ভবিষ্যৎকে সামান্য একটু কথার সূত্রে আলোচনা করেছেন, 'ক্যাপিট্যালিজমের মূল সূত্র হচ্ছে অল্প লোকের বহু অন্ন, আর বলশেভিজমের মূলসূত্র হচ্ছে বহুলোকের যথেষ্ট অন্ন।' লেখকের মতে এই দুটি মতবাদের মধ্যেই অসঙ্গতি আছে—রুটি যেমন সকলেরই চাই, একথা যেমন সত্য, তেমনি মানুষের অন্নময় সত্তাই সর্বস্ব নয়—যেমন অন্ন-বস্ত্র চাই, তেমনি চাই দর্শন-বিজ্ঞান-সাহিত্য। 'ন্যাশন্যালিজ্‌ম্' শব্দটি যখন অপরের সম্পত্তির ওপর হস্তক্ষেপ বোঝায়, তখন মনে করতে হবে যে সেটা নিতান্ত ঔদরিক অর্থেই প্রযুক্ত হয়েছে। লেখকের মতে যখন নিজেদের হাতে রাষ্ট্র শাসনের ভার পড়বে তখন প্রতিটি প্রদেশ নিজেদের ঘর সামাল করার জন্য সচেতন হ'য়ে উঠবে। চৌধুরী মহাশয়ের মতে 'বাঙালি-ন্যাশন্যালিজ্‌ম্ মুখ্যতঃ মানসিক এবং গৌণতঃ রাজনৈতিক।'

বাঙালীর জাতীয় মনের প্রকাশ তার সমৃদ্ধ সাহিত্যের মধ্যে। মনোজগতের দিক থেকে সে ভারতের অপরাপর জাতি থেকে অনেকখানি অগ্রসর। কারণ বাঙালী ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের দ্বারা সবচেয়ে বেশী লাভবান হয়েছে। নব্য পলিটিক্স যে ইউরোপ থেকে আমদানি এ বিষয় কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু বাঙালী তার চেয়েও বেশী ইউরোপের কাছ থেকে আদায় করেছে; তাই আজ শেক্সপীয়র তার কাছে বিদেশী লেখক নয়, আত্মার আত্মীয়। প্রবন্ধকারের মতে বাঙালী-পেট্রিয়টিজ্‌ম্‌কে অস্বীকার করা সম্ভব নয়, তা ছাড়া এ পেট্রিয়টিজ্‌ম্ ভারতীয় পেট্রিয়টিজ্‌মের বিরোধী নয়। পরবিদ্বেষ বুদ্ধির ওপর প্রতিষ্ঠিত ন্যাশন্যালিজ্‌ম্ শুধু ধ্বংসের কারণ হয়—গত প্রথম বিশ্বযুদ্ধ তার প্রমাণ।

'দু-ইয়ারকি'—পুস্তিকাটি রৌলট-অ্যাক্ট ও মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড শাসন সংস্কারের পটভূমিকায় লেখা। 'দু-ইয়ারকি,' 'দেশের কথা (১)', 'দেশের কথা (২)'—প্রবন্ধ তিনটির মধ্যে প্রধানত সমসাময়িক রাজনৈতিক প্রসঙ্গই আলোচিত হয়েছে। তিনি নিজেই তাঁর এই শ্রেণীর রচনার প্রকৃতি সম্পর্কে বলেছেন, 'গত চার বছরের ভিতর এ দেশে যেসব রাজনৈতিক সমস্যা উঠেছে, সেগুলির মর্ম আমি একটু তলিয়ে বোঝবার চেষ্টা করেছি,

যে দেশে মানুষের বর্তমান রাজনৈতিক মনোভাবের জন্ম, সে দেশের ইতিহাস ও সাহিত্যের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় দিতে আমি বাধ্য হয়েছি। আমার বিশ্বাস সাময়িক ব্যাপারকে কেবলমাত্র সাময়িক ভাবে দেখলে তার স্বরূপ আমাদের দেশের চোখে পড়ে না। অনেক জিনিস যা আমরা মনে করি, অতি নূতন, কথনো কথনো দেখা যায় যে তা অতি পুরাতন।' বিলেতি রাজনীতির পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি ইতিহাস ও সাহিত্যের দ্বারস্থ হয়েছেন। প্রবন্ধটিতে তিনি গণতন্ত্রের ইতিহাস আলোচনা করেছে। 'ডায়ার্কি' শব্দটি শব্দ-কুশলী লেখকের হাতে 'দু-ইয়ারকি'-তে পরিণত হয়েছে। মণ্টেগু-চেমসফোর্ড রিফর্ম্‌ বিলের ডায়ার্কি বোঝাতে গিয়ে তিনি ইউরোপীয় গণতন্ত্রের গোড়ার কথা আলোচনা স্থরু করেছেন।

'দেশের কথা (১)' প্রবন্ধটিতে মণ্টেগু সাহেবের ভারতবর্ষে পদার্পণের পরে ভারতীয় নেতাদের মনে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল, তারই কৌতুককর বর্ণনা করেছেন। এখানেও চৌধুরী মহাশয় 'বাঙালি পেট্রিয়টিজমে'র বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করেছেন। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশবাসীর সঙ্গে বাঙালীর রাজনৈতিক দৃষ্টির প্রভেদ কোথায় লেখক তাই দেখিয়েছেন। তিনি তিলকের একটি উক্তিকে সমালোচনা ক'রে বাঙালীর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করেছেন, 'বাঙালীর কাছে ন্যাশনালিজ্‌মের অর্থ হচ্ছে জাতির স্বধর্মের চর্চা এবং সেই শাসনতন্ত্রই ঈপ্সিত ও বরণীয়, যার অন্তরে একটি বিশেষ জাতির স্বধর্ম পূর্ণবিকশিত হ'য়ে ওঠার পূর্ণ অবকাশ পায়। অতএব প্রতি দেশের স্বাধীন স্বাতন্ত্র্যই তার ন্যাশনালিজ্‌মের অটল ভিত্তি।...স্বাধীনতা শব্দের অর্থ আমাদের কাছে শুধু রাজনীতিগত নয়; কিন্তু তার চাইতে ঢের বেশী উদার, ঢের বেশী ব্যাপক।' চৌধুরী মহাশয়ের এই মন্তব্যটি অত্যন্ত প্রণিধানযোগ্য। তিনি জাতীয় স্বাতন্ত্র্যের পক্ষপাতী, কিন্তু তাই ব'লে প্রাদেশিকতার সঙ্কীর্ণ ও অনুদার ক্ষেত্রে কথনো নেমে আসেন নি। গণতন্ত্র ও ব্যক্তিস্বাধীনতার মধ্যে সম্পর্ক কি এ সম্বন্ধে তিনি আলোচনা করেছেন 'দেশের কথা' পর্যায়ের দ্বিতীয় প্রবন্ধে। এই পর্যায়ের প্রথম প্রবন্ধে তিনি 'জাতির স্বধর্ম-চর্চা' সম্পর্কে যে প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন, তাকেই আরও বিশদ ও বিস্তৃত ক'রে তুলেছেন 'দেশের কথা' (২)' প্রবন্ধটিতে। আলোচনাটি স্থরু হয়েছিল 'প্যাটেল বিল' প্রসঙ্গে। প্রমথ চৌধুরী গণতন্ত্র সম্পর্কে একাধিক প্রবন্ধে আলোচনা করেছেন—গণতন্ত্রের সংজ্ঞা ও সার্থকতা নিয়ে অনেক মূল্যবান কথা বলেছেন। গণতন্ত্র তাঁর মতে

মনুষ্যত্বের পূর্ণতর বিকাশের সাহায্য করবে। কারণ রাজনৈতিক স্বাধীনতাই মানুষের একমাত্র স্বাধীনতা নয়। তাই ব্যক্তিস্বাধীনতার ওপর তিনি অত্যন্ত জোর দিয়েছেন। ঐতিহাসিক Seignobos-এর বিখ্যাত মন্তব্য উদ্ধার ক'রে তিনি বলেছেন, 'যিনি individual liberty, অর্থাৎ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মাহাত্ম্যে বিশ্বাস না করেন, ডেমোক্রাসীর নাম উচ্চারণ করবার তাঁর অধিকার নেই।' গণতন্ত্র শব্দটি ইউরোপীয় রাজনৈতিক নেতাদের শুধু একটি মুখের বুলিই নয়,—সেটা শুধু তাদের পক্ষে পুঁথিগত বিদ্যাই নয়, একে তাঁরা জীবনের মর্মমূলের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছেন। জীবনের মর্মমূলের মধ্যে ও বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে গণতন্ত্রকে সম্পূর্ণভাবে মিশিয়ে দিতে পারেন নি বলেই আমাদের নেতাদের কাছে 'গণতন্ত্র' কথাটি নিতান্ত মুখের বুলিই হ'য়ে উঠেছে। প্রবন্ধকার 'প্যাটেল বিল' প্রসঙ্গে আমাদের রাষ্ট্রনায়কদের পরস্পর-বিরোধী বিচিত্র মানসিকতার কথা বলেছেন। গণতন্ত্র যাঁরা সমর্থন করেন, তাঁরা যে কেমন ক'রে প্যাটেল বিলের বিরুদ্ধাচরণ করেন, তা লেখক কোনো সূত্রে ভেবেই পান না। মুখে ডেমোক্র্যাসীর কথা বললেও তাঁদের মনটা পড়ে আছে সেই মান্ধাতার আমলে।

'রায়তের কথা' অর্থনৈতিক প্রবন্ধ। যে গণতন্ত্রের রাজনৈতিক দিক তিনি বহু প্রবন্ধে আলোচনা করেছিলেন, এখানে তিনি তার অর্থনৈতিক দিকের ওপরে আলোকপাত করেছেন—একথা বললে অত্যুক্তি হয় না। বঞ্চিত সর্বহারা কৃষক-সম্প্রদায়ের স্বপক্ষে তিনি অনেক কথাই বলেছেন। গণতন্ত্র ব্যাপারটি শুধু রাজনৈতিক ব্যাপারই নয় অর্থনৈতিক সাম্যও এর মধ্যে একটা বড়ো জিনিস। লেখক বঙ্কিমচন্দ্রের 'সাম্য' থেকে অনেক উদাহরণ নিয়ে তার বক্তব্যটি আলোচনা করেছেন। Peasant proprietor হ'য়ে উঠলে যে দেশের সমৃদ্ধি হবে একথা তিনি স্পষ্টভাবেই বলেছেন। প্রবন্ধের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হ'ল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুদীর্ঘ ইতিহাসটি। তিনি ভারতচন্দ্রের কাব্য থেকে নবাবী আমলের রায়তের অবস্থার একটি বাস্তব পরিচয় দিয়েছেন। হাণ্টারের Annals of Rural Bengal থেকে ইংরেজ আমলের প্রথম যুগের অর্থনৈতিক অবস্থার বর্ণনা ক'রে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আসন্ন কারণগুলিকে পরিস্ফুট করেছেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কুফল লেখকের সংক্ষিপ্ত একটি উক্তি থেকেই বেশ বোঝা যায়, 'যদি অত তাড়াহুড়ো ক'রে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত না ক'রে বসতেন তা হলে রায়তের peasant proprietorship নষ্ট হত না। কারণ রাজাপ্রজার যে সম্বন্ধ সেকালের ইংরেজদের বুদ্ধির অগম্য ছিল, কালক্রমে

তার মর্ম তাঁরা উদ্ধার করতে সমর্থ হয়েছেন। আজ প্রায় দেড়শ বৎসর ধরে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে অভ্যস্ত হ'য়ে আমাদেরও মনে এই ধারণা জন্মেছে যে, রায়তের আর যাই থাক, জমির উপর কোনরূপ মালিকীস্বত্ব নেই, এবং পূর্বেও ছিল না।' এই ব্যবস্থার 'জনক-জননী' ফ্রান্সিস সাহেব ও লর্ড কর্ণওয়ালিশ এই ব্যবস্থার কুফল যে একেবারে বুঝতে না পেরেছিলেন এমন নয়, কিন্তু দুঃখের বিষয় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি তাঁদের পূর্ব-প্রতিজ্ঞার কিছুই আর পরবর্তী কালে পালন করেন নি। বঙ্কিমচন্দ্র তার 'সাম্য' গ্রন্থের মধ্যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে একদিন 'প্রবল প্রতাপান্বিত মহারাজাধিরাজ' ও 'পরাণ মণ্ডল' সমকক্ষ হবেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্য উদ্ধার ক'রে চৌধুরী মহাশয় বলেছেন, 'এক্ষণে আমার বক্তব্য এই যে, ইতিমধ্যে আমরা যদি বাংলার প্রজাকে peasant proprietor না করে তুলি তা হ'লে বঙ্কিমচন্দ্রের ভবিষ্যদ্‌বাণী সার্থক হতে আর বড় বেশিদিন লাগবে না।' প্রমথ চৌধুরীর এই জাতীয় আলোচনার মধ্যে নিঃসন্দেহে প্রগতিশীলতার পরিচয় আছে, কিন্তু তারও একটি নির্ধারিত সীমা ছিল। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মতবাদের মধ্যে তাঁর যুগোপযোগী চিন্তার বহু পরিচয় আছে, সে দিক থেকে তিনি মোটেই পিছিয়ে পড়েন নি।

'বীরবলের টিপ্পনী' পুস্তিকায় যে পাঁচটি প্রবন্ধ সঙ্কলিত হয়েছে, তাও প্রধানত সমকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতির ওপর লেখা। ভারতসচিব মণ্টেগু সাহেব ভারত-শাসনের ভাবীরূপ সম্পর্কে কিছু আভাস দেন। কিন্তু একে কেন্দ্র ক'রে নেতৃবৃন্দের মধ্যে দু'টি দলের সৃষ্টি হল। বামপন্থীরা এই দান অগ্রাহ্য করলেন এবং মডারেট বা দক্ষিণপন্থীরা আনন্দই প্রকাশ করলেন। বামপন্থীরা অন্তরীণাবদ্ধ অ্যানী বেসান্তকে কলকাতা কংগ্রেসের (১৯১৭) অধিবেশনে সভাপতি করার প্রস্তাব করলেন, কিন্তু মডারেটরা ইংরেজ সরকারের সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কায় এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করলেন। কংগ্রেসের এই দলাদলির পরিণতি পাছে মারাত্মক হ'য়ে ওঠে এই জন্য রবীন্দ্রনাথকে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি পদ গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হয়। অবশ্য পরে গোলমাল মিটে যাওয়ায় রবীন্দ্রনাথকে এ পদ গ্রহণ করতে হয় নি।[১০] 'কংগ্রেসের দলাদলি' প্রবন্ধটি এই ঘটনাকে উপলক্ষ করে লেখা।

'গুলীখোরের আবেদন-পত্র' ও 'গর্জন-সরস্বতী-সংবাদ'—রচনা দুটি 'দেশে যখন লর্ড কার্জনের উপদ্রব হয়' সেই সময় লেখা। 'সবুজপত্র' প্রকাশের প্রায় দশ বছর আগের ঘটনা—সুতরাং কালগত দিক থেকে রচনা-দু'টিকে

চৌধুরী মহাশয়ের প্রথম দিকের রচনাই বলা যায়। রচনা-দু'টির মধ্যে নূতনত্ব আছে—স্টাইল ও টেক্‌নিক্—দু'দিকেই এর নূতনত্ব। প্রথম রচনাটি পত্রাকারে লেখা; দ্বিতীয়টি লেখা নাটকীয় রীতিতে—চরিত্র মাত্র দু'টি—গর্জন ও সরস্বতী। গর্জন কর্জনের অপভ্রংশ, সরস্বতী সঙ্কীর্ণ অর্থে বঙ্গভাষা হলেও বৃহত্তর অর্থে দেশজননীও বটে। এই দু'টি রচনায় চৌধুরী মহাশয় 'লোক-রহস্যে'র বঙ্কিমচন্দ্রের টেক্‌নিক্ অবলম্বন করেছেন। বাক্-চাতুর্য, শ্লেষ-ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ রচনা-দু'টিতে নূতন ধরণের আস্বাদন সঞ্চারিত করেছে। কিন্তু হাল্‌কা হাসির বুদ্বুদ সৃষ্টিই রচনা-দু'টির স্বরূপ নয়—বাক্-চাতুর্যের তীব্রোজ্জ্বল দীপ্তি ও লঘুরসের আড়ালে কার্জনী-শাসনের যথার্থ রূপ উদ্ঘাটিত করেছে। তিনি এই পুস্তিকার ভূমিকায় বলেছেন, 'দেশে যখন লর্ড কর্জনের উপদ্রব হয়, তখন সে উপদ্রবে—যাঁদের চোখ ও মুখ একসঙ্গে দুই ফোটে—তাঁদের মধ্যে আমিও ছিলুম একজন।' সাময়িক প্রসঙ্গগুলির মধ্যে সব রচনাই যে সাহিত্যিক গুণসম্পন্ন, এ কথা বলা যায় না, কিন্তু তাদের ঐতিহাসিক মূল্য অস্বীকার করার উপায় নেই।

দ শ

বর্তমান শিক্ষার ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে প্রমথ চৌধুরী তাঁর বহু রচনায় প্রসঙ্গক্রমে নানাকথার উত্থাপন করেছেন। শিক্ষাব্যবস্থার অসঙ্গতিগুলিকে তিনি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের মাধ্যমে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। বাঁধাধরা নিয়ম, বই মুখস্থ করা ও নোট-বইয়ের শাসন—তরুণ শিক্ষার্থীদের মানসিক বিকাশের অন্তরায়। জীর্ণ করতে পারুক. আর নাই পারুক, এখানে জোর ক'রে প্রভূত পরিমাণে বিদ্যা গেলানো হয়—তার অনিবার্য পরিণতি হল শারীরিক ও মানসিক মন্দাগ্নি বৃদ্ধি পাওয়া। বৃহত্তর জীবনের সঙ্গে এ শিক্ষার কোন যোগ নেই—তাই জীবন-সম্পর্ক-বর্জিত এ শিক্ষা অবিদ্যারই নামান্তর হ'য়ে ওঠে। তিনি এই সময় বলেছিলেন, '...আমাদের শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য হচ্ছে ইঁচড়ে পাকানো, আর আমাদের সমাজনীতির উদ্দেশ্য হচ্ছে জাগ দিয়ে পাকানো।' 'সাহিত্যে খেলা' রচনাটিতে সাহিত্য ও শিক্ষার বিরোধিতার কথা শ্লেষের ভঙ্গিতে বলেছেন, 'কাব্যরস নামক অমৃতে যে আমাদের অরুচি জন্মেছে, তার জন্য দায়ী এ যুগের স্কুল এবং তার মাস্টার। কাব্য পড়বার ও বোঝবার জিনিস, কিন্তু স্কুলমাস্টারের কাজ হচ্ছে বই পড়ানো ও বোঝানো। লেখক এবং পাঠকের মধ্যে এখন স্কুলমাস্টার দণ্ডায়মান।'

শিক্ষা ও সাহিত্যের সম্পর্ক নিয়ে তিনি 'বই পড়া' প্রবন্ধটিতে (আমাদের শিক্ষা) সুদীর্ঘ আলোচনা করেছেন। লাইব্রেরীর সার্থকতা ও উপকারিতা সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বই পড়ার প্রসঙ্গ তুলেছেন। প্রবন্ধের প্রথমাংশে তিনি প্রাচীন ভারতের বিদগ্ধ জীবনচর্যার একটি পরিপূর্ণ ও নিপুণ ছবি এঁকেছেন এবং দ্বিতীয়ার্ধে সাহিত্য ও শিক্ষার মধ্যে যোগসূত্রের কথা বলেছেন। সেকালে বই পড়া ব্যাপারটি যে নাগরিক জীবনের একটি প্রধান উপকরণ ছিল, তা সংস্কৃতসাহিত্য থেকে জানা যায়। প্রবন্ধকার প্রাচীন ভারতের বই পড়ার সূত্রটি নিয়ে তৎকালীন 'নাগরিক' জীবনের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় দিয়েছেন। এই চিত্রটিকে প্রাচীন ভারতবর্ষের আংশিক সমাজচিত্রও বলা চলে। লেখক বাৎস্যায়নের কামসূত্র অবলম্বন ক'রে প্রাচীন ভারতবর্ষের নাগরিকদের দৈনন্দিন জীবনাচরণের বর্ণনা করেছেন। বই পড়া এই নাগরিকদের দৈনন্দিন জীবন-চর্যার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ও অংশ ছিল। চৌধুরী মহাশয়ের বিদগ্ধ ও সুকর্ষিত মনোজীবনের স্বচ্ছন্দ অনুমোদন প্রাচীন ভারতের এই অবসরপুষ্ট বিদগ্ধমণ্ডলীর জীবন-চিত্রকে অপরূপ ক'রে তুলেছে। এই জীবনটির সঙ্গে কোথায় যেন তিনি তাঁর মনোজীবনের একটি ঐক্য খুঁজে পেয়েছিলেন। তিনি বলেছেন, 'সংস্কৃত বিদগ্ধ শব্দের প্রতিশব্দ cultured। বাৎস্যায়ন যাকে নাগরিক বলেন, টীকাকার তাকে বিদগ্ধ নামে অভিহিত করেন। এর থেকে প্রমাণ হচ্ছে যে, এদেশে পুরাকালে কালচার জিনিসটা ছিল নাগরিকতার একটি প্রধান গুণ। এ স্থলে বলা আবশ্যক যে, একালে আমরা যাকে সভ্য বলি সেকালে তাকেই নাগরিক বলত। অপর পক্ষে সংস্কৃতভাষায় গ্রাম্যতা এবং অসভ্যতা পর্যায়-শব্দ, ইংরেজিতে যাকে বলে Synonymus।

বাৎস্যায়নের কামসূত্রে বর্ণিত নাগরিক জীবনে যে বই পড়ার কথা আছে, তা থেকে হয়তো কেউ কেউ অনুমান করতে পারেন যে মাল্যচন্দন-বনিতার মতো উক্ত ব্যাপারটিও ছিল 'বিলাসের একটি অঙ্গ'। প্রবন্ধকারের মতে কাব্যচর্চা হেন বস্তু যে-সমাজের বিলাসের অঙ্গ সে-সমাজ নিঃসন্দেহে সভ্যতার চরম শীর্ষে উঠেছে। বৈদগ্ধ্যও একজাতীয় সামাজিক গুণ এবং এ গুণ অর্জন করতে হলে রীতিমত কর্ষণার প্রয়োজন। দীর্ঘকালের অনুশীলনেই একমাত্র এই গুণ অর্জন করা সম্ভব। লেখক মৃচ্ছকটিক নাটকের রাজশ্যালক শকার ও বিটের চরিত্রের তুলনামূলক আলোচনা ক'রে এই সত্যটি বুঝিয়ে দিয়েছেন। শকার নিরক্ষর, স্থূলরুচি কিন্তু বিট বিদগ্ধ ও সুজন; অথচ দুজনেই বিলাসভক্ত।

প্রবন্ধকার প্রাচীন কালের জীবনচর্যা থেকে ক্ল্যাসিক ও রোম্যান্টিক সাহিত্যতত্ত্বের মধ্যে প্রবেশ করেছেন। ক্ল্যাসিক সাহিত্যের মধ্যে স্পষ্টতা, পরিচ্ছন্নতা ও আর্টের পরিমাণ বেশী—কথার বহিরঙ্গ-প্রসাধনের দিকে তাদের দৃষ্টি ছিল প্রখর। তিনি 'অ্যারিষ্টক্র্যাটিক' ও 'ডেমোক্র্যাটিক' কথা দু'টি তুলেছেন। 'ডেমোক্র্যাসি' শব্দটিকে তিনি রাজনীতি ও সমাজের ক্ষেত্রে যে ভাবেই ব্যবহার করুন না কেন, কাব্যের ক্ষেত্রে এই ডেমোক্র্যাটিক মেজাজ তিনি স্বীকার ক'রে নিতে পারেন নি। তিনি স্পষ্টই বলেছেন, 'এ যুগের ডেমোক্র্যাটিক আত্মা আর্টকে উপেক্ষা করে, অবজ্ঞা করে, সম্ভবতঃ মনে মনে হিংসাও করে ; বোধ হয় এই কারণে যে আর্টের গায়ে আভিজাত্যের ছাপ চিরস্থায়ীরূপে বিরাজ করে।' প্রাচীন ভারতের বই পড়ার কথা বলতে গিয়ে তিনি সেকালের বৈদগ্ধ্য ও ক্ল্যাসিক মনোবৃত্তির কথা বলেছেন। 'মার্জিত-রুচি, পরিষ্কৃত বুদ্ধি, সংযত ভাষা ও বিনীত ব্যবহার'—এই যুগের নাগরিকদের প্রধান কয়েকটি লক্ষণ হিসাবে নির্দেশ করেছেন। প্রবন্ধটির এই অংশে তিনি আর্ট সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেছেন, তা থেকে তাঁর সাহিত্য-চিন্তাও উপলব্ধি করা যায়।

বর্তমান কালে জীবনধারণের মধ্যে জটিল সমস্যার উদ্ভব হয়েছে, তাতে জীবনকে সুন্দর ক'রে তোলারও যে একটি প্রয়োজনীয়তা আছে, তা আমরা প্রায়ই বিস্মৃত হই। সাহিত্যের রস উপভোগ করার চেয়ে আমরা যেন সাহিত্যের মধ্যে শিক্ষালাভ করার দিকেই অতিরিক্ত ঝুঁকে পড়েছি। লেখক মনে করেন যে সাহিত্যচর্চা শিক্ষালাভের একটি প্রধান অঙ্গ। সাহিত্যের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ের সমন্বয় ঘটে। তাই অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে সাহিত্যের তুলনা করে লেখক বলেছেন 'দর্শন-বিজ্ঞান ইত্যাদি সব হচ্ছে মনগঙ্গার তোলা জল, তার পূর্ণস্রোত আবহমান কাল সাহিত্যের ভিতরেই সোল্লাসে সবেগে বয়ে চলেছে ; এবং সে গঙ্গাতে অবগাহন ক'রেই আমাদের সকল পাপ হতে মুক্ত হব।' লেখক মনে করেন যে লাইব্রেরীর প্রয়োজনীয়তা হাসপাতাল থেকে কোন অংশ কম নয়। কেউ জোর করে কাউকে শিক্ষা দিতে পারে না। শিক্ষিত মানেই স্বশিক্ষিত। কিন্তু বর্তমানে শিক্ষা-ব্যবস্থা এর বিপরীত পথ অবলম্বন করেছে। জীর্ণ করার ক্ষমতা থাকুক আর না থাকুক শিক্ষার্থীকে জোর ক'রে 'বিদ্যে গেলানো হয়'। এর ফলে হিতে বিপরীত হচ্ছে, মানসিক মৃত্যুর সংখ্যা ক্রমাগতই বাড়ছে। অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এ অবস্থায়

আমরা শঙ্কিত না হ'য়ে বরং উৎসাহিতই হচ্ছি। কারণ তার, ছেলে এখন পাশ করছে অনেক বেশী। লেখক প্রসঙ্গক্রমে ছেলেদের নোট মুখস্থ ক'রে পাশ করার কথা বলেছেন। এতে ছেলেদের মনের মৌলিকত্ব নষ্ট হচ্ছে। এই কারণেই শিক্ষাব্যাপারেও লাইব্রেরীর স্থান কম নয়, এখানে 'লোকে স্বেচ্ছায় সুশিক্ষিত হবার সুযোগ পায়'।

উদরপূর্তির কাজে না লাগলে স্বেচ্ছায় বই পড়ার ব্যাপার ক্রমশই বিরল হ'য়ে আসছে। তার কারণ উদরের দাবিকেই আমরা একমাত্র দাবি বলে মেনে নিয়েছি। মানুষের দেহরক্ষা অবশ্য কর্তব্য, কিন্তু তাকেই চরম ক'রে তোলা সঙ্গত নয়। মানুষের ক্ষুৎ-পিপাসার উর্ধ্বেও আর একটি জগৎ আছে, সে জগৎ হচ্ছে আনন্দলোক, রসলোক। 'সুতরাং সাহিত্যচর্চার আনন্দ থেকে বঞ্চিত হওয়ার অর্থ হচ্ছে, জাতির জীবনীশক্তির হ্রাস করা।' কিন্তু সাহিত্য-রসের এই বিরূপতার কারণ হচ্ছে ক্রটিপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থা। প্রমথ চৌধুরীর বিদগ্ধ মনোজীবনের স্বরূপ প্রবন্ধটিকে উজ্জ্বল ক'রে তুলেছে। বিষয় খুব বড় না হ'লেও একে ঘিরেই বিচিত্রাশ্রয়ী মনের ঐশ্বর্য দানা বেঁধে উঠেছে। বিংশ শতাব্দীর বাঙালী হ'য়েও তিনি চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্রে ছিলেন প্রাচীন এথেন্সের অভিজাত-মানস নাগরিক। বাঙালী জীবনের সঙ্গে অভিজাতরুচি ক্ল্যাসিক্যাল্ গ্রীক জগতের কোন মিলই নেই। তথাপি এই অনন্য-মানস বাঙালী লেখক কী অপূর্ব কৌশলে যে সেই অসাধারণ জীবনরস-রসিক হয়েছিলেন, তা ভাবতে গেলে বিস্মিত হ'তে হয়। দীর্ঘকালব্যাপী যত্ন ক'রে তিনি একটি মনের কাঠামো তৈরী করেছিলেন। এক অসাধারণ রূপজ্ঞান, রুচির আভিজাত্য ও বৈদগ্ধ্য তাঁর মনোজীবনের ভিত্তিভূমি রচনা করেছে। তাই এই কুশলী লেখকের অতি-মানস লোককান্ত ও জনপ্রিয় হ'য়ে উঠতে পারে নি। রূপজ্ঞান ও রুচিবোধের যে সমুন্নত মানদণ্ড তিনি সৃষ্টি করেছেন, তা সাধারণের পক্ষে নিতান্ত অনধিগম্য। তিনি নির্বাচিতের শিল্পী হ'য়েই রইলেন। 'বইপড়া' প্রবন্ধের মধ্যে লেখকের সেই বিদগ্ধজীবনের যে স্নিগ্ধোজ্জ্বল আলোকপাত ঘটেছে, তা একটি অসাধারণ মানুষেরই ব্যক্তিত্বের রহস্যকে উদ্ভাসিত করেছে। সর্বশেষে লেখকের মনের গোপন আকাঙ্ক্ষা বিশেষভাবে লক্ষণীয়, 'আমার মতে এ যুগের বাঙালির আদর্শ হওয়া উচিত প্রাচীন গ্রীকসভ্যতা, কেননা এ উচ্চ আশা অথবা দুরাশা আমি গোপন মনে পোষণ করি যে, প্রাচীন ইউরোপে এথেন্স যে স্থান অধিকার করেছিল, ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষে বাংলা সেই স্থান অধিকার করবে।'

১. সবুজ পাতার গান : সবুজপত্র, বৈশাখ, ১৩২১।

২. Creative Evolution.

৩. ঐ

৪. সবুজপত্র : জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়, ১৩২৯।

৫. বিচিত্রা : ভাদ্র, ১৩৩৪।

৬. মাসিক বসুমতী : মাঘ ও ফাল্গুন ১৩৩০ ও জ্যৈষ্ঠ ১৩৩১।

৭. ভারতী : মাঘ-ফাল্গুন, ১৩১২।

৮. নূতনে পুরাতনে : নারায়ণ, অগ্রহায়ণ, ১৩২১।

৯. 'সুখের বিষয় এই দলাদলি বেশি দিন চলে নাই ; বাংলার প্রবীণ দল বেসান্তকে সভানেত্রী করিতে রাজী হওয়ায় রবীন্দ্রনাথ অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি পদত্যাগ করিলেন (৩০শে সেপ্টেম্বর) ; ৪ঠা অক্টোবর (১৮ই আশ্বিন) অভ্যর্থনা সমিতির অধিবেশন হইল তাহাতে শ্রীমতী বেসান্ত কংগ্রেসের সভানেত্রী নির্বাচিত হইলেন। তরুণ বাংলার জয় হইল।'

—রবীন্দ্র-জীবনী (দ্বিতীয় খণ্ড), পৃঃ ৪৬৫, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

রচনারীতি ও স্টাইল

আধুনিক বাংলা গদ্যরীতির বিচিত্র কর্ষণার ইতিহাসে প্রমথ চৌধুরীর একটি উল্লেখযোগ্য স্থান আছে। আধুনিক বাংলা গদ্যরীতির সমৃদ্ধির মূলে রবীন্দ্রনাথের পরে যে নামটি সবচেয়ে বেশী মনে পড়ে, সে হ'লো প্রমথ চৌধুরীর। অথচ তাঁর রচনার পরিধিও তেমন নয়, বরং অন্যান্য লেখকের তুলনায় তাঁর রচনাকে স্বল্পই বলতে হবে। কিন্তু রচনার কৃশতা তাঁর সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্যেরই নির্দেশক,—তাতে আধুনিক বাংলা গদ্যরীতির ওপর তাঁর অসাধারণ প্রভাবের তারতম্য ঘটে নি। এমন কি কোন কোন সমালোচক এমন কথাও বলেছেন যে, তাঁর প্রভাব তাঁর রচনাকেও অতিক্রম করেছে।[১] এর মূল কারণ হলো তাঁর রচনারীতির অনন্যতা। প্রমথ চৌধুরী বাংলা সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট স্টাইলের প্রবর্তক এখানে 'স্টাইল' শব্দটির অর্থ শুধু বিশেষ ধরণের বাক্-পদ্ধতি অথবা কথা-বিন্যাস মাত্র নয়—এখানকার 'স্টাইল' ও লেখকের ব্যক্তিত্ব এক ও অভিন্ন। Personal idiosyncracy of expression'—এইটুকুই প্রমথ চৌধুরীর গদ্যরীতির সবটুকু নয়। শুধু বহিরাশ্রয়ী রীতি বা ভঙ্গি নয়, লেখকের ব্যক্তিত্ব যখন তাঁর রচনার ভেতর দিয়ে গভীরভাবে প্রকাশ পায়, তখন একটি বিশেষ স্টাইলের রূপ-বৈচিত্র্যে তার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে। প্রমথ চৌধুরীর গদ্যরীতির আলোচনার প্রথমেই স্টাইল সম্পর্কে বিদগ্ধজনের এই বহুস্বীকৃত ব্যাখ্যাটির কথা মনে রাখা উচিত।

বাংলা গদ্যে বিদ্যাসাগরের রচনায় সর্বপ্রথম একটি বিশিষ্ট স্টাইলের সন্ধান পাওয়া যায়। 'বিদ্যাসাগরী রীতি' শুধু শব্দগ্রন্থনগত বাক্-পদ্ধতিই নয়, ব্যক্তিত্ব প্রকাশক স্টাইল। তা ছাড়া যুক্তিনিষ্ঠা, মননশীলতা ও ক্ষুরধার বিশ্লেষণ পদ্ধতি বিদ্যাসাগরের রচনায় অনুপস্থিত নয়। অক্ষয়কুমার দত্তের প্রবন্ধে পাণ্ডিত্য ও মননশীলতার অভাব ছিলনা, কিন্তু ব্যক্তিত্ব-প্রকাশক স্টাইল সর্বপ্রথম বিদ্যাসাগরের রচনাতেই পাওয়া যায়। বিদ্যাসাগরের গদ্যরীতিতে একটি নূতন ধরণের গতিভঙ্গি ও ছন্দময় রূপ-লাবণ্য ফুটে উঠেছে। বাংলা গদ্যের নিজস্ব রূপ যতিসমন্বিত সুঠাম বাক্যরীতির মাধ্যমে বিদ্যাসাগরের হাতেই রূপ পেল। এই প্রসঙ্গে একজন সমালোচকের সুচিন্তিত মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য, 'বিদ্যাসাগরের রচনাভঙ্গি সর্বত্র সংস্কৃত শব্দ-বহুল নয়। উপযুক্ত স্থানে সুললিত তৎসম শব্দ ও তদ্ভব ক্রিয়াপদ ও বাগ্‌ভঙ্গির ব্যবহার করিয়া বিদ্যাসাগর বিশেষ

শব্দকুশলতার পরিচয় দিয়েছেন। শেষের দিকের রচনায় এই ভঙ্গি বিশেষভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে।'[২] বিদ্যাসাগরী রীতি ও 'আলালী ভাষা'র মধ্যপথ অবলম্বন করলেন বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার মধ্যে এক বিশেষ ধরণের স্টাইল আত্মপ্রকাশ করেছিল। যুক্তিনিষ্ঠা, মননশীলতা, আবেগদীপ্ত কল্পনা-প্রসারতা বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যক্তিত্বকে সুস্পষ্ট করে তুলেছে। পরবর্তী কালেও হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর রচনায় বিশিষ্ট স্টাইলের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

সাহিত্যের অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো গদ্যের ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথের সুদীর্ঘ পরীক্ষা-নিরীক্ষার মূল্য কম নয়। রবীন্দ্রনাথের গদ্যরচনার ক্রম-পরিণতির ইতিহাস বহুমুখী বৈচিত্র্যে চিহ্নিত। বঙ্কিমযুগের উত্তরাধিকার থেকে সুরু করে আধুনিক বাংলা গদ্যের যুগ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের দাক্ষিণ্য প্রসারিত। রবীন্দ্রনাথের গদ্য, মহাকবির হাতের গদ্য, তাতে অনেকগুলি রীতি এসে মিলেছে—এই কারণেই এককথায় তাঁরা সমৃদ্ধ গদ্যরীতির পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথের মধ্য বয়সে এবং সম্ভবত সবচেয়ে সৃষ্টিশীল অধ্যায়ে 'সবুজপত্র' পত্রিকার জন্ম। সবুজপত্র রবীন্দ্রস্নেহধন্য, এমন কি রবীন্দ্রলালিত, কিন্তু একথাও বোধ হয় মিথ্যে নয় যে এই পর্বে কবির কাব্যের ও গদ্যের রূপ ও রীতির অভিনবত্বের জন্য সবুজপত্রের দায়িত্বও ছিল অনেকখানি। সবুজপত্র-পর্বের কথ্যভাষা আন্দোলনের বহু পূর্বে রবীন্দ্রনাথ 'ভারতী'তে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্রে' (অক্টোবর, ১৮৮১) কথ্যভাষা আশ্রয় করেন। প্রমথ চৌধুরীর গদ্যরীতি প্রসঙ্গে কথ্যভাষার আন্দোলনের কথা বিশেষভাবে মনে রাখা প্রয়োজন। এর আগে কথ্যভাষার নমুনা থাকলেও সবুজপত্রই কথ্যভাষাকে যথার্থ কৌলীন্য দিয়েছিল। অবশ্য রবীন্দ্রলালিত ও প্রমথপ্রবর্তিত এই গদ্যরীতির বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াও কম দেখা যায় নি। কিন্তু কালবিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিক্রিয়াশীলদের কণ্ঠ ক্রমাগত ক্ষীণ হয়ে এসেছে।

প্রাক্-সবুজপত্র যুগের বাংলা গদ্যরীতির ঢিলেঢালা গঠন, আতিশয্য দোষ, বৃহদায়তন শব্দ-বিন্যাসের অকিঞ্চিৎকর অর্থদ্যোতনা, অপরিচ্ছন্ন প্রকাশ প্রভৃতি কতকগুলি দুর্লক্ষণ অনেক ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা গিয়েছে। বিদ্যাসাগর-অক্ষয়কুমার-দেবেন্দ্রনাথ-বঙ্কিমের গদ্য বাংলা গদ্যরীতিকে একটি স্থিতিস্থাপকতা দিয়েছিল। কিন্তু সাধারণভাবে বাংলা গদ্যের সর্বাবয়ব রূপটি তখনও পরিস্ফুট হয় নি। সামান্য বক্তব্য প্রকাশ করতে গিয়ে যেন অনেকগুলি উচ্ছ্বাসময় অযথা

শব্দ এসে পড়েছে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকে বাংলা গদ্যের বিশেষ পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তার কথা মনে হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক। সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে তৎকালীন গদ্যরীতির অক্ষমতা ধরা পড়েছে। তা ছাড়া বিদ্যাসাগরের নিরাসক্ত যুক্তিনিষ্ঠা ও বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্যরীতির বুদ্ধি ও হৃদয়ের সামঞ্জস্য সেকালের খুব বেশী লেখকের লেখায় দেখা যায় নি। প্রমথ চৌধুরী বাংলা গদ্যের কতকগুলি বহু প্রচলিত ত্রুটির উল্লেখ করেছেন, 'অযথা এবং অনর্থক বিশেষণের প্রয়োগ, ভুল অর্থে বিশেষ্যের প্রয়োগ, অদ্ভুত বিশেষণ এবং সমাসের সৃষ্টি, 'উল্টোপাল্টা' রকম রচনার পদ্ধতি প্রভৃতি বর্জনীয় দোষ আজকালকার মুদ্রিত সাহিত্যের পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে দেখা যায়। সাধুভাষার আবরণে সে সকল দোষ, শুধু অন্যমনস্ক পাঠকদের নয়, অন্যমনস্ক লোকদেরও চোখে পড়ে না।'[৩] প্রমথ চৌধুরীর এ অভিযোগ শুধু সাধুভাষার বিরুদ্ধেই নয়, প্রচলিত গদ্যরীতির বিরুদ্ধেও। গদ্যরীতির যে সুকর্ষিত ও সুগঠিত আদর্শ তিনি চেয়েছিলেন, তার বিরুদ্ধে ছিল নানা অন্তরায়। তাঁর সাধুভাষার বিরুদ্ধে সচেতন বিদ্রোহ, আসলে প্রাচীন গদ্যরীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। সমগ্র বাংলা গদ্যরীতিকেই তিনি ঢেলে সাজাতে চেয়েছিলেন—তাই প্রমথ চৌধুরীর ভাষাদর্শ তাঁর গদ্যরীতির মৌলিক উপাদান।

প্রমথ চৌধুরীর গদ্যরীতির আলোচনা করতে গেলে এই রীতিকর্ষণায় তাঁর নানামুখী পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বিচার-বিশ্লেষণ চোখে পড়ে। নূতন ধরণের গদ্যরীতি প্রবর্তন তাঁর পক্ষে শুধু ক্ষণিক উন্মাদনা অথবা 'একটা নূতন কিছু করবার মতো আকস্মিক হুজুগপ্রিয়তা নয়। তাঁর মানস-গঠনের মধ্যেই যে স্বাতন্ত্র্য ছিল, তাই পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথের সহৃদয় আনুকূল্যে ও সবুজপত্রের আশ্রয়ে রূপ পেয়েছিল। 'জয়দেব' প্রবন্ধটি তাঁর সর্বপ্রথম বাংলা রচনা। 'ভারতী'তে প্রবন্ধটি প্রকাশ করবার সময় সম্পাদিকা স্বর্ণকুমারী দেবী প্রবন্ধটি অনেকাংশ বাদ দিয়ে ছাপান। প্রবন্ধটি সাধুভাষায় রচিত হ'লেও প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যিক ব্যক্তিত্বের ছাপ তাতে সুপরিস্ফুট। প্রবন্ধটির মধ্যে লেখকের দৃঢ়নিষ্ঠতার অভাব নেই। কিন্তু সতর্ক সমালোচকের কাছে এই রীতি খাঁটি বীরবলী গদ্যরীতির পূর্বাভাস বলে মনে হবে। সাধুভাষার আড়াল থেকেও বীরবলী রীতির সেই 'বিগাঢ়যৌবনা তন্বী'-কে চিনতে অসুবিধে হয় না। সবুজপত্রের মাধ্যমে কথ্যভাষা আন্দোলনের বহু আগে থেকেই প্রমথ চৌধুরীর গদ্য রচনায় নূতন প্রতিশ্রুতির ইঙ্গিত দেখা গিয়েছিল। আসল কথা তিনি

নূতন করে দেখার চোখ ও নূতনভাবে বলার মন নিয়েই জন্মেছিলেন—এক্ষেত্রে তাঁর কথ্যভাষা-পারঙ্গমতা অনেকখানি হ'লেও সবটুকু নয়।

দুই

তথাপি সবুজপত্রকে কেন্দ্র ক'রে কথ্যভাষার কৌলীন্য প্রতিষ্ঠার আন্দোলন বাংলা সাহিত্যের এক ঐতিহাসিক ঘটনা। সবুজপত্রকে বাহন হিসেবে না পেলে এই ভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়তো সম্ভব হ'য়ে উঠত না। অবশ্য প্রমথ চৌধুরীর অনেক আগেই মৌখিক লোকভাষা সম্পর্কে কৌতূহল জেগেছিল। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ উইলিয়ম কেরী ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে 'কথোপকথন' নামে এক দ্বিভাষিক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। কতকগুলি প্রস্তাবে কথ্যভাষাশ্রিত রীতির সাক্ষাৎও মেলে। সমাজের সাধারণ শ্রেণীর মানুষের মৌখিক ভাষার মোটামুটি একটি আদর্শ সেখানে পাওয়া যায়। কিন্তু সেখানেও ক্রিয়াপদকে সাধুভাষার রূপ দেওয়ার চেষ্টা আছে। সাহেব, সম্ভ্রান্ত বাঙালী ভদ্রলোক, বণিক, জমিদার, দিন-মজুর, নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোক, জেলে, কৃষক, ভিক্ষুক প্রভৃতি নানাশ্রেণীর নরনারীর কথ্যভাষার নমুনা এখানে পাওয়া যায়। সাধুভাষার পাশাপাশি কথ্যভাষার যে ধারা চলেছিল তা সর্বপ্রথম এই গ্রন্থটিতেই ধরা পড়েছে। ডাঃ সুশীলকুমার দে 'কথোপকথন'-এর কথ্যভাষাশ্রিত প্রস্তাবগুলি সম্পর্কে যথার্থই বলেছেন, 'In this respect Carey has been called, not unwisely or too enthusiastically the spiritual father of Tekchand and Dinabandhu.'[৪]

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের যুগে বাংলা গদ্যের নিতান্ত শৈশব অবস্থা। কিন্তু সাধুভাষার পাশাপাশি মৌখিক ভাষার যে প্রবাহ চলেছিল, তাকেও একেবারে অস্বীকার করা হয় নি। কিন্তু তখন সে ভাষার কোনো সাহিত্যিক কৌলীন্য ছিল না। প্রমথ চৌধুরী সবুজপত্র পত্রিকার মাধ্যমে কথ্যভাষাকে কৌলীন্য দেওয়ার চেষ্টা করেছেন, সে সময়ে তাঁর বিরুদ্ধপক্ষরাও নিষ্ক্রিয় ছিলেন না। মৌখিক ভাষা প্রতিষ্ঠার কৃতিত্ব কারো কারো মতে 'আলালের ঘরের দুলাল'-এর লেখকের ও 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'-র লেখকের। এখানে প্রমথ চৌধুরীর ভাষাদর্শ বিচারের খুব বড় বিভ্রান্তি ঘটেছে। যেকালে টেকচাঁদ ঠাকুর ও কালীপ্রসন্ন সিংহ চলতি ভাষার আন্দোলন সুরু করেছিলেন, তার পটভূমিকা আলোচনা করলেই এঁদের ভাষা আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য পরিস্ফুট হবে।

আলালী ও হুতোমী ভাষার উৎপত্তির মূলে রয়েছে পণ্ডিতী ভাষার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া। তাই এর মধ্যে কোন সৃষ্টিশীল চিত্তের উন্মাদনা ছিল না। এই ভাষায় পণ্ডিতী ভাষার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার ভাবটিই যেন উগ্র হ'য়ে উঠেছে, নূতন রূপ রচনার কোন সৃষ্টিশীল প্রয়াস নেই। তা ছাড়া এ ভাষায় যতটুকু শক্তি ছিল, তার চেয়ে ছিল অনেক বেশী হঠকারিতা। তৎসম শব্দের ছায়াটুকুকেও এ ভাষা এড়িয়ে চলেছে, খানিকটা গায়ের জোরেই যেন অনেক চলতি ধাতু ও শব্দ চালাতে হয়েছে। পণ্ডিতী ভাষার তুলনায় এ ভাষা অনেকটা সজীব হলেও এতে কলাকৌশল-বর্জিত স্থূলহাতের চিহ্ন বিদ্যমান। প্রতিদিনের প্রাত্যহিকতাকে এ ভাষা রূপ দিতে পারে, তার বেশী এ ভাষা শক্তির অতীত। কথ্যভাষাকে যদি সাধুভাষার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দাঁড় করাতে হয়, তাহলে কথ্যভাষাকে নিঃসন্দেহে বিচিত্র ভাব-প্রকাশক হতে হবে। 'আলালী' ও 'হুতোমী' ভাষায় সে উপযোগিতা ছিল না।

আলালী ও হুতোমী ভাষায় আর একটি অতি-নির্দিষ্ট সীমা আছে। এই ভাষা বিশেষ আঞ্চলিকতার সীমা অতিক্রম করতে পারে নি। কথ্যভাষাকে যদি সাধুভাষার সার্বজনীন আসন দিতে হয়, তবে তাকে আঞ্চলিক সঙ্কীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠতে হবে। অবশ্য এ ক্ষেত্রেও প্রশ্ন উঠতে পারে যে প্রমথ চৌধুরীও তো কৃষ্ণনগরের আঞ্চলিক ভাষাকেই ব্যবহার করেছেন। কৃষ্ণনগরের ভাষা এককালে শিষ্ট বাংলার জনসমাজের ভাষার কৌলীন্য পেয়েছিল। চর্যা ও চর্চা, দু'দিক থেকেই এই ভাষা আঞ্চলিক সঙ্কীর্ণতার ওপরে একটি বিশেষ রূপ পেয়েছিল। কৃষ্ণনগরে 'নানা শ্রেণীর নানা লোকের' মুখের ভাষাকেই সতর্ক চর্চা ও উন্নত প্রয়োগবিধির মাধ্যমে প্রমথ চৌধুরী 'বীরবলী ভাষা'র বনিয়াদ রচনা করেছেন। প্রমথ চৌধুরীর ভাষাশিক্ষার মূলে আছে কৃষ্ণনগরের লোকভাষা। যে সমস্ত কথা জনসাধারণের মুখে মুখে চলেছে, অথচ তখনও পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্ভুক্ত হয় নি তার ওপর তাঁর ছিল অসাধারণ আকর্ষণ। প্রায় তিন শতাব্দীব্যাপী নিপুণ কথা-রসিকতার ফলে কৃষ্ণনগরের ভাষার স্বতন্ত্র আভিজাত্য গ'ড়ে উঠেছিল। শুধু আভিজাত্যই নয়, এই ভাষাই অষ্টাদশ শতাব্দীতে এক নাগরিক বৈদগ্ধ্যের মাধ্যম হয়ে উঠেছিল। প্রমথ চৌধুরী তাঁর এই ভাষাচর্চার ইতিহাস সম্পর্কে বলেছেন, '…বাঙ্গলা ভাষা আমি একমাত্র বই পড়ে শিখি নি। শিখেছি নানালোকের মুখে শুনে, যেমন সকলেই শেখেন। কিন্তু এ সব কথা আজ পর্যন্ত আমাদের পাঠ্য পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত হয় নি; বোধোদয়েও নয়,

কথামালাতেও নয়, সীতার বনবাসে ত নয়-ই। আমি এ-জাতীয় শব্দ আবশ্যক হ'লে আমার লেখায় ব্যবহার করি। ফলে আমার সাহিত্যিক ভাবারও পুঁজি বেড়ে গিয়েছে। ...তাছাড়া সেকালে নদে-শান্তিপুরের মৌখিক কথাও খুব শ্রুতিমধুর ছিল। আমাদের বিশ্বাস ছিল, সেই ভাষাই—কি উচ্চারণে কি অর্থব্যক্তিতে—বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠভাষা। ...তাই আমার ভাষার বনেদ হচ্ছে সেকালের কৃষ্ণনাগরিক ভাষা। ...আমি জন্মেছিলুম পদ্মাপারের বাঙ্গাল, কিন্তু আমার মুখে ভাষা দিয়েছে কৃষ্ণনগর। সেই ভাষাই আমার মূল পুঁজি, তারপর তা সুদে বেড়ে গিয়েছে। বাঙ্গলা বই ছেলেবেলায় অনেক পড়েছি, কিন্তু বইয়ের ভাষা আমার কস্মিনকালেও আদর্শ ছিল না।'[৫]

ভাষা সম্পর্কে আরও দু'টি মূলকথা তাঁর স্বীকৃতি থেকে জানা যায়, এর প্রথমটি হ'ল বাক্‌চাতুরী। প্রমথ চৌধুরীর গদ্যরীতির একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হ'ল এর ঘোরানো প্যাঁচানো ভঙ্গি—তাই এ ভাষার গতি যেমন সূক্ষ্ম-চতুর, তেমনি এর আঘাত অমোঘ ও নির্মম। ভাষার 'স্থিতিস্থাপকতাগুণ' না থাকলে এই শ্রেণীর বাক্-চাতুর্য সম্ভব নয়। তিনি নিজেই বলেছেন, 'যার গলার স্বর আছে সে গান করতে বসলে তার স্বর যেমন আপনা হ'তেই বাঁকে-চোরে আর ঘোরে, তেমনি যার মুখের ভাষা ভালো, সেও সেই ভাষাকে ইচ্ছা করলে ঘোরাতে পারে। ভাষার এই স্থিতিস্থাপকতার সন্ধান কৃষ্ণনাগরিকেরা জানতেন, এরই নাম বাক্‌চাতুরী। ভাষা শুধু কাজের ভাষা নয়, লেখারও ভাষা। ফরাসীরা যাকে jue de mots বলে, সে খেলার চর্চা সে শহরেও করা হত।'[৬] প্রমথ চৌধুরীর মন্তব্যটি থেকে তাঁর ভাষাচর্যায় শুধু কৃষ্ণনগরের ভাষার প্রভাবই নয়, ফরাসী ভাষার বাক্‌বৈদগ্ধ্যের প্রভাবের কথাও জানা যায়। তিনি তাঁর ভাষাচর্যা প্রসঙ্গে হাস্যরসের কথাও উল্লেখ করেছেন। বাক্‌চাতুর্য্যের সঙ্গে হাস্যরসের একটি আত্মিক সম্পর্কে আছে। একমাত্র 'হিউমার' ছাড়া অন্য যে কোন শ্রেণীর হাস্যরসের মূল উপাদান বাগ্‌বৈদগ্ধ্য। মোলিয়েরের হাস্যরসে হৃদয়াবেগ-নির্মুক্ত কথা-চতুরতা, ভল্‌তেয়ারের মর্মভেদী বিদ্রূপে সূক্ষ্ম ও অতিমার্জিত কথার শরাঘাত, বার্ণাড-শ'র বুদ্ধিদীপ্ত 'উইট্'-এর অন্তরালে কথার তলোয়ার খেলা! প্রমথ চৌধুরী লিখেছেন, 'সেকালে যারা ছোকরা ছিল, তাদের মধ্যে দু'জন লেখক বলে স্বীকৃত হয়েছেন,—৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও আমি। আমরা দুজনেই কৃষ্ণনাগরিক। আমাদের দু'জনের লেখায় আর যে গুণের অভাব থাক—রসিকতার অভাব

নেই। দ্বিজেন্দ্রলালের বিশিষ্ট রচনার নাম 'হাসির গান' আর বীরবলের কথা কান্নার বস্তু নয়।'[৭] শুধু এখানেই নয়, অন্যত্রও চৌধুরী মহাশয় দ্বিজেন্দ্রলালের কথা বলেছেন। সাহিত্যের মূলনীতির দিক থেকে যত বিরোধই থাক না কেন, দ্বিজেন্দ্র-প্রতিভার সঙ্গে তিনি একটি কৃষ্ণনাগরিক স্বজাতীয়ত্ব অনুভব করেছেন। অবশ্য দ্বিজেন্দ্রলালকে তিনি মূলত হাসির গানের কবি হিসেবেই দেখেছেন,

'উদার-আঁধার মাঝে বিদ্যুতের মত
উঠেছিল ফুটে তব ক্ষিপ্র তীব্র হাসি'[৮]

চলতি ভাষার স্বপক্ষে বলতে গিয়ে তিনি প্রসঙ্গক্রমে আলালী ভাষার প্রসঙ্গও তুলেছেন, 'আলালী ভাষাকে আমাদের শোধন করে নিতে হবে। বাবু-বাংলার কোনরূপ সংস্কার করা অসম্ভব, কারণ সে ভাষা হচ্ছে পণ্ডিতী বাংলার বিকারমাত্র।'[৯] আলালী ভাষার আঞ্চলিক সঙ্কীর্ণতা অতিক্রম করার জন্যই তিনি একে 'শোধন ক'রে নিতে' চেয়েছিলেন।

তিন

প্রমথ চৌধুরীর ভাষাচর্যা প্রসঙ্গে একটি কথা মনে রাখা দরকার। যেকালে তিনি কথ্যভাষার আন্দোলন সুরু করেন, তখন বাংলা গদ্যের সাধুভাষা একটি চূড়ান্ত সিদ্ধির স্তরে এসেছিল। গদ্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র সঞ্চরণের ফলে সাধু ভাষার মধ্যেও শক্তি ও লাবণ্য ফুটে উঠেছিল। যাঁর হাতে একটা সাধুভাষা চরম সমুন্নতি লাভ করেছিল, তিনিই মৌখিক ভাষাকে সবুজপত্র-পর্বে নূতন শিল্প-মহিমায় অলঙ্কৃত ক'রে তুললেন। সুতরাং বাংলা গদ্যরীতির ইতিহাসে একটি সত্য অবশ্য স্বীকার্য যে প্রমথ চৌধুরীর সাধুভাষার একটি পূর্ণাঙ্গ রূপাদর্শই তাঁর সামনে পেয়েছিলেন। 'আলালী' বা 'হুতোমী' ভাষার সম্মুখে বাংলা সাধুভাষার সেই পূর্ণায়ত রূপ ছিল না,—তার ফলে সাধুভাষার শক্তি ও সম্পদ সেখানে সঞ্চারিত হওয়ারও সম্ভাবনা ছিল না। প্রমথ চৌধুরীর কথ্যভাষার সঙ্গে তৎসম শব্দ-প্রধান সাধুভাষার একটি আত্মিক সংযোগ ছিল। এই কারণেই সে ভাষা চলিত ভাষা হ'লেও তার গাঢ়বদ্ধতা ও স্থিতিস্থাপকতা ছিল। মেরুদণ্ডহীন 'ললিত লবঙ্গলতা', প্রমথ চৌধুরীর ভাষা নয়—এইখানেই তৎসম শব্দ-প্রধান সাধুভাষার সঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর ভাষার সংযোগসূত্র। প্রমথ চৌধুরীর ভাষার তৎসম-প্রাধান্যের উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে, 'প্রকৃতির সহিত

লেখকদের যদি কোনরূপ পরিচয় থাকত তা হ'লে শুধু বর্ণের সঙ্গে বর্ণের যোজনা করলেই যে বর্ণনা হয়, এ বিশ্বাস তাঁদের মনে জন্মাত না। এবং যে বস্তু কখনো তাঁদের চর্ম-চক্ষুর পথে উদয় হয় নি, তা অপরের মনশ্চক্ষুর সুমুখে খাড়া ক'রে দেবার চেষ্টারূপ পণ্ডশ্রম তাঁরা করতেন না। সম্ভবতঃ এ যুগের লেখকদের বিশ্বাস যে, ছবির বিষয় হ'চ্ছে দৃশ্যবস্তু আর লেখার বিষয় হচ্ছে অদৃশ্য মন। সুতরাং বাস্তবিকতা চিত্রকলায় অর্জনীয়, এহং কাব্য-কলায় বর্জনীয়। সাহিত্যে সেহাইকলমের কাজ করতে গিয়ে যাঁরা শুধু কলমের কালি ঝাড়েন, তাঁরাই কেবল নিজের মনকে প্রবোধ দেবার জন্য পূর্বোক্ত মিথ্যাটিকে সত্য বলে গ্রাহ্য করেন। ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষ জ্ঞানই হচ্ছে সকল জ্ঞানের মূল। বাহ্যজ্ঞানশূন্যতা অন্তর্দৃষ্টির পরিচায়ক নয়। দূরদৃষ্টি লাভ করার অর্থ চোখে চালশে-ধরা নয়। দেহের নবদ্বার বন্ধ ক'রে দিলে মনের ঘর অলৌকিক আলোকে কিংবা পারলৌকিক অন্ধকারে পূর্ণ হ'য়ে উঠবে, বলা কঠিন। কিন্তু সর্বলোক-বিদিত সহজ সত্য এই যে, যাঁর ইন্দ্রিয় সচেতন এবং সজাগ নয়, কাব্যে কৃতিত্ব লাভ করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। জ্ঞানাঞ্জনশলাকার অপপ্রয়োগে যাঁদের চক্ষু উন্মীলিত না হয়ে কানা হয়েছে, তাঁরাই কেবল এ সত্য মানতে নারাজ হবেন।'[১০] এই অংশটি থেকেই প্রমথ চৌধুরীর ভাষায় তৎসমশব্দ বাহুল্য ও সমাসবদ্ধতার পরিচয় পাওয়া যায়! 'চর্মচক্ষু', 'মনশ্চক্ষু', 'দৃশ্যবস্তু' বাহ্যজ্ঞানশূন্যতা' 'জ্ঞানাঞ্জনশলাকা',—প্রভৃতি সংস্কৃত শব্দ যেমন অবাধে প্রয়োগ করেছেন, তেমনি তার সঙ্গে অত্যন্ত লঘু-ধরণের ক্রিয়াপদের ব্যবহারও রয়েছে। 'আলালী ভাষা' যতদূর সম্ভব তৎসম শব্দ বর্জন করার চেষ্টা করেছে, তার ফলে ভাষার স্থিতিস্থাপকতাগুণ ও গাঢ়ববদ্ধতা সেখানে অনুপস্থিত। শব্দ চয়নে ও শব্দ গ্রন্থনে চৌধুরী মহাশয় ভাষার শ্রীক্ষেত্র রচনা করেছেন—সংস্কৃত, আরবি-ফার্সি, দেশী, লৌকিক সব রকমের শব্দই তিনি অক্লেশে ব্যবহার করেছেন। রবীন্দ্রনাথ একসময় বাংলা ছন্দের আলোচনা প্রসঙ্গে পয়ারের 'আশ্চর্য শোষণশক্তি'র[১১] কথা উল্লেখ করেছিলেন। প্রমথ চৌধুরীর গদ্যরীতির বৈশিষ্ট্য নির্ণয় প্রসঙ্গে সেই বিশেষণটির কথাই মনে পড়ে। তাঁর গদ্যরীতিতে যেমন শোষণশক্তি, তেমনি দৃঢ়তা—সমাসবদ্ধ তৎসমশব্দের প্রচুর ব্যবহারেও সে ভাষা ভেঙে পড়ে না। চলতি ভাষা সম্পর্কে বিরুদ্ধবাদীদের প্রধান অভিযোগ হ'লো এই যে এ ভাষা লঘু—সুতরাং এ ভাষার মাধ্যমে কোন গভীর বিষয় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। প্রমথ চৌধুরীর ভাষাপ্রসঙ্গে এই শ্রেণীর মন্তব্য বিচারসহ নয়। তাঁর ভাষা চলতি

ভাষা হয়েও 'তথাকথিত হাল্‌কা' ভাষা নয়—অথচ এ ভাষা ক্ষিপ্রগতি, আশ্চর্য এর চলার ক্ষমতা।

তৎসম শব্দ প্রাচুর্যে ও সমাসবদ্ধ বাগ্‌বিন্যাসে ভাষার সংহতি গুণ কিছুমাত্র নষ্ট হয়নি—তাঁর এক একটি বাক্যের ফ্রেম যেন কঠিন ইস্পাত দিয়ে বাঁধানো। অথচ তার মধ্যে অলঙ্করণ ও কলাকৌশলের অভাব নেই। প্রমথ চৌধুরীর গদ্য-স্টাইল সম্পর্কে একজন আধুনিক সমালোচক মূল্যবান মন্তব্য করেছেন, 'Breaking up the compounds and preferring the dressing gown ease of indigenous and Persian words to the tautness of Sanskritic diction, Pramatha Choudhury evolved a modern prose counterpart of Bharatchandra's Sanskro-Persian verse style.'[১২]

দু'শতাব্দীর ব্যবধানকে অতিক্রম করে এখানেও দুজন কথা-কুশলী কৃষ্ণ-নাগরিক হাত মিলিয়েছেন। ভাষাকে সহজ ও স্বাভাবিক করার দিকে চৌধুরী মহাশয়ের উদ্যমের অন্ত ছিল না। সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগের তিনি বিরোধী ছিলেন না, কিন্তু তার প্রয়োগবিধি সম্পর্কেও নির্দেশ দিয়েছেন, 'এ কথা আমি অবশ্য মানি যে, আমাদের ভাষায় কতক পরিমাণে নতুন কথা আনবার দরকার আছে। যার জীবন আছে, তারই প্রতিদিন খোরাক যোগাতে হবে। আর, আমাদের ভাষার দেহ পুষ্টি করতে হলে প্রধানত অমরকোষ থেকেই নতুন কথা টেনে আনতে হবে। কিন্তু যিনি নতুন সংস্কৃত কথা ব্যবহার করেন তাঁর এইটি মনে রাখা উচিত যে, তাঁর আবার নতুন ক'রে প্রতি কথাটির প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে হবে, তা যদি না পারেন তাহলে বঙ্গসরস্বতীর কানে শুধু পরের সোনা পরানো হবে।'[১৩] ভারতচন্দ্রও বহুকাল আগে ভাষা সম্পর্কে এক কৈফিয়ৎ দিয়েছিলেন—এই কৈফিৎয় থেকেই ভারতচন্দ্রের ভাষা বিষয়ক উদারতার পরিচয় পাওয়া যায়,

'মানসিংহ পাতশায় হৈল যে বাণী।
উচিত যে আরবী পারসী হিন্দুস্থানী॥
পড়িয়াছি সেইমত বর্ণিবারে পারি।
কিন্তু সে সকল লোকে বুঝিবারে ভারি॥
না রবে প্রসাদগুণ না হবে রসাল।
অতএব কহি ভাষা যাবনী মিশাল॥
প্রাচীন পণ্ডিতগণ গিয়াছেন কয়ে।
যে হৌক সে হৌক ভাষা কাব্য রস লয়ে॥'[১৪]

ভারতচন্দ্রের 'যাবনী মিশাল' কাব্যরীতি প্রমথ চৌধুরীর বিচিত্র শব্দাশ্রিত গদ্যরীতির কথা মনে করিয়ে দেয়। নানাজাতীয় শব্দের মিশ্রণে তাঁর ভাষার বনেদ, কিন্তু সে ভাষায় এমন একটি প্রাণশক্তি আছে যা সব রকমের শব্দকেই একটি বাঁধুনী দিয়েছে।

প্রমথ চৌধুরীর ভাষা ভাস্কর্যধর্মী, ঠিক গীতিধর্মী নয়। ভাবাবেগমুক্ত ঋজু-সংহত, আতিশয্য-বর্জিত গদ্যরীতি ক্ল্যাসিক্যাল মনের পরিচয়বাহী। স্পষ্টালোকিত বুদ্ধি-মার্জিত জগতেই তাঁর বিচরণ। প্রমথ চৌধুরীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমালোচক শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের মন্তব্যটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, 'মানুষের অনুভূতির যে একটি জগৎ আছে বুদ্ধির আলোতে যা স্পষ্ট দেখা যায় না, ভাষায় যার পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ সম্ভব নয়—প্রমথবাবু সেকথা ভালো ক'রেই জানতেন। কিন্তু সে জগতের আকর্ষণ প্রমথবাবুর মনে প্রবল ছিল না। অথবা সে আকর্ষণকে তিনি এড়িয়ে চলতেন। ভাবের বিন্দুমাত্র আতিশয্য যেমন তাঁর লেখায় নেই, কথায় তেমনি কখনও তা প্রকাশ হ'ত না। এ কি তাঁর ক্ল্যাসিক্যাল আর্যমনের সহজ অভিব্যক্তি, না বাঙ্গালীর স্বাভাবিক ভাবপ্রবণতা থেকে মুক্তির চেষ্টায় নিজের মনকে বিশেষ গড়নে গ'ড়ে তুলে ছিলেন?[১৫]

চার

প্রমথ চৌধুরীর ভাষাচর্যা ও গদ্যরীতি প্রসঙ্গে সবচেয়ে বড়কথা হ'লো এর পারিপাট্য। ভাষাকে পরিপাটি ক'রে গুছিয়ে লিখতে তিনি ছিলেন ওস্তাদ শিল্পী। ফরাসী গদ্যের অনুশীলন ও অধ্যয়ন তাঁকে রচনার নিপুণ পারিপাট্য সম্পর্কে অধিকতর সচেতন ক'রে তুলেছিল। ফরাসী সাহিত্য আলোচনা করতে বসে তিনি যে মন্তব্য করেছেন, তা তাঁর নিজের রচনা সম্পর্কেও প্রযোজ্য, 'কিসে রচনার অঙ্গ সৌষ্ঠব হয় সে বিষয়ে ফরাসি মনীষীরা বহু চিন্তা বহু বিচার করে গেছেন, এবং সেই চিন্তা সেই বিচারের ফলে ফরাসি রচনা এত সাকার এত পরিচ্ছন্ন হ'য়ে উঠেছে।'[১৬] রচনার অঙ্গ সৌষ্ঠবের দিকে তাঁর ছিল সতর্ক দৃষ্টি। ১৯২১ সালের উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে পঠিত তাঁর অভিভাষণটিতে তিনি বাংলাগদ্যের শিথিলবন্ধতার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন, 'আমাদের গদ্যের ভাষা ও ভাব দুইই শিথিলবন্ধ। আমাদের রচনায় পদ, বাক্য—কিছুই, সুবিন্যস্ত নয় এবং আমাদের বক্তব্য কোথাও সুসম্বদ্ধ নয়। ইহা যে শক্তিহীনতার লক্ষণ তাহা বলাই বাহুল্য। যে দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সকলের পরস্পর সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ

নয়, সে দেহের শক্তিও নাই ; সৌন্দর্যও নাই। প্রতি জীবন্ত ভাষারই একটি নিজস্ব গঠন আছে, নিজস্ব ছন্দ আছে। সেই গঠন রক্ষা না করিতে পারিলে আমাদের রচনা সুগঠিত হয় না, সেই ছন্দ রক্ষা করিতে না পারিলে গদ্য স্বচ্ছন্দ হয় না'—ভাষার এই গাঢ়বদ্ধতার জন্য সংস্কৃত ভাষ্যকার ও টীকাকারদের রচনারীতির তিনি অনুরাগী ছিলেন। তাঁর গদ্যরীতির সঙ্গে সংস্কৃত টীকাকারদের যুক্তিনিষ্ঠা, শব্দকুশলতা ও চিন্তার সুস্পষ্টতার একটি মিল খুঁজে পাওয়া যায়।[১৭]

প্রমথ চৌধুরীর ভাষা অলঙ্কার-সমৃদ্ধ। আবেগ-প্রধান সমাস-বহুল সাধুভাষা অলঙ্কারবহুল হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু বীরবলী ভাষা যতই হৃদয়াবেগ নির্মুক্ত হোক না কেন, এতে অলঙ্কারের অভাব নেই—ঠিক নির্ভূষণ 'সাদাগদ্য' একে বলা যায় না। শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কার, দুই-ই তাঁর গদ্যরচনায় প্রচুরভাবে বিদ্যমান। তাঁর গদ্যরীতিতে 'ঘোর-প্যাঁচ' কম নেই। সরল ও সহজরীতি তাঁর নয়—বেঁকিয়ে ঘুরিয়ে বলার মধ্যে একটি বলিষ্ঠতা আছে—বক্তব্যকে স্পষ্ট ও জোরালো ক'রে তোলার এও এক রীতি। এইজন্য বীরবলী ঢঙে সরসতার অভাব নেই—কিন্তু সেই সরসতা অম্ল-মধুর ধর্মী। কেবল মধুর প্রশান্তি তাঁর রচনায় মিলবে না। বাংলা গদ্যের অযত্ন-শিথিল ভাবালুতার মধ্যে প্রমথ চৌধুরীর গদ্য স্টাইল যেন একটি প্রদীপ্ত প্রতিবাদ। অর্ধনিমীলিত ভাবাতুর চোখ তিনি তাঁর তীক্ষ্ণ কঠিন ভাষার শরাঘাতে জাগিয়ে দেন, সচকিত ক'রে তোলেন আমাদের তন্দ্রাতুর চিত্তবৃত্তি।

বীরবলী ঢঙে দীপ্তি ও দাহ সমভাবে বিদ্যমান। বুদ্ধির খেলা, শব্দের চতুর প্রয়োগ, শ্লেষ-বক্রোক্তি বিরোধাভাসের নিপুণ বিন্যাস বীরবলী গদ্যরীতিকে অনন্যতা দিয়েছে। উইট বা বাগ্‌বৈদগ্ধ্য বীরবলী ঢঙের ভিত্তিমূল। কৃষ্ণনাগরিক প্রমথ চৌধুরী একটি মার্জিতরুচি নাগরিক বৈদগ্ধ্যের উত্তরাধিকার পেয়েছিলেন। এই নাগরিক বৈদগ্ধ্য ভারতচন্দ্রের কাল থেকেই কৃষ্ণনাগরিকদের এক বিশেষ অনুশীলনের বিষয় হয়ে উঠেছিল। প্রমথ চৌধুরীর প্যারাডক্স-প্রিয়তা সুবিদিত। তাঁর প্রবন্ধে শুধু নয় ছোট গল্পেও প্যারাডক্সের ছড়াছড়ি। শ্লেষ, যমক, বক্রোক্তি তাঁর গদ্যরীতির ঠাস-বুনোনির মধ্যে চুমকির কাজ করেছে। তাঁর রচনায় এপিগ্রামের অজস্রতা লক্ষণীয়। মন্তব্যগুলি সংক্ষিপ্ত ও দ্রুতসঞ্চারী, কিন্তু তার শরবৎ ঋজুতা ও তীক্ষ্ণতা লক্ষ্যভেদী অলঙ্কারগুলি সর্বত্র যে সুপ্রযুক্ত হয়েছে, এমন কথা বলা যায় না। তাঁর ছোট গল্পগুলিতেও তীক্ষ্ণধার মন্তব্যের অজস্রতা আছে। তাঁর অনেকগুলি গল্পেই গল্পরসের স্বাভাবিক প্রবাহ

অতিক্রম ক'রে বিতর্কমূলক মন্তব্য-প্রধান এপিগ্রামের শরবর্ষণ আত্মপ্রকাশ করেছে। তাঁর গদ্যরীতির আর একটি ধর্ম ক্লাইম্যাক্স অ্যান্টি-ক্লাইম্যাক্সের আরোহণ ও অবরোহণের ক্ষিপ্রগতি লঘুভঙ্গি। প্রমথ চৌধুরীর গদ্যরীতির তথাকথিত অবিসর্পিল প্রবাহ নেই। গতিও সর্বত্র সমান নয়। একটু বেঁকে একটু ঘুরে, এক পা পেছিয়ে, দু'পা এগিয়ে, কখনও বা জোরে পা চালিয়ে, কখনও বা একটু দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে চেয়ে ; একটু লঘু মন্তব্য করে গালগল্প করে চলাই তাঁর চলা। তার কারণ চলার নেশা যে একান্ত তা নয়, কিন্তু যতটুকু চলা তাকেই রমণীয় করে তোলা। প্রমথ চৌধুরীর পাশ্চাত্য দোসর ম্যাক্স বিয়ারবম্ সম্পর্কে যে কথা বলা হয়েছে, সে কথা তাঁরও গদ্যরীতি সম্পর্কে বলা যায়, 'Nearly every picture bears···a fragment of artists' jewelled prose, and the effect of these phrases upon current foibles and foillies was as a diamond upon thin glass.'[১৮]

পাঁচ

মানসিক অনন্যতা ও স্বাতন্ত্র্য প্রমথ চৌধুরীর রচনাকে নূতন আস্বাদন দিয়েছে। সবচেয়ে বড় প্রমাণ এই যে রবীন্দ্রযুগে জন্মগ্রহণ ক'রে ও রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে এসেও তিনি সেই আত্মভাবমুগ্ধ সাহিত্যের প্রবল প্রবাহে নিজেকে ভাসিয়ে দেন নি। সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে দৈব-নির্ভর প্রেরণাকেও তিনি স্বীকার করেন নি। বহু-কর্ষণা ও প্রযত্নের ওপরেই যে সাহিত্য গড়ে ওঠে, এই ছিল তাঁর ঐকান্তিক বিশ্বাস। অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্বের স্বরূপ তাঁর স্টাইলকেও গ'ড়ে তুলেছে। মনকে তৈরী করার যে নিঃসঙ্গ অবকাশ তিনি পেয়েছিলেন, সেই একই প্রযত্নে তাঁর স্টাইলও সৃষ্ট হয়েছিল। প্রমথ চৌধুরীর মনোজীবনের সঙ্গে তাঁর স্টাইলের একটি গভীর যোগাযোগ আছে। তিনি চিরকালই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-চর্চার পক্ষপাতী ছিলেন। এই কারণেই সম্ভবত তাঁর গদ্যে এবং কবিতায় একটি বিশেষ ধরণের ব্যক্তিত্ব-প্রকাশক স্টাইল আত্মপ্রকাশ করেছে। তাই উত্তরকালে তাঁর রচনার বিষয় বস্তুকেও যেন অনেকটা গৌণ করে স্টাইলটিই প্রাধান্য লাভ করেছে। একালে প্রমথ চৌধুরীর বক্তব্যের চেয়ে বলার বিশেষ মেজাজ ও ঢঙই যেন অনেক বেশী পরিচিত। কিন্তু এর জন্য বিষয়বস্তুর দায়িত্বকেও একেবারে অগ্রাহ্য করা যায় না। তাঁর বিষয়বস্তুর মধ্যেও অনেকখানি নূতনত্ব ছিল, তার ফলে বলার ভঙ্গিও নূতন ধরণের হয়েছে।

পেটার Style-এর স্বরূপ নির্ণয় করতে গিয়ে একটি বিশেষ ধরণের ঐক্যের কথাই বলেছেন, 'All the laws of good writing aim at a similar unity or identity of the mind in all the process by which the word is associated to its import. To give the phrase, the sentence ; the structural member, the entire composition—song or essay, a similar unity with its subject and with itself style is in the right way when it tends towards that. All depends upon the original unity, the vital wholeness and identity, of the initiatory apprehension of view'.[১৯]

পেটারের মত অনুসরণ করলে দেখা যায় যে তিনি সাহিত্যসৃষ্টির ব্যাপারে স্টাইলের ওপর অতিরিক্ত জোর দিয়েছেন। তাঁর মতটিকে অনুধাবন করলে একটি সত্য স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে—এখানে সাহিত্য ও স্টাইল, এই দুই যেন একার্থবোধ হ'য়ে উঠেছে। কোন কোন সমালোচকের মতে স্টাইলের খাঁটি বাংলা অর্থ 'সাহিত্য'।[২০] লেখকের যথার্থ স্বরূপ হচ্ছে তাঁর স্টাইল। স্টাইলকে লেখকের ব্যক্তিগত অভিব্যক্তি বললেও এর একাংশ অনুদ্ঘাটিত থাকে, এমন কি ভুল ধারণা হওয়াও কিছু অস্বাভাবিক নয়। এই জাতীয় ভুল ধারণা হওয়ার সম্ভাবনা অনুমান ক'রেই বোধ হয় পেটার বলেছেন, 'If the style be the man, in all the colour and intensity of a veritable apprehension, it will be in a real sense impersonal'.[২১] অর্থাৎ খাঁটি স্টাইল ব্যক্তিগত হ'য়েও সার্বজনীন। এইজন্য খাঁটি স্টাইল ব্যক্তিত্বের পরিমিতিকে অতিক্রম করে। সুতরাং মনোজীবন, আত্মিক স্বরূপ ও ব্যক্তিত্ব—বিশেষ একটি স্টাইলকে বিশ্লেষণ করলে এই তিনটি জিনিষই বিশেষভাবে চোখে পড়ে।

সাহিত্য জীবনের গোড়া থেকেই 'বীরবলী ঢঙে'র বিশিষ্ট রূপ ফুটে উঠেছিল। 'আদিম মানব' প্রবন্ধ' 'প্রবাস-চিত্র' গল্প, জয়দেব' প্রবন্ধ সাধুভাষায় লেখা। 'সবুজপত্র' পত্রিকার প্রকাশ তো অনেককাল পরের ব্যাপার। 'সবুজপত্র' প্রমথ চৌধুরীর আত্মপ্রকাশের প্রধান মাধ্যম হ'লেও তার বহু পূর্ব থেকেই যেন প্রমথ চৌধুরীর স্টাইলটি তৈরী হ'য়েই ছিল, 'সবুজপত্র' শুধু দিয়েছে সুবিস্তৃত সুযোগ ও অনুকূল পরিবেশ। সুতরাং চলতি ভাষা বীরবলী রচনারীতির অন্যতম লক্ষণ হ'লেও প্রধান লক্ষণ নয়। সাধুভাষার মধ্যেও সেই রীতির

স্বরূপধর্ম ফুটে উঠেছে। সেই বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য, ক্ল্যাসিক্যাল বাঁধুনি ও প্রসাদগুণ এখানেও বিদ্যমান। আবেগের বিন্দুমাত্র বাষ্পোচ্ছ্বাস নেই, অথচ স্বচ্ছন্দচর ভাষায় রচিত লেখাগুলির মধ্যেই একটি নিটোল-সুন্দর লাবণ্য আছে। সাধুভাষায় রচিত লেখাগুলির মধ্যেই একটি নিজস্ব স্টাইলের আভাস আছে, পরবর্তী কালে অনুশীলন ও কর্ষণার ফলে সেই স্টাইল পরিমার্জিত হয়েছে মাত্র। মাঝে মাঝে শ্লেষের অম্ল-মধুর সুরও ফুটেছে। সবুজপত্র-পর্বে শ্লেষ ও প্যারাডক্সের ব্যবহার আরও নিপুণ ও অভ্রান্তভাবে ফুটে উঠেছে। বিষয়কে অন্তর্ভেদী দৃষ্টির সাহায্যে আলোকিত ক'রে তোলা ও যুক্তিশৃঙ্খলাপূর্ণ বিশ্লেষণ ও চিন্তাকে প্রকাশ করার উপযুক্ত স্টাইল প্রথম থেকেই তাঁর রচনায় লক্ষ্য করা যায়।

প্রমথ চৌধুরীর রচনারীতি ও স্টাইল সম্পর্কে অনেক বিরুদ্ধ মন্তব্যও শোনা যায়। কিন্তু একথা সম্ভবত কেউই অস্বীকার করবেন না যে তাঁর বলার ভঙ্গি ও চিন্তার মধ্যে স্বাতন্ত্র্য আছে। চৌধুরী মহাশয় উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে যে 'অভিভাষণ' পড়েছিলেন, তার মধ্যেই তাঁর স্টাইল-চর্চার 'যোগাভ্যাসে'র পরিচয় আছে, 'যে সকল মনোভাব গ্রন্থিবদ্ধ নয়, তাহাদের বিশৃঙ্খল সমষ্টি সমগ্রতা নয়। চিন্তাগঠনের প্রণালীকেই আমরা লজিক বলি। লজিক এবং আর্টের সম্পর্ক যে অতি ঘনিষ্ঠ, গ্রীক সভ্যতাই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কেন না আর্ট এবং লজিক, এই দুই এ সভ্যতার সর্বপ্রধান কীর্তি। প্রকরণভঙ্গ সংস্কৃতসাহিত্যে মহাদোষ বলিয়া গণ্য। আমাদের পদ্যরচনা যে এ দোষে অল্প বিস্তর দুষ্ট, একথা অস্বীকার করিবার জো নাই। এ দোষ বর্জন করিবার জন্য প্রতিভার প্রয়োজন নাই, প্রয়োজন আছে শুধু মনোযোগের। সাহিত্যের সাধনাও একরূপ যোগাভ্যাস। ধ্যানধারণা ব্যতীত এ ক্ষেত্রেও সিদ্ধিলাভ করা যায় না। ধ্যানধারণা করা আর না করা আমাদের ইচ্ছাধীন। সুতরাং ইচ্ছা করিলেই আমরা আমাদের রচনাকে দৃঢ়বদ্ধ করিতে পারি।' চৌধুরী মহাশয়ের এই উক্তিটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে তিনি একদিকে যেমন 'যোগাভ্যাস' বা 'ধ্যান-ধারণা'র কথা বলেছেন, তেমনি অভ্যাস ও সযত্ন কর্ষণার ওপরেও জোর দিয়েছেন। বীরবলী ঢঙয়ের স্পষ্টতা, পারিপাট্য ও পরিহাস-প্রবণ বাক্‌চাতুর্যের একটি উদাহরণ নেওয়া যাক।

'...শালগ্রামের শোওয়া বসা দুই এক হ'লেও মানুষের অবশ্য তা নয়। কাজেই এ দুয়ের ভেতর যেটি হোক একটি আসন গ্রহণ করবার জন্য আমাকে অবিশ্রাম কসরৎ করতে হচ্ছিল। কুচিমোড়া না ভেঙ্গে বীরাসন ত্যাগ ক'রে পদ্মাসন গ্রহণ

করবার জো ছিলনা, অথচ আমাকে বাধ্য হ'য়ে মিনিটে মিনিটে আসন পরিবর্তন করতে হচ্ছিল। আমার বিশ্বাস এ অবস্থায় হঠযোগীরাও একস্থানে বহুক্ষণ স্থায়ী হতে পারতেন না, কেন না পৃষ্ঠদণ্ড ঋজু করবামাত্র, পাল্কির ছাদ সজোরে মস্তকে চপেটাঘাত করছিল। ফলে গুরুজনের সুমুখে কুলবধূর মত, আমাকে কুব্জপৃষ্ঠে নতশিরে অবস্থান করতে হয়েছিল। নাভিপদ্মে মনঃসংযোগ করবার এমন সুযোগ আমি পূর্বে কখনও পাই নি; কিন্তু অভ্যাস-দোষে আমার বিক্ষিপ্ত চিত্তবৃত্তিকে সংক্ষিপ্ত ক'রে নাভিবিবরে সুনিবিষ্ট করতে পারলুম না।'—আহুতি

উদ্ধৃত অংশটিতে প্রমথীয় রচনারীতির কয়েকটি প্রধানবৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। পাল্কির মধ্যে অনভ্যস্ত ও বিসদৃশ বসার বর্ণনাটিকে যেমন কৌতুকাবহ ক'রে তোলা হয়েছে, তেমনি স্পষ্টতায় ও উজ্জ্বলতায় অঙ্কন-রেখাগুলিও চোখের সামনে ফুটে ওঠে। ব্যঙ্গাত্মক চিত্রের একটি বড়দিক হ'ল পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণ—এই পর্যবেক্ষণের ফলে অনেক অপ্রধান অংশও প্রধান হ'য়ে ওঠে। জীবনের বিসদৃশ অবস্থা ও ঘটনার বর্ণনা কিম্বা উদ্ভট ব্যাপারের নিপুণ বিশ্লেষণ অনেক সময় হাস্যরসের উদ্রেক করে। এ সব ক্ষেত্রে তৎসম শব্দের সঙ্গে ঘরোয়া চলতি শব্দের স্বচ্ছন্দ ব্যবহারের ফলে অম্ল মধুর রস আরও জমে উঠেছে। লেখক বলেছেন হাল্‌কা সুরে, কিন্তু মাঝে মাঝে 'কুব্জপৃষ্ঠে', 'পৃষ্ঠদণ্ড', 'নাভিপদ্ম' প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার স্টাইলের গাঢ়বদ্ধ সংহতি-গুণকেই আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। তা ছাড়া ভাবগত অসঙ্গতির মধ্যেও লেখকের কৌতুক-সমুজ্জ্বল বর্ণনাটি ফুটে উঠেছে। 'গুরুজনের সম্মুখে কুলবধূর মত' অথবা হঠযোগীসুলভ 'নাভিপদ্মে মনঃসংযোগ' ব্যাপার দু'টিকে টেনে এনে তাঁর হাস্যকর অবস্থাকে মূর্ত ক'রে তুলেছেন। দৈনন্দিন-জীবনের একটি তুচ্ছ ব্যাপারের সঙ্গে দুটি গুরুতর ব্যাপারের সংযোগ করে লেখক যে অসঙ্গতি সৃষ্টি করেছেন, তাতেই খাঁটি সাহিত্যিক স্টাইলের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়েছে। রচনা-পারিপাট্যের মধ্যে ঝরঝরে বলার ভঙ্গি বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাছাড়া, 'বিক্ষিপ্ত' ও 'সংক্ষিপ্ত' দু'টির প্রয়োগও লক্ষণীয়। তাঁর রচনায় ঠাস-বুনোনির অভাব নেই, কিন্তু শব্দ, অর্থ, চিত্র, চরিত্র—প্রত্যেকটিরই একটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ সুস্পষ্ট রূপ চোখে পড়ে। কোনটিই অস্পষ্ট নয়। এর প্রধান কারণ হ'ল ভাবালুতার কুয়াসা-মুক্তি। ভাবাতিরেক অনেক সময় বক্তব্যকে অস্পষ্ট করে—সে ক্ষেত্রে শব্দের ঘন-সংহত ব্যবহার ভাবকে বাষ্পাচ্ছন্ন ক'রে তোলে।

প্রমথ চৌধুরীর শ্লেষাত্মক বাচনভঙ্গি বক্তব্যকে আরও স্পষ্ট ক'রে তুলেছে। শব্দের ধ্বনিগত ঐক্য ও একই শব্দের অর্থগত বৈষম্য দিয়ে তিনি যে-জাতীয় বিদ্রূপাত্মক প্রকাশরীতির নিপুণ কৌশল দেখিয়েছেন, তাতে বলার বিষয় আরও স্পষ্ট হয়েছে। যেমন, 'সকল বিষয়ে মাঝারি হ'য়েও তারা সকলের মাথা হল কি করে? এর অবশ্য নানা কারণ আছে, তার মধ্যে একটি হচ্ছে এই যে তারা ছিল চৌকস। যে সব ছেলেরা পড়ায় ফার্স্ট হত—তারা খেলায় লাস্ট হত আর যে সব ছেলেরা পড়ায় লাস্ট হত—তারা খেলায় ফার্স্ট হয় নি। চৌকস হতে হলে যে মাঝারি হতে হয়, এ জ্ঞান তাদের ছিল; কেননা বয়েসের তুলনায় তারা ছিল যেমন সেয়ানা তদধিক হুঁসিয়ার।'—(রাম ও শ্যাম)

এখানে শব্দ ও অর্থ নিয়ে কথা-বিলাসী লেখক কথার রসে মেতে উঠেছেন। উদ্ধৃত অংশটির মধ্যে আগাগোড়া একটি কৌতুকদীপ্ত সূক্ষ্ম বিদ্যুতের আগ্নেয় রেখা আছে—যার স্পন্দনে শব্দার্থগত ব্যঞ্জনা পূর্ণায়ত হ'য়ে উঠেছে। আমাদের ভাবমন্থর প্রকাশরীতির মধ্যে লেখক এমন একটি বিশেষ বলার ভঙ্গি এনেছেন, যা আমাদের বুদ্ধিকে নাড়া দেয়—আমাদের তন্দ্রাতুর ভাববৃত্তিকে প্যারাডক্সের খোঁচায় সজাগ করে তোলে। 'বীরবলের হালখাতা', 'সাহিত্যে খেলা', 'আমরা ও তোমরা' প্রভৃতি রচনার মধ্যে বলার এই বহু-বঙ্কিম ভঙ্গি, জোরালো ও প্যাচালো ঢঙ্ নিপুণভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। কথার খেলায় খুব বেশী সিদ্ধ না হ'লে এমন কসরৎ করা সম্ভব হত না। আসল কথা স্টাইল ঠিক ভাষার গুণ, নয়, যদিও ভাষার প্রসঙ্গ এখানে অনিবার্যভাবেই এসে পড়ে। স্টাইল হল মনের গুণ, চিন্তা করার বিশেষ পদ্ধতির ওপরেই এর ভিত্তিভূমি।

ছয়

প্রমথ চৌধুরীর স্টাইল প্রসঙ্গে প্রধানত তাঁর প্রবন্ধ ও গল্পরচনার ওপরেই নির্ভর করা হয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাঁর কবিতাগুলিকে বাদ দেওয়া যায় না। 'সনেট পঞ্চাশৎ' ও 'পদচারণ'—বাংলা কবিতার ইতিহাসে আঙ্গিক-বৈচিত্র্যে একটি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। তিনি তাঁর সনেটের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করতে গিয়ে যথার্থই বলেছেন,

'বিগাঢ়যৌবনা-তন্বী, আকারে বালিকা,
পরিণত দেহখানি আঁট সাঁট ক্ষুদ্র।'

সম্ভবত এই অংশের মধ্যেই তাঁর কাব্যরচনার সমস্ত বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যাবে। 'বিগাঢ়যৌবনা-তন্বী'—বাক্যাংশটির মধ্যেই ঘনত্ব ও সংহতির কথা আছে। শিথিলবন্ধ কবিতায় অপরিণত দেহের অনুপাতেই তার কায়া-নির্মিতির আদর্শ গড়ে ওঠে। প্রমথ চৌধুরী এ ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র রীতির পক্ষপাতী। দেহটি পরিণত হলেই যে আয়তন সুবিশাল হতে হবে এ কথা তিনি স্বীকার করেন নি—কারণ তাতে কাব্যলক্ষ্মীর সৌন্দর্যহানির সম্ভাবনা আছে। কাব্য শব্দ-কায়—সুতরাং তার পরিমার্জিত, সুচিক্কন দেহযষ্টি লাবণ্যকেই বৃদ্ধি করে। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে এখানে গদ্য-স্টাইলের সঙ্গে কবিতার আঙ্গিক ও প্রকাশরীতির কোনো পার্থক্য নেই। তাঁর স্টাইলের মধ্যে একটি ভাস্কর্য-সুলভ বৈশিষ্ট্য আছে—খোদাই ক'রে স্পষ্ট ক'রে তোলাই এর কাজ—দেহের প্রতিটি রেখাই এখানে উজ্জ্বল। এই শব্দ-শরীর, বাক্যগঠন, ছন্দ-মিল প্রভৃতির দিকে তাঁর তীক্ষ্ণ নজর ছিল। তিনি বলেছেন 'যেমন কেবল মাত্র মনের আনন্দে গান গাইলে তা সঙ্গীত হয় না, তেমনি কেবলমাত্র মনের আবেগে স্বচ্ছন্দে লিখে গেলেও তা কবিতা হয় না। মনের ভাবকে ব্যক্ত করবার ক্ষমতার নামই রচনাশক্তি। মনের ভাবকে গড়ে না তুলতে পারলে তা মূর্তি-ধারণ করে না আর যার মূর্তি নেই তা অপরের দৃষ্টির বিষয়ীভূত হ'তে পারে না। কবিতা শব্দ-কায়। ছন্দ, মিল ইত্যাদির গুণেই সে-কায়ায় রূপ ফুটে ওঠে। মনোভাবকে তার অনুরূপ দেহ দিতে হলে শব্দজ্ঞান থাকা চাই, ছন্দ-মিলের কান থাকা চাই। এ জ্ঞান লাভ করবার জন্য সাধনা চাই, কেননা সাধনা ব্যতীত কোনো আর্টে কৃতিত্ব লাভ করা যায় না।'[২২]

কাব্য সম্পর্কে চৌধুরী মহাশয়ের এই মন্তব্যটি তাঁর বিশিষ্ট স্টাইলের স্বরূপ-ধর্মটিকে চিহ্নিত করেছে। তাঁর গদ্যের মতো কবিতারও গড়ন ইস্পাতের মতো—এর কোন অংশই ভাবাতিরেকের ফেনায় ফাঁপা নয়—সারগর্ভ ও কঠিন। তাই কাব্যরীতিও ঠিক লতা-নমনীয় হয়ে ওঠে নি। রবীন্দ্রযুগে কাব্য রচনা ক'রেও তিনি সম্পূর্ণভাবে আবেগ বর্জন করতে পেরেছিলেন—তাই তাঁর মানস-বিহঙ্গ কোন দূর অলকাপুরীর সন্ধান করে নি। 'পদচারণ'-এর কবিতাগুলির মধ্যে আঙ্গিক বৈচিত্র্যের নানা পরীক্ষা করেছেন। প্যারাডক্স, উইট্, পান্, তীক্ষ্ণাগ্র এপিগ্রাম—প্রভৃতি তাঁর স্টাইলের যতগুলি হাতিয়ার সবগুলি তাঁর কবিতাতেও পাওয়া যায়। কিন্তু গদ্যের ক্ষেত্রে যে কারণগুলি সিদ্ধির কারণ হয়েছে, কবিতার ক্ষেত্রে তা অনেক সময় ব্যর্থতা সূচিত করেছে। প্রমথ চৌধুরী এক সময় ফরাসি

কবিতার প্রসঙ্গে যে মন্তব্য করেছিলেন, তা তাঁর নিজের কবিতা সম্পর্কেও প্রযোজ্য, 'ফরাসি জাতির দেহে কিংবা মনে কোনো ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় নেই এবং তাঁরা কস্মিনকালেও তাঁদের মগ্ন চৈতন্যের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেন নি। এই কারণে ফরাসি কবিতা ইংরেজি কবিতার তুলনায় আবেগহীন ও কল্পনার ঐশ্বর্যে বঞ্চিত; সে কবিতা মানবমনের গভীরতম দেশ স্পর্শ করে না' অথচ সেই একটি রীতির চর্চা ক'রে ফরাসি গদ্য অনন্যসাধারণ শিল্পরূপ লাভ করেছে।

'পদচারণ'-এর অন্তর্গত 'সনেট-সপ্তক' নামক ব্যঙ্গাত্মক কবিতাগুচ্ছের প্রেরণা হিসেবে চৌধুরী মহাশয় যে গল্পটির অবতারণা করেছেন, তাতে তাঁর কবিতাগুলির মূলগত বৈশিষ্ট্য ও ভাবাবেগপূর্ণ রোম্যাণ্টিক দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধিতা লক্ষণীয়। তিনি বলেছেন, 'ইংলণ্ডে কোন বিশেষ অবস্থায় পড়িয়া, জনৈক বঙ্গযুবকের হৃদয় ও মন, সহসা যুগপৎ প্রণয় ও কবির রসে আপ্লুত হইয়া উঠে। ...বুকের রক্ত জল হইয়া চক্ষু হইতে নির্গত হওয়ার উপরেই যদি বাঙালী কবির কবিত্ব নির্ভর করে, তাহা হইলে আমাদের স্বীকার করিতেই হইবে যে, এই অপরিচিত যুবকটি বঙ্গদেশের একটি শ্রেষ্ঠ কবি।' হৃদয়াবেগের আতিশয্য ও রোম্যাণ্টিক ভাবোচ্ছ্বাসকে তিনি শুধু অস্বীকারই করেন নি, নির্মমভাবে ব্যঙ্গও করেছেন। তাঁর কাব্যরীতির মধ্যেও বুদ্ধির সতর্ক শাসন আছে। তাঁর কবিতা ও কাব্যরূপ সম্পর্কে বিরুদ্ধ-বাদীরা যে সমস্ত প্রশ্ন তুলেছেন তার উত্তর তিনি দিয়েছেন স্বভাবসিদ্ধ রীতিতে। দীপ্ত খরশান কণ্ঠ—বক্রাগ্র ধারালো ছুরির মতো অব্যর্থ লক্ষ্য,

'আমি নাকি ভাবদেহে করি বিশ্লেষণ,
প্রাণহীন মূর্তি গড়ি অঙ্গে অঙ্গ জুড়ে!
প্রতিমা দর্শনে শুধু বিনা আশ্লেষণ,
পোরে না এদের সাধ গাত্র যায় পুড়ে।'

ভাবগত ও রূপগত দু'শ্রেণীর স্বাতন্ত্র্যই প্রমথ চৌধুরীর কবিতায় লক্ষণীয়। তাই সংস্কারের গড্ডালিকা-প্রবাহে যাঁরা গা ভাসিয়ে দিয়েছিলেন, তাঁদের এ কবিতা ভাল লাগে নি। কাব্যরচনায় তিনি অনধিকার চর্চা করেন নি—তিনি তাঁর নির্ধারিত সীমা ছাড়িয়ে এক পাও অগ্রসর হন না। মনের স্বাভাবিক প্রবণতাকে স্বীকার ক'রে নিয়েছিলেন—তাই ভাব বা কল্পনাকে জোর ক'রে বিস্তার করতে চান নি। প্রমথ চৌধুরীর গদ্য স্টাইল বুঝতে হ'লে তাঁর কাব্য রীতিও বুঝতে হবে। কারণ কাব্যে যার প্রাথমিক পদক্ষেপ, গদ্যে তারই পূর্ণতর

পরিণতি। তাঁর প্রবন্ধ ও গল্পে যেমন বিতর্কমূলক ও আলোচনাত্মক অংশ আছে, কবিতাতেও তার প্রাচুর্য লক্ষ্য করা যায়। তার ফলে গীতিকবিতার অখণ্ডতা রক্ষিত হয় নি—রীতিও নিতান্ত গদ্যাত্মক হ'য়ে উঠেছে। প্রমথ চৌধুরীর কবিতা পড়েই বোঝা যায় যে গদ্যই তাঁর স্বক্ষেত্র, কবিতা গদ্যের ছায়ায় গড়ে উঠেছে মাত্র। তিনি এ সত্য বুঝেছিলেন, তাই কবিতা রচনায় তিনি বেশী অনুশীলন করতে পারেন নি।

কিন্তু গীতোচ্ছ্বাস না থাকলেও অনেক জায়গায় তার অভাবপূরণ করেছে সুমিতাক্ষর সুডৌল ভাস্কর্য-সুলভ কাব্যরীতি। 'সনেট-পঞ্চাশৎ'-এর 'তাজ-মহল' কবিতাটি নেওয়া যাক। এখানে ভাব ও রূপ কোন দিকেই কোন অসাধারণত্বের চিহ্ন নেই। এখানে প্রেমের কোনো গভীর রহস্য নিয়ে প্রশস্তি রচনা করা হয় নি। দেশী বিদেশী নানা কবির দীর্ঘকাল আচরিত রীতিকে বর্জন ক'রে তিনি স্পষ্টই বলেছেন, 'সকলি সদর তব নাহিক অন্দর'—অব্যক্ত ও অশরীরী কোন ব্যঞ্জনাকে তিনি তাজমহলের ভেতর আবিষ্কার করতে পারেন নি। অসীম সৌন্দর্যের নীলাকাশে তাঁর কল্পনা-বিহঙ্গ পক্ষবিস্তার করে নি। ভাবের দিক থেকে যেমন ব্যক্ত রূপটি এক আবেগহীন নিরুত্তাপ ভঙ্গিতে বলা হয়েছে, কাব্যরীতির মধ্যেও তেমনি অ্যান্টি-ক্লাইম্যাক্সের গদ্যাত্মক নিম্নমুখী গতি লক্ষ্য করা যায়,

'আঁখিতে সুর্মা-রেখা অধরে তাম্বূল,
হেনায় রঞ্জিত তব নখাগ্র রাতুল,
জরিতে জড়িত বেণী, রুমালে তাম্বূল—
বাদ্‌শার ছিলে তুমি খেলার পুতুল।'

অংশটি নিঃসন্দেহে আবেগহীন, কল্পনার বর্ণময় কলাপ-বিস্তারও এখানে নেই—'মমতাজ'কে বিলাসিনী ও বাদশার 'খেলার পুতুল' করেই তোলা হয়েছে—চাপা-বিদ্রূপের সুরও আছে। কিন্তু অব্যক্ত ও অশরীরী ব্যঞ্জনা না থাকলেও ব্যক্তরূপের যে নিপুণ কারুকার্য আছে, তা অস্বীকার করার উপায় নেই—মোগল বিলাসিনীর একটি সুডৌল রূপমূর্তি!

সাত

প্রমথ চৌধুরীর গদ্য-স্টাইল বিচারের প্রশস্ত ক্ষেত্র তাঁর প্রবন্ধাবলী ; তার কারণ কথাসাহিত্যের মধ্যে স্টাইল ছাড়া এমন দু'টি জিনিস আছে যা পাঠকের মনকে

সহজেই আকর্ষণ করে—সে দু'টি হ'ল কাহিনীর রস ও গল্পের প্রবাহ। গল্প ও উপন্যাসের পক্ষেও ভাল স্টাইলের প্রয়োজন আছে, কিন্তু এর একটু উনিশ-বিশ হ'লে খুব বেশী ক্ষতি হয় না, কারণ কাহিনীর রস ও গল্পের প্রবাহ অনেকখানি সে ক্ষতিকে পূরণ করতে পারে। কিন্তু প্রবন্ধ-সাহিত্যের সে সুবিধা নেই—সেখানে স্টাইলকে স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। কারণ কাহিনীর রস ও গল্পের প্রবাহ তার ত্রুটি শোধন করার জন্য আসবে না। এইজন্য স্টাইল-সম্পর্কে প্রবন্ধকারের দায়িত্ব কথাসাহিত্যিকের চেয়ে অনেক বেশী। কথাসাহিত্যের গদ্যরীতির শিথিলবন্ধতার চেয়ে প্রবন্ধের এই শ্রেণীর দোষ আর্টের দিক থেকে তাই অনেক বেশী মারাত্মক।

অবশ্য প্রমথ চৌধুরী সম্পর্কে ঠিক এ জাতীয় বিচার করা চলে না। কারণ ছোটগল্প এবং প্রবন্ধ—উভয় ক্ষেত্রেই তিনি একই রকম কলা-প্রযত্নের পরিচয় দিয়েছেন। কারণ তাঁর মতে ছোটগল্পের ক্ষেত্রে যেমন বিশেষ রকম ফর্ম-নিষ্ঠার প্রয়োজন আছে উপন্যাসের ক্ষেত্রে তেমন নেই, 'ছোটগল্প বলবারও একটা আর্ট আছে, এবং আমার বিশ্বাস এ আর্ট নভেল লেখার আর্টের চাইতেও কঠিন। কারণ, এ-জাতীয় গল্পের উপাদানকে আগে মনে সাকার ক'রে নিতে হয়, পরে ভাষায় মূর্ত করতে হয়। নভেলের মতো এতে নানাকথা বলবার অবসর নেই।' প্রমথ চৌধুরী ছোটগল্পের যে ফর্ম দিয়েছেন, যে গদ্য-স্টাইলে বলেছেন, গল্পরস ছাড়াও যেন তার একটি স্বতন্ত্র আবেদন আছে। প্রমথ চৌধুরীর গল্পগুলি বলা হয়েছে উত্তমপুরুষে—যিনি অনেক সময় ঘটনার দর্শক ও ব্যাখ্যাতা। এইজন্য প্রবন্ধকার প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে কথক প্রমথ চৌধুরীর প্রভেদ নেই। তাঁর পয়লা নম্বর কথক নীল-লোহিতের মুখেই শোনা যাক, 'আমি এমন কোনও স্ত্রীলোকের সঙ্গে কখনও প্রেমে পড়িনি, যার মুখে আমি তার চেহারা দেখতে পাই নি। বর্ণ তার ছিল উজ্জ্বল শ্যাম, গড়ন ছিপ্‌ছিপে, নাক তোলা, আর চোখ সাতরাজার ধন কালমাণিকের মত। আমি চিরজীবন তাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছি, আর যখনই তার ঈষৎ পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণের সাক্ষাৎ পেয়েছি, তখনই আবার প্রেমে পড়েছি। এই কারণেই আমি বলছি যে, আমার সব নতুন প্রেম আমার সেই আদিপ্রেমের reprint মাত্র। যখনই কোন নতুন প্রেমে পড়েছি, তখনই পৃথিবী একেবারে উল্টেপাল্টে গিয়েছে, ডুমুরের ফুল ফুটেছে, অমাবস্যায় জ্যোৎস্না ফুটেছে, আকাশকুসুমের গন্ধ চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে এবং আমার মনে হয়েছে যেন আমি হঠাৎ জেগে উঠেছি, আর তার আগে ঘুমিয়েছিলুম।

এই আদিপ্রেমের কৃপায় কোন ইংরেজ কিংবা জাপানী অথবা ইহুদী মেয়ের প্রেমে কখনও পড়ি নি। কারণ ইংরেজের রং উজ্জ্বল শ্যাম নয়, চুণের মত সাদা; জাপানীর নাক তোলা নয়, চাপা, আর ইহুদীদের নাক হাতীর শুঁড়ের মত লম্বা।'—(নীল-লোহিতের আদিপ্রেম)

খুব গভীর কথাকে হাল্কা চালে বলা হয়েছে—কিন্তু বলার ভঙ্গি কেমন ঝর্‌ঝরে। শেষের দিকটাতে ব্যঙ্গাত্মক উপমার তালিকাটি হাস্যরসের উদ্রেক করে। এখানে কোন একটি বিশেষ ভঙ্গি নিয়ে বাড়াবাড়ি করা হয় নি—সহাস্য ভাষা প্রসন্নতার আলো ছড়িয়েছে। তাঁর প্রবন্ধাবলীতেও এই বুদ্ধিবৃত্ত গদ্যরীতি বিশেষ পরিমার্জনা ও অনুশীলনের ফলে একটি নূতন রূপলাভ করেছিল। একালের একজন খ্যাতনামা সমালোচক বলেছেন, 'বাংলার নব্যন্যায়-স্রষ্টাদের তিনি আধুনিকতম সাহিত্যিক বংশধর।'[২৩] বিতর্কের অবকাশ যেখানেই তিনি পেয়েছেন, সেখানেই তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত যুক্তিনিষ্ঠ মন কথার খেলায় মেতে উঠেছে। তীক্ষ্ণাগ্র মিতবাক্‌ মন্তব্য [Epigram] প্যারাডক্স ও শ্লেষের চতুর গ্রন্থন ও ক্লাইম্যাক্সের দ্রুতসঞ্চারী আরোহ-অবরোহ দিয়ে 'আমরা ও তোমরা' রচনাটিকে বীরবলী ঢঙ-এর একটি চূড়ান্ত সিদ্ধিতে পরিণত করা হয়েছে—এ যেন যথার্থই 'শব্দের বিদ্যুৎ-ছটা', 'অর্থাৎ এককথায়, তোমরা যা চাও আমরা তা চাই নে, আমরা যা চাই তোমরা তা চাও না; তোমরা যা পাও আমরা তা পাই নে, আমরা যা পাই তোমরা তা পাও না। আমরা চাই এক, তোমরা অনেক। আমরা একের বদলে পাই শূন্য, তোমরা অনেকের বদলে পাও একের পিঠে অনেক শূন্য।'

বীরবলের গদ্য-স্টাইলকে তাই বলে সম্পূর্ণভাবে ত্রুটিমুক্ত বলা যায় না। বীরবলী ভঙ্গির যে কয়েকটি বিশেষ লক্ষণ আছে তাদের মধ্যে ভারসাম্যের অভাব হলেই স্টাইলের মধ্যে দুর্বলতা দেখা যায়। কোনো কোনো সময় শব্দার্থের খেলায় তিনি এমন মেতে উঠেছেন, যার ফলে শুধু যে আতিশয্য দোষ ঘটেছে তাই নয়, অনেক সময় এর ঢেউ একে মূল বিষয় থেকে অনেক দূরে সরিয়ে এনেছে। ভঙ্গি যেখানে উৎকৃষ্ট কলার সহায়ক, সেখানে একে নিঃসন্দেহে স্বীকার ক'রে নিতে হবে, কিন্তু যেখানে উৎকটভাবে সব রকম সামঞ্জস্য নষ্ট করে, সেখানে শিল্পের দিকেও ত্রুটি ঘটে। বীরবলী ঢঙ-এর বিরুদ্ধে এই শ্রেণীর অভিযোগ এখনও কোন কোন মহলে শোনা যায়। যে ভঙ্গি রসসৃষ্টির অনুকূল তা অভিনন্দনযোগ্য, কিন্তু তাই ব'লে ভঙ্গিসর্বস্বতা কোনক্রমেই স্বীকার করা

যায় না। 'বীরবলী রীতি' মাত্রই ভঙ্গিসর্বস্ব এ কথা যথার্থ নয়, কিন্তু কোথায়ও কোথায়ও যে আতিশয্য দোষ ঘটেছে একথাও অনস্বীকার্য। বাঁকানো ও প্যাঁচালো ভঙ্গি ও বাক্‌চাতুর্যের ওপর অতিরিক্ত নির্ভর করলে শেষে mannerism হ'য়ে উঠতে পারে। চেস্টারটনের বিরুদ্ধেও এই ধরণের একটি অভিমত আছে। একই কৌশলের পুনঃ পুনঃ প্রয়োগের ফলে কথার জাদুশক্তিও নষ্ট হ'য়ে যায়—ধার কমে যায়। প্রমথ চৌধুরীর মতো বহু বিষয়ে অধিকার সকলের থাকে না—তাই তিনি যেভাবে সিদ্ধ হয়েছেন তা সকলের পক্ষে আয়ত্তগোচর হওয়া সম্ভব নয়। 'বীরবলী ঢঙ'—বাংলা গদ্যের মুক্তির ইতিহাসে একটি বিরাট অধ্যায়। সুতরাং নবীন লেখকের পক্ষে এই ঢঙ-এর অনুরাগী ও অনুগামী হ'য়ে ওঠা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু সীমাবদ্ধ শক্তি ও মানস-প্রস্তুতির অভাব নিয়ে এই রীতির অনুসরণ সম্ভব নয়। স্টাইল বাণী-সাধনার একটি বহিরাশ্রয়ী প্রকরণ মাত্র নয়, লেখকের মনোজীবনের সঙ্গেই তা ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। তা ছাড়া চৌধুরী মহাশয় দীর্ঘকাল ধ'রে মন তৈরী করেছিলেন, তার পরে পরিণত চিন্তা ও পরিপক্ক মন নিয়ে লিখতে বসেছিলেন। যাঁরা তাঁর পথ অনুসরণ করেছেন তাঁদের এই সত্যটি মনে রাখা দরকার।

আগেই বলা হয়েছে যে কথ্যভাষায় লেখা প্রমথ চৌধুরীর স্টাইলের একটি দিক মাত্র—কিন্তু ভাষাটিকেই স্টাইল বললে ভুল করা হবে। তাঁর স্টাইলের স্বরূপ উদ্ঘাটন করতে হ'লে সমসাময়িক দু'জন খ্যাতকীর্তি স্টাইলিস্টের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনার কথা স্বভাবতই মনে পড়ে—এই দু'জন হলেন রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ। সবুজপত্রের যুগে কবিতা ও গদ্য—উভয় ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের রচনারীতি ও আঙ্গিকের পরিবর্তন হয়েছে। তথাপি প্রমথ চৌধুরীর গদ্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের গদ্যের পার্থক্য কম নয়। এই পর্বে রবীন্দ্রনাথের গদ্যে আবেগের পরিমাণ অনেক কম, উজ্জ্বল বুদ্ধির বৈদ্যুতিক রেখায় তার তনুদেহটি অঙ্কিত—ক্ষিপ্র অথচ বিসর্পিল গতি চোখ ধাঁধিয়ে দেয়, চমকের সৃষ্টি করে। 'চার-ইয়ারী-কথা' ও 'ঘরে-বাইরে' সমসাময়িক—দু'টি কাহিনীই কথ্যভাষায় লেখা। 'চার-ইয়ারী'র বলায় আবেগ নেই, সংযত জমাটবাঁধা চারটি গল্প—খাঁটি ভাস্কর্যের রূপকরণ। 'ঘরে-বাইরে' অলঙ্কারপ্রধান, কখনও কখনও আতিশয্যের অপচয়ও আছে। ভাষার লঘুস্পর্শ, গতি লঘু ফেনার মতই—কবিত্বের সূর্যালোকে তার মধ্যে ইন্দ্রধনুর বর্ণবিলাস ফুটে ওঠে। প্রমথ চৌধুরীর গদ্যে কবিত্বের সেই সুরভি ও সম্পদ নেই। 'চার-ইয়ারী-কথা'র স্টাইল ভাস্কর্যধর্মী

আর 'ঘরে-বাইরে'-র স্টাইল গীতিস্পন্দী। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ ও প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধের মধ্যেও স্টাইল-গত পার্থক্য আছে। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধেও উপমা ও চিত্রকল্পের প্রাচুর্য। এই চিত্রকল্পগুলি তাঁর বক্তব্যকে আরও পরিস্ফুট ক'রে তুলেছে। প্রমথ চৌধুরীর ভঙ্গি যুক্তিপ্রধান, তাকে ইমেজ-প্রধান না ব'লে লজিক-প্রধান বলা যায়। তা ছাড়া, রবীন্দ্রনাথ ভাষাকে অনেক বেশী লঘু করতে পেরেছেন, প্রমথীয় রীতির মধ্যে তৎসম শব্দ ও সমাসের বাহুল্য আছে—তাই এ ভাষা চল্‌তি হ'লেও লঘু নয়—ইস্পাতের মতো কঠিন, এর সর্বাঙ্গে এক উজ্জ্বল-কঠিন তীক্ষ্ণ ধাতবদীপ্তি! রবীন্দ্রনাথের কথায় মহাকবির মনের আকাশের ছায়া পড়ে অনেকখানি—তাই বুদ্ধির সঙ্গে কিছু হৃদয়ের অংশও থাকে—তাই বাগ্‌বৈদগ্ধ্য সত্ত্বেও প্রমথীয় স্যাটায়ার তাঁর অধিগত নয়।

অবনীন্দ্রনাথের গদ্যরচনায় একটি নিজস্ব ভঙ্গি ফুটে উঠেছে। একে এক কথায় বলা যায় চিত্ররীতি। ভাষা তৎসম শব্দের জটিল বন্ধন থেকে একেবারে মুক্ত। অবনীন্দ্রনাথের ভাষা কথ্যভাষার সাহিত্যিক ছাঁদ নয়। প্রমথ চৌধুরীর ভাষা কথ্যভাষারই একটি সাহিত্যিক রূপ,—অবনীন্দ্রনাথের ভাষা মুখের ভাষাই, অথচ সম্পূর্ণ নূতন ভঙ্গিতে বলা হয়েছে। তাঁর শিল্পপ্রবন্ধাবলী, রূপকথা, আত্মজীবনীমূলক রচনা দুটি—সবগুলিই বলা হ'য়েছে রূপকথার ঢঙে। প্রমথ চৌধুরীর স্টাইলের মতো অবনীন্দ্রনাথের স্টাইল শব্দগাঢ় ও পেশীবহুল নয়, ছোটছোট কথা পার্বত্যনদীর উপলখণ্ডের মতো—গল্পবলার স্রোতোরেখায় সেখানে গানের নূপুর বেজে ওঠে। কথার মধ্যেও রং আছে—যে রং ছবি এঁকে গল্প বলে। কিন্তু এ-ভাষায় পরমত খণ্ডন করা যায় না, যুক্তিতর্ক ও বুদ্ধির তীব্র আলোয় এ ভাষা রামধনুর মতো শূন্যে মিলিয়ে যায়। প্রমথ চৌধুরীর স্টাইল শব্দগাঢ়, চল্‌তি রীতির হ'য়েও ভারি—যুক্তিতর্ক-বিচার ও বহু-প্রসঙ্গের অবতারণায় সে অকুণ্ঠ—তার দেহ সুমার্জিত—মর্মরমসৃণ। অবনীন্দ্রনাথের স্টাইল সূক্ষ্মসার চিত্র-রূপময়—রূপকথার ঘুমন্ত রাজকন্যার লুণ্ঠিত শিথিল ওড়না—ভাঁজে ভাঁজে যার সূক্ষ্ম বয়নের কারুবিলাস।

১. 'চৌধুরী মহাশয়ের বঙ্গসাহিত্যে স্থান ঠিক তাঁহার রচনার উপর নির্ভর করে না—তিনি একজন সেই শ্রেণীর লেখক, যাঁহার প্রভাব লিখিত পুস্তককে অতিক্রম করিয়া ছড়াইয়া পড়ে।'

—বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা : শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

২. বাংলা সাহিত্যে গদ্য : সুকুমার সেন।

৩. বঙ্গভাষা বনাম বাবু ওরফে সাধুভাষা : নানাকথা।

৪. History of Bengali Literature in the 19th Century : Dr. S. K. De.

৫. আত্মকথা : পৃষ্ঠা ১৬-১৭।

৬. আত্মকথা : পৃষ্ঠা ১৮।

৭. ঐ :

৮. দ্বিজেন্দ্রলাল : পদচারণ।

৯. সাধুভাষা বনাম চলিত-ভাষা : নানাকথা।

১০. বঙ্গসাহিত্যের নবযুগ : বীরবলের হালখাতা।

১১. ছন্দ : রবীন্দ্রনাথ।

১২. Modern Bengali Prose : An acre of green grass.

—Buddhadev Basu, Page 64.

১৩. কথার কথা : বীরবলের হালখাতা।

১৪. মানসিংহের দিল্লীতে উপস্থিতি : অন্নদামঙ্গল (তৃতীয় খণ্ড), সাহিত্য পরিষদ সং।

১৫. প্রমথ চৌধুরী : বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ, ১৩৫৪।

১৬. ফরাসী সাহিত্যের বর্ণপরিচয় : নানাকথা।

১৭. 'যে রচনা তাঁর মনে হ'ত চিন্তার শৈথিল্যে পরিণতবাচ্য, বা ভাষার জড়তায় অস্বচ্ছ-প্রকাশ তাকে তিনি বরদাস্ত করতে পারতেন না।—সেই কারণেই প্রাচীন ভারতবর্ষের ভাষ্যকার ও টীকাকারদের তিনি পরম অনুরাগী ছিলেন। এঁদের মধ্যে যাঁরা বড় তাঁদের সূক্ষ্ম অথচ বস্তুনিষ্ঠ যুক্তির ধারা এবং বিপুল শব্দসম্পদের প্রয়োগনৈপুণ্য এই প্রোজ্জ্বলবুদ্ধি অসাধারণ শব্দকুশলী বাঙালী লেখককে মুগ্ধ করেছিল।'

—প্রমথ চৌধুরী : বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৫৪ : অতুলচন্দ্র গুপ্ত।

১৮. Twentieth Century Literature : A. C. Ward.

১৯. Style : Appreciation : Page 22.

২০. '...আবার স্টাইলেরও খাঁটিবাংলা 'সাহিত্য'। কবি-আত্মার সহিত বস্তু ও শব্দার্থের মিলনেই তো জন্ম লয় আসল সাহিত্য। তাই কবিই তো সাহিত্য বা স্টাইল।'

—কাব্যলোক, পৃঃ ৫৬৭ : ডঃ সুধীরকুমার দাশগুপ্ত।

২১. Style : Appreciation, Page 35.

২২. বর্তমান বঙ্গসাহিত্য : নানাকথা।

২৩. প্রমথ চৌধুরী : বাংলার লেখক : প্রমথনাথ বিশী।

প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যকৃতি বিচার-প্রসঙ্গে সবচেয়ে বেশী আলোচিত হয়েছে তাঁর ভাষা। এক সময় বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে যখন ভাষাকে কেন্দ্র ক'রে তুমুল আলোড়ন এবং আন্দোলন হয়েছিল, সেই সময় এই যুধ্যমান প্রবল দু'টি প্রতিপক্ষের মধ্যে একটি পক্ষের তিনি সারথ্য গ্রহণ করেছিলেন। সে আন্দোলন এত বেশী ব্যাপক হ'য়ে উঠেছিল যে উত্তরকালেও অনেকের কাছে তিনি নব্যতন্ত্রী ভাষা-আন্দোলনের নায়ক হিসেবেই সমধিক পরিচিত। অবশ্য এই পরিচয় নিতান্তই খণ্ডিত, কিন্তু এই ঐতিহাসিক আন্দোলনের পেছনে বাংলাভাষার যে গুরুতর পট-পরিবর্তনের ইতিহাস জড়িত ছিল, তার কাহিনী যেমন বিচিত্র তেমনি বিস্ময়কর। বিশেষত পরবর্তীকালের বাংলাসাহিত্যের ওপর এই প্রশ্নসঙ্কুল ও বিতর্কবহুল অধ্যায়টির প্রভাব অনস্বীকার্য। সেদিনের সেই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া আজ নেই সত্য, কিন্তু বর্তমান বাংলা গদ্য যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, তারই মধ্যে সেই বাদপ্রতিবাদ-মুখরতার ফলশ্রুতি লক্ষ্য করা যায়।

বাংলাসাহিত্যে কথ্যভাষাকে সাহিত্যিক মর্যাদা দানের চেষ্টা যে চৌধুরী মহাশয় সর্বপ্রথমে করেছেন, একথা ঐতিহাসিক সত্য না হ'লেও তিনিই যে এই ভাষাকে প্রতিষ্ঠিত ক'রে গিয়েছেন এ বিষয় কোন সন্দেহ নেই। তার কারণ প্রমথ চৌধুরী পরিচালিত কথ্যভাষা-আন্দোলনের প্রায় ষাট-সত্তর বছর আগে বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসে এই ধরণের একটি প্রচেষ্টা চলেছিল। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রের মনকে পর্যন্ত যুধ্যমান দুই প্রতিপক্ষের বাদানুবাদ গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে রাধানাথ শিকদারের সহযোগিতায় প্যারীচাঁদ মিত্র 'মাসিক পত্রিকা' নামে একটি পত্রিকা প্রতিষ্ঠিত করেন। এই পত্রিকায় বাংলাভাষার এক নূতন রূপদানের চেষ্টা করা হয়েছিল। সুতরাং 'আলালের ঘরের দুলাল'-কে আকস্মিক বলা যায় না—'মাসিক পত্রিকা'কে আশ্রয় করে একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠিও গড়ে উঠেছিল। এই পত্রিকার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন। 'কথ্যভাষার রীতিতে কাব্যরচনা, প্রচুর তদ্ভব ও চলতি ফারসী শব্দের ব্যবহার, এবং ক্রিয়াপদে সাধু ও কথ্যভাষার মিশ্রণ—ইহাই হইতেছে 'মাসিক পত্রিকা'র বাগ্‌ভঙ্গির প্রধানতম বৈশিষ্ট্য'।[১] 'টেকচাঁদ ঠাকুর' ছদ্মনামে প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' রচনা বাংলা গদ্যের বিবর্তনের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। প্যারীচাঁদ তাঁর এই ভাষার

কিছু কিছু সম্ভাবনা সম্পর্কেও যে সচেতন ছিলেন তার প্রমাণ আছে বইটির ইংরেজি ভূমিকায়।

'আলালের ঘরের দুলাল'-এর ভাষার সর্বজন-বোধগম্যতাকে অস্বীকার করা যায় না। যতদূর সম্ভব সমাস-বদ্ধ বাগ্‌বিন্যাসকে পরিহার করা হয়েছে। তদ্ভব ও দেশী শব্দের প্রাচুর্য, কথ্যভাষার ইডিয়ম ব্যবহার, তৎসম শব্দ বর্জন-প্রচেষ্টা, চল্‌তি ভাষার ধাতু-ব্যবহার প্রভৃতি কতকগুলি বিষয় 'আলালী ভাষা'য় বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কিন্তু ক্রিয়াপদ-ব্যবহারে সর্বত্র চল্‌তি ভাষার আদর্শ রক্ষা করতে পারেন নি—সাধু ও চল্‌তি ভাষার ক্রিয়াপদের মিশ্রণ ঘটেছে। আবার এমনও হয়েছে যে সাধুভাষাকে জোর ক'রে চলতি ভাষার ক্রিয়াপদের রূপ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে—ফলে শব্দবিকৃতি দোষও ঘটেছে।

কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' 'আলালের ঘরের দুলালে'র পাঁচ বছর পরে প্রকাশিত হয় (১৮৬২)। সচরাচর 'আলালী' ও 'হুতোমী' ভাষাকে একই পর্যায়ে ফেলা হয়, কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে এই দু'টি ভাষাদর্শের মধ্যে প্রচুর পার্থক্য আছে। আলালী ভাষায় সাধু ছাঁদ ও কথ্যরীতির মধ্যে যে-জাতীয় মিশ্রণ আছে, হুতোমী ভাষায় তা নেই—এখানে মোটামুটিভাবে অবিমিশ্র কথ্যভাষা ব্যবহারেরই নিদর্শন আছে। শিল্পগত দিক থেকে এ ভাষা উন্নততর। হাস্যরস-সৃষ্টিতে ও লঘুবিষয়-রচনায় এ-ভাষার একটি সার্থকতা আছে, কিন্তু গুরুগম্ভীর বিষয়প্রকাশে এ ভাষার উপযোগিতা সম্পর্কে সংশয় জাগে। বঙ্কিমচন্দ্র এই যুগের ভাষা-সমস্যার ওপর আলোকপাত করেছেন। 'আলালের ঘরের দুলাল' তাঁর সশ্রদ্ধ অনুমোদন লাভ করেছিল। সংস্কৃতানুকারিতাকে তিনি সমর্থন করতে পারেন নি, 'এইরূপ সংস্কৃতপ্রিয়তা ও সংস্কৃতানুকারিতা হেতু বাঙ্গালা সাহিত্য অত্যন্ত নীরস, শ্রীহীন, দুর্বল এবং বাঙ্গলা সমাজে অপরিচিত হইয়া রহিল। টেকচাঁদ ঠাকুর প্রথমে এই বিষবৃক্ষের মূলে কুঠারাঘাত করিলেন। তিনি ইংরেজিতে সুশিক্ষিত। ইংরেজিতে প্রচলিত ভাষার মহিমা দেখিয়াছিলেন এবং বুঝিয়াছিলেন। ...যে ভাষায় কথোপকথন করে, তিনি সেই ভাষায় 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রণয়ন করিলেন। সেই দিন হইতে বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি। সেই দিন হইতে শুষ্কতরুর মূলে জীবনবারি নিষিক্ত হইল।'[৩]

বঙ্কিমচন্দ্রের মতামত বিচার করলে দেখা যায় যে তিনি কয়েকটি মূল সমস্যার ওপর আলোকপাত করেছেন। যে সমস্ত সংস্কৃত শব্দ তদ্ভব শব্দের মতোই প্রায়

সমপরিমাণে ব্যবহৃত হয়, বঙ্কিমচন্দ্রের মতে তাদের ভাষা থেকে বহিষ্কার ক'রে কোনো লাভ নেই—যেমন 'মস্তক' ও 'মাথা'—দুই-ই প্রচলিত আছে, সুতরাং অযথা 'মস্তক' শব্দটি বাদ দিয়ে কোন লাভ নেই। 'সংস্কৃতের সহিত সম্বন্ধ শূন্য' শব্দ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্য অত্যন্ত কঠোর হ'লেও এর যুক্তিবত্তা অস্বীকার করা যায় না। তিনি বলেছেন, 'সংস্কৃত-প্রিয় লেখকদিগের অভ্যাস যে, এই শ্রেণীর শব্দ-সকল তাঁহারা রচনা হইতে একেবারে বাহির করিয়া দেন। অন্যের রচনায় সে সকল শব্দের ব্যবহার শেলের ন্যায় তাঁহাদিগকে বিদ্ধ করে।' অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার সম্পর্কেও বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য। 'অভাব পূরণের' জন্য সংস্কৃতের রত্নভাণ্ডার থেকে শব্দ ধার করাকে তিনি অন্যায় মনে করেন না। এর তিনটি কারণ তিনি নির্দেশ করেছেন। প্রথমত সংস্কৃত শব্দভাণ্ডার ঐশ্বর্যময়, দ্বিতীয়ত সংস্কৃত শব্দ বাংলায় 'ভাল মিশে', তৃতীয়ত সংস্কৃত থেকে শব্দ সংগ্রহ করলে অনেকের পক্ষে ইংরেজি ও আরবির চেয়ে অনেক বেশী বোধগম্য হয়। সর্বশেষে বঙ্কিমচন্দ্র সিদ্ধান্ত করেছেন, 'অতএব যেখানে বাঙ্গালা শব্দ নাই, সেখানে অবশ্য সংস্কৃত হইতে অপ্রচলিত শব্দ গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু নিষ্প্রয়োজনে, অর্থাৎ বাঙ্গালা শব্দ থাকিতে তদ্বাচক অপ্রচলিত শব্দ ব্যবহার যাঁহারা করেন, তাঁহাদের কিরূপ রুচি আমরা বুঝিতে পারি না'।—ভাষার সরলতা ও প্রাঞ্জলতার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র যে কোন শ্রেণীর শব্দ ব্যবহারেরই পক্ষপাতী ছিলেন।

বাংলা গদ্যে চলিত ভাষার নমুনা সর্বপ্রথম সংগ্রহ করেছিলেন উইলিয়ম কেরি তাঁর 'কথোপকথন' নামক দ্বিভাষিক সঙ্কলনটিতে (১৮০১), কিন্তু কথ্যভাষায় রচিত প্রস্তাবগুলিতেও ক্রিয়াপদে সাধুভাষাই ব্যবহৃত হয়েছে। সাধুভাষা ও চলিত ভাষা সম্পর্কে একটি সাহিত্যিক আন্দোলনের রূপ সৃষ্ট হয়েছে 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রকাশিত হওয়ার পর। অবশ্য নাটকীয় সংলাপ হিসেবে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম দিকেই কথ্যভাষার প্রচলন ছিল। মধুসূদনের নাটকে (বিশেষত তাঁর প্রহসন দু'টিতে) ও দীনবন্ধুর নাটকে কথ্যভাষায় রচিত সংলাপ বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তথাপি এই প্রচেষ্টাগুলিকে একজাতীয় বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা বললেও অত্যুক্তি হয় না। আলালী ভাষাকে কেন্দ্র ক'রে সে যুগে ভাষা-বিষয়ক আন্দোলনের সৃষ্টি হয়েছিল বটে, কিন্তু কথ্যভাষার কোন সুকর্ষিত আদর্শের অভাবে সে আন্দোলন খুব সক্রিয় হ'য়ে উঠতে পারে নি। বঙ্কিমচন্দ্র সেই আন্দোলনে একটি বড় অংশ

গ্রহণ করেছিলেন সত্য, কিন্তু 'বিদ্যাসাগরী' ও 'আলালী' রীতির মধ্যপন্থাই তিনি অবলম্বন করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র সাধারণভাবে ভাষাকে সরল ও সহজবোধ্যই করতে চেয়েছিলেন, 'না বুঝিয়া, বহি বন্ধ করিয়া, পাঠক ত্রাহি ত্রাহি করিয়া ডাকিবে, বোধ হয় এ উদ্দেশ্যে কেহ গ্রন্থ লিখে না। যদি এ কথা সত্য হয়, তবে যে ভাষা সকলের বোধগম্য—অথবা যদি সকলের বোধগম্য কোন ভাষা না থাকে, তবে যে ভাষা অধিকাংশ লোকের বোধগম্য—তাহাতেই গ্রন্থ প্রণীত হওয়া উচিত।' বঙ্কিমচন্দ্র ভাষার সরলতার কথাই বলেছেন, কথ্যভাষা সম্পর্কে কোন বিপ্লবাত্মক আন্দোলন করেন নি।

সাধুভাষা ও কথ্যভাষা নিয়ে যখন বিতর্কের সূত্রপাত হল, তখন রবীন্দ্রনাথ তাঁর সৃষ্টির মাধ্যমেই এই আন্দোলনের একটি মীমাংসা করলেন। এই যুগে ভাষা নিয়ে বেশী বিতর্ক না ক'রে তিনি তাঁর বিচিত্র রচনাবলীর ভেতর দিয়েই তাঁর নিজস্ব মতামতের কথা জানিয়েছেন। 'ঘরে বাইরে'-র সময় থেকে তিনি আর সাধুভাষা ব্যবহার করেন নি। সবুজপত্রের প্রভাব ছিল, কিন্তু তার বহু আগে থেকেই রবীন্দ্রনাথ চলতি ভাষায় লেখা সুরু করেছিলেন। 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র', 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়েরি', 'ছিন্নপত্র', 'শান্তিনিকেতন' পর্যায়ের প্রবন্ধাবলী সম্পূর্ণরূপেই চলিত ভাষায় লেখা। তা ছাড়া কিছু কিছু নাটকীয় সংলাপ-রচনায় ও হাস্যকৌতুক-সৃষ্টিতে কবি কথ্যভাষা এর অনেক আগে ব্যবহার করেছিলেন। উপন্যাসের ক্ষেত্রে অবশ্য সর্বপ্রথম 'ঘরে-বাইরে'ই তিনি চল্‌তি ভাষা ব্যবহার করেন। 'গোরা' উপন্যাসের সংলাপ-রচনায় চল্‌তি ভাষা ব্যবহৃত হয়েছিল। 'চতুরঙ্গের' ভাষা সাধুভাষা হ'লেও তার মধ্যেই কথ্যরীতির সংক্ষিপ্ততা ও গতিবেগ লক্ষ্য করা যায়—এর বহিরঙ্গ সাধুভাষার কিন্তু মেজাজ চল্‌তি ভাষার।

দুই

প্রমথ চৌধুরীর নেতৃত্বে ও সবুজ-পত্রের মাধ্যমে কথ্যভাষার স্বপক্ষে যে আন্দোলনে গ'ড়ে উঠেছিল, তার প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, এর আগে চল্‌তি ভাষা নিয়ে নানা তর্ক-বিতর্ক হ'লেও তা একটি বৃহৎ আন্দোলনের রূপ পায় নি। তা ছাড়া প্রমথ চৌধুরী এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মতো একজন অসাধারণ শিল্পীর আনুকূল্য লাভ করেছিলেন। তিনি বলেছেন, 'বাংলা ভাষার অস্তিত্ব 'প্রকৃতিবাদ অভিধানে'র ভিতর নয়, বাঙালির মুখে। কিন্তু অনেকে দেখতে পাই, এই সহজ কথাটা স্বীকার করতে নিতান্ত কুণ্ঠিত।'

'আত্ম-কথা'র মধ্যেও তিনি মুখের বুলির ওপরেই জোর দিয়েছেন। কৃষ্ণনাগরিক প্রমথ চৌধুরী তৎকালীন কৃষ্ণনগরের নানাশ্রেণীর ব্যক্তির মুখের বুলির কথা সশ্রদ্ধভাবে উল্লেখ করেছেন। এ ভাষার কাছে সাধুভাষা কৃত্রিম, কারণ সে ভাষা দৈনন্দিন জীবনে আমরা ব্যবহার করি না। মৌখিক ভাষার মধ্যে তাই একটি সজীবতা ও সচলতা আছে। 'আলালের ঘরের দুলাল' ও 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'-র ভাষা 'আঞ্চলিক ভাষা'।[৪] কিন্তু কৃষ্ণনগরের ভাষা দীর্ঘকালব্যাপী অনুশীলনের ফলে তার আঞ্চলিকতা অতিক্রম করেছিল। তা ছাড়া আলালী ভাষাকেও ঠিক পূর্ণাঙ্গ কথ্যভাষা বলা যায় না—তাই চৌধুরী মহাশয় এই ভাষাকে 'শোধন' ক'রে নিতে চেয়েছেন।

একদল পণ্ডিতের ধারণা ছিল বাংলায় যত সংস্কৃত শব্দ আমদানি করা যাবে, ততই বাংলা ভাষার মঙ্গল হবে। পণ্ডিত প্রবর সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণের মতে, '…মুখের ভাষার ব্যাকরণ নেই, কিন্তু লিখিত ভাষার ব্যাকরণ নইলে চলে না। প্রমাণ, সংস্কৃত শুধু অমরত্ব লাভ করেছে, পালি প্রভৃতি প্রাকৃত ভাষা একেবারে চিরকালের জন্য মরে গেছে; অর্থাৎ এক কথায় বলতে গেলে, যে-কোনো ভাষারই হোক্-না কেন, চিরকালের জন্য বাঁচতে হলে আগে মরা দরকার।' চৌধুরী মহাশয় তীব্র ভাষায় এই মতের প্রতিবাদ করেছেন। 'যদি বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের মত সত্য হয়, তাহলে সংস্কৃতবহুল বাংলায় লেখা কেন, একেবারে সংস্কৃত ভাষাতেই তো আমাদের লেখা কর্তব্য।' আসল কথা সংস্কৃতপন্থীরা মনে করতেন যে বাংলাকে সংস্কৃত-শব্দবহুল ভাষা ক'রে তুললে অপর প্রদেশের লোকের পক্ষে বাংলা ভাষা শেখা অনেকখানি সহজসাধ্য হবে। তাঁদের ধারণা ছিল যে সংস্কৃত শব্দ যেখানে সেখানে ব্যবহার করলেই চলে—তাতে 'বাংলা ভাষার বাংলাত্ব নষ্ট হয় না। এই দুটি মতই চৌধুরী মহাশয় সমানভাবে অস্বীকার করেছেন। তার কারণ বাংলা ভাষারও একটি স্বকীয় রীতি ও স্বধর্ম আছে, সেই স্বকীয়তা লঙ্ঘিত হ'লে তার স্বধর্মচ্যুতিও ঘটে। সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার সম্পর্কে চৌধুরী মহাশয় বঙ্কিমচন্দ্রের মতই অনেকটা সমর্থন করেছেন। কিন্তু যাঁরা মনে করেন যে তিনি সংস্কৃত শব্দ ব্যবহারের ওপরই খড়্গহস্ত ছিলেন, তাঁরাও এ ক্ষেত্রে সুবিচার করেন নি। ভাষার দেহপুষ্টির জন্য সংস্কৃত শব্দ ব্যবহারের উপযোগিতা তিনিও অস্বীকার করেন নি। কিন্তু তার সঙ্গে তিনি যে বিধি-নিষেধের কথা বলেছেন তাও প্রণিধানযোগ্য, "কিন্তু যিনি নূতন সংস্কৃত কথা ব্যবহার করবেন তাঁর এইটি মনে রাখা উচিত যে,

তাঁর আবার নূতন ক'রে প্রতি কথাটির প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে হবে; তা যদি না পারেন তাহলে বঙ্গ-সরস্বতীর কানে শুধু পরের সোনা পরানো হবে। বিচার না ক'রে এক রাশ সংস্কৃত শব্দ জড়ো করলেই ভাষারও শ্রীবৃদ্ধি হবে না, সাহিত্যেরও গৌরব বাড়বে না, মনোভাবও পরিষ্কার ক'রে ব্যক্ত হবে না। ভাষার এখন শানিয়ে ধার বার করা আবশ্যক, ভার বাড়ানো নয়।'

'বঙ্গভাষা বনাম বাবু-বাংলা ওরফে সাধুভাষা' প্রবন্ধটি প্রধানত প্রতিবাদমূলক হ'লেও তিনি বাংলাভাষা ও তার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কতকগুলি মূল্যবান কথা বলেছেন। তাঁর মতে চলিত ভাষার প্রধান গুণ তিনটি—সরলতা, গতি ও প্রাণ। 'বাবু-বাংলা'র মধ্যে সে গুণ নেই। তিনি এই প্রবন্ধে কথ্যভাষার সমর্থনে আরও স্পষ্ট ক'রে বলছেন, 'আমার বিশ্বাস যে, আমরা যদি সংস্কৃত ভাষার দ্বারস্থ না হ'য়ে ঘরের ভাষার উপরেই নির্ভর করি, তা হ'লে আমাদের লেখার চাল স্বচ্ছন্দ হবে এবং আমাদের ঘরের লোকের সঙ্গে মনোভাবের আদান-প্রদানটাও সহজ হ'য়ে আসবে।' শব্দ-নির্বাচন সম্পর্কে তিনি দু'দিকই নজর রেখেছেন; প্রথমত, সংস্কৃত শব্দের আধিক্যকে ও অকারণ প্রয়োগকে যেমন বাংলা ভাষার স্বকীয়তা হিসেবে স্বীকার ক'রে নেন নি, তেমনি 'ইতর' ভাষা সম্পর্কেও তাঁর মোটেই শুচিবায়ুগ্রস্থতা ছিল না। এ বিষয়ে তিনি বলেছেন, 'যে শব্দ ইতর বলে আমরা মুখে আনতে সঙ্কুচিত হই, তা আমরা কলমের মুখ দিয়েও বার করতে পারি নে। কিন্তু যে সকল কথা আমরা ভদ্রসমাজে নিত্য ব্যবহার করি, যা কোন হিসেবেই ইতর বলে গণ্য নয়, সেই সকল বাক্যকে সাহিত্য থেকে বহির্ভূত করে রাখায় ক্ষতি শুধু সাহিত্যের।' এই মন্তব্যটির সঙ্গেও বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্যের কোনো পার্থক্য নেই। কারণ তিনি মনে করতেন যে ভাষার সরলতা ও প্রাঞ্জলতার জন্য অশ্লীল ছাড়া আর সবই গ্রহণ করা যেতে পারে। কথাবার্তায় যে সব শব্দ আমরা নিত্য ব্যবহার করি, সাহিত্যের ক্ষেত্রে কেন যে তাদের প্রবেশাধিকার থাকবে না, চৌধুরী মহাশয় তা কিছুতেই ভেবে পান নি। তিনি মনে করেন যে এই শ্রেণীর শব্দের প্রবেশাধিকার বন্ধ হওয়াতে ভাষার প্রাণহীনতা দেখা দিয়েছে। 'আলালের ঘরের দুলাল' ও 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'র ভাষায় যে প্রচুর পরিমাণে 'ওজঃ-ধাতু' ব্যবহৃত হয়েছে, এ কথাও তিনি প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করেছেন।

সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে বাংলাভাষার 'আকৃতিগত মিল'কে স্বীকার করলেও 'জাতিগত' মিলকে তিনি স্বীকার করেন নি। মন্থরগতি ভাষাও জাতশিল্পীর

হাতে পড়লে কেমন দ্রুতসঞ্চারী গতি ও বিচিত্র ভঙ্গি লাভ করে তা তিনি রবীন্দ্রনাথের 'ছিন্নপত্রে'র ভাষার উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন। ভাষার আড়ষ্টতা ও জড়তা গতিশীলতার বিরোধী। গদ্যের এই 'গদাই লস্করি' চালের বিরুদ্ধেই চৌধুরী মহাশয়ের সংগ্রাম। তাঁর মতে 'এই জড়তার বন্ধন থেকে মুক্ত হবার একমাত্র উপায় হচ্ছে, লেখাতেও মৌখিক ভাষার সহজ ভঙ্গিটি রক্ষা করা। কিন্তু যেই আমরা সে কাজ করি অমনি আমাদের বিরুদ্ধে সাধুভাষার কলের জল ঘোলা ক'রে দেবার এবং বাংলাসাহিত্যের বাড়া-ভাতে 'প্রাদেশিক শব্দে'র ছাই ঢেলে দেবার অভিযোগ উপস্থিত হয়।' প্রাদেশিক ভাষার কথা আলোচনা করতে গিয়ে তিনি ইউরোপীয় ভাষার নজির দেখিয়েছেন। সংস্কৃত ছাড়া 'গ্রীক ল্যাটিন প্রভৃতি মৃতভাষা এক সময় লোকের মুখের ভাষা ছিল।' গোটা গ্রীক-সাহিত্য তিনটি ডায়ালেক্‌টে লেখা হয়েছে। ইংরেজি সাহিত্যের ভাষাও 'ইংরেজ জাতির মুখের ভাষারই অনুরূপ।' বাংলা সাধুভাষার উপাদান ও গোত্র নির্ণয় করতে গিয়ে তিনি বলেছেন '···নদিয়া শান্তিপুর প্রভৃতি স্থানে, ভাগীরথীর উভয় কূলে এবং বর্তমান বর্ধমান ও বীরভূম জেলার পূর্ব ও দক্ষিণাংশে যে ডায়ালেক্‌ট প্রচলিত ছিল, তাই কতক পরিমাণে সংস্কৃত শব্দের সঙ্গে মিশ্রিত হ'য়ে সাধুভাষার রূপ গ্রহণ করেছে'।

আঞ্চলিক ভাষাগুলির উচ্চারণ সম্পর্কেও তিনি আলোচনা করেছেন। উচ্চারণগত ভেদ থেকেই ডায়ালেক্‌টগুলির পার্থক্য নির্ণীত হয়। চৌধুরী মহাশয়ের মতে স্পষ্টোচ্চারণের ওপরেই ডায়ালেক্‌টের কৌলীন্য নির্ভর করে। ঢাকাই কথা বা খাস-কলকাতার কথার মধ্যে অস্পষ্টতার কিছু কিছু উদাহরণ দিয়েছেন। তাঁর সিদ্ধান্ত হ'ল এই যে, 'মোটের উপর দক্ষিণদেশী ভাষাই উচ্চারণ হিসেবে যে বঙ্গদেশে সর্বশ্রেষ্ঠ ডায়ালেক্‌ট এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নেই।' দক্ষিণদেশী ভাষার ওপর ভিত্তি ক'রেই সাধুভাষা গড়ে উঠেছে। সাধু-ভাষার বন্ধন থেকে ভাষাকে মুক্ত ক'রে তিনি একে মৌখিক ভাষার অনুরূপ ক'রে তুলতে চেয়েছেন। 'খাস কলকাত্তাই' ভাষা তাঁর আদর্শ ছিল না, কিন্তু তিনি এ কথাও বলেছেন যে 'কলকাতার ভদ্রসমাজের মুখের ভাষা অনুসরণ করেই আমাদের চলা কর্তব্য।' চলিত ভাষার ক্রিয়াপদের সংক্ষিপ্ততার কথা তিনি একাধিকবার উল্লেখ করেছেন। কারণ এতে ক্রিয়াপদের অযথা জটিলতাকে যেমন অতিক্রম করা যায়, তেমনি ভাষার মধ্যে একটি গতি সঞ্চারিত হয়। উদাহরণ স্বরূপ তিনি 'আসিতেছি' ও 'আস্‌ছি'

এই দু'টি ক্রিয়াপদের কথা উল্লেখ করেছেন। 'আসিতে' ও 'আছি' এই দুটি ক্রিয়াপদ পাশাপাশি বিদ্যমান—কিন্তু 'আসছি'-তে এই দু'টি ক্রিয়াপদের একটি সংক্ষিপ্ত অথচ সুসঙ্গত সমন্বয় ঘটেছে। এ বিষয়ে চৌধুরী মহাশয়-কথিত 'দক্ষিণ দেশি' ডায়ালেক্‌ট অন্যান্য ডায়ালেক্‌টের চেয়ে অনেক বেশী অগ্রগামী।

ক্রিয়াপদ সম্পর্কে আর একটি প্রশ্নেরও তিনি মীমাংসা করার চেষ্টা করেছেন। চলিত ভাষায় 'তাম', 'তেম', 'তুম', তিনটিই চলে, যেমন—'করতাম' 'করতেম,' 'করতুম'। 'করতুম' মূলত কলকাতা শহরের মধ্যেই আবদ্ধ—বাদবাকি দু'টি রূপের ভৌগোলিক বিস্তৃতি অনেক বেশী। সুতরাং এই দু'টি রূপই সম্ভবত চলিত ভাষার রূপ হিসাবে অধিকতর গ্রাহ্য হবে। আসলে কলকাতার ভাষারও দু'টি রূপ বিদ্যমান—একটি হল খাস কলকাত্তাই বুলি, যাকে শহুরে ককনি বলা যায়, আর দ্বিতীয়টি হল বিভিন্ন অঞ্চলের শিষ্ট শিক্ষিত জনসাধারণের ভাষা। কলকাতা বাংলাদেশের শিক্ষা-সংস্কৃতি, ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রভূমি হওয়ার ফলে বিভিন্ন অঞ্চলের শিক্ষিত ভদ্রলোকের পরস্পরের কথার আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে এক নূতন ভাষা গড়ে উঠেছে। চৌধুরী মহাশয় একেই বলেছেন 'সর্বাঙ্গীন বঙ্গভাষা'। এই উপভাষার ছত্রচ্ছায়ার নীচেই শিক্ষিত বাঙালী ভদ্রলোকের মুখের বুলির পার্থক্য ঘুচে যাচ্ছে। শুধু শহুরে ককনি আঞ্চলিক ভাষার সীমার মধ্যেই আবদ্ধ হ'য়ে রইল। 'আলালী ভাষা' ও 'হুতোমী ভাষা' প্রধানত এই কলকাত্তাই ককনি-ভিত্তিক ভাষা—এইজন্য এর ভৌগোলিক সীমাও নির্দিষ্ট।

বিরুদ্ধবাদীরা সাধুভাষার স্বপক্ষে দু'টি যুক্তির ওপর খুব জোর দিয়েছিলেন, প্রথমত, এই ভাষা আর্টের অনুকূল; দ্বিতীয়ত, চলিত ভাষার চেয়ে সাধুভাষা বিভিন্ন প্রদেশবাসীর কাছে সহজবোধ্য। অধ্যাপক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'সাধুভাষা বনাম চলিত ভাষা' প্রবন্ধে বহু অনুসন্ধানের পর সাধুভাষার স্বপক্ষে দু'টি যুক্তি আবিষ্কার করেছিলেন। এই দু'টি যুক্তির কোনটিই চৌধুরী মহাশয়ের মনঃপূত হয় নি। তাঁর মতে সাধুভাষা যেহেতু কৃত্রিম ভাষা সেইজন্য এখানে 'আর্টের কোনো স্থান নেই'। দ্বিতীয় যুক্তিটি তিনি 'কথার কথা' (বীরবলের হালখাতা) প্রবন্ধে বিধিমতো খণ্ডন করেছেন। ভিন্ন প্রদেশবাসীর কাছে বাংলা ভাষার সহজবোধ্যতা সম্পর্কে তিনি শ্লেষ-তীক্ষ্ণ মন্তব্য করেছেন, 'ভারতবর্ষের বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতি যে ভাষা ভাব আচার এবং আকার সম্বন্ধে নিজেদের বিশেষত্ব হারিয়ে যে এক জাতি হ'য়ে উঠবে এ আশা

করাও যা, আর কাঁঠালগাছ ক্রমে আমগাছ হ'য়ে উঠবে এ আশা করাও তাই।'

'পণ্ডিতি বাংলা' ও 'বাবু-বাংলার' মধ্যে তিনি কোনো কোনো বিষয়ে পূর্বোক্ত ভাষার সমর্থন করলেও বাবু বাংলাকে একেবারেই সমর্থন করতে পারেন নি। প্রমথ চৌধুরীর এই বিশিষ্ট মনোভাব তাঁর ভাষা ও স্টাইলের স্বরূপ-প্রকৃতিকে নির্দেশ করে। পণ্ডিতি বাংলা সংস্কৃতবহুল, শব্দের 'মিষ্টিপ্রয়োগ' সেখানে না থাকতে পারে কিন্তু দুষ্টপ্রয়োগ নেই। প্রসঙ্গক্রমে তিনি রামমোহন রায় ও মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের ভাষার উল্লেখ করেছেন। রামমোহনের গদ্যকে তিনি ভূয়সী প্রশংসা করেছেন, তার কারণ এ ভাষা যথার্থই যুক্তিতর্কের ভাষা। সংস্কৃত টীকাকারদের বাহুল্যবর্জিত গদ্যরীতি ও বুদ্ধিধর্মী অতিসূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণ চৌধুরী মহাশয়ের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। ঠিক সেই কারণেই রাম-মোহনের গদ্যেরও তিনি পক্ষপাতী ছিলেন, 'রামমোহন রায়ের গদ্যের বাগাড়ম্বর নেই, সমাসের নামগন্ধও নেই, এবং সে ভাষা সংস্কৃতবহুলও নয়।' কিন্তু বিদ্যা-সাগরের ভাষা যে এত সুখপাঠ্য হয়েছে তার কারণ হ'ল এই ভাষার অন্বয়গুণ। পণ্ডিতি বাংলাকে নব্য বাংলার লেখকরা অনুকরণ করেন নি—তাঁরা একজাতীয় খিচুড়ি-ভাষার সৃষ্টি করেছেন। তিনি বলেছেন, 'আসল সর্বনেশে ভাষা হচ্ছে চন্দ্রাহত সাহিত্যিকেরা ইংরেজি বাক্য এবং পদকে যেমন-তেমন ক'রে যে খিচুড়ি-ভাষার সৃষ্টি করেছেন, সেই ভাষা। সে ভাষার হাত থেকে উদ্ধার না পেলে বঙ্গ-সাহিত্য আঁতুড়েই মারা যাবে। এবং সেই কৃত্রিম ভাষার হাত এড়াতে হলে মৌখিক ভাষার আশ্রয় নেওয়া ছাড়া আমাদের উপায়ান্তর নেই।'

তিন

সাধুভাষা ও চলিত ভাষার মধ্যে প্রভেদটিকে রবীন্দ্রনাথ একটি ছোট্ট গল্প ক'রে বুঝিয়ে দিয়েছেন, 'রূপকথায় বলে, এক-যে ছিল রাজা, তার ছিল দুই রানী—সুয়োরানী আর দুয়োরানী। তেমনি বাংলা-বাক্যাধীপেরও আছে দুই রানী—একটাকে আদর ক'রে নাম দেওয়া হয়েছে সাধুভাষা; আর একটাকে কথ্যভাষা, কেউ বলে চল্‌তি ভাষা, আমার কোনো কোনো লেখায় আমি বলেছি প্রাকৃত বাঙ্‌লা। সাধুভাষা মাজাঘষা, সংস্কৃত ব্যাকরণ অভিধান থেকে ধার-করা অলংকারে সাজিয়ে তোলা। চল্‌তি ভাষার আটপৌরে সাজ নিজের চরকায় কাটা সুতো দিয়ে বোনা।'[৫] রবীন্দ্রনাথ ত্রিশ

বছরের উদ্যম অনুশীলন ও অনলস সৃষ্টিপ্রবাহের ভেতর দিয়ে কথ্যভাষারও নানা বৈচিত্র্যময় রূপের নমুনা রেখে গিয়েছেন। প্রাক্-সবুজপত্র পর্বে তিনি চলিত ভাষা ব্যবহার করেছেন বটে, কিন্তু কিছু কিছু কুণ্ঠা ও জড়তার চিহ্ন সে ভাষায় আছে। সবুজপত্রের যুগ থেকে এলো দুর্বার বন্যা—অনভ্যাসের জড়তা ও কুণ্ঠার বাঁধ সেখানে ভেঙে দিল। এই অসাধারণ রূপদক্ষ তাঁর রচনার ভেতর দিয়ে শুধু চলিত ভাষার কৌলীন্যই নয়, যথার্থ শিল্পরূপও প্রতিষ্ঠিত করলেন।

ভাষা সম্পর্কে অনেকগুলি রচনায় প্রমথ চৌধুরী তাঁর ভাষাদর্শের পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর নিজের ভাষায় তিনি এই আদর্শ কতটা রক্ষা করতে পেরেছেন, সেইটেই হ'ল বিচার্য। মৌখিক ভাষা সম্পর্কে সর্বপ্রথম চোখে পড়ে সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের সংক্ষিপ্ততা। এই দুটি বিষয়ে কথ্যভাষার শাসন তিনি সম্পূর্ণভাবে মেনে নিয়েছেন। কিন্তু খাঁটি মৌখিক ভাষা এ দু'টি বৈশিষ্ট্যের ওপরেই নির্ভরশীল নয়। কারণ এই ভাষার একটি স্বতন্ত্র স্বরূপ ও প্রাণৈশ্বর্য আছে। বাক্‌রীতি, গতি-ভঙ্গিমা প্রভৃতি বিষয়ে এমন স্বাতন্ত্র্য আছে, যা শুধু ক্রিয়াপদ ও সর্বনামের সংক্ষিপ্ততার ওপরেই নির্ভর করে না। মৌখিক ভাষা যতক্ষণ শুধু মুখের বুলি, ততক্ষণ অত্যন্ত সহজ বলেই মনে হয়, কিন্তু তাকে কলমের মুখে সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ করা সহজ নয়—রীতিমতো সাধনার ব্যাপার। তা ছাড়া সাধুভাষা দীর্ঘকাল অনুশীলন ও কর্ষণার ফলে এমন একটি পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে, যাকে আমরা অনায়াসেই একটা Standard বলতে পারি। আমাদের সংস্কার ও অভ্যাস—দুই-ই এর সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। কিন্তু চলিত ভাষা সম্পর্কে একথা আজও সম্পূর্ণভাবে বলা যায় কিনা সন্দেহ, আর সবুজপত্রের যুগে যে কি অবস্থা ছিল তা সহজেই অনুমান করা যায়। প্রমথ চৌধুরীর ভাষা সম্পর্কে কোন কিছু মন্তব্য করবার আগে এ বিষয়টি মনে রাখা দরকার।

মৌখিক বুলির সঙ্গে তিনি লেখার ভাষাকে এক ক'রে তুলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এ বিষয়ে তিনি অনেকখানি সার্থক হ'লেও সম্পূর্ণ সার্থক হন নি। দৈনন্দিন জীবনের সর্বজনবোধ্য ভাষার সঙ্গে এ ভাষার পার্থক্য অনেকখানি। তিনি সাধুভাষাকে কৃত্রিম বলেছেন, কিন্তু তাঁর ভাষা বিশ্লেষণ করতে গেলে দেখা যাবে যে একজাতীয় কৃত্রিমতা অতিক্রম করতে গিয়ে তিনি নূতন ধরনের কৃত্রিমতার সৃষ্টি করেছেন। বাক্যগঠনের দিকে অতিরিক্ত ঝোঁক বা জোর দিতে গিয়ে দৃষ্টি ও বাগ্‌যন্ত্রকে এত বেশী সচকিত ক'রে রাখতে

হয়, যার ফলে ভাষার সহজ ও স্বচ্ছন্দ-গতি অনেক সময় ব্যাহত হয়। তাঁর ভাষা যে সহজ ও মৌখিক ভাষার অনুসারী ছিল না দু'একটি উদাহরণ দিলেই তা বোঝা যাবে,

'মধ্যযুগের শেষভাগে গ্রীকসাহিত্যর আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপ মানুষের স্বাধীন চিন্তা ও স্বোপার্জিত জ্ঞানের সাক্ষাৎ লাভ করলে। এর ফলে, রোমের ধর্মমন্দিরের অটল ভিত টলটলায়মান হল এবং সেই সঙ্গে ল্যাটিন ভাষায়ও দৈবশক্তি লোপ পাবার উপক্রম হ'ল। গ্রীকভাষার প্রভূত ঐশ্বর্য ও অপূর্ব সৌন্দর্যের তুলনায় ল্যাটিন ভাষা ইউরোপের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের চোখে ক্ষীণস্বত্ব ও হীনপ্রভ হ'য়ে পড়ল। এই গ্রীকসাহিত্যের চর্চায় সে যুগের মনীষিগণ নূতন দর্শনবিজ্ঞানের সৃষ্টি করতে গিয়ে ব্যগ্র হলেন। কিন্তু স্বাধীন-চিন্তাপ্রসূত দর্শন বিজ্ঞান সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্মতন্ত্রকে বিচলিত করতে পারলেও বিপর্যস্ত করতে পারে না'।[৩]

একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের হ্রস্বত্ব ও সংক্ষিপ্ততা ছাড়া এ ভাষা পুরোপুরি সাধুভাষারই লক্ষণাক্রান্ত। 'স্বোপার্জিত', 'টলটলায়মান', 'ক্ষীণস্বত্ব', 'হীনপ্রভ', 'স্বাধীনচিন্তাপ্রসূত' প্রভৃতি তৎসম ও সমাসবদ্ধ শব্দ ব্যবহার করেছেন। সমাসবদ্ধতাও তৎসমশব্দ প্রয়োগকে তিনি ইচ্ছা করলেই বর্জন ক'রে অনেক সহজভাবে একই ভাব যে প্রকাশ করতে না পারতেন এমন নয়। এমন কি সাধুভাষার লেখকদের তুলনায় তাঁর তৎসম শব্দ-প্রয়োগ মোটেই কম নয়। অবশ্য এ কথাও ঠিক যে তিনি তৎসম শব্দকে সাহিত্য-সীমা থেকে বহিষ্কার করতে চান নি, কিন্তু মুখের কথায় তো আমরা যতদূর সম্ভব তৎসম শব্দকে বর্জন ক'রেই থাকি। তা ছাড়া 'করল' ও 'করলে'—দু' রকম ব্যবহারই তাঁর লেখায় দেখা যায়। 'করতাম' 'করতেম' ও 'করতুম' ক্রিয়াপদের এই ত্রিবিধ রূপান্তরও তাঁর লেখায় দেখা যায়। অথচ বিধান দেবার সময়ে তিনি বলেছিলেন, '…'উম'-রূপ বিভক্তিটি অদ্যাবধি কেবল কলকাতা শহরে আবদ্ধ, সুতরাং সমগ্র বাংলাদেশে যে সেটি গ্রাহ্য হবে সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে, বিশেষত যখন 'হালুম' 'হলুম' প্রভৃতি শব্দের সঙ্গে অপর এক জীবের ভাষার সাদৃশ্য আছে।' কিন্তু প্রয়োগের সময় তিনি নিজেই এই বিধি অনেক সময় মানতে পারেন নি।

সমস্যাটিকে একটু বিশদভাবে আলোচনা করা উচিত। সাধুভাষার ও মৌখিক ভাষার পার্থক্য যদি শুধু সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের আয়তনিক পার্থক্য

থেকে ধরা যায়, তাহলে অবিচার হওয়ার সম্ভাবনাই ষোল আনা। সবুজপত্রের যুগের ভাষাবিষয়ক বিতর্কের মধ্যে একটি বড় রকমের ফাঁক ছিল—তর্কের ঝোঁকে এ জাতীয় ফাঁক থাকা এমন কিছু অসম্ভব নয়। সাধুভাষার সমর্থকেরা কথ্যভাষার বিরুদ্ধে তরলতার অভিযোগ এনেছিলেন আবার চলিত ভাষার অনুকারকদের মধ্যেই অনেকেই মনে করতেন সাধুভাষার ক্রিয়াপদগুলি মৌখিক ভাষার মতো ক'রে তুললে বোধহয় চলিত ভাষার সমস্ত রকম বৈশিষ্ট্যই ফুটে ওঠে। এমন কি এ সত্য সাধুভাষার পক্ষপাতীদেরও দৃষ্টি এড়ায় নি। একজন চিন্তাশীল প্রবন্ধকারের কথা শোনা যাক,'…থিওরি হিসাবে সাধুপন্থী ও চলিত-পন্থীদের মধ্যে যতই মতভেদ থাকুক না কেন, প্রকৃতপক্ষে দেখিতেছি, সব প্রভেদ আসিয়া দাঁড়াইয়াছে ক্রিয়াপদ ও সর্বনামগুলি ও আর দুই-চারটি কথা লইয়া।'[৭] বিতর্কের স্রোতে দু'দলই আসল সমস্যা থেকে অনেক সরে গিয়েছেন। সাধুভাষাপন্থীরা যেমন সর্বপ্রযত্নে তথাকথিত 'ইতর ভাষা'কে দূর ক'রে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, তেমনি বিরুদ্ধবাদীরাও তাঁদের ভাষা যে নেহাৎ তরল নয়, এটা প্রমাণ করার চেষ্টা করলেন—ফলে তৎসম-শব্দ-প্রধান জমকালো দেহ ও আয়তন বদলালো না, বদলে গেল শুধু সাধুভাষার পূর্ণায়ত ক্রিয়াপদ।

সাধুভাষার বহিরঙ্গ নিয়ে রবীন্দ্রনাথের এমন অনেক লেখা আছে যা মেজাজের দিক থেকে অনেকটা চলিত ভাষারই সমধর্মী। 'জীবনস্মৃতি' রবীন্দ্রনাথের মধ্যবয়সের লেখা—বহিরঙ্গের দিক থেকে একে সাধুভাষা বলা অসঙ্গত হবে না, কিন্তু গদ্য স্টাইলটির মধ্যে চলিত ভাষার লঘুতা, সাবলীলতা ও মসৃণতা অলক্ষ্যগোচর নয়। 'ছিন্নপত্রে'র বহিরঙ্গ চলিত ভাষার, কিন্তু ভাষার মেজাজটি যে সব সময় চলিত ভাষার অনুরূপ এ কথা বলা যায় না। সাধুভাষা-সুলভ সমাসবহুল শব্দ-বিন্যাস ও মন্থরগতি দীর্ঘায়ত বাক্-পদ্ধতি এ ভাষার অনেক জায়গায়ই লক্ষ্য করা যায়, যেমন, 'আমাদের এই চিরপীড়িত, ধৈর্যশীল, স্বজনবৎসল বাস্তুভিটাবলম্বী প্রচণ্ড কর্মশীল পৃথিবীর এক নিভৃত প্রান্তবাসী শান্ত বাঙালীর কাহিনী কেউ ভালো ক'রে বলে নি।'[৮] 'বলে নি'-র জায়গায় 'বলে নাই' লিখলেই এ ভাষা সাধুভাষা হত। 'চতুরঙ্গ' উপন্যাস সাধুভাষায় লেখা, কিন্তু সে সাধুভাষা যেন চলিত ভাষার একটি ছদ্মবেশ। এতে তিনি যেন প্রমাণ করলেন যে কয়েকটি বহিরঙ্গ লক্ষণেই সাধুভাষা ও কথ্যভাষার পার্থক্য নির্দেশ করা যায় না।

সাধুভাষা ও চলিত ভাষার স্বরূপগত পার্থক্যের কথা মনে রাখলে প্রমথ

চৌধুরীর ভাষাকে একটি সর্বাঙ্গসুন্দর কথ্যভাষা বলা যায় না। কারণ বহিরঙ্গ লক্ষণ সাধুভাষার হলেও সমাসবদ্ধ বাক্-বিন্যাস, তৎসম শব্দের প্রাচুর্য এ ভাষায় আছে—তাই এ ভাষা ধ্রুপদী, ওজনে ভারি। তাঁর ভাষাকে নিভূর্ষণ বা অনলঙ্কৃত ভাষাও বলা যায় না। একে ঠিক রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'আটপৌরে সাজ, নিজের চরকায় কাটা সুতো দিয়ে বোনা' বলা যায় না। তাঁর ভাষা রীতিমত অলঙ্কৃত। কালিদাস রায় মহাশয় কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায় ভঙ্গির সঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর রচনারীতির তুলনা দিয়ে বলেছিলেন, 'বীরবলের রচনাভঙ্গির ক্রম আলঙ্কারিক এবং বীরবলের রচনায় অর্থালঙ্কারের সংযত ও সুসমঞ্জস প্রয়োগ আছে—সেইজন্য বৈচিত্র্য যথেষ্ট। কেদারবাবুর ভঙ্গিটি কৌতুকমধুর ও শব্দালঙ্কার-ভূয়িষ্ঠ। কিন্তু ক্রমটি আলঙ্কারিক নয়—জীবনের অভিজ্ঞতাকেই তিনি প্রাধান্য দেন এবং ঐ অভিজ্ঞতাই তাঁহার রচনার ক্রমনির্দেশ করিয়াছে।'[৯] কৃষ্ণনগরের মৌখিক ভাষার ওপরেই ভিত্তি ক'রে তাকে পরিশীলিত ক'রে তিনি নূতন ধরনের কথ্যভাষা তৈরী করেছেন। কিন্তু এ ভাষাকে প্রমথ চৌধুরী জনসাধারণের সহজবোধ্য ভাষা ক'রে তুলতে পারলেন না। তার কারণ বোধ হয় তাঁর অতিমানসিকতা, নাগরিক বৈদগ্ধ ও মননাতিরেক। তিনি নিজেও তাঁর এই কীর্তি সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দিহান ছিলেন—মনের সংশয় তাঁর ঘোচে নি। এক সময় তিনি অন্নদাশঙ্করকে দুঃখ ক'রে সে কথা বলেছিলেন। অন্নদাশঙ্কর লিখেছেন, 'কিন্তু কথ্যভাষা সম্বন্ধে তাঁর মনের খেদ ছিল। একবার তিনি আমাকে বলেছিলেন যে, আমি যে কথ্যভাষা লিখেছি সেটা কাদের কথ্যভাষা? শিক্ষিত স্তরের। কিন্তু তারাই কি সারা দেশ? সাধারণের কথ্যভাষা আমার লেখনীতে ফোটে নি। আমার এ ভাষাও কৃত্রিম। ···নিজের কীর্তিকেও তিনি যথেষ্ট মনে করেন নি। সাধ্য থাকলে তিনি তাকে ছাড়িয়ে যেতেন, অতিক্রম করতেন। সেই ছাড়িয়ে যাওয়ার অতিক্রম করার দায়টা আমাদেরই ঘাড়ে তুলে দিয়েছেন নীরবে।'[১০]

চার

প্রমথ চৌধুরীর এই ধ্রুপদাঙ্গ চলিত ভাষা সম্পর্কে আর একটি কথাও মনে পড়ে। তৎসম শব্দ ও সমাসবদ্ধ বাক্-বিন্যাসের আধিক্য তাঁর ভাষার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। আবার অনেক সময় এর পাশেই কথ্যভাষার ইডিয়ম বা দেশী শব্দের ব্যবহারও দেখা যায়। এতে সব সময় যে ভাষার মিশ্রণজাত

'গুরুচণ্ডালী' দোষ ঘটেছে এমন কথা বলা যায় না। তৎসম শব্দের মাঝে কথ্য-ভাষার ইডিয়ম দিয়ে অথবা লঘু-গুরু শব্দ পাশাপাশি বসিয়ে তিনি অনেক সময় শ্লেষাত্মক মনোভাবকে সুস্পষ্ট ক'রে তুলেছেন—এই শাব্দিক অসামঞ্জস্য অনেক সময় তাঁর তির্যক দৃষ্টিকেই ফুটিয়ে তোলার সহায়তা করেছে। একটি উদাহরণ নেওয়া যাক, 'এ যুগের কবিদের বাহু যে আজানুলম্বিত নয়, তার জন্য আমাদের লজ্জিত হবার কোন কারণ নেই। বধ এবং সংহার ছাড়া কাব্যের যে অপর কোন কর্তব্য নেই, এ কথা একালে মানা কঠিন। আর যদি এ কথা সত্য হয় যে মার্‌কাট্‌ ব্যাপার না থাকলে কাব্য মহাকাব্য হয় না তাহলে বলতে হয় যে, সাহিত্যজগতের এমন কোনো বিধিবদ্ধ নিয়ম নেই যার দরুণ যুগে যুগে সকলকে শুধু মহাকাব্যই লিখতে হবে।' এখানে 'আজানুলম্বিত,' 'বাহু' শব্দও যেমন আছে, তেমনি' 'মার্‌কাট্‌' শব্দও আছে। আপাতদৃষ্টিতে এই জাতীয় অসমান শব্দের প্রয়োগ নিতান্ত অসঙ্গত ব'লে মনে হবে। কিন্তু লেখকের মনোভাব সুপরিস্ফুট করতে হলে এই জাতীয় লঘু-গুরু শব্দ প্রয়োগের প্রয়োজন ছিল। লেখকের শ্লেষ ও বক্রোক্তির তীব্রতা এতে আরো বেড়েছে। শব্দগত অসামঞ্জস্যও হাস্যরস উদ্রেক করে। দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান অলোচনা করতে গিয়ে তিনি এই প্রসঙ্গটিকেই অন্যভাবে বলেছেন, 'আপনারা সকলেই জানেন যে, সঙ্গীতে কোন বিশেষ রস ফুটিয়ে তুলতে হলে, সেই রসের অনুরূপ সুরের আবশ্যক। করুণ রসের প্রকাশের জন্য সুরও করুণ হওয়া চাই। কিন্তু এ বিষয়ে হাস্যরসের একটু বিশেষত্ব আছে। অনুরূপ কি বিরূপ, সকল রূপ সুরেই গুণীব্যক্তির হাতে হাস্যরস সমান ফুটে ওঠে।' প্রমথ চৌধুরীর হাস্যরস ফুটেছে শব্দগত 'বিরূপতা'র ভেতর দিয়ে। লঘু-গুরু শব্দের পাশাপাশি ব্যবহারের ফলে বাক্যাংশের শ্লেষাত্মক ধ্বনি স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে। এইভাবে লেখকের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে।

স্টাইল যেমন ব্যক্তিত্ব-প্রকাশক, ভাষাও তেমনি ব্যক্তিত্বেরই উন্মোচন করে। প্রমথ চৌধুরীর ভাষা সহজবোধ্য নয়, মুখের ভাষার সঙ্গেও এর পার্থক্য কম নয়, কৃত্রিমতার দোষও আছে। কিন্তু এ ভাষার এমন কতকগুলি গুণ আছে, যা অত্যন্ত সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁর বাক্‌-ভঙ্গির মধ্যে এমন ঘন-সংহত বন্ধন আছে যা প্রচুর সমাসবদ্ধ, শব্দের ভারে ভেঙে পড়ে না—লঘু-গুরু শব্দকে এক সঙ্গে ঢালাই ক'রে দেওয়া হয়েছে যেন। তাই কথ্যভাষার ক্রিয়াপদ, সর্বনাম ও ইডিয়ম নিয়েও এ ভাষা তরল ও চটুল হ'য়ে

ওঠে নি। অভিজাত হ'য়েও যে কত সহজ হওয়া যায় এ ভাষা তাই প্রমাণ করেছে। সে যুগে কথ্যভাষার বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ ছিল এই যে, এ ভাষা 'মেরুদণ্ড হীন'।[১১] কিন্তু প্রমথ চৌধুরীর ভাষা সম্পর্কে এ অভিযোগ করা সঙ্গত নয়। ইস্পাতের কঠিন ফ্রেমে এ ভাষা বাঁধা—তাই যেমন ভারবহ, তেমনি এর শোষণশক্তি। খাঁটি মুখের বুলি তিনি লিখতে পারেন নি, কিন্তু প্রচুর শব্দবাহী সমাসবদ্ধ বাক্যরীতির মধ্যে যে আসলে চলিত ভাষার মেজাজই আত্মপ্রকাশ করেছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। একটি উদাহরণ দিয়েই বক্তব্যটি পরিস্ফুট করা যাক, 'ভগবান গৌতমবুদ্ধের জীবনের ব্রত ছিল মানবের মোহ নাশ করে তাকে সংসারের সকল শৃঙ্খল হতে মুক্ত করা; আর বৎসরাজ উদয়নের জীবনের ব্রত ছিল ঘোষবতী বীণার সাহায্যে অরণ্যের গজকামিনী এবং অন্তঃপুরের গজগামিনীদের প্রথমে মুগ্ধ ক'রে পরে নিজের ভোগের জন্য তাদের অবরুদ্ধ করা। অথচ সংস্কৃত কাব্যে বুদ্ধচরিতের স্থান নেই, কিন্তু উদয়ন কথায় তা পরিপূর্ণ।'—উদ্ধৃত গদ্যাংশটির গঠনরীতির মধ্যে অনেকগুলি ভারী তৎসম শব্দ আছে—শব্দগুলিকে কোন মতেই হাল্‌কা বা লঘু বলা চলে না। অথচ ভাষা এর চেয়েও অনেক সরল ও তরল করা সম্ভব ছিল। 'অরণ্যের গজকামিনী', 'অন্তঃপুরের গজগামিনী', 'অবরুদ্ধ করা' প্রভৃতি তৎসম শব্দ সত্ত্বেও কথ্য ভাষার মেজাজটি এখানে মোটেই অনুপস্থিত নয়, বরং এই সমস্ত শব্দ গদ্যাংশটিকে শ্লেষ-গাঢ় ক'রে তুলেছে। প্রমথ চৌধুরীর ভাষা সম্পর্কে শ্লেষের কথা মনে হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক। দণ্ডীর কাব্যাদর্শে স্টাইলের যে দশটি গুণের উল্লেখ করা হয়েছে, তার প্রথমটিই হ'ল 'শ্লেষ'। শ্লেষই রচনাকে গাঢ়বদ্ধ ক'রে তোলে—কারণ শ্লিষ্টতাই হ'লো শ্লেষ। বামন শ্লেষের প্রধান বৈশিষ্ট্যকে বলেছেন মসৃণত্ব। সংস্কৃতে সমাসবদ্ধতার আধিক্যের জন্য একজাতীয় সংযোগের সৃষ্টি হত; কিন্তু চলিত ভাষাকে গাঢ়বদ্ধ করতে হ'লে শব্দগুলির প্রত্যেকের স্পষ্টতা ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করেও 'বৈদর্ভী শ্লেষ' দিয়ে তাকে গাঢ় করতে হয়।

এই প্রসঙ্গে অতুলচন্দ্র গুপ্তের একটি মন্তব্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, 'প্রমথবাবুর গদ্যরীতির একটি প্রধান কথা হচ্ছে বাঙলা গদ্যকে সম্পূর্ণ বৈদর্ভী শ্লেষ দিয়ে গাঢ়বদ্ধ করা, গৌড়ী ওজঃ-এর সঙ্গে কোন আপস না রেখে, সমস্ত রকম দীর্ঘ সমাস ও শব্দাড়ম্বর বর্জন করতে হবে, অথচ রচনা হবে যেমন আঁটসাঁট তেমনি মসৃণ। সকলেই জানেন বাঙলায় ক্রিয়াপদ নিয়ে

লড়াইটাই ছিল যুদ্ধের একটি প্রধান পর্ব।…'হইয়া', 'করিয়া', 'যাইয়া', 'হইতেছিল', 'করিতেছিল', 'যাইতেছিল'—এসব ক্রিয়াপদ বাক্যের মধ্যে আনলে তাকে গাঢ়বন্ধ করা একরকম অসম্ভব কাজ। …অর্থাৎ ক্রিয়াপদগুলির ঠিক ও রূপ বজায় রেখে বাঙলা গদ্যে শ্লেষ আনা যায় না এবং শ্লেষ ছিল প্রমথবাবুর লক্ষ্য। …ক্রিয়াপদগুলি ছোট হ'য়ে গাঢ়বন্ধত্বের সহায় হয়েছে, কিন্তু স্বল্পক্ষম লেখকের হাতে পড়লেই মসৃণত্বের পরিপন্থী হ'য়ে ওঠে। এ দুর্বলতা সম্পূর্ণ গোপন ক'রে বাঙলা গদ্যকে বৈদর্ভী শ্লেষের পূর্ণ গঠন দিতে পারে শুধু প্রমথবাবুর মতো যারা ওস্তাদ আর্টিস্ট।'[১২] কিন্তু সমাস ও শব্দাড়ম্বর বর্জিত হলেও একে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করা প্রমথ চৌধুরীর পক্ষে সম্ভব ছিল না। সংস্কৃত শব্দ-সম্পদকে নানাভাবে প্রয়োগ করে তিনি ভাষার ঐশ্বর্য বাড়িয়েছেন, আবার অন্যদিকে নিত্যপ্রচলিত অনভিজাত শব্দ ও চলিত ভাষার ইডিয়মকেও তিনি বর্জন করেন নি।

বাংলা গদ্যের চলতি রূপকে চূড়ান্ত সীমায় নিয়ে গিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। প্রমথ চৌধুরী একে অনেক দূর নিয়ে গেলেও এর সর্বশেষ রূপকরণের জন্য রবীন্দ্রনাথের মতো অসাধারণ শিল্পীর প্রয়োজন ছিল। কথ্যভাষার রীতি অনেকগুলি। সাধুভাষার একটি অতি-নির্দিষ্ট রীতি আছে, দীর্ঘকালের কর্ষণার ফলে সেই রীতি তৈরী হয়েছে। কিন্তু কথ্যভাষার মধ্যে বিভিন্ন স্তর আজও চোখে পড়ে—সাধুভাষার সঙ্গে সম্পর্কের তারতম্য নিয়ে এক-একটি রীতির সৃষ্টি হয়েছে। প্রমথ চৌধুরীর চলিত ভাষা একটি বিশেষ স্তরেই আবদ্ধ হ'য়ে রইল—তার যেন ক্রমপরিণতি নেই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নিজের সৃষ্টিকে বার বার অতিক্রম করেছেন—তাঁর শেষ ত্রিশ বছরেরর গদ্যরচনার মধ্যে তার বিস্ময়কর অভিব্যক্তি আছে। কথ্যভাষার সর্বময় রূপসিদ্ধি, সূক্ষ্ম সুগভীর ব্যঞ্জনা, ও ঐশ্বর্যদীপ্ত কল্পনা-প্রসারতা রবীন্দ্রনাথের ত্রিশ বছরের গদ্যরীতির অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য। তাই 'ঘরে-বাইরে'র গদ্য একদিন 'শেষের কবিতা'র বাণী-বিলাসে পরিণত হয়েছে। সবুজপত্রের যুগের ভাষাকেও ভেঙে-চুরে আর এক নূতন ভাষার সৃষ্টি হ'ল। ভাষাকে যতদূর সম্ভব সংক্ষিপ্ত ও লঘু করে তোলা হয়েছে। 'ঘরে-বাইরে'র ভাষায় উগ্রতা আছে, ভাষার জন্য যেন কবিকে পৃথক যত্ন নিতে হয়েছে—তাই ভাষার উপকরণের দিকেই প্রধানত নজর পড়ে। 'শেষের কবিতা'র ভাষা অনেক বেশী স্বচ্ছন্দ, সংক্ষিপ্ত ও দ্রুতসঞ্চারী, মোড়ফেরার কৌশলটি যেমন অতর্কিত তেমনি চকিত, বিদ্যুতের সোনালী লেখায় রেখাঙ্কিত।

নয়েন মিটারের পরিচয় দিতে গিয়ে কবি বলেছেন, 'য়ুরোপের শ্রেষ্ঠ দরজিশালার রেজিস্ট্রী বহিতে ওর গায়ের মাপ ও নম্বর লেখা এমন-সব কোঠায়, যেখানে খুঁজলে পাতিয়ালা-কর্পূরতলার নাম পাওয়া যেতে পারে। ওর শ্ল্যাঙ্-বিকীর্ণ ইংরেজি ভাষার উচ্চারণটা বিজড়িত, বিলম্বিত, আমীলিত-চক্ষুর-অলস-কটাক্ষ-সহযোগে অনতিব্যক্ত ; যারা অভিজ্ঞ তাদের কাছে শোনা যায়, ইংলণ্ডের অনেক নীলরক্তবান্ আমীরদের কণ্ঠস্বরে এইরকম গদ্‌গদ জড়িমা। এর উপরে ঘোড়দৌড়ীয় অপভাষা এবং বিলিতি শপথের দুর্বাক্যসম্পদে সে তার দলের লোকের আদর্শ পুরুষ।' 'শেষের কবিতা'য় ভাষায় রূপের ইন্দ্রজাল আছে—বিদ্রূপের বাঁকাহাসি কখনো এই ভাষাকে বক্রশীর্ষ অসিফলকে পরিণত করেছে, আবার কখনো বিহ্বল কল্পস্বপ্নের সুখাবেশ এই ভাষাকে কোমল ক'রে তুলেছে। অশীতিস্পৃষ্ট রবীন্দ্রনাথের 'ছেলেবেলা' ও 'তিনসঙ্গীর' ভাষা অনেক বেশী নমনীয়—জীবন-রঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায়ের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত মহাকবির হাতের জাদুদণ্ড-স্পর্শে বাংলা গদ্য প্রতিমুহূর্তে নূতন রূপলীলায় ধন্য হ'য়ে উঠেছে। এইভাবেই সবুজপত্রের চলিত ভাষার আন্দোলন সাহিত্যিক কৌলিন্য পেয়েছে।

'সবুজপত্র' পর্বের এই চলিত ভাষা আন্দোলনের বিরুদ্ধে সর্বশেষ সক্রিয় লেখনী ধারণ করেছিলেন কবি-সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার। তাঁর মতে চলিত ভাষা বাঙালীর সুদীর্ঘকালের ভাষাগত আদর্শকে ক্ষুণ্ন করেছে। 'জাতির আত্মভ্রষ্টতা'ই এর মূল কারণ। রবীন্দ্রনাথকেই তিনি এ-বিষয়ে প্রধানত দায়ী করেছেন, 'ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথের চিঠির ভাষা, শান্তিনিকেতনে তাঁহার মৌখিক আলাপ-আলোচনা ও ধর্ম-ব্যাখ্যানের ভাষা এবং তাহার লিপিবদ্ধ রূপ, বাংলা-গদ্যের জাত্যন্তর ঘটাইতে, শিশুবিদ্যা গরীয়সী করিয়া তুলিতে যথাসম্ভব সহায়তা করিয়াছিল।'[১৩] মোহিতলালের বক্তব্যের মধ্যে নিঃসন্দেহে এক তীব্র আক্রমণাত্মক দিক আছে, কিন্তু মন্তব্যের কোনো কোনো অংশ আজও প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন,

ক. 'গদ্যে যাহারা চলিত ভাষাকে আদর্শ করিতে চাহিল তাহারা একটি কৃত্রিম ভাষা গড়িয়া তুলিল—সমাজের এক সম্প্রদায়ের বৈঠকখানায়, কৃত্রিম স্বর-ভঙ্গিতে আধো-আধো টানাটানা উচ্চারণে যে ধরনের কথাবার্তা হয়, ইহা সেই ভাষা ; ইহাতে 'ককনি'-উচ্চারণযুক্ত 'ককনি' বুলির মিশ্রণও অল্প নহে। এ ভাষা যেমন পুঁথির ভাষাও নয়, তেমনি ইহা বাঙালী সন্তানের মুখের বুলিও নহে।'

খ. রবীন্দ্রনাথের কথা বলিতেছি না, এত বড় ওস্তাদের ওস্তাদীর কথাই স্বতন্ত্র। অপর দু'একজন যাঁহারা সাধুভাষাকেই উচ্চারণ বদলাইয়া 'চল্‌তি' নামে চালাইয়া থাকেন, তাঁহাদের কথাও বলি না—যদিও এই নাটের গুরু তাঁহারাই; যাঁহারা এই নূতন ভঙ্গির অনুকরণ করিয়া থাকেন, খাঁটি বাংলা-বুলি তাঁহাদের জানা নাই, কেবল ক্রিয়াপদগুলি ভাঙ্গিয়া দেওয়াই তাঁহাদের একমাত্র বাহাদুরী। এই ক্রিয়াপদের খর্বতা সাধনই যেমন এ ভাষার একমাত্র মৌলিক লক্ষণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তেমনই এই রন্ধ্রপথেই যত অনাচার প্রবেশ করিতেছে।'

মোহিতলালের এই উদ্ধৃতি-দুইটির মধ্যে তীব্র আক্রমণের ভাষা ও উষ্মার সুর বহ্নিমান হয়ে উঠেছে। বক্তব্য-দুটিতে আতিশয্য থাকলেও বীরবলী ভাষা যে 'বাঙালী সন্তানের মুখের বুলি' নয় একথাও তিনি প্রবল আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে ঘোষণা করেছেন। দ্বিতীয়ত, সে যুগের কারো কারো চলিত ভাষায় ক্রিয়াপদ-হ্রস্বতার সুযোগ নিয়ে যে 'রন্ধ্রপথে অনাচার' প্রবেশ করেছিল, এ বিষয়েও কোন সন্দেহ নাই। রবীন্দ্রনাথ-প্রমথ চৌধুরীর পক্ষে যা সম্ভব ছিল, স্বল্পশক্তি লেখকদের কাছে তা সম্পূর্ণ অনায়ত্ত ছিল। প্রমথ চৌধুরীর ভাষা আদর্শ চলিত ভাষা এ কথা স্বীকার করা যায় না। কিন্তু বাংলা গদ্যের বৈচিত্র্যহীনতা, শৈথিল্য ও অস্পষ্টতার বিরুদ্ধে এই প্রোজ্জ্বলবুদ্ধি লেখক যে সংগ্রাম করেছিলেন, তারই বৈশিষ্ট্য ও স্বাক্ষর এই ভাষাকে সঞ্জীবিত করেছিল। প্রমথ চৌধুরীর মানসিকতা, স্টাইল ও ভাষা—এই ত্রিবেণীবন্ধন অবিচ্ছেদ্য।

১. বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য (দ্বিতীয় সংস্করণ): পৃঃ ১২১।

২. The work has been written in simple style, and to foreigners desirous of acquiring an idiomatic knowledge of the Bengali language and an acquaintance with Hindu domestic life, it will perhaps be found useful.

৩. বাঙ্গালা ভাষা: বিবিধ প্রবন্ধ (দ্বিতীয় খণ্ড)।

৪. এই সম্পর্কে শ্রীপ্রমথনাথ বিশীর একটি মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য, 'সাহিত্যের মৌখিক ভাষা সাহিত্যের লৈখিক ভাষার মতই দেশব্যাপী পটভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক, আঞ্চলিক ভাষা সে দাবি করিতে পারে না।...এদিক দিয়া বিচার করিলে সাহিত্যের লৈখিক ভাষা ও মৌখিক ভাষা দুই-ই সমানভাবে লেখকের হাতে গড়া, ইচ্ছা করিলে ঐ অর্থে কৃত্রিম শব্দটিও ব্যবহার করা যাইতে পারে। আঞ্চলিক ভাষা সে অর্থে কৃত্রিম নহে, কিন্তু তাহা সর্বজনবোধগম্য নহে, তাহার প্রভাব বিশেষ ক্ষেত্রেই আবদ্ধ।'—বাংলার লেখক, পৃঃ ৭১।

৫. বাংলাভাষা পরিচয় : পৃঃ ৩৮।

৬. বাংলার ভবিষ্যৎ : আমাদের শিক্ষা

৭. চলিতভাষা ও সাধুভাষা : নারায়ণ : অগ্রহায়ণ, ১৩২৩ ও ভাদ্র, ১৩২৪।

৮. ছিন্নপত্র, ৫নং।

৯. সাহিত্য-প্রসঙ্গ (প্রথম খণ্ড) : পৃ: ১১-১২।

১০. প্রমথ চৌধুরী ; সবুজপত্র ও আমি : আধুনিকতা : পৃ: ৩৫।

১১. 'আনন্দের মনোরম বিক্ষোভের অন্তরালে রহিয়াছে তীব্র তাপস-প্রকৃতি। মৌখিক ভাষা কবিতার এই তপস্বী প্রাণকে ফুটাইয়া তুলিতে পারে না। তাই দৈনন্দিন কথোপকথনের ভাষা দেখি যেন কেমন মেরুদণ্ডহীন ; নিজের উপর জোর করিয়া দাঁড়াইবার ক্ষমতা নাই, আশ্রয়চ্যুতা পেলবাঙ্গী লতিকাটির ন্যায় ধরিত্রীপৃষ্ঠে লুটাইয়া চলিয়াছে।...ভাষা হইবে যেন সোনার তার, সেই প্রকার নমনীয় অথচ সেই প্রকারই কঠিন, ভারসহ। এলায়িত বিহ্বলতা ভাষার একমাত্র গুণ নহে।—'নারায়ণ : অগ্রহায়ণ, ১৩২৩ ও ভাদ্র ১৩২৪।

১২. রীতিবিচার : শ্লেষ : পরিচয়, কার্তিক, ১৩৩৮।

১৩. আধুনিক সাহিত্যের ভাষা : আধুনিক বাংলাসাহিত্য, পৃ: ২৩৫।

ভাবী কালের সঙ্কেত

কোনো লেখকের লেখা সম্পর্কে চূড়ান্ত অভিমত দেওয়া সম্ভব নয়। অল্পকাল আগেও যিনি আমাদের মধ্যে ছিলেন, তাঁর লেখা সম্পর্কে তো নয়ই। সময়ের দূরত্ব ও কালের ব্যবধান এ বিষয়ে অনেকখানি সাহায্য করে। আজ থেকে প্রায় বারো বছর আগে (১৯৪৬) প্রমথ চৌধুরীর তিরোধান ঘটেছে। তাঁর সম্পর্কে কিছু কিছু খণ্ড-বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধ এবং একখানি পূর্ণাঙ্গ ও সুলিখিত গ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছে। প্রমথ চৌধুরী সম্পর্কে কৌতূহলের সীমাও ক্রমবর্ধিত হচ্ছে। তথাপি একটি বিষয়ে কৌতূহল থেকে যায়—সেটি হ'ল বাংলাসাহিত্যে তাঁর প্রভাবের কথা। বাংলাসাহিত্যে তাঁর প্রভাব কতখানি এবং কি জাতীয় ? এর চেয়েও আর একটি দুরূহ প্রশ্ন আছে, প্রমথ চৌধুরীর পরবর্তী কালের সাহিত্যে তাঁর ধারা কতদূর সার্থক হয়েছে। সমকালে ও তার পরবর্তী কালে তাঁর যে প্রভাব পড়েছে—এ দু'য়ের মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে কি না ? এই জাতীয় প্রশ্নগুলির বিচার করতে হ'লে তাঁর সমকালের কথাই আগে তুলতে হবে।

প্রাক্-সবুজপত্র যুগে তাঁর রচনার পরিধি নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বললেও চলে। সাহিত্য-জগতে তাঁর তখন বিস্তৃত পরিচয় ঘটে নি। 'সবুজপত্র' প্রতিষ্ঠার পর থেকেই তাঁর শুধু সাহিত্যিক খ্যাতি নয়, সাহিত্যিক প্রভাবও ছড়িয়ে পড়েছে। সর্বপ্রথম প্রভাব পড়েছে সবুজপত্রের অতি ক্ষুদ্র, অথচ নির্বাচিত সাহিত্যিক গোষ্ঠীর ওপর। এই পর্বের কয়েকজন সাহিত্যিক পরবর্তী কালেও চিন্তায় ও গদ্য-স্টাইলে বিশেষত্ব দেখিয়েছেন। তাঁদের রচনার ওপর প্রমথ চৌধুরীর প্রভাব অনস্বীকার্য। চিন্তায় ও রূপকর্মের বৈশিষ্ট্যে তিনি নব্যতন্ত্রী লেখকদের পথ নির্দেশ করেছেন। প্রমথ চৌধুরীর সাক্ষাৎ প্রভাবের কথা আলোচনা করতে হ'লে সর্বপ্রথম মনে পড়ে ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর কথা। 'সবুজপত্র'-কে অবলম্বন করেই তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভার উদ্বোধন ঘটে। তাঁর রচনার পরিধি খুব বেশী নয়, কিন্তু প্রত্যেকটি লেখায় একটি ব্যক্তিত্বের ছাপ আছে। সঙ্গীতজ্ঞা হিসাবে তাঁর সিদ্ধি সুবিদিত, শুধু তাই নয় সঙ্গীত-সমালোচনার ইতিহাসেও তাঁর বিচার ও মন্তব্যগুলি মননশীলতার পরিচয় দেয়। উনিশ শতকের বাঙালীদের কেউ কেউ ইংরেজী ভাষার সঙ্গে ফরাসী ভাষারও চর্চা করেছেন—মূল ফরাসী ভাষা থেকে অনুবাদ ক'রে বাংলাসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। প্রমথ

চৌধুরীর মতো ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর ফরাসী ভাষা ও সাহিত্যে অধিকার ছিল। পিতৃকুল ও শ্বশুরকুল—দুদিক থেকেই তিনি তাঁর সমৃদ্ধ মনোজীবন গড়ে তোলার প্রচুর উপকরণ পেয়েছিলেন। মননশীলতায়, বৈদগ্ধ্যে ও রূপ-রুচির সাধনায় তিনি ছিলেন প্রমথ চৌধুরীর সুযোগ্যা সহধর্মিণী ও সহমর্মিণী। চৌধুরী-দম্পতি সম্পর্কে বলা হয় 'Bengal's most distinguished Couple'—নিঃসন্দেহে এ বিশেষণ অত্যুক্তি নয়।

তথাপি সাহিত্যক্ষেত্রে ইন্দিরা দেবীর আবির্ভাবের পেছনে রয়েছে সবুজপত্রের তাগিদ ও রবীন্দ্রনাথ প্রমথ চৌধুরীর প্রেরণা এবং উৎসাহবাক্য। অনুবাদ ও মৌলিক রচনা দুদিকেই তিনি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। আন্দ্রে জিদ-অনূদিত ফরাসী গীতাঞ্জলির ভূমিকার অনুবাদ নিয়ে তিনি সবুজপত্র পত্রিকায় প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন।[১] পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় সবুজপত্র উঠে যাওয়ার প্রাক্কালে ইন্দিরা দেবীর যে ছবি ফুটিয়েছেন, তা থেকেই বোঝা যাবে যে তিনি এই পত্রিকার কতখানি ছিলেন, 'ন'মার (ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী) কাছে বিদায় নিতে গেলাম। তিনি বললেন, 'ব্যাপার ত সবই জানি, কিন্তু রবিকাকার কাছ থেকেও কোন ভরসা না পেয়ে উনি (প্রমথ চৌধুরী) একেবারে মুষড়ে পড়েছেন। আমি হয়ত কখনো-সখনো লিখি, কিন্তু ওঁদের কলম বন্ধ হ'লে শুধু আমার লেখায় 'সবুজপত্র' চলে না।

'তোমার সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করবেন, সেকথা আমাকে আগেই বলেছেন তিনি। কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে, 'সবুজপত্র' উঠে গেল ওঁর মনের হতাশা আরও বেড়ে যাবে, তখন হয় ত জীবনকেই মনে করবেন দুর্বহ। যত শীগগির সম্ভব আমি এ সম্বন্ধে রবিকাকার সঙ্গে পরামর্শ করব।'[২]··· সবুজপত্রে ইন্দিরা দেবীর রচনার সংখ্যা খুব বেশী না হ'লেও এর অন্তরালে যে এই অসামান্য মহিলার প্রেরণা ও আন্তরিকতা কতখানি ছিল তা অনুমান করতে অসুবিধে হয় না। বাংলাসাহিত্যের বিবর্তনের ইতিহাসে সবুজপত্রের দান অবিস্মরণীয়—আজ চল্লিশ বছরের ব্যবধানে সে-কাল ইতিহাসে পরিণত হয়েছে। সেই ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরীর পরেই যে নামটি মনে পড়বে সেটি হ'ল ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর।

ইন্দিরা দেবীর গদ্য-স্টাইল ও রচনা-প্রকর্ষের ওপর বীরবলী স্টাইলের প্রভাব সুস্পষ্ট। প্রমথ চৌধুরীর মতো সম্ভবত তাঁরও রচনার আদর্শ ছিল ফরাসী ভাষার সুকর্ষিত গদ্যরীতি। ঘনসংহত বাক্‌-বিন্যাস, ভাবাবেগ-বর্জিত বুদ্ধিদীপ্ত

রূপরচনা, পরিচ্ছন্ন ও সুমার্জিত প্রকাশভঙ্গি তাঁর রচনাগুলিকে বিশেষত্ব-মণ্ডিত করেছে। অবশ্য প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে তাঁর গদ্যরীতি ও ভাষার কিছু পার্থক্যও আছে—বোধ হয় সে পার্থক্যও খুব বেশী প্রকৃতিগত নয়, যতখানি পরিমাণগত। ইন্দিরা দেবীর ভাষায় সমাসবদ্ধ শব্দের সংখ্যা অনেক কম—চৌধুরী মহাশয়ের গদ্যরীতি শব্দ-সম্ভারে অনেক বেশী ভারী, তির্যক-ভঙ্গির কৌটিল্য চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। ইন্দিরা দেবীর রীতি অনেক লঘু, অনেক সময় মুখের বুলিতেই পরিণত হয়েছে—চৌধুরী মহাশয়ের ভাষার চেয়ে অনেক সরল ও লঘুস্পন্দী। চৌধুরী মহাশয়ের ভাষায় অলঙ্কারের প্রাচুর্য ও মণ্ডনকলার প্রবণতা লক্ষণীয়। ইন্দিরা দেবীর ভাষা অনলঙ্কৃত না হ'লেও সেখানে মণ্ডনকলার প্রয়াস অনেক কম। কিন্তু আসল জায়গায় এই দু'জনের গদ্যস্টাইলের ঐক্য চোখে পড়ে। ইন্দিরা দেবীর গদ্যও বুদ্ধিমার্জিত—আবেগের আতিশয্য তাঁর বক্তব্যকে বাষ্পাচ্ছন্ন ক'রে তুলতে পারে নি। একটি তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণী মন বস্তুর মর্মমূলকে অনায়াসে উদ্ভাসিত ক'রে তুলতে পারে। মৃদু ভ্রূভঙ্গি, শ্লেষ, সংক্ষিপ্ত অথচ তীক্ষ্ণাগ্র বাক্যাংশের ব্যবহার প্রভৃতিতে তিনি বীরবলী রীতির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। দু'একটা উদাহরণ নেওয়া যেতে পারে, 'নানামুনির নানা মতের ভিতর সংগীতশাস্ত্রে ভরত ও হনুমন্তের মতই প্রধান। ভরত বাল্মীকির সমসাময়িক, এবং আদি নাট্যকার বলেও প্রসিদ্ধ। হনুমন্ত আমাদের আবাল্য-সুহৃদ পবননন্দন কি না তা বলা যায় না, তবে ঐ নামে একজন পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন, এটুকু নিশ্চিত।' উদ্ধৃত বাচন-ভঙ্গিটির মধ্যে প্রমথীয় চাতুর্য ও শ্লেষাত্মক রীতি দীপ্ত হ'য়ে উঠেছে। চৌধুরী মহাশয়ের মতো তিনিও বিচিত্র বিষয়ের ওপর আলোকপাত করেছেন, কিন্তু কোথাও অকারণ পাণ্ডিত্য জাহির করার প্রয়াস নেই। যে কোন বিষয়ই হোক না কেন, বলার ভঙ্গিতে ও সরসতায় তা সুখপাঠ্য হয়ে উঠেছে। ইন্দিরা দেবীর স্টাইল সম্পর্কে আর একটি কথা মনে হয়। তাঁর স্টাইলের ওপর রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরী দু'জনের রচনারীতির প্রভাবই পড়েছে—সবটা প্রমথ চৌধুরীর নয়। তাই ইন্দিরা দেবীর গদ্যরীতির ভেতরে যেন রাবীন্দ্রিক ও প্রমথীয় দুই রীতির মাল্যবন্ধন হয়েছে। অনুবাদ-সাহিত্য, বেল্-লেত্যর জাতীয় রচনা ও চিন্তাশীল প্রবন্ধ—তিন শ্রেণীর রচনাতেই তিনি সমান দক্ষতা দেখিয়েছেন।

দুই

'সবুজপত্র' পত্রিকার নিয়মিত লেখকদের মধ্যে অনেকেই পরবর্তী কালে

বাংলাসাহিত্যে খ্যাতিলাভ করেছেন। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের স্মৃতিচিত্রের মধ্যে 'সবুজপত্র' গোষ্ঠীর একটি লোভনীয় বর্ণনা আছে—সেখানে তিনি বিশেষভাবে ক'জনের নাম করেছেন, '···একদিকে প্রকাশভঙ্গীর সহজ রূপ, অপরদিকে যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গী—এই দুয়ের আকর্ষণে 'সবুজপত্র'কে ঘিরে একটি বিশিষ্ট গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল। সেই গোষ্ঠীর মধ্যে যাঁদের কথা আমার বিশেষ ক'রে মনে আছে, তাঁদের মধ্যে অতুলচন্দ্র গুপ্ত, কিরণশঙ্কর রায়, সতীশচন্দ্র ঘটক, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়; বিশ্বপতি চৌধুরী, হারিতকৃষ্ণ দেব, বরদাচরণ গুপ্ত, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, এঁরা সকলেই সংস্কৃতি-জীবনে প্রথিতযশা হয়েছেন'।[৩] এঁদের সকলের রচনায় প্রমথ চৌধুরীর প্রভাব সমানভাবে পড়েছে, এ কথা বলা যায় না। কিন্তু জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিচিত্র চিন্তায় তাঁরা সকলেই যে উন্নত মানসিকতার অধিকারী ছিলেন এবং চৌধুরী মহাশয়ের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

সতীশচন্দ্র ঘটক ও বরদাচরণ গুপ্ত—দুজনের নামই আধুনিককালে বিস্মৃত-প্রায়। সতীশচন্দ্র সবুজপত্রে নানাধরনের লেখাই লিখেছেন। সেদিক দিয়ে তাঁর বিষয়-বৈচিত্র্য কম ছিল না। আসল কথা 'সবুজপত্র' গদ্যরচনার ইতিহাসে যে মজলিশী মেজাজ সঞ্চারিত করেছিল তা অল্প-বিস্তর সবুজপত্রীদের সকলের লেখায়ই পাওয়া যায়। পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ ও সমালোচনার ক্ষেত্রে যেমন সতীশচন্দ্রের বিশ্লেষণী শক্তি ও মননশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনি হাস্যরসাত্মক লঘুরচনা ও প্যারডি রচনায়ও তাঁর অসাধারণ দক্ষতা ছিল। প্রত্যক্ষদর্শী বর্ণনা ক'রেছেন, 'এঁদের মধ্যে সব চেয়ে আগে আমার মনে হয় সতীশচন্দ্র ঘটক মহাশয়ের কথা। তিনি দীর্ঘকাল পরলোকগত হয়েছেন, তবুও তাঁর হাস্যরস-প্রবণতা ভুলতে পারি নি। বিশেষ ক'রে তিনি একদিন হাসির যে বংশ-তালিকা পেশ করেছিলেন, ঠিক সেই ধরণের রসের জিনিস আর কোথাও পেয়েছি কিনা সন্দেহ···কিন্তু আশ্চর্য, এই সমস্ত ব্যাখ্যা করার সময় কিংবা বিমল হাস্যরস পরিবেশনের সময় তাঁকে কখনো হাসতে দেখা বা শোনা যেত না। অথচ কথা-প্রসঙ্গে কত রসের টিপ্পনীই যে তিনি কাটতেন। কথায় কথায় প্যারডির তিনি ছিলেন রাজা।'[৪] 'সবুজপত্র' পত্রিকার স্মৃতি-চিত্রকর সতীশচন্দ্রের যে ব্যক্তিচরিতের উল্লেখ করেছেন তা তাঁর রচনার মধ্যেও ফুটেছে। উদ্ধৃত অংশটিতে সতীশচন্দ্রের বিখ্যাত 'হাসি' প্রবন্ধটিরই[৫] প্রসঙ্গ

উল্লেখ করা হয়েছে। সবুজপত্রের আদর্শকেই তিনি রচনায় নানাভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। সম্পাদক প্রমথ চৌধুরী করুণ রসের স্যাঁতসেতে দেশে হাস্যরসের আলো ফোটাতে চেয়েছিলেন, শিষ্য সতীশচন্দ্র তাকেই যেন বর্ণনা ও বিশ্লেষণের সাহায্যে পরিস্ফুট ক'রে তুলেছেন। সামান্য বিষয়ও যে স্নিগ্ধোজ্জ্বল প্রসন্ন মনের খেয়াল-খুশির লীলায় কত সুন্দর হ'য়ে উঠতে পারে তার উদাহরণ তাঁর অনেক লেখায় ছড়িয়ে আছে। তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হ'ল তাঁর উদ্ভিদতত্ত্ব-সম্পর্কিত কয়েকটি সরস রচনা। রচনাগুলি এক হিসেবে 'পপুলার সায়েন্স' জাতীয়। লেখাগুলি পরিভাষা-কণ্টকিত টেক্‌নিক্যাল লেখা নয়, বিষয়কে সরস ও উপাদেয় ক'রে তোলা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ এই পর্যায়ের রচনাগুলি সম্বন্ধে বলেছেন, 'সবুজপত্রে গাছ সম্বন্ধে যে লেখা বের হচ্ছে সেটা বড় উপাদেয় ঠেক্‌চে। বিষয়টি এমন সরল সরস ক'রে লেখা সহজ নয়। ওটা অবিলম্বে ছেলেদের জন্যে বই আকারে প্রকাশ করা উচিত, যদিও ছেলেদের বাপ-দাদারাও যদি যথোচিত নম্র হ'য়ে ওটা পড়েন তাহলে বঞ্চিত হবেন না।'[৬]

সতীশচন্দ্রের রচনারীতি অনেক সরল ও কথ্যভাষাশ্রয়ী—ছোট ছোট শব্দের মিহি সুতোয় গাঁথা—তাঁর হাসি ঠিক 'স্যাটায়ার' জাতীয় নয়—অনাবিল কৌতুক রসই তাঁর রচনার উপজীব্য। বীরবলী রচনায় বিদ্রূপের ঝাঁঝও আছে, কিন্তু সতীশচন্দ্রের রচনায় ফুটেছে কৌতুকের স্নিগ্ধতা। সতীশচন্দ্রের রচনা থেকে একটি উদাহরণ নিলেই তাঁর রচনারীতির বৈশিষ্ট্য উদ্ঘাটিত হবে। 'ফুলের বিয়ে' রচনায় বলেছেন,

'যে ফুলের যে ঘটক, সে ফুল সে ঘটকের মনের মতো রং পরে সেজেগুজে বসে থাকে। ছোট ছোট পোকা-মাছিরা যে ফুলের ঘটক, সে ফুলের রং সাদা কি হলদে, কিম্বা সাদার মধ্যে অন্য রঙের ছিট্। প্রজাপতিরা সব চেয়ে পছন্দ করে লাল রং, যদি সে লাল রং টক্‌টকে না হ'য়ে একটু ম্যাড়্‌মেড়ে হয়, আর পছন্দ করে নিজের ডানার মত পাঁচরঙা রং। প্রজাপতিরা যে সব ফুলের ঘটক, তারা হয় গোলাপ-জবার মত লাল, না হয় ঋতুফুলের মত পাঁচরঙা। ভুঁড়ো প্রজাপতি সাদা রংটাই বেশী পছন্দ করে, তবে খুব ফিকে হলে কোন রঙেই তার আপত্তি নেই।'[৭]

ফুলের কাহিনীকে এখানে ঝর্‌ঝরে ও পরিচ্ছন্ন ভাষায় বলা হয়েছে। ছোট-ছোট হাল্‌কা শব্দ মিশিয়ে একে তিনি আলাপের ভাষায় পরিণত করেছেন। সতীশচন্দ্র এখানে বৈঠকখানার খোশ্‌মেজাজের মানুষ—সুরসিক

ও আলাপচারী। কিন্তু তাঁর রসের এমন একটি কৌশল ছিল যা গুরুগম্ভীর বিষয়কেও সমানভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারত। কবি দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচীর 'একতারা' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হ'লে সতীশচন্দ্র তার ওপর যে প্রবন্ধ লিখেছিলেন, তা নানাকারণে উল্লেখযোগ্য। অনেক সময় রচনার ধার বাড়ানোর দিকে খুব বেশী মনোযোগ দিলে, ভার কমে যাওয়ার একটি আশঙ্কা থাকে। কিন্তু বীরবল-শিষ্য সতীশচন্দ্র সেই কৌশলটি আয়ত্ত করেছিলেন যার দ্বারা রচনার ভার না কমিয়েও ধার বাড়ানো যায়। সতীশচন্দ্রের 'একতারা' সমালোচনা শুধু প্রচলিত গ্রন্থ-সমালোচনা নয়, সাহিত্য-সমালোচনার এক বিশিষ্ট নিদর্শনও বটে।

বরদাচরণ গুপ্ত ও মূলত চৌধুরী মহাশয়ের উৎসাহে ও অনুপ্রেরণায় 'সবুজপত্র'-গোষ্ঠীর অন্যতম প্রধান লেখক হিসেবে স্বীকৃত হয়েছিলেন। সতীশচন্দ্রের চেয়েও বরদাচরণের স্টাইলের বাঁধুনি ভাল। বরদাচরণ যেন প্রমথ চৌধুরীর স্টাইলটি সম্মুখে রেখে রচনায় হাত পাকিয়েছেন। তাঁর সামাজিক প্রবন্ধ ও ব্যক্তিগত প্রবন্ধ 'সবুজপত্র'কে সমৃদ্ধ ক'রে তুলেছিল। ১৩২৪ সালের আশ্বিন ও কার্তিক সংখ্যা সবুজপত্রের তিনটি লেখার সপ্রশংস উল্লেখ করেছেন রবীন্দ্রনাথ,—অতুলচন্দ্র গুপ্তের 'অন্ন-চিন্তা', বীরবলের 'কংগ্রেসের দলাদলি' ও বরদাচরণ গুপ্তের 'বুদ্ধিমানের কর্ম নয়.' অতুলচন্দ্র গুপ্ত ও বরদাচরণ সম্পর্কে কবি অনেক আশা পোষণ করতেন, 'অতুল এবং বরদাবাবু তোমার সবুজপত্রের আসরে ওস্তাদের আসন নিয়েচেন—সাহিত্যের দ্যুলোকে ওঁরা নিজের আলোকে আলোকিত—এখন আশা হচ্চে সবুজের ক্ষেত্রে দুর্ভিক্ষের অবসান হল।'[৮] বরদাচরণের সামাজিক প্রবন্ধগুলি যেমন সূক্ষ্ম বিশ্লেষণী শক্তিতে ও চিন্তা-সৌকর্যে অপরূপ তেমনি তাঁর স্টাইলে বৈদর্ভী শ্লেষের গাঢ়বন্ধ-রূপ চৌধুরী মহাশয়ের রচনার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়, অনেক সময় চৌধুরী মহাশয়ের নিজের রচনা বলেই ভুল হয়। আমাদের জাতীয় চরিত্রের ত্রুটি-বিচ্যুতিকে তিনি অনেক সময় চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন—এক প্রদীপ্ত, স্বচ্ছন্দ, শ্লেষ-গাঢ় স্টাইলে বলেছেন, 'সমবেতভাবে কোনো কাজের আশু প্রয়োজন হ'লে, আমরা চারদিক থেকে অজস্র মন্ত্রণার জাল বিস্তার ক'রে অচিরেই সেটাকে লোকচক্ষুর অগোচর ক'রে ফেলি। তারপরে জাল গুটানোর সময় হ'লে সবাই অকুতোভয়ে নিজ নিজ কোলের দিকে টানি; এবং জাল নিংড়ে যা পাই, তা হচ্ছে বিশুদ্ধ কথাসরিৎসাগর'।[৯] তৎসম শব্দ সন্নিবেশ ক'রে লেখক তাঁর বক্তব্যের শ্লেষাত্মক

ভঙ্গিকেই সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন—এ বিষয়ে তিনি চৌধুরী মহাশয়ের সুযোগ্য শিষ্য। সতীশচন্দ্রের ভাষার চেয়ে এ ভাষা অনেক বেশী ধারালো—মখমলের কারুখচিত অসিবর্মের আড়ালে বক্র-দীর্ঘ তলোয়ারের কঠিন অবয়ব-রেখা ফুটে উঠেছে। 'জাল গুটানো' শব্দের পাশাপাশি 'অকুতোভয়' শব্দটির ব্যবহারে যে শব্দগত বৈষম্যের সৃষ্টি হয়েছে, তাতে লেখকের তির্যক বাচনভঙ্গিই বিশেষভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। 'কথাসরিৎসাগর' শব্দটি ব্যবহার ক'রে যেন তিনি তাঁর গোটা বক্তব্যকে জমিয়ে তুলেছেন। তৎসম শব্দ হ'লেও, সমগ্র বক্তব্যের সঙ্গে অন্বিত হ'য়ে নূতন অর্থব্যক্তি ঘটিয়েছে।

সবুজপত্র-গোষ্ঠীর লেখকদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরীর পরে রচনার বিষয়-বৈচিত্র্য ও পরিধির দিক থেকে সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর নাম সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। প্রবন্ধ, গল্প ও কবিতা তিনদিকেই সুরেশচন্দ্রের প্রবণতা ছিল। তবে তাঁর প্রবন্ধাবলীই এই তিন বিভাগের মধ্যে সবচেয়ে মূল্যবান। সুরেশচন্দ্রের গদ্য-স্টাইলে প্রমথ চৌধুরীর স্টাইলের পূর্ণাঙ্গ রূপ অভিব্যক্ত হয়েছে। ১৩২৫ সালের শ্রাবণ সংখ্যা সবুজপত্রে প্রকাশিত তাঁর 'সাহিত্যে জাতরক্ষা' প্রবন্ধের স্টাইল সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ প্রশংসা করেছিলেন।[১০] সুরেশচন্দ্রের লেখার ওপরে সবুজপত্রের সম্পাদকের কতখানি ভরসা ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় একটি ঘটনা থেকে। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'চলমান জীবনে' বলেছেন, 'পরের দিন সকালে আগের দিন ছাপাখানা-থেকে-আনা কাগজগুলি সম্বন্ধে নির্দেশ নেওয়ার জন্য চৌধুরী মহাশয়ের ঘরে গেলাম। যে সব চিঠিপত্র এসেছিল, তারমধ্যে একখানি ছিল পণ্ডিচেরী থেকে সুরেশ চক্রবর্তীর লেখা। চৌধুরী মহাশয় বললেন, সুরেশকে লেখার জন্য কড়া তাগাদা দিয়ে দাও'।'[১১] তাঁর "সবুজকথা" গ্রন্থটি 'সবুজপত্র'-পর্বের সুকর্ষিত স্টাইল ও জ্ঞানবিজ্ঞান-পরিশীলিত যুক্তিনিষ্ঠ মননের একটি খুব মূল্যবান নিদর্শন। প্রায় চল্লিশ বছর আগে লেখা হ'লেও রচনার পরিচ্ছন্নতা ও স্বচ্ছতার সঙ্গে বিষয়ের গুরুত্বও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি বীরবলী স্টাইল সম্পর্কে যা বলেছেন এবং যেভাবে বলেছেন দুই-ই সবুজপত্রীয়, 'শব্দের দেহায়তন যত বাড়বে অর্থের মূল্যও যে তত চড়বে এ ভুল আমাদের প্রমথবাবু ভেঙ্গেছেন। শব্দকল্পদ্রুমের বাইরেও যে চিন্তাশীলতার অবসর আছে তা আমাদের স্বীকার করতেই হবে।'[১২] এখানেও প্রমথীয় প্যাঁচালো শ্লেষগাঢ় রীতি লক্ষণীয়। 'শব্দকল্পদ্রুম' শব্দটিকে সম্পূর্ণ নূতন অর্থে প্রয়োগ ক'রে বক্তব্যের ধার বাড়ানো হয়েছে।

তিন

প্রমথ চৌধুরী ও 'সবুজপত্রে'র কথা মনে হলেই পরবর্তী কালের সংস্কৃতিবান বাঙালীর মনে গদ্য-স্টাইলের অভিনবত্বের কথাই মনে হয়। 'সবুজপত্র' পর্বের গদ্য-স্টাইল-কর্ষণার ইতিহাস বিস্ময়কর। তবুও মনে হয়, 'সবুজপত্র' এর চেয়েও আর একটি মহৎ মন্ত্রে বাংলাসাহিত্যকে দীক্ষিত করেছে। সে হচ্ছে স্বাধীনভাবে চিন্তা করার ক্ষমতা। এর জন্যই সবুজপত্রের অধিকাংশ লেখার মধ্যেই অপূর্ব মননশীলতা ও চিন্তার স্বাধীনতা লক্ষ্য করা যায়। চৌধুরী মহাশয়ের মনোজীবনের প্রভাবই যে একটি বিদগ্ধমণ্ডলী রচনা করেছিল, সে বিষয় কোন সন্দেহ নেই। উচ্চকোটির জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, অর্থনীতি প্রভৃতি বিচিত্র বিষয়ের প্রাচীন ও আধুনিক বিদ্যা এই গোষ্ঠীর সম্পূর্ণ করতলগত ছিল।

পরবর্তী কালে সাহিত্যের সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করেছেন অথবা যে কারণেই হোক্ সাহিত্যক্ষেত্র থেকে সরে গিয়েছেন, এমনও কোনো কোনো লেখক সবুজপত্রের যুগে অসাধারণ প্রতিশ্রুতি দেখিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কিরণশঙ্কর রায়ের নাম। পরবর্তী কালে বাংলার রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তিনি একজন কর্ণধার হয়েছিলেন। কিন্তু তরুণতর কিরণশঙ্কর ছিলেন একজন যথার্থ 'সবুজপত্রী'। তখন তিনি রাজনীতির জটিলাবর্তের মধ্যে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে কোনো সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন নি—তিনি ছিলেন ইতিহাসের অধ্যাপক, সুরসিক ও চিন্তাশীল। এখানেও চৌধুরী মহাশয়ের নির্বাচন ভুল হয় নি। যে বৈদগ্ধ্য সবুজপত্রীদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল, কিরণশঙ্কর রায় ছিলেন তার মুকুটমণি। 'সবুজপত্র' ছাড়াও 'ভারতবর্ষ', 'প্রবাসী' প্রভৃতি অভিজাত পত্রিকায় তাঁর অনেক লেখা ছাপা হয়েছিল। তিনি একটি অসাধারণ বিশ্লেষণী মনের অধিকারী ছিলেন। ইতিহাস, রাজনীতি ও সমাজ—ত্রিবিধ বিষয়ে লেখা তাঁর মনীষাদীপ্ত প্রবন্ধগুলি সবুজপত্র পত্রিকার গৌরব বৃদ্ধি করেছে। কিরণশঙ্করের রুচিবোধ ও 'ইস্‌থেটিক সেন্স' যে কত সমুন্নত ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁরই একটি উক্তিতে, 'একথা আমি কিছুতেই স্বীকার করবো না যে দেবতাদের মধ্যে কুবেরই বড় এবং জাতির মধ্যে বৈশ্যই শ্রেষ্ঠ। সাহিত্য ও দর্শন নির্বাসিত হ'য়ে পাটের বিজ্ঞাপনই আদৃত হবে, দেশের সেই ভয়াবহ দিন আমরা কেউ সহ্য করতে পারব না।' কিরণশঙ্করের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। গল্প-লেখক কিরণশঙ্কর আজ একেবারেই বিস্মৃত। কিন্তু

তাঁর গল্পে প্রশংসনীয় শক্তির পরিচয় আছে। 'সপ্তপর্ণী' সঙ্কলনটিতে অধুনা-বিস্মৃত এই শক্তিশালী গল্পকারকে নূতন ক'রে আবিষ্কার করা সম্ভব।

কিরণশঙ্কর রায়ই অতুলচন্দ্র গুপ্তের সঙ্গে চৌধুরী মহাশয়ের যোগাযোগ ঘটিয়ে দেন। সবুজপত্রীদের মধ্যে অতুলচন্দ্র গুপ্তের নাম সবচেয়ে বেশী উল্লেখযোগ্য। মননে, রচনা-পারিপাট্যে ও বিদ্যাবুদ্ধির গরীয়সী সাধনায় অতুলচন্দ্র প্রায় অর্ধশতাব্দী ব্যাপী বাংলা দেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য স্থানে প্রতিষ্ঠিত আছেন। সাহিত্য ছাড়াও বৃহত্তর সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও তাঁর দান কম নয়। তা ছাড়া, বর্তমান কালে প্রমথ-কথা-কোবিদ হিসেবে তিনি শীর্ষস্থানীয়। প্রমথ চৌধুরী-সম্পর্কিত তাঁর বিচ্ছিন্ন রচনাগুলি ভাবীকালের বীরবল-গবেষকদের নূতন পথনির্দেশ করবে। চৌধুরী মহাশয়ের সুযোগ্য শিষ্য হিসেবে অতুলচন্দ্রও পরিচ্ছন্ন রচনারীতির পক্ষপাতী। বৃথা শব্দাড়ম্বর ও বাগ্‌বাহুল্য বর্জন ক'রে এক গাঢ়বন্ধ মিতাক্ষর স্টাইল রচনা করে তিনি গুরুঋণ শোধ করেছেন। গুরুর সঙ্গে শিষ্যের একটি বিষয়ে অত্যন্ত মিল দেখা যায়। এঁরা কেউই রচনা-পরিধির দিকে নজর দেন নি। কিন্তু সবগুলি রচনাতেই যত্নকৃত লিপি-নিপুণতার পরিচয় আছে।

অতুলচন্দ্রের রচনা প্রথম থেকেই রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। পাকা হাতেই তিনি কলম ধরেছিলেন—তাঁর অলঙ্কারশাস্ত্রের আলোচনাকে তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—'পাকা মাথার চিন্তা, পাকা হাতের লেখা।' যে কোন বিষয়কেই সাহিত্যিক গুণসমৃদ্ধ ক'রে তোলা অতুলচন্দ্রের রচনার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। প্রাচীন ও আধুনিক—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যবিদ্যা—সব ক্ষেত্রেই তাঁর অধিকার সমান। চৌধুরী মহাশয়ের গদ্যে তৎসম শব্দের পরিমাণ বেশী। অতুলচন্দ্রের গদ্যে তৎসম শব্দ আছে, কিন্তু সমাসবদ্ধ-বাক্য অনেক কম। প্রাচীন আলঙ্কারিকদের কাব্যতত্ত্ব বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। সংস্কৃত আলঙ্কারিকদের প্রাচীন বিদ্যার চিরন্তন রূপটিকে তিনি আধুনিক মনের উপযোগী ক'রে পরিবেশন করেছেন—ইউরোপীয় কাব্যতত্ত্বের সঙ্গেও অনেক ক্ষেত্রে তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। এত বড় দুরূহ বিষয়কে তিনি কত সহজে পরিবেশন করেছেন! প্রাচীন আলঙ্কারিক ও আধুনিক সমালোচকদের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করতে গিয়ে তিনি যে ইঙ্গিত করেছেন তা উপভোগ্য, 'আলঙ্কারিকেরা বুঝেছিলেন কাব্যের তত্ত্ববিশ্লেষণ বুদ্ধির ব্যাপার।

কাব্যের রস দরকার হলে পাতলা ক'রে পাঠককে গিলিয়ে দেওয়া তার উদ্দেশ্য নয়। কারণ ওকাজে কেউ কখনও সফলকাম হতে পারবে না। আলঙ্কারিকেরা জানতেন কাব্যের রস-আস্বাদন লোকে কাব্য পড়েই করবে। সমালোচকের 'কবিত্ব' পড়ে কাব্যের রসাস্বাদনের আধুনিক তত্ত্ব তাঁদের জানা ছিল না।'[১৩] প্রমথ চৌধুরীর মতো অতুলচন্দ্রের মনের কাঠামোও 'ক্ল্যাসিক্যাল'—ভাষার আটসাঁট বাঁধুনি ও দীপ্তি প্রমথ চৌধুরীর লেখার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। অতুলচন্দ্রের সবচেয়ে বড় সৌভাগ্য এই যে সবুজপত্রীদের মধ্যে কেউই বোধ হয় তাঁদের সাহিত্যিক গুরুর কাছে এতখানি শ্রদ্ধা ও আশীর্বাদ পান নি।

চৌধুরী মহাশয়ের উৎসাহবাক্য ও আনুকূল্য অতুলচন্দ্রের সাহিত্যিক জীবনের ওপর কতদূর প্রভাব বিস্তার করেছে তা তাঁর নিজের মুখেই শোনা যাক, 'প্রমথ চৌধুরীর লেখা আত্মকথার ভূমিকা লেখা যে আমার পক্ষে কতদূর ধৃষ্টতা, এবং সম্ভব এক রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর সকলের পক্ষেই লেখা ধৃষ্টতা—তা জানি। কিন্তু তবুও প্রকাশকদের প্রস্তাব অস্বীকার করি নি। প্রমথ বাবুর সঙ্গে পরিচয় ও তাঁর সাহায্য আমার জীবনের বড় সম্পদ। তা না ঘটলে সম্ভবত জীবিকার্জনের উৎসাহে, লোকে যাকে বলে 'কাজ' তাতেই ডুবে যেতাম। আমি বাংলা সাহিত্যের দু'ছত্রের নগণ্য লেখক। কিন্তু সে লেখাও লিখতাম না প্রমথবাবুর সঙ্গে পরিচয় না হ'লে। এককালে যে নবীনের দল প্রমথ চৌধুরীর উৎসাহে ও উপদেশে 'সবুজপত্রে' লিখে লেখক হবার চেষ্টা করেছিল, তাদের সকলের হ'য়ে এই উপলক্ষে আমাদের গুরুকে প্রণাম জানাচ্ছি।'[১৪]

চার

চৌধুরী মহাশয়ের অনুবর্তীদের মধ্যে আর একজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। ইনি হলেন ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। ব্রাইট স্ট্রীটের বিদগ্ধ পরিবেশে ধূর্জটিপ্রসাদ প্রথম থেকেই একটি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী ছিলেন। বিদ্যায় বুদ্ধিতে ও জ্ঞানের বিচিত্র পথ-পরিক্রমায় সেদিনের তরুণ জিজ্ঞাসু ও সাহিত্য-রসিক ধূর্জটিপ্রসাদ চৌধুরী মহাশয়ের সপ্রশংস অভিনন্দন পেয়েছিলেন। চিন্তাগর্ভ প্রবন্ধ, ব্যক্তিগত প্রবন্ধ, এমন কি তাঁর গল্পের মধ্যেও প্রমথ চৌধুরীর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস এমন কি রসতত্ত্ব সম্পর্কেও অনেক মূল্যবান মন্তব্য তিনি করেছেন। বিংশ শতাব্দীর

ইউরোপীয় চিন্তানায়কদের প্রভাব তাঁর লেখায় নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। বার্ট্রাণ্ড রাসেল, বেনোদিত্তো ক্রোচে ও বের্গস'র প্রভাব তাঁর 'সবুজপত্র' পর্বের চিন্তা-চেতনায় অনেকখানি কাজ করেছে। সবুজপত্রে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত 'দাদার ডায়েরী' রচনাটিতে ধূর্জটিপ্রসাদের একটি বিশিষ্ট রচনারীতির পরিচয় পাওয়া যায়—রচনার মধ্যে একটি বিদগ্ধ ও জ্ঞানবিজ্ঞান-সমুজ্জ্বল মনের দীপ্তি আছে, কিন্তু বলেছেন বৈঠকী মেজাজে। তাঁর 'ডিমোক্র্যাসী' রচনাটি[১৫] চিন্তায় ও স্টাইলে প্রমথীয়, প্রচ্ছন্ন শ্লেষেরও আভাস আছে, 'কিন্তু বর্তমান যুগে বীরের আসন নেই, মূলগায়েন আর বংশ-পরম্পরায় অবতীর্ণ হতে পারেন না। তাই সভ্যজগৎ আজকাল বহুর উপর আস্থা স্থাপন করেই নিশ্চিন্ত হয়েছে।' দৈনন্দিন জীবনের সমস্যা ও সাময়িক অবস্থার ওপরে তিনি যে সমস্ত প্রবন্ধ লিখেছেন, তার মূল্যও অনস্বীকার্য। প্যাঁচালো ভঙ্গির মধ্য দিয়ে অনেক সময় তিনি তাঁর বক্তব্যকে তীক্ষ্ণ ও জোরালো ক'রে তুলেছেন। 'ধরতাই বুলি'[১৬] রচনাটির প্রথমেই তিনি বলেছেন, 'এ কথাটা বাংলায় সর্বত্র প্রচলিত না থাকলেও কথাটায় যা বোঝায় তা পৃথিবীর সর্বত্র প্রচলিত আছে; এবং মানুষে ধরতাই বুলির উপর যে বিশ্বাস খরচ করে, সেটা যদি নিজের জন্য জমিয়ে রাখত তা হলে পৃথিবীতে এত দুঃখ কষ্ট থাকত না।'

ধূর্জটিপ্রসাদ তাঁর সাহিত্যিক গুরুর মতোই 'বাক্যকুশল' লেখক। তাঁর লেখা পড়ে মনে হয় যেন তিনি বৈঠকখানায় ব'সে আলাপ করছেন, আর সেখানে ব'সে আছেন ক'জন নির্বাচিত সমান-রস-রসিক শ্রোতা। এইজন্য সাধারণ পাঠকের কাছে তাঁর রচনা 'দুর্বোধ্য' বলে মনে হবে, এমন কি সুখপাঠ্যও মনে না হতে পারে। ধূর্জটিপ্রসাদের পাণ্ডিত্য ও মননশীলতা বিস্ময়কর, কিন্তু রচনারীতির মধ্যে আতিশয্য দোষ আছে। অতুলচন্দ্রের রচনারীতিতে যে পরিচ্ছন্নতা, মসৃণতা ও নিটোলতা আছে, ধূর্জটিপ্রসাদের রচনায় তা অনুপস্থিত। বাক্-সংক্ষিপ্ততা ও 'এপিগ্রামে'র তীক্ষ্ণতা তাঁর রচনায় প্রমথীয় দীপ্তি সঞ্চারিত করেছে। বৈঠকখানায় চায়ের টেবিলে তাঁর সমানধর্মা বিদগ্ধদের সঙ্গে বসে যেন তিনি কথা ব'লে চলেছেন—বিতর্ক ও কথা-চতুরতার ফাঁকে ফাঁকে তাঁর বিদ্যাবুদ্ধির দীপ্তি চমকের সৃষ্টি করেছে। ধূর্জটিপ্রসাদের নাম আর এক কারণেও উল্লেখযোগ্য। 'সবুজপত্র' পত্রিকা সঙ্গীত-সমালোচনার ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। ধূর্জটিপ্রসাদ সঙ্গীত-সমালোচনা ও সাঙ্গীতিক বিতর্কের আসরে যোগ দিয়ে নিঃসন্দেহে এর গৌরব বৃদ্ধি করেছেন।

কথাসাহিত্যিক ধূর্জটিপ্রসাদের ওপরও প্রমথ চৌধুরীর প্রভাব অলক্ষ্যগোচর নয়। চৌধুরী মহাশয়ের ছোটগল্পে যেমন মূল গল্পাংশকে ঘিরে নানা প্রসঙ্গ ও বিতর্কের অবতারণা করা হয়, ধূর্জটিপ্রসাদের গল্পগুলির মধ্যেও অনেকটা এই রীতির অনুসরণ করা হয়েছে। অনেক সময় বাগ্‌বাহুল্য ও অবান্তর প্রসঙ্গের সংযোজনে গল্পগুলির মূল ধারা ব্যাহত হয়েছে। কিন্তু ধূর্জটিপ্রসাদের উপন্যাসত্রয়ী—'অন্তঃশীলা', 'আবর্ত' ও 'মোহনা'—প্রমথীয় জগৎ ছেড়ে আর এক নূতন জগতের ইঙ্গিত দিয়েছে। আধুনিক বুদ্ধিজীবী মানুষের জীবনসমস্যা ও হৃদয়দ্বন্দ্বের এক বিস্ময়কর লিপিচিত্র এখানে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। দীর্ঘ-বিন্যস্ত কাহিনীর মধ্যে খগেনবাবু, রমলা ও সুজনের সম্পর্ক-বৈচিত্র্য, সূক্ষ্মতর মানসদ্বন্দ্ব ও প্রেমের বহু-বঙ্কিম বিসর্পিল পথরেখার যে বর্ণনা আছে তা বিস্ময়কর। প্রবন্ধকার ধূর্জটিপ্রসাদের স্বরূপ-চিহ্নটিও তাঁর এই উপন্যাসত্রয়ী থেকে অন্তর্হিত হয় নি। মননশীলতা ও বুদ্ধিদীপ্ত জীবন-বিশ্লেষণের সঙ্গে ঔপন্যাসিকের ধর্ম সুষ্ঠুভাবে সমন্বিত হয়েছে। কথাসাহিত্যিক ধূর্জটিপ্রসাদ তাঁর গুরু-প্রদর্শিত পথেই যাত্রা সুরু করেছিলেন, কিন্তু উপন্যাস-ত্রয়ীতে তিনি নিঃসন্দেহে সে পথ অতিক্রম ক'রে বাংলা উপন্যাসের নূতন গতিপথ নির্দেশ করেছেন। প্রমথ-চৌধুরীর গল্পগুলির মধ্যে এক পুরোনো দিনের আস্বাদন আছে—সে যেন একালের মস্তিষ্কজীবী মধ্যবিত্তের পৃথিবী নয়—যেন একালের জটিল জীবনের উষ্ণ নিঃশ্বাস তাকে বিবর্ণ করতে পারে নি। সে জগৎ জমিদারের বৈঠকখানার সান্ধ্য-আলোচনায় মুখর, ক্ষয়িষ্ণু ভূস্বামীদের রোমাঞ্চকর কাহিনীতে পূর্ণ, উত্তর ভারতের সঙ্গীত-সরস্বতীর সুরতীর্থ। সিতিকণ্ঠ সিংহঠাকুর কিম্বা সীতাপতি রায়ের মতো এক একজন অদ্ভুত চরিত্রের বিচিত্রকর্মা মানুষ এর অধিবাসী। ধূর্জটিপ্রসাদের উপন্যাসের বিষয়বস্তু ও চরিত্রই নয়, সমস্যাটাও আধুনিক। আধুনিক যুগের বুদ্ধিজীবী মানুষের জীবনদ্বন্দ্ব, বিশেষত প্রেমের কুটিল প্রবাহ তিনি নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করেছেন।

দিলীপকুমার রায় সবুজপত্রে অপেক্ষাকৃত শেষ প্রহরে যোগ দিয়েছেন। সবুজপত্রে তাঁর মাত্র কয়েকটি লেখাই প্রকাশিত হয়েছিল। তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হ'ল 'রবীন্দ্রনাথ' নামক ডায়েরীধর্মী রচনাগুচ্ছ। সঙ্গীতশিল্পে বিদগ্ধ দিলীপকুমার সঙ্গীত সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যে আলোচনা করেছিলেন, তাই রচনাগুলিতে লিপিবদ্ধ হয়েছে। তাঁর 'ভ্রাম্যমানের জল্পনা'র কিয়দংশও সবুজপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। অতুলচন্দ্র বা ধূর্জটিপ্রসাদ যে অর্থে প্রমথ চৌধুরীর

শিষ্য, দিলীপ রায়কে সে অর্থে প্রমথ-শিষ্য বলা সঙ্গত নয়। দিলীপকুমার প্রধানত সুরকার ও সঙ্গীতজ্ঞ হিসেবে খ্যাত হ'লেও ভ্রমণকাহিনী, ডায়েরী, সঙ্গীত ও ছন্দ সম্পর্কিত প্রবন্ধগুলি বাংলা গদ্য-সাহিত্যের পরিধি বিস্তার করেছে। সবুজপত্রের সংস্কৃতিবান লেখকগোষ্ঠীর সঙ্গে দিলীপকুমারের রূপ ও রুচিবোধের একটি গভীর সম্পর্ক ছিল। তা ছাড়া দিলীপকুমারও তো একজন কৃষ্ণনাগরিক। উত্তরকালে বহু বিশ্ববরেণ্য মনীষীর সাহায্যে ও স্নেহানুকুল্যে তিনি এক সমুন্নত রসিকতা ও উদার মানসিকতার অধিকারী হয়েছেন।

কথাসাহিত্যিক দিলীপকুমার তাঁর রচনার কৃশতা সত্ত্বেও বাংলা কথাসাহিত্যের ইতিহাসে একটি নূতন আসন দাবী করতে পারেন। যুদ্ধোত্তর যুগে নানাদিক থেকে বাংলা কথাসাহিত্যের পটপরিবর্তন ঘটেছিল। এই পট-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নূতন ধরনের সমস্যামূলক উপন্যাসের সৃষ্টি হ'ল। বিশেষত পশ্চিমের জীবনসমস্যা ও তার পরিবর্তিত মূল্যবোধ আমাদের সমাজ-জীবনের মধ্যেও আলোড়নের সঞ্চার করেছে। বাংলা উপন্যাসের পরিধি বিস্তৃত হল। প্রাচ্যের নর-নারী পশ্চিমের দ্রুত-পরিবর্তনশীল মনোজীবনের উষ্ণ স্পর্শে নিজেদের জীবন-জিজ্ঞাসা রঞ্জিত করেছে। প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য জীবনধারার যুগ্মবেণী রচনায় প্রমথ চৌধুরীর দাম কম নয়। রবীন্দ্রনাথ, প্রভাতকুমার ও শরৎচন্দ্রের মধ্যে কথাসাহিত্যের যে প্রবাহ লক্ষ্য করা যায়, তাঁর সঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর গল্পের কোন আত্মিক সংযোগ নেই। কিন্তু বাংলা কথাসাহিত্যের পরিধি-বিস্তারে ও নূতন-ধরনের পটভূমি-রচনায় তাঁর গল্পগুলির দান কম নয়। এ ক্ষেত্রে প্রমথ চৌধুরীকে শুধু 'নাগরিক' চেতনার লেখক বললেই যথেষ্ট হবে না। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য জীবনধারার যুগ্মবেণী তাঁর কোনো কোনো ছোটগল্পে ছায়াপাত করেছে। একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, কলকাতা ও লণ্ডন তাঁর গল্পগুলির একটি বিরাট অংশ জুড়ে আছে। বাংলা কথাসাহিত্যের পরিধি-বিস্তারে চৌধুরী মহাশয় যে পথনির্দেশ করেছেন, দিলীপকুমার তার সম্ভাবনা ও সার্থকতাকে পূর্ণতর ক'রে তুলেছেন। 'মনের পরশ', 'রঙের পরশ', 'বহুবল্লভ', 'দুধারা' প্রভৃতি উপন্যাসে তিনি কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে এক নূতন রীতির পরীক্ষা করেছেন। ইউরোপের পটভূমিকায় বাঙালী তরুণের বিদেশিনী-প্রীতি দিলীপকুমারের অধিকাংশ উপন্যাসেরই বিষয়বস্তু। তর্ক-বিতর্ক ও বুদ্ধিদীপ্ত জীবন-সমালোচনা তাঁর উপন্যাসে প্রাচ্য-প্রতীচ্য জীবনের সংমিশ্রণ ও ভাব-বিনিময়কে অনিবার্য ক'রে তুলেছে। পূর্ব ও পশ্চিমের জীবনসমস্যার

মৌলিক দ্বন্দ্বগুলিও এখানে তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণশক্তি ও মননশীলতার সঙ্গে আলোচিত হয়েছে। 'রঙের পরশ' উপন্যাসে ইতালীর ও 'বহুবল্লভ' উপন্যাসে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের স্মৃতিরঞ্জিত গ্রাসমিয়ার ও হ্রদ-অঞ্চলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের পটভূমিকায় তিনি যে মানবজীবন-নাট্যকে উদ্ভাসিত করেছেন তা অপূর্ব।

প্রমথ চৌধুরীর গল্পে ইউরোপীয় জীবন ও চরিত্রের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাতে বৃহত্তর সমাজ-জীবনের প্রভাব নিতান্ত গৌণ। তা ছাড়া অধিকাংশ গল্পেই পূর্বতন অভিজ্ঞতাকেই বিবৃত করেছেন এক নৈর্ব্যক্তিক 'আমি'। কিন্তু দিলীপকুমারের উপন্যাসে পাশ্চাত্ত্য-ভূখণ্ডের বৃহত্তর সমাজ-জীবনও অনুপস্থিত নয়—ইউরোপীয় জীবনের তরঙ্গলীলা বাঙালী তরুণের মনেও উন্মাদনা জাগিয়েছে। ব্যক্তিজীবন ও সমাজ-জীবন, পূর্ব-পশ্চিমের দ্বন্দ্বে আলোড়িত—সেই দ্বন্দ্বোত্থিত জীবনের বিষামৃতময় প্রণয়লীলার তিনি রূপকার। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য জীবনের সম্পর্ককে প্রমথ চৌধুরী খণ্ডচিত্র ও ছোটগল্পের বিষয়বস্তু ক'রে তুলেছেন, কিন্তু দিলীপকুমার তাকে বৃহত্তর ক্ষেত্রে উপন্যাসের বিস্তৃততর ক্ষেত্রে রূপ দিয়েছেন। তীক্ষ্ণোজ্জ্বল ভাষার লঘু-স্বচ্ছ রূপ উপন্যাসগুলিকে নূতন রূপ দিয়েছে। চৌধুরী মহাশয়ের শ্লেষ-বিদ্রূপ ও হৃদয়াবেগ-নির্মুক্ত গদ্যরীতির দ্বারা দিলীপকুমার প্রভাবিত হন নি। উপন্যাসের ভাষায় কল্পনা-প্রবণতা ও কবিত্বের সূক্ষ্ম সুরভি ছড়িয়ে দিয়েছেন।

পাঁচ

'সবুজপত্র'-পর্ব প্রমথ চৌধুরীর জীবনের অনেকখানি হলেও, তাঁর সাহিত্যিক প্রভাব শুধু সবুজপত্রের যুগ এবং এর কয়েকজন বিশিষ্ট লেখকের ওপরেই নিবদ্ধ ছিল না। পরবর্তী কালের বাংলা গদ্যের ওপরেও তাঁর প্রভাব কম নয়। জ্ঞাতসারে এবং অজ্ঞাতসারে অনেকেই এই বিদগ্ধ গদ্যশিল্পীর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। তাঁর সম্পর্কে প্রধানত দু'টি বিষয় পরবর্তী কালের লেখকদের গভীরভাবে আকর্ষণ করেছিল—প্রথমটি হ'ল তাঁর বিদগ্ধ মনোজীবন, আর দ্বিতীয়টি হ'ল তাঁর গদ্যরীতি। প্রথমটিকে অনুসরণ করা শুধু দুঃসাধ্যই নয়, অসাধ্যও বটে। কিন্তু তাঁর গদ্যরীতি পরবর্তীকালের অনেক লেখককেই নূতন প্রেরণা দিয়েছে। নব্যতন্ত্রী লেখকদের তিনি গুরু হিসেবে স্বীকৃত হয়েছেন।

পরবর্তীকালে যাঁরা প্রমথ চৌধুরীর মনোজীবন ও রচনারীতির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলেন অন্নদাশঙ্কর

রায়। তাঁর নিজের মুখেই শোনা যাক, 'সবুজপত্র যেদিন বিনুর মতো অবুঝের হাতে প্রথম পড়ল সেদিন সেই দ্বাদশবর্ষীয় বালক আর সব বাদ দিয়ে পড়তে আরম্ভ করল 'চার-ইয়ারী-কথা।' তখন বোধ হয় রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' চলছিল, কিন্তু বিনুর সেদিকে দৃষ্টি ছিলনা। তখনকার দিনে রবীন্দ্রনাথ যে কে ও কত বড় সে জ্ঞান ছিল না তার। গুরুত্ব-নির্ণয়ের, মূল্য-নির্ণয়ের বয়স সেটা নয়। ভাললাগা চিরদিনই নিরঙ্কুশ, বাল্যবয়সে সব চেয়ে বেশী। 'চার-ইয়ারী-কথা' বিনুর ভালো লেগেছিল। ভালো লেগেছিল প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের আরো অনেক রচনা।'[১৭] অন্নদাশঙ্করের নিজের উক্তি থেকেই জানা যায় যে বীরবলের লেখার 'বাঁধুনীপনা' তাঁর বাল্যকাল থেকেই হৃদয় ও মনকে আকর্ষণ করেছিল এবং 'বীরবলের রচনার আস্বাদনে'ই তাঁর রুচি গড়ে উঠল। বীরবলকে নূতন ক'রে আবিষ্কার ক'রে তিনি একটি অনাস্বাদিতপূর্ব রসলোকই আবিষ্কার করেছিলেন।

অন্নদাশঙ্কর 'সবুজপত্রী' নন, কালগত বিচারে তা হওয়াও সম্ভব ছিল না—কিন্তু দূর থেকে যাঁরা প্রমথ চৌধুরী ও সবুজপত্রের জয়যাত্রাকে অকুণ্ঠ অভিনন্দন জানিয়েছেন তিনি তাঁদের একজন। শুধু এক জনই নন, তিনি সর্বোত্তম। গদ্যরীতির দিক থেকে তিনি প্রমথ চৌধুরীর অপূর্ণ সম্ভাবনাকেই পূর্ণতর করেছেন। প্রমথ চৌধুরী ভাষাকে আরও সরল সহজ ও সর্বজনবোধগম্য করতে পারেন নি সেজন্য আক্ষেপ করেছিলেন। অন্নদাশঙ্কর তাঁর অনলস শিল্প-সাধনার মাধ্যমে চৌধুরী মহাশয়ের আরব্ধ কার্য সম্পন্ন করেছেন। তাঁর একটি স্বীকৃতি থেকে জানা যায়, 'প্রমথ চৌধুরী যে কাজে বাধা পেলেন, যে কাজে ভঙ্গ দিলেন সে কাজ আমার উপরেও চেপেছে। আমি পালাতে চাইলেও পালাতে দিচ্ছে কে?'[১৮] অন্নদাশঙ্কর প্রমথ চৌধুরীর দ্বারা সম্পূর্ণ প্রভাবিত হয়েছেন, এ কথা বলা সঙ্গত নয়—এখানে 'প্রভাবিত' না বলে 'অনুপ্রাণিত' বললেই বোধ হয় যথার্থ হবে। প্রমথ চৌধুরীর গদ্যরীতির অপূর্ণতা সম্পর্কেও তিনি অবহিত ছিলেন। কারণ বীরবলী ঢঙ্‌ যত নূতনত্বই আনুক না কেন, এর ভেতর একটি নির্ধারিত সীমা ছিল। একটু লক্ষ্য করলেই এর কারণ বোঝা যাবে। সবুজপত্রের দু'জন কর্ণধার—রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরী, সে যুগের সাধুভাষা ও চলিতভাষার দ্বন্দ্বের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু এই দু'জন কৃতকর্মা গদ্যশিল্পী মনোজীবনের দিক থেকে ছিলেন স্বতন্ত্র জগতের অধিবাসী। রবীন্দ্র-শাসিত বাংলাসাহিত্যে চৌধুরী মহাশয় আনতে চেয়েছিলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর 'কৃষ্ণনাগরিক' ভারতচন্দ্রের

বাণী-বিলাস ও শব্দার্থ-চাতুর্য। কিন্তু সে প্রচেষ্টা যত কৌশলীই হোক না কেন, রবীন্দ্র-যুগের সাহিত্যিক আবহের সঙ্গে তার কোথায় যেন একটি প্রচ্ছন্ন বিরোধ ছিল। তা ছাড়া কথ্যভাষাশ্রয়ী বাণী-বিন্যাসে বীরবলী পদক্ষেপ বলিষ্ঠ হলেও সীমার সতর্কশাসনে শঙ্কিত, অর্ধসমাপ্ত, খণ্ডিত। রবীন্দ্রনাথ ভাষা ও স্টাইলের রূপ ও রীতিকে বহুদূর এগিয়ে দিয়েছেন। এই অসাধারণ রূপদক্ষের রীতি-কর্ষণার ইতিহাসে 'সবুজপত্র' একটি বিশিষ্ট অধ্যায় মাত্র—তারপরেও সুদীর্ঘ ত্রিশ বছর ব্যাপী তিনি এর নানা রূপান্তর ঘটিয়ে আধুনিক বাংলা গদ্যের বিচিত্র সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছেন।

অন্নদাশঙ্কর বীরবলী রীতির সীমা এবং সম্ভাবনা, উভয় সম্পর্কেই সচেতন ছিলেন। এই জন্যই তিনি প্রমথ চৌধুরীর মনোজীবন ও গদ্যরীতির ওপর শ্রদ্ধা রেখেও রবীন্দ্রনাথের পন্থানুসারী হয়েছেন। তিনি প্রমথ চৌধুরীকে রবীন্দ্র-রস-মণ্ডিত করেছেন—যা ধূর্জটিপ্রসাদ. দিলীপকুমার, এমন কি অতুলচন্দ্রের পক্ষেও সম্ভব হয় নি। এইভাবে তিনি রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরীর মধ্যে একটি সমন্বয় সাধন করেছেন। তিনি প্রমথীয় ঐশ্বর্যকেই সম্বল ক'রে থাকেন নি—তাকে বাড়িয়েছেন ও ভাবীকালের ইতিহাসে প্রসারিত ক'রে দিয়েছেন। এইখানেই তাঁর উত্তরাধিকারের সার্থকতা। অন্নদাশঙ্করের রচনাগুলির গদ্যরীতির একটি আতিশয্য চোখে পড়ে—কখনও কখনও এই ভাষা এত সূক্ষ্ম, সুরময় ও লঘুস্পর্শ যে এ ভাষা গদ্য ব'লে মনেই হয় না—মনে হয় সুরের বুদ্বুদ-লীলা। যে কোন কথাই সেখানে গীতিস্পন্দী—লীলা-লাবণ্যে কম্পমান।

অন্নদাশঙ্করের 'পথে প্রবাসে' প্রবীণ প্রমথ চৌধুরীর সানন্দ অভিনন্দন পেয়েছিল। তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে এই বইয়ের ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন। হয়তো একষট্টি বছরের সিদ্ধকাম প্রবীণ লেখক পঁচিশ বছরের প্রতিভাবান তরুণ লেখকের মধ্যে নিজের চিত্ত-জগতের দোসর খুঁজে পেয়েছিলেন। তিনি বলেছেন, 'আমি যখন 'বিচিত্রা' পত্রিকায় প্রথম 'পথে প্রবাসে' পড়ি, তখন আমি সত্য সত্যই চমকে উঠেছিলুম। কলম ধরেই এমন পাকা লেখা লিখতে হাজারে একজনও পারে না। শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্করের লেখা পড়লে মনে হয় যে, তাঁর মনের কথা মন থেকে কলমের মুখে অবলীলাক্রমে চলে এসেছে। এ গদ্যের কোথাও জড়তা নেই এবং এর গতি সম্পূর্ণ বাধামুক্ত। আমরা যারা বাঙলা ভাষায় মনোভাব প্রকাশ করতে চেষ্টা

করি, আমরা জানি যে, ভাষাকে যুগপৎ স্বচ্ছ ও স্বচ্ছন্দ করা কতদূর আয়াস-সাধ্য। সুতরাং এই নবীন লেখকের সহজ, স্বতঃস্ফূর্ত স্বপ্রকাশ ভাষার সঙ্গে যখন আমার পরিচয় হয়, তখন যে আমি চমৎকৃত হয়েছিলুম তাতে আর আশ্চর্য কি'[১] ? তাঁর 'সত্যাসত্য' উপন্যাসের ভাষা-সম্পর্কে চৌধুরী মহাশয় যে মূল্যবান নির্দেশ দিয়েছিলেন, সে কথা অন্নদাশঙ্কর কৃতজ্ঞচিত্তে উল্লেখ করেছেন। এই সুবৃহৎ উপন্যাসটির মহাকাব্যোচিত পরিসর প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য জীবনপ্রবাহের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করেই ক্ষান্ত হয় নি, সমগ্রভাবে আধুনিক জীবনের কেন্দ্রচ্যুত স্বরূপকেই তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণের সাহায্যে রূপ দিয়েছে। বাংলা উপন্যাসের নাগরিক মনন আমাদের পল্লীকেন্দ্রিক জীবনের সঙ্কীর্ণভূমি অতিক্রম ক'রে প্রতীচ্য ভূখণ্ড পর্যন্ত যে তার অধিকার বিস্তৃত করেছে, বাংলাসাহিত্যে তার সর্বোত্তম প্রমাণ অন্নদাশঙ্করের এই মহাকাব্যে। বিশ্বসংস্কৃতির আলোক-রেখায় তাঁর মন পরিমার্জিত—এ আলোর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের পাশেই আছেন প্রমথ চৌধুরী। কিন্তু প্রমথ চৌধুরীর এই শ্রদ্ধাশীল পাঠক উত্তরকালে সত্যোপলব্ধির তৃষ্ণায় ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছেন।

প্রমথ চৌধুরীর গদ্যস্টাইলের অল্প-বিস্তর প্রভাব পরবর্তী কালের অনেক লেখকের ওপরেই পড়েছে। প্রমথ চৌধুরীর নির্দেশিত পথে, মূল কাঠামোটিকে অক্ষুণ্ণ রেখে গদ্যরীতির রূপান্তর সাধনের চেষ্টা করেছিলেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। প্রমথ চৌধুরীর কবিতা ও গদ্যের মধ্যে যেমন একটি মূলগত ঐক্য আছে, তেমনি কবি সুধীন্দ্রনাথ ও গদ্যলেখক সুধীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ এক মানুষ। সুধীন্দ্রনাথ অত্যন্ত সচেতন শিল্পী। কবিতা ও গদ্যের বহিরঙ্গ-প্রসাধন ও কলাপ্রযত্নের দিকে তাঁর ঝোঁক। দুরূহ, এমন কি অপ্রচলিত শব্দকেও তিনি তাঁর রচনার মধ্যে নিয়ে এসেছেন। গদ্যশিল্পী সুধীন্দ্রনাথ ভাষার কারিগরিতে অনেক নূতনত্ব দেখিয়েছেন। বাংলা ১৩৩৮ সালে সুধীন্দ্রনাথের সম্পাদনায় 'পরিচয়' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকা বাংলা গদ্যের কর্ষণার ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল। সুধীন্দ্রনাথ বহু ইংরেজি ফরাসী শব্দের আক্ষরিক অনুবাদকে বাংলাগদ্যের অঙ্গীভূত করেছেন। সংস্কৃত শব্দের ওপরও তাঁর পক্ষপাতিত্ব আছে। পদ-বিন্যাসে সংস্কৃত-শব্দপৃথুলতা লক্ষণীয়। সুধীন্দ্রনাথের গদ্যে দ্রুতলয়ের প্রবাহ নেই—যেন স্তব্ধগতি নদীর হিম-স্তম্ভিত গাম্ভীর্য; ধ্রুপদী পদবিন্যাসের মধ্যে কোথাও পরিহাসের লঘুস্পর্শ স্মিত-রেখা ফুটে ওঠে নি। শব্দ-তক্ষণ-কৌশলে সুধীন্দ্রনাথ সিদ্ধ, তাই তাঁর ভাষার গাঢ়-

বক্তৃতা অসাধারণ। সুধীন্দ্রনাথের ভাষা শব্দ-চিত্রল ও মণ্ডনময়। প্রমথ চৌধুরীর ভাষাও হালকা নয়, কিন্তু পরিহাস-রসিক মেজাজটি সেখানে অলক্ষ্যগোচর নয়। সুধীন্দ্রনাথ ভাষাগত কাঠামোর দিক থেকে অনেকখানি সরে গিয়েছেন। বাংলা গদ্যরীতিতে তিনি যে পথ বেছে নিয়েছেন সে পথের যাত্রী তিনি একাই। ক্রিয়াপদের সংক্ষিপ্ততা সত্ত্বেও তাঁর গদ্যস্টাইলের মেজাজ সাধুভাষার। প্রমথ চৌধুরীর গদ্যরীতির কথ্যভাষামুখিতা যেমন অন্নদাশঙ্করের গদ্যে চূড়ান্ত রূপ পেয়েছে, তেমনি তাঁর ভাষায় তৎসমশব্দ-বাহুল্যের মধ্যে যে স্থাপত্য ও ভাস্কর্য-রীতির সম্ভাবনা ছিল, তার শ্রমলব্ধ উৎকর্ষের পরিচয় পাওয়া যায় সুধীন্দ্রনাথের গদ্যে। ফলে এ গদ্য তৎসমশব্দ-বহুল সাধুভাষা বলেই মনে হয়। এ দিক থেকে রূপান্তরিত বীরবলী রীতির ইতিহাসে এঁরা দুজন হলেন দুই বিপরীত প্রান্তবাসী।

ছয়

'সবুজপত্র' পর্বের পরে প্রমথ চৌধুরীর রচনার কৃশতা লক্ষণীয়। তথাপি বাংলা দেশের নব নব সাহিত্য-প্রয়াস ও প্রচলিত ধারার বিরুদ্ধতা অনেক সময় তাঁর সোৎসাহ সমর্থন পেয়েছে। 'কল্লোল' যুগের সাহিত্যিকদের ওপর তাঁর প্রভাব যে খুব স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ, এ কথা বলা যায় না। তা ছাড়া এই পর্বে প্রধানত কথাসাহিত্যের ওপরেই জোর দেওয়া হয়েছে। তথাপি এ যুগের লেখকদের নূতন মনোভঙ্গি ও প্রকাশরীতির দিক থেকে তিনি ছিলেন মৌলিকতার পক্ষপাতী। বড় প্রতিভার ছায়ায় সঙ্কোচের সঙ্গে বেড়ে ওঠা যে কিছু নয়, এ কথা তিনি প্রথম থেকেই বুঝতে পেরেছিলেন—তিনি চেয়েছিলেন স্বাধীনভাবে বেড়ে উঠতে—কারো ছায়ায় নয়, মুক্ত আকাশের প্রসারিত দাক্ষিণ্যে।

কবিতার ক্ষেত্রে প্রমথ চৌধুরীর কোনো উত্তরাধিকারী নেই। রবীন্দ্র-যুগে তা হওয়াও সম্ভব ছিল না। সবুজপত্রের যুগে কান্তিচন্দ্র ঘোষ সনেট-রচয়িতা হিসাবে খ্যাতি লাভ করেছিলেন, অবশ্য ওমর-খৈয়ামের সার্থক অনুবাদক হিসাবেই বর্তমানে তিনি বেঁচে আছেন। তিনিও প্রমথ চৌধুরীর কাব্যরীতির দ্বারা প্রভাবিত হন নি। এমন কি চৌধুরী মহাশয়ের সনেট-রচনার পদ্ধতিও তাঁর ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। প্রমথীয় যত্নকৃত কলাকৌশল ও বাগ্‌বৈদগ্ধ্য সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে অনুপ্রাণিত

করেছিল। 'পদ-চারণ'-এর ছড়াজাতীয় কবিতা পরবর্তীকালে এক অন্নদাশঙ্করের রচনায় কিছু কিছু পাওয়া যায়। কিন্তু আস্বাদনে ও রূপায়ণে এই দু'য়ের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। অন্নদাশঙ্করের ছড়াগুলি সূক্ষ্ম-রেখায় আঁকা—কাব্যগন্ধী। *গল্পের ক্ষেত্রেও প্রমথ চৌধুরীর প্রভাব খুব দীর্ঘ নয়।* যে-যুগে শরৎচন্দ্র জনপ্রিয় কথাশিল্পী সে-যুগে প্রমথ চৌধুরীর গল্পের পাঠকসংখ্যা ছিল নির্বাচিত ও মুষ্টিমেয়। কবিতার ক্ষেত্রে তাঁর উত্তরসাধক মেলে নি, তার কারণ সেদিকে তাঁর ক্ষমতাই ছিল সীমাবদ্ধ। সে দাবী তিনিও কোনদিন করেন নি—ওটা যেন যুক্তিবাদী গদ্য-লেখকেরই লেখা—নিতান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্র। কিন্তু তাঁর গল্পগুলি সম্পর্কে এ কথা বলা চলে না। তবু গল্পলেখক প্রমথ চৌধুরীর পথ কেউ নিলেন না কেন? বোধ হয় কিছুটা চেষ্টা করেছিলেন ধূর্জটিপ্রসাদ তাঁর 'রিয়্যালিস্ট' গল্প-সঙ্কলনটিতে। শরৎচন্দ্রের গল্প-উপন্যাসে বাংলা দেশের মাটির গন্ধ আছে, আর আছে স্বল্পবিত্ত মধ্যবিত্ত জীবনের আনন্দ-বেদনার কথা। প্রমথ চৌধুরীর গল্প ঠিক সে ধরনের নয়—তিনি বাংলা দেশের আর একটি দিক দেখেছেন, আর একটি কাল দেখেছেন। তার পরিধি বড় না হলেও মূল্য কম নয়। সেখানে বৃহত্তর সমাজের কথা নেই, কিন্তু চরিত্র আছে, যা অদ্ভুত অসাধারণ—কিন্তু তাই বলে 'অবাস্তব' নয়। অনেক ক্ষেত্রে তাঁর চরিত্রগুলি 'কামলোকে' না হ'লেও 'রূপলোকে' সত্য। তাই এর অনুকরণ এমন কি অনুসরণও সম্ভব নয়। একবার একখানি চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন, 'আমার বিশ্বাস প্রতি সাহিত্যিকের অন্তরে double personality আছে, তার একটি হচ্ছে সামাজিক ব্যক্তি, অপরটি সাহিত্যিক। ...এ দুই personality-ই গড়ে তোলা যায় এবং সে গড়ে তোলা নির্ভর করে কে কোন্‌টিকে বড় মনে করেন তার উপর। সমাজে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করা সামাজিক লোকের মতে দোষ হিসাবে গণ্য হতে পারে, কিন্তু মনোজগতে বাঁচতে হলে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করতেই হবে।'[২০] গল্পকার প্রমথ চৌধুরী নৈর্ব্যক্তিক 'আমি' মাত্র—কোনো কিছুই যেন তাঁকে স্পর্শ করে না। গল্পের মধ্যে এ কালের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা নেই বললেই হয়। তাই সম্ভবত চলতিকালের ছবি যাঁরা এঁকেছেন তাঁরাও তাঁকে পরিত্যাগ করেছেন।

তবু গদ্যসাহিত্যের মুক্তিদাতাদের তিনি একজন। গল্প ও প্রবন্ধের মাঝামাঝি অনেকগুলি প্রকরণ আছে, যার সন্ধান দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। প্রমথ চৌধুরী এই অনাবিষ্কৃত ক্ষেত্রকে শুধু আবিষ্কারই করেন নি, তাকে সমৃদ্ধ

করেছিলেন। ব্যক্তিগত প্রবন্ধ বা 'খেয়ালী রচনা'র সম্ভাবনাকেও তিনি বাড়িয়ে দিয়েছেন। এ বিষয়েও তাঁর ফরাসী সাহিত্য-রসিকতা কার্যকরী হয়েছে। বিষয়ের জগদ্দল পাথরের নীচে যাতে মন ও মেজাজ চাপা না পড়ে, এইদিকেই ছিল তাঁর প্রধান লক্ষ্য। ফরাসী বেল্-লেত্যরের আদর্শ বাংলা গদ্যে নিয়ে এসে তিনি প্রকৃতপক্ষে আমাদের মনের মুক্তিই ঘটাতে চেয়েছেন। পরবর্তী-কালে বাংলাসাহিত্যের অনেক কৃতকর্মা লেখক এই পথ অনুসরণ করেছেন। কত সহজে তুচ্ছ জিনিসকেও অসাধারণ ক'রে তোলা যায়, গুরুতর কথাকেও কত সহজে সুন্দর করে বলা যায়, প্রমথ চৌধুরী বাঙালী লেখকের সামনে সেই আদর্শ ই রেখেছেন। তাঁর 'বীরবলের হালখাতা' গ্রন্থটির মধ্যে যে সংক্ষিপ্ত ও মিতাক্ষর রচনাগুলি আছে তা এই শ্রেণীর রচনার ইতিহাসে পথিকৃতের স্থান অধিকার করেছে।

একালের কয়েকজন গদ্যশিল্পীর রচনায় প্রমথ চৌধুরীর রচনার আস্বাদন পাওয়া যায়। বৈদগ্ধ্য ও প্রসাদগুণের দিক থেকে বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। বিমলাপ্রসাদের রচনাগুলির মধ্যে বৈঠকী মেজাজ ও মজলিশী মনের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর লঘুসুরের রচনাগুলির মধ্যেও বীরবলী ভঙ্গির বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। 'ইন্দ্রজিতে'র রচনাগুলির মধ্যেও বুদ্ধিদীপ্ত মননশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। রসিকতা ও মজলিশী মেজাজ কখনো কখনো সুলভ 'জার্ণালিজমে'র পর্যায়ভুক্ত হ'য়ে রচনার ধার কমিয়ে দিয়েছে। 'যাযাবরে'র লেখায় পরিচ্ছন্নতা, স্বচ্ছতা ও প্রসাদগুণের পরিচয় পাওয়া যায়। বীরবলী বাগ্‌ভঙ্গির তীক্ষ্ণতা ও দীপ্তি না থাকলেও এই কুশলী গদ্যলেখকের রচনারীতি সুসংযত ও সুকর্ষিত। 'রঞ্জন'-এর রচনাগুলি বিশ্লেষণাত্মক ও ঝাঁঝালো—তাঁর রচনাতে দীপ্তি ও দাহ দুই-ই আছে। 'রঞ্জন' মননিষ্ঠ ও যুক্তিবাদী লেখক—জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানাপথে তাঁর স্বচ্ছন্দ-বিচরণ। শ্লেষ-বক্রোক্তির সংমিশ্রণে তাঁর রচনা অম্ল-মধুর। ভাষার বাঁধুনির মধ্যেও স্থিতিস্থাপকতা গুণ আছে।

প্রমথ চৌধুরীর 'গুণপণাযুক্ত ছিব্‌লেমি'র পথেই সৈয়দ মুজতবা আলী তাঁর সাহিত্যিক জীবন শুরু করেছিলেন। তাঁর এই জাতীয় রচনার মধ্যে 'দেশে-বিদেশে' ও 'পঞ্চতন্ত্র'ই খ্যাততম। তাঁর বিচিত্রধর্মী খোশ্‌গল্প ও গালগল্পগুলির মধ্যে এক অন্তরঙ্গ মজলিশী মন প্রকাশিত হয়েছে। সাত-সাগরের নানারকম গল্প ও অদ্ভুত উদ্ভট অভিজ্ঞতা তাঁর রম্যরচনাগুলির অন্যতম আকর্ষণের কারণ হ'য়ে উঠেছে। রাজা ফারুক ও কাফে-দ্য-নীল থেকে শুরু ক'রে দেশ-বিদেশের

নানা মানুষের চাল-চলন, এমন কি খাদ্যতালিকা পর্যন্ত তাঁর কণ্ঠস্থ। গল্পের এমন প্রচুর খোরাক বাংলাসাহিত্যের অন্যত্র যথার্থই দুর্লভ! তাঁর লেখাগুলির পেছনে আছে এক আড্ডাবাজ খোশমেজাজী মানুষ—যাকে অতি সহজেই অন্তরঙ্গ বলে চেনা যায়। মুজতবা আলীর সব চেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য হ'ল তার ভাষা ও স্টাইল। আরবী, ফারসী, বিদেশী শব্দ, ককনি এমন কি 'শ্ল্যাং' দিয়েও তিনি বাংলা শব্দভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছেন। ঝরঝরে ভাষার বিদ্যুতের মতোই দীপ্তি ও গতি। নানাজাতীয় শব্দ-গ্রন্থনেও তাঁর ভাষার বাঁধুনি শিথিল হয় নি। ইংরাজিতে যাকে 'গসিপ' বলে, মুজতবা আলীর রচনাগুলি অনেকটা তাই। কিন্তু তাঁর পরবর্তী রচনাগুলিতে তার প্রাথমিক প্রতিশ্রুতিকে রক্ষা করতে পারেন নি। স্টাইলের ধার কমে এসেছে, বার বার একই জাতীয় রসিকতা করার ফলে এর দুর্বলতার দিকটাই প্রকট হ'য়ে উঠেছে।

সাম্প্রতিক কালের বাংলা গদ্যে 'রম্যরচনা'-র একটি বিস্তৃত অংশ প্রমথ চৌধুরীর পদচিহ্ন অনুসরণ করেছে। 'রম্যরচনা' শব্দটি ফরাসী 'বেল্-লেত্যর' শব্দটির আক্ষরিক অনুবাদ। ফরাসী সাহিত্যে এই শব্দটির দ্বারা একটি বিস্তৃত অংশকেই চিহ্নিত করা হয়েছে। বাংলাসাহিত্যেও চল্লিশের পর থেকে এই জাতীয় লেখার সংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে—বিষয়গত ও রীতিগত বৈচিত্র্যও তার সঙ্গে দেখা গিয়েছে। ভ্রমণকাহিনী-মূলক, আত্মজীবনীধর্মী, 'ফ্যামিলিয়ার এসেস'-জাতীয়, জীবনের লঘু-চপল মেজাজ-মর্জি-প্রকাশক, সামাজিক বা ঐতিহাসিক নক্সা, বিচিত্রধর্মী 'গসিপ'—প্রভৃতি নানাজাতীয় গদ্যরচনা এই শ্রেণীতে পড়ে। অবশ্য সাম্প্রতিক বাংলাসাহিত্যে এই শ্রেণীর রচনাগুলির সবই যে সমান রসোত্তীর্ণ হয়েছে একথা বলা যায় না। তথাপি এই শ্রেণীর রচনারীতির মধ্যে প্রমথ চৌধুরীর নির্দেশিত পথ যে অনেকখানি কার্যকরী হয়েছে এ বিষয় অস্বীকার করা যায় না। তাঁর এমন কিছু লেখা আছে যা পড়ে মনে হয়, কোন একটি নির্দিষ্ট বিষয় সেখানে নেই। কিন্তু একটি অতি সাধারণ কথার সূত্র ধরে যেই কথা বলতে সুরু করলেন, অমনি দেখা গেল রসে আকৃষ্ট হ'য়ে আরো অনেক কথা জুটে গেল—'বাজে কথার ফুলের চাষে'র ঐ তো নিয়ম। গল্পগুলিও কাহিনী ও গালগল্পের মিশ্রণ। বাংলাসাহিত্যের গল্পকাররা শরৎচন্দ্র অথবা রবীন্দ্রনাথের ধারা ধরেছেন। চেকভের পথে কেউ কেউ চলার চেষ্টা করলেও মোপাসাঁর ধারা বাংলাসাহিত্যে তেমন ভাবে আসেনি। প্রথম থেকেই প্রমথ চৌধুরী তাঁর গল্পরচনায় ফরাসী বস্তুনিষ্ঠ ধারাই অনুসরণ করেছেন। তাই মনে

হয়, প্রবন্ধ ও রম্যরচনাই তাঁর সার্থক স্বক্ষেত্র—পরবর্তীকালের বাংলাসাহিত্য অন্তত সেই রায়ই দিয়েছে।

বীরবলী স্টাইল ও ভাষার সাক্ষাৎ সাহিত্যিক বংশধর কমে এসেছে, কিন্তু উত্তরাধিকারী কমে নি। এককালে যা বিশেষ একটি বিদগ্ধ গোষ্ঠীর মধ্যেই আবদ্ধ ছিল, আজ তাই বহু লেখকের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। বর্তমান বাংলা গদ্যে 'বিশুদ্ধ বীরবলী রীতি'র সন্ধান মিলবে না, রবীন্দ্র-শাসিত বাংলা গদ্যে তা মেলা সম্ভব নয়। প্রমথ চৌধুরীর ওপর শ্রদ্ধা রেখেও রবীন্দ্রনাথের পথই এ গদ্য অনুসরণ করেছে। প্রমথীয় গদ্যরীতির শক্তিশালী উত্তরসাধকেরা রবীন্দ্রনাথের অনুসরণ ক'রে এই রীতিকেই আরো পরিমার্জিত ও শিল্পিত ক'রে তুলেছেন।

সাত

প্রমথ চৌধুরী বাংলা গদ্যে যে নূতন রীতির প্রবর্তক, তার সাফল্য সম্পর্কেও বিভিন্ন শ্রেণীর আলোচনার অবকাশ আছে। তাঁর রচনার সর্বত্র যে সমান তীব্রতা আছে, এ কথা বলা যায় না। শব্দার্থ-কৌশল ও বাগ্‌বিধির দিকে অতিরিক্ত নজর দেওয়ার ফলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে রচনার স্বাচ্ছন্দ্য নষ্ট হয়েছে—কথাগুলোকে এতবেশী প্যাঁচালো করেছেন, যার ফলে রসটুকু সবই নিঙ্‌ড়ে নেওয়া হয়েছে। শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কারের ক্ষিপ্রতা ও প্রাচুর্য বস্তুকে ঢেকে ফেলেছে। এই অভিযোগ যে সর্বৈব মিথ্যা এ কথা বলা চলে না। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে এর জন্য বাংলাসাহিত্যের প্রস্তুতিই বা কতখানি ছিল? ভাবালুতা ও বাষ্পাচ্ছন্নতার দেশে বুদ্ধিবৃত্তির জড়তা অত্যন্ত স্বাভাবিক। তা ছাড়া উনিশ শতকের হাস্য-রসিকদের সঙ্গেও বীরবলের প্রভেদ ছিল অনেকখানি।

কথ্যভাষা, 'খেয়ালী রচনা', সুমার্জিত স্টাইল—প্রমথ চৌধুরীর এই সমস্ত বিশিষ্ট দান ভাবীকালের বাংলাসাহিত্যে নিঃসন্দেহে প্রভাব বিস্তার করেছে। কিন্তু তাঁর ঐশ্বর্যদীপ্ত মনোজীবন?—সেখানে তিনি নিঃসঙ্গ, একক। একালে সাময়িকতার কোলাহল বেশী, খণ্ডকালের দাবী মেটাতেই পরমায়ু নিঃশেষিত হচ্ছে। ক্ল্যাসিকগুলির সঙ্গে পরিচয়ও ক্রমাগত ক্ষীণ হ'য়ে আসছে। ক্ল্যাসিকচর্চা এ যুগে অচল বললেই হয়। মন তৈরী করার যে প্রয়োজনীয়তা কত বেশী, এ বোধ কোলাহলের যুগে হারিয়ে যাওয়াই সম্ভব। প্রমথ চৌধুরী ছিলেন সেই জগতের মানুষ, যে জগৎ তাঁর লেখায় ফুটেছে—যে জগৎ তিনি দীর্ঘদিনের

জীবনাচরণের দ্বারা গড়ে তুলেছিলেন। তিনি এক জায়গায় বলেছেন, 'মানুষের ভিতরে-বাইরে যে গতিশক্তি আছে, তা মানুষের মতির দ্বারা নিয়মিত ও চালিত। এই মতিগতির শুভপরিণয়ের ফলে যা জন্ম লাভ করে তারই নাম উন্নতি। আমাদের মনের অর্থাৎ বুদ্ধি ও হৃদয়ের উৎকর্ষ সাধনেই আমরা মানব জীবনের সার্থকতা লাভ করি। জীবনকে সম্পূর্ণ জাগ্রত করে তোলা ছাড়া আয়ুবৃদ্ধির অপর কোনো অর্থ নেই।'[২১] প্রমথ চৌধুরী এই আয়ুই বাড়াতে চেয়েছিলেন। মনন-জীবিত মানুষের এর চেয়ে বড় কামনা আর থাকতে পারে না।

প্রমথ চৌধুরী কামলোক থেকে আমাদের মনকে রূপলোকে নিয়ে যেতে চেয়েছেন। সুস্থ, সংযত, সুসভ্য ও রুচিশীল জীবন ছিল তাঁর প্রার্থনীয়। প্রাচীন এথেন্স ও প্রাচীন ভারতবর্ষের জীবনচর্যার রসে তাঁর বাসনালোক ছিল অভিসিঞ্চিত। তাই ক্লাসিক্যাল জগতের নন্দনস্বপ্ন তাঁর সম্মুখে এক অতি মানসিক আবহের সৃষ্টি করেছিল। এখানে বিদূষক বীরবলের কথা-কৌশলের আড়ালে এক জীবনরসিক দার্শনিক আছেন। তিনি একসময় বলেছিলেন, 'আর যদি এ কথাই সত্য হয় যে, আমরা সুন্দরভাবে বাঁচতে পারিনে তা হ'লে আমাদের সুন্দরভাবে মরাই শ্রেয়ঃ। তাতে পৃথিবীর কারো কোনো ক্ষতি হবে না, এমন কি আমাদেরও নয়।' কথাটাকে শুধু বীরবলী প্যারাডক্স বলে উড়িয়ে দেওয়া সম্ভব নয়, কারণ এর নেপথ্যে আছে তাঁরই কথা যিনি বিংশ শতকের কলকাতায় বসে মনোজীবনে প্রাচীন এথেন্সের অধিবাসী ছিলেন। তাঁকে 'ড্রইংরুমের সাহিত্যিক' বা 'ভঙ্গিসর্বস্ব-গদ্যলেখক' বললে শুধু বিচার-বিমূঢ়তা ও আংশিক দৃষ্টিরই পরিচয় দেওয়া হবে।

চিরাচরিত অভ্যাসের বল্মীকস্তূপে যে জীবন আচ্ছন্ন, কর্মনাশা জড়তা যেখানে প্রাণ-প্রবাহ স্তিমিত করেছে, অলস-ভাবালুতা যেখানে বুদ্ধিকে নিত্যই ঘুম-পাড়ানি গান শোনায় সেখানে প্রমথ চৌধুরী নূতন মন্ত্র শোনালেন। এ জীবনকে জাগাতে গিয়ে তাই বিদ্রূপের কশাঘাত করতে হয়েছে, বিদূষক সেজে রসিকতার ছলে অনেক গভীর কথা শোনাতে হয়েছে, আবার নিজের সমৃদ্ধ রূপচর্যা দিয়ে পথ দেখানোর চেষ্টা করেছেন। ইসথেটিক্সের অনেক কথাই তিনি বলেছেন। তাই তাকে পলায়নবাদী নিছক স্বপ্নদর্শী বললেও ভুল করা হবে। তিনি বলেছেন, 'তবু এ কথা সত্য যে, মানবজীবনের সঙ্গে যার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নেই, তা নিতান্ত সাহিত্য নয়, তা শুধু বাক্-ছল। জীবন অবলম্বন করেই সাহিত্য জন্ম

ও পুষ্টিলাভ করে, কিন্তু সে জীবন মানুষের দৈহিক জীবন নয়। সাহিত্য হাতে-হাতে মানুষের অন্নবস্ত্রের সংস্থান করে দিতে পারে না। কোনো কথায় চিঁড়ে ভেজে না, কিন্তু কোনো কোনো কথায় মন ভেজে; এবং সেই জাতির সাধারণ সংজ্ঞা হচ্ছে সাহিত্য।' তাঁর সাহিত্য-সম্পর্কিত ধারণার নির্গলিতার্থ এই মন্তব্যটির মধ্যেই উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

প্রমথ চৌধুরীর মানসিকতায় উনিশ শতক ও বিংশ শতাব্দীর চিন্তাধারার সংমিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। জ্ঞান-বিজ্ঞান-পরিশীলিত উনিশ-শতকী ক্ল্যাসিক ধারার সঙ্গে আধুনিক চিন্তা-চেতনার একটি সমন্বয় ঘটানোর প্রয়াস আছে। ক্রোচে, বার্ণার্ড শ', বের্গসঁ প্রভৃতি মনীষীর চিন্তাধারা তাঁকে প্রভাবিত করেছে। তিনি লিখেছেন, তার চেয়ে বেশী পড়েছেন এবং সবচেয়ে বেশী বোধ হয় ভেবেছেন—অথচ আশ্চর্যের বিষয় হল এই যে মন তৈরী করার গোপন কৌশল তিনি জানতে দেন নি। লেখক হতে গেলে যে প্রস্তুতির প্রয়োজন, এ কথাই তিনি তাঁর জীবনাচরণের ভেতর দিয়ে জানিয়ে গেলেন। তাই সুলভ জনপ্রিয়তার মোহ তাঁর চিত্তচাঞ্চল্য ঘটায় নি, পাঠকের মনোরঞ্জন করতে গিয়ে তাঁকে কোনো কালে 'নট-বিটের' পর্যায়ভুক্ত হ'তে হয় নি। তাই তাঁর কাল যতই দূরবর্তী হবে ততই তাঁর কণ্ঠ স্পষ্ট ও বলিষ্ঠ হ'য়ে উঠবে, 'Fools look at thy heart and write'।

ভাবীকাল এই উজ্জ্বল-শাসনের মধ্যেই খুঁজে পাবে তার অনন্ত সম্ভাবনাময় চিত্ত-মুক্তির ইতিহাস।

২. চলমান জীবন (দ্বিতীয় পর্ব): পৃ: ৩০২-৩০৩
৩. চলমান-জীবন (প্রথম পর্ব): পৃ: ২২০।
৪. চলমান-জীবন (প্রথম পর্ব): পৃ: ২২২-২২৩।
৫. সবুজ-পত্র: কার্তিক, ১৩২১।
৬. চিঠিপত্র (পঞ্চমখণ্ড): ১০২ নং।
৭. সবুজ-পত্র: আষাঢ়' ১৩৩৩।
৮. চিঠিপত্র (পঞ্চম খণ্ড): ৬৩নং।
৯. কথা ও কাজ: সবুজ-পত্র, চৈত্র, ১৩৩২।
১০. চিঠিপত্র (পঞ্চম খণ্ড): ৭০নং।
১১. চলমান জীবন (প্রথম পর্ব): পৃ: ১২৭
১২. সবুজ কথা: সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী।

১৩. সবুজপত্র : শ্রাবণ. ১৩৩৩।

১৪. প্রমথ চৌধুরীর আত্মকথার ভূমিকা : অগ্রহায়ণ, ১৩৫২।

১৫. সবুজপত্র : পৌষ, ১৩২৬।

১৬. ঐ : জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৪।

১৭. বীরবল : জীবন-শিল্পী, পৃ: ৪১।

১৮. প্রমথ চৌধুরী : সবুজপত্র ও আমি : আধুনিকতা, পৃ: ৩১।

১৯. ভূমিকা : পথে প্রবাসে।

২০. রাধারাণী দেবীকে লেখা চিঠি : বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৫৪।

২১। প্রাণের কথা : নানাকথা।